অকথিত কাহিনী

AKATHITA KAHINI

A Bengali Translation of

THE UNTOLD STORY

By Lt. General B. M. Kaul

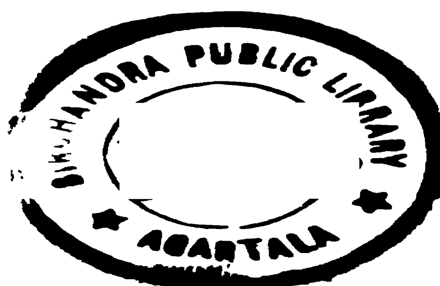
[Rupees Twenty only]

অকথিত কাহিনী

[THE UNTOLD STORY]

লেঃ জেনারেল বি. এম. কল

সম্পাদনাঃ বিজন চক্রবর্তী



সান্যাল এণ্ড কোম্পানী
১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল, এম. এ , এল্‌এল্‌. বি.
১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রী বিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৩৫।এ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭

ব্লক ও ছবি ছাপা :
ন্যাল আর্ট প্রেস প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা ১৩

পুস্তক গ্রন্থনা :
ইউনাইটেড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
২৯ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৫

কুড়ি টাকা।

আমার সহধর্মিণী ধনরাজ কিশোরী
এবং কন্যা অনুরাধা ও চিত্রলেখাকে—

গ্রন্থকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গ্রন্থখানি রচনার ব্যাপারে আমার সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করেছেন প্রিমুলা পণ্ডিত; বহুমূল্য নির্দেশ পেয়েছি কে. পি. মুশ্‌রন্‌ এবং পি. কে. শুণ্ডলু'র কাছ থেকে; মনি বাদশাহ, দেবী দত্ত এবং গিয়ানী সপ্রু করেছেন অমূল্য সাহায্য; পাণ্ডুলিপির কিছুটা অংশ টাইপ করেছেন আশা চন্দ্রা; পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন চুন্নো এবং কামনী; একনিষ্ঠ সহায়তা করেছেন আমার ভ্রাতা শ্যাম কুমার কল; এবং গ্রন্থের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন রাজীন্দর পুরী। এ ছাড়া, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এবং স্তরে বহু সুহৃদ আমার তথ্যগুলির যথার্থতা যাচাই করে দিয়েছেন।

এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

১৯৬৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পি. টি. আই-এর সংবাদে প্রকাশ, ১৪ই নভেম্বর তারিখে লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় সরকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, 'অকথিত কাহিনী' গ্রন্থখানির জন্য লেখক লেঃ জেনারেল বি. এম. কলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। বহুবিতর্কিত এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অতীব প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও অবশেষে প্রকাশিত হ'ল।

প্রকাশনায় অ্যালায়েড্‌ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার শ্রী আর. ভি. উল্লাল, শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশশী রায় এবং শ্রীবিভূতিভূষণ রায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে অমূল্য সাহায্য করেছেন শ্রীগিরিজা প্রসাদ ক্ষেত্রী; অব্যাহত অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন শ্রীমতী রাণু চক্রবর্তী। এঁদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অনুল্লিখিত থাকলে গুরুতর কর্তব্য-চ্যুতি ঘটবে।

পরিশেষে, যাঁর জন্য এই দুরূহ কার্য সম্পাদিত হ'ল, সেই পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সাহিত্য-ভারতীর চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল

॥ পূর্বাভাষ ॥

নিয়তি মানুষের প্রতি সব সময় সদয় থাকে না। সুবিখ্যাত বহু রাজনীতিবিদ্, সৈনিক এবং সন্ন্যাসী নিয়তির শিকারে পরিণত হয়ে মনুষ্য সমাজে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। মহত্বের দাবী আমি করি না। কিন্তু অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে আমারও; এবং তাঁদের অনেকের মতো, কোন্ পরিবেশ ও প্রভাবের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি এবং দেশ-মাতৃকার সেবায় কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছি, সেগুলি বর্ণনা করবার উদ্দেশ্যেই এই জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হ'লাম।

বিগত কয়েক বৎসরে ব্যক্তিগত ভাবে আমার বিরুদ্ধে এবং বিশেষ কতগুলি পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বহু কুৎসা প্রচারিত হয়েছে। অথচ নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করবার কোন সুযোগই পাই নি আমি। ফলে, মূল্যায়ন হয়েছে এক তরফা। যে ঘটনাবলীর জন্য আমার বিরুদ্ধে এই কুৎসার সংগ্রাম, সেগুলি সম্বন্ধে আমি অথবা অন্যেরা কে কতখানি দায়ী, আশা করি পাঠক সাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করেই নির্ণয় করতে পারবেন।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে আমাদের সেনাবিভাগে দু'ধরনের অফিসর ছিলেন: যাঁরা আ[illegible]াদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করতেন; এবং যাঁরা, হয় ছিলেন সেই স্বাধনীতা-তরঙ্গের বিরোধী, নয় তো সে সম্বন্ধে উদাসীন। প্রথমোক্তদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। শেষোক্ত ব্যক্তিরাই ছিলেন দলে ভারী। আমার জাতীয়তাবাদী মনোভাব তথা নেহ্রু এবং অন্যান্য মহান নেতাদের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা এই শেষোক্ত দলের উপহাসের কারণ ছিল। অবশ্য উপহাস তাঁরা করতেন ব্রিটিশের আনুকূল্য লাভের আশায়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর, ব্রিটিশ রাজত্বের এই উগ্র সমর্থকগণ দারুণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কিন্তু এঁরা ছিলেন সুবিধাবাদী। ভারতের যে নেতৃবৃন্দ কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিলেন তাঁদের অবজ্ঞার পাত্র, সেই নেতৃবৃন্দেরই তাঁরা অনুগত হয়ে পড়লেন রাতারাতি। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বের সময় নিজেদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে কোনদিনই এঁরা বিবেক-দংশন থেকে রেহাই পান নি। শুধু তাই নয়, স্বাধীন ভারতে নিরাপত্তার

অভাবও তাঁরা বোধ করতে থাকেন। সুতরাং, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ক্ষমতাসীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের, বিশেষ করে নেহ্‌রুর কাছে আমার অবারিত দ্বার দেখে এই সুবিধাবাদীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আমার প্রতি নেতৃবৃন্দের এইরূপ মনোভাবের সঠিক কারণ কি তা' বলতে পারি না। হয় তো, চরম সংকটকালে উক্ত সুবিধাবাদীরা যখন তাঁদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন সেই সময় আমি তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম এবং মাঝে মধ্যে আমার পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁরা অতি প্রয়োজনীয় মনে করতেন বলেই আমার প্রতি অনুরক্তি ছিল তাঁদের। এ পরিস্থিতি আমি সৃষ্টি করি নি ; ঐতিহাসিক পরিবেশই সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আমার উন্নতির ফলে, উক্ত সুবিধাবাদীদের কাছে আমি হয়ে পড়লাম অভিশাপ স্বরূপ। ঈর্ষান্বিত হয়ে দেশে ও বিদেশে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী বন্ধু মহলে সুযোগ মতো আমার সম্বন্ধে নানা গাল-গল্প, গুজব, নিন্দা ইত্যাদির অবাধ এবং ব্যাপক প্রচারকার্যে তাঁরা লেগে পড়লেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বহু পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করলেন ; এবং আমি যে যোগ্যতা তথা প্রয়োজনীয় গুণাবলী ছাড়াই 'রাজনৈতিক' প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে চলেছি, এমন একটি ধারণা সুসম্বদ্ধ এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় একাধিক মহলে গড়ে তোলবার ব্যাপারেও অনেকাংশে সফল হলেন।

স্বাধীনতার আগে এবং পরে, সরকার-নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ডে যাচাই করে কর্মজীবনে বহুবার আমাকে দায়িত্বশীল পদের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই আমার অনুকূলে যোগ্যতা অথবা অভিজ্ঞতার নিয়মাবলী এতটুকু শিথিল করা হয় নি। কর্ম-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিদের অধীনে এবং স্মরণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে কাজ করবার বহু সুযোগ আমি পেয়েছি। এবং সেই সময়, স্মরণীয় তথা বিপজ্জনক বহু পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করে কিছুটা খ্যাতিও অর্জন করেছি। ফলে, স্বভাবতঃই প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার প্রতি রুষ্ট হন এবং আমার সুনাম হানির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। প্রকাশ্যে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার অনুমতি সরকার আমাকে দেন নি। কিন্তু কয়েকটি মহল থেকে প্রায়ই আমার বিরুদ্ধে

কুৎসা রটনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়, তখন নেহ্রু নিজেই সংসদ এবং সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিকবার আমাকে সমর্থন করেন। অবশ্য এর জন্যও সমালোচকেরা বলতে ছাড়েন নি যে, নেহ্রু আমার দোষগুলি চাপা দিচ্ছেন। বেশ কিছু দিন ধরে এই অন্যায়-অবিচার সহ্য করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় এসে উপনীত হলাম, যখন সময়কাল পূর্ণ হবার পূর্বেই সামরিক কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার সংকল্প গ্রহণ করতে হ'ল। বর্তমান গ্রন্থে সেই বিষয়েরই আলোচনা করেছি।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরও আমার কুৎসা রটনাকারীরা ক্ষান্ত দেন নি। অবশেষে নেহ্রুকে এ ব্যাপারে একখানি পত্র লিখলাম, এবং তার উত্তরে
সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর কাছ থেকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি পাই:

'এই মাত্র তোমার ২৬শে সেপ্টেম্বরের চিঠি পেলাম। এ ব্যাপারে তোমার মনের অবস্থা বেশ ভালো ভাবেই অনুভব করছি। সুযোগ মতো ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি খণ্ডন করবার তোমার প্রস্তাবের সঙ্গেও আমি একমত। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখবে। বর্তমান আক্রমণগুলি তোমার বিরুদ্ধে ততখানি নয়। আসল লক্ষ্য হলেন ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন, এবং খানিকটা আমিও। বহু লোকেরই আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক রূপে আমি বর্তমান রয়েছি। আমাকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে তোমায় ও কৃষ্ণ মেননকে। উপযুক্ত অবসরে এই ব্যাপারটির আমরা ফয়সালা করবো। সুযোগ মতো তুমিও জনসাধারণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থিত করতে পারো। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তোমার সে ধরনের কোন বিবৃতিতে বিশেষ কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না।'

নেহ্রুর উপদেশ সশ্রদ্ধচিত্তে মেনে নিয়ে প্রকাশ্যে আজ অবধি কিছু বলি নি। কিন্তু নেহ্রুর মৃত্যুর পরও আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার অব্যাহত রয়েছে দেখে মনে হয়, জনসাধারণের কাছে কিছু কিছু তথ্য তুলে ধরার উপযুক্ত সময় আজ এসে গেছে। তিন বৎসর আমার লেগেছে এই গ্রন্থখানি লিখতে, এবং এর মধ্যে স্পষ্টভাবে বহু ব্যক্তি এবং বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তার মধ্যে কিছু কিছু হয়তো অপ্রিয় মনে হবে। কিন্তু যা' সত্য, তা' বলতেই হবে আমাকে।

দিল্লী ক্যানটনমেণ্ট

বি. এম. কল

সূচীপত্র

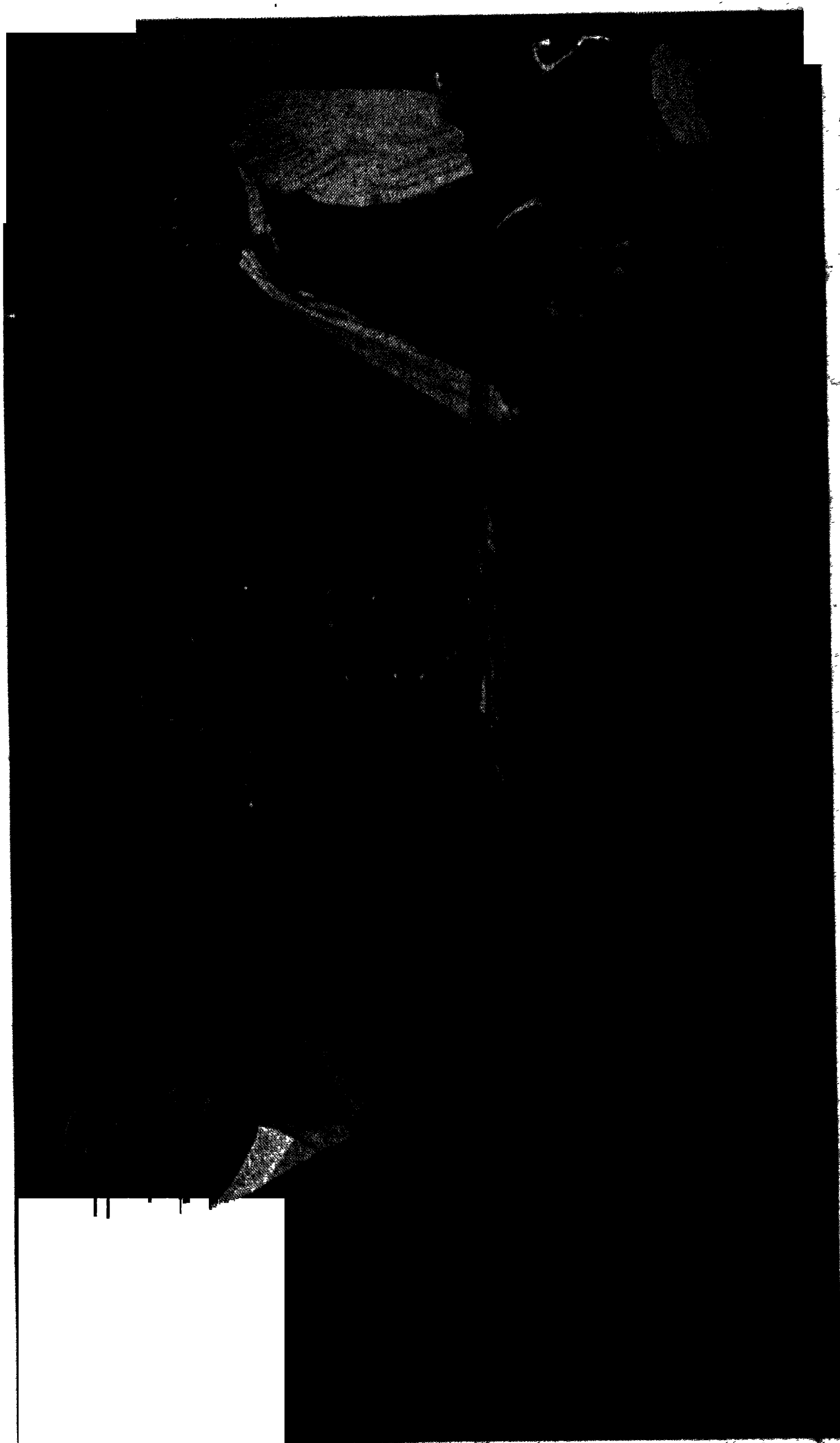
চিত্রসূচী



গ্রন্থকার : ১৯৩৫ সালে রাজপুতানা রাইফেলস্-এর সেকেণ্ড লেফ্টনাণ্ট্



১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট : ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং গ্রন্থকার





রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বস্তি পরিষদে ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর মামলায় গ্রোমিকো, শেখ আবদুল্লা এবং গ্রন্থকার



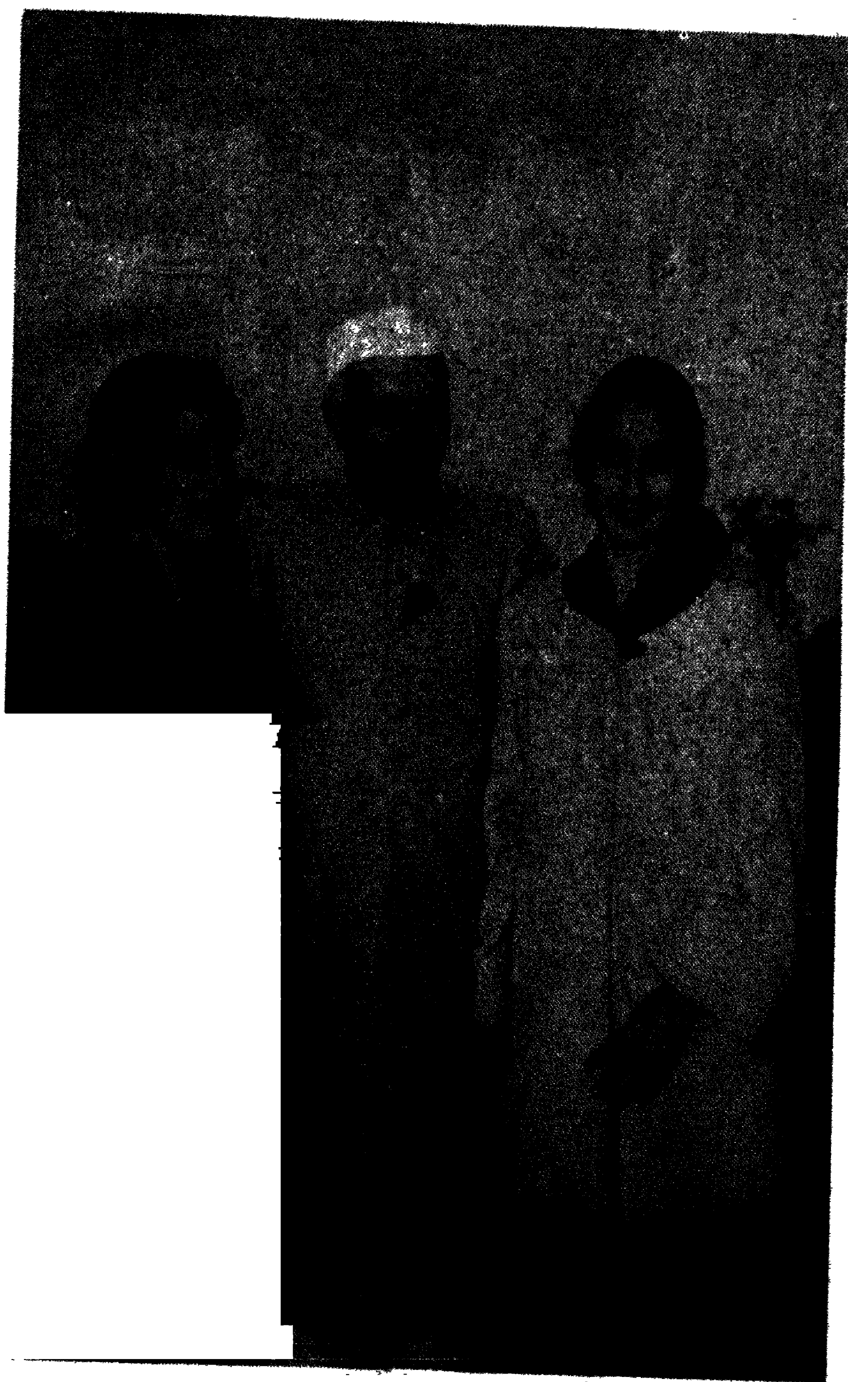
১৯৫৩ সালে কোরিয়ায় জেনারেল ম্যাকস্‌ওয়েল টেলার এবং গ্রন্থকার



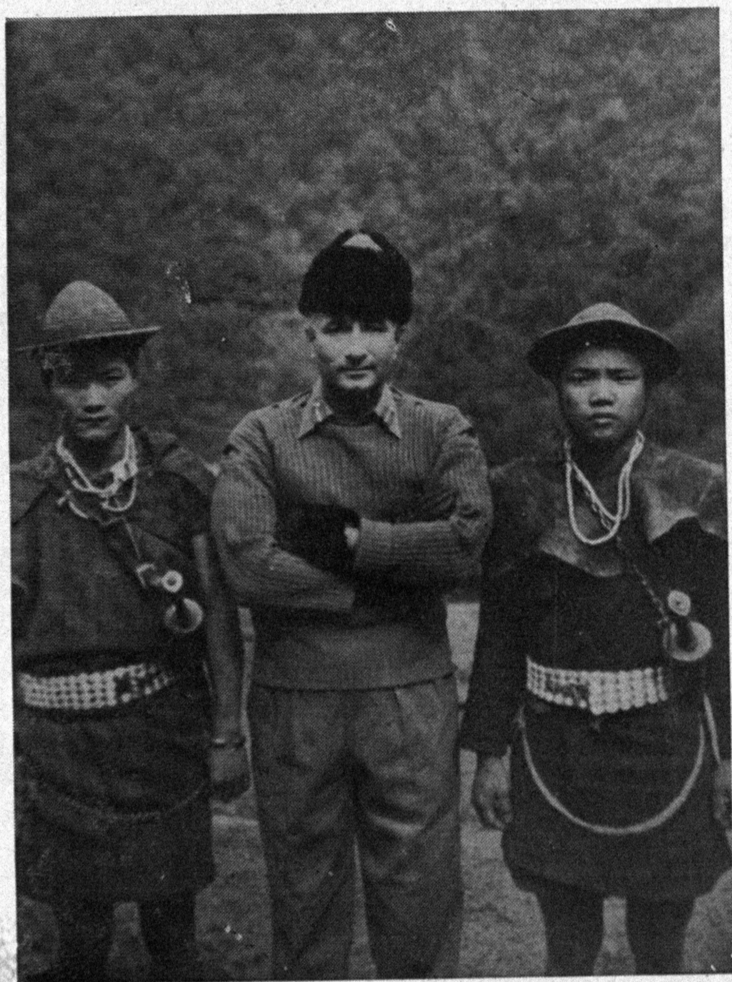
১৯৫৯ সাল : জেনারেল কে. এস. থিমায়ার সঙ্গে গ্রন্থকার (পশ্চাতে বক্সী গুলাম মহম্মদ)



১৯৫৯ সালে জওহরলাল নেহ্রু, কৃষ্ণ মেনন এবং গ্রন্থকার



১৯৫৯ সালে নেহ্‌রুর সঙ্গে গ্রন্থকারের কন্যাদ্বয়



নিফা ১৯৫৯ : লংজুর পথে
দুইজন থাগিন উপজাতীয় ব্যক্তি ও গ্রন্থকার

১

প্রস্তাবনা

ব্যথাতুর জীবনালেখ্য

তার্ন

•

আমার সপ্তম জন্মদিবস। পূজার্চা ও কাঙ্গালী ভোজনের পর নতুন ঝলমলে পোষাক পরতে দেওয়া হলো আমাকে, আর সেই সঙ্গে পেলাম সুন্দর সুন্দর নানা উপহার। ছোট্ট করে বলতে হলে বলতে হয়, এই উদ্দীপনাময় বাৎসরিক আনন্দোৎসবের দিনটিতে আমাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ করা হলো। এই দিনটি যদি বার বার আর তাড়াতাড়ি আসত!

সপ্তাহ কয়েক পর। উঃ, সে এক ভয়ংকর আঁধার রাত্রি! আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ চমকে উঠে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন নিশাবসানে উষার প্রথম আলো সবে ফুটে উঠেছে। আকাশে বিদ্যুৎ আর বজ্রনির্ঘোষ আর সেই সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে মুষল ধারায় বৃষ্টি। মৌসুমী ঝড়ের তাণ্ডবে গাছপালা মাথা ভেঙ্গে হেলছে দুলছে। চোখে তখনও ঘুমের আবেশ, শুয়ে শুয়ে সেদিনের জন্মদিনের আনন্দধারার স্বপ্ন বুনছি, এমন সময়ে বাবা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে বললেন যে মামণি আমার মারা গেছেন। কয়েক লহমা কেটে গেল আমার এ দুঃসংবাদ হৃদয়ঙ্গম করতে। তারপর আমি ভেঙ্গে পড়লাম কান্নায়, অঝোর কান্নায়।

মা আমার মারা গেলেন কলেরায়, মারা গেলেন বিনা চিকিৎসায়, কারণ আমাদের গাঁয়ে না ছিল ডাক্তার, না হাসপাতাল। মার বয়স তখন পঁচিশ। ঝাঙের কাছে আমাদের গ্রাম, আজ সে-অঞ্চল পাকিস্তানে। মৃত্যুকে আমি দেখলাম এই প্রথম।

হিন্দু নবজাতকের ঠিকুজি তৈরি করার রীতি আছে। বুদ্ধের পুণ্য জন্মদিবসে আমার জন্ম, সৌভাগ্যের নক্ষত্রোদ্ভাসিত এই দিন···সুতরাং আমার সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তবুও আমাদের পরিবারে এই যে দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে পরিযুক্ত হয়ে দেখা দিল, আমার ঠাকুরমা তাই ঠিকুজিখানা আবার জ্যোতিষীকে দিয়ে পাঠ করিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করলেন।

বাবার বয়স তখন তিরিশ-উর্ধ্ব। সংসারযাত্রায় তিনি ছিলেন কঠোর, তাঁর কথাই ছিল আইন। মাদকদ্রব্য তিনি স্পর্শও করতেন না, জীবনাভ্যাসে তিনি ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু, স্পার্টান। অতি প্রত্যুষে আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হতো, শীতে-গ্রীষ্মে সেই সাত-সকালেই ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাওয়া শেষ করতে হতো আবার রাত সাতটার মধ্যেই শুয়ে পড়তে হতো।

দু'বছর পর বাবা আবার বিয়ে করলেন। নতুন মাকে আমার বেশ ভালোই লাগলো। সে-সময়ে আমরা অমৃতসরের কাছে ছোট্ট শহর তারণ-তারাণে বাসা বেঁধেছি। বাবা সেচ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার, প্রায়ই এখানে-ওখানে তাঁর কর্মস্থলের পরিবর্তন হতো। ফলে আমার শিক্ষা হয়েছে অনেক স্কুলে। খ্রীষ্টান, মুসলিম, শিখ, হিন্দু—সর্বধর্মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আমাকে বাবা ভর্তি করিয়েছেন এই কারণে যে শিশুকাল থেকেই যাতে আমি সর্বধর্মের বাণী শিখে সমভাবে সব ধর্মমতকে সম্মান করতে শিখি। বাবা বলতেন যে প্রত্যেক ধর্মের ব্যাখ্যাতারাই তাঁদের নিজের নিজের ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের বাণীর সত্যিকারের ব্যাখ্যা খুঁজে পান, অন্য ধর্মের ব্যাখ্যাকে আংশিক বলে মনে করেন। বাবা বলতেন ভগবান এক এবং সব ধর্মই তাঁরই পায়ে ভক্তকে নিয়ে যায় কিন্তু কোন ধর্মই ঈশ্বরের ধারণা পরিষ্কার করে বলে নি। তাই তাঁর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন নাম। কেউ তাঁকে চিন্তা করে মানবিকরূপে, কেউ করে অ-মানবিকরূপে। আবার কেউ কেউ তাঁকে ব্যাখ্যা করে অবিনাশী শক্তিরূপে, সর্বশক্তিমান শাশ্বত শক্তির আধার বলে, যিনি জীবন ও মৃত্যুর অধীশ্বর। জীবন আমাদের শিখিয়েছে সেই ব্রহ্মাকে আরাধনা করতে যাঁর করুণায় জীবন-কর্মশক্তি বুক ভরে গ্রহণ করে আমরা আছি বেঁচে, যাঁর করুণায় পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে তার কক্ষপথে।

বাবা আরও বলতেন যে, কোন্ সুপ্রাচীন কাল থেকে, খ্রীষ্ট যুগারম্ভের বহু বহু পূর্বে, মানুষ সূর্য-পূজা করে আসছে সেই তাপাধারকে দেবতা মনে করে। আমাদের চিন্তা ও দর্শন সীমার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থিত এই সূর্যই হলো সর্বোজ্জ্বল সর্বশক্তিমান। জীবজগতের প্রাণশক্তির মূল যেমন সূর্য, তেমনি জীবনীশক্তির হর্তারকও সে। নভোমণ্ডলের এই পরমার্থ শক্তির আধারকে সব ধর্মই সম্মান করে। এই অনাদি আদিত্যের পানে তাকিয়ে তাঁরই পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকে তারা। সহস্র সহস্র বৎসর

পূর্বে আর্যরা অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। হিন্দু ও জাপানের রাজ-রাজড়ারা তাঁদের বংশোদ্ভবের সূত্র দাবী করেন অর্ক দেবতার সঙ্গে। তাহলে সূর্য কি দেবতা ?—বাবা প্রশ্ন করতেন।

প্রত্যেকদিন স্কুলে যাবার আগে আমি লক্ষ্য করতাম পাদ্রী গীলফোর্ডকে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একায় চেপে যেতে। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত রুগীদের সেবায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল মিশনের এই অশীতিতম বৃদ্ধ নিজের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি ব্যয় করেছেন। রোগাক্রান্ত দুর্ভাগাদের সান্ত্বনা দেওয়ার সেবায় এই বৃদ্ধ দৃঢ় সংযমী জীবন যাপন করতেন। বহুদিন ব্যাপী এই আত্মোৎসর্গ তাঁর ধার্মিক সদ্গুণের প্রতীক বলে স্থানীয় লোকেরা তাঁকে সম্মান করতো।

একদিন গীলফোর্ড সাহেব আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বোঝালেন ভগবানের নিকট প্রার্থনার মূল্য, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের অগণিত করুণামিশ্রিত আশীর্বাদের জন্য তাঁকে আমাদের হৃদয়-উজাড়-করা ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজনীয়তার কথা। তিনি আমাকে খাওয়ালেন পেট পুরে, তারপর আমরা জানু পেতে প্রার্থনা করলাম ভগবানের উদ্দেশ্যে—একজন হিন্দু কিশোর, আর একজন খ্রীষ্টান।

পরদিন আমি দেখলাম গীলফোর্ডকে তাঁর কর্মস্থলে। একটা জীর্ণ অট্টালিকায় তাঁর ওষুধ বিতরণের কেন্দ্র অবস্থিত। করুণাপ্লুত নয়ন-সম্বলিত উদার বৃদ্ধ সহকারী ডাঃ দাসকে নিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন তাঁর দাওয়াই-খানায়। অদূরে হিমেল হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ-বাস পরে রুগীরা, কারও হাতের আঙুল গেছে খসে, কারও পায়ের অংশ অদৃশ্য, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সমস্ত স্থানটিতে যেন এক রোগের দুর্গন্ধ। মিশনারী ডাক্তার অতি সযতনে রুগীদের ক্ষতস্থান দেখছেন। সেবাধর্মে সমাহিত আত্মনিবেদনকারীর এক অপূর্ব জীবন!

সে-স্থান পরিত্যাগ করে আমি গেলাম আশ্রমের প্রধান কেন্দ্রে। কিছু কিছু রুগীদের এখানে ভর্তি করা হয়েছে, পরিষ্কার কাপড় ও বিছানা দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে তারা পাচ্ছে সযত্ন ব্যবহার, বোধ হয় জীবনে এই প্রথম পাওয়া। প্রতি প্রত্যূষে গীলফোর্ড আসতেন তাদের দেখতে, প্রার্থনা করতেন তাদের জন্য, তারাও বিচিত্র সুর আর হৃদয়-উজাড়-করা ধ্বনি তুলে গাইত তাঁর সঙ্গে। রোগমুক্তির কত না আকুতি এই দুর্ভাগাদের, কিন্তু কতটুকু তার সম্ভাবনা!

তারণ-তারাণ বাসের সময়ে বার কয়েক আমি গিয়েছি এই কুষ্ঠাশ্রমে।

হতভাগ্য মানুষদের দুর্দশা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দেখবার অভিজ্ঞতা আমার সেই প্রথম, দুঃখ নিবারণের একটা অন্তর-আনন্দানুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ আমার সেদিন থেকে। আমি দেখেছি নৈঃশব্দের মহান্ সম্মানে খ্রীষ্ট ধর্মকে সেবায় ডুবে থাকতে।

আমার বোন দুলারী ছিল প্রিয়দর্শিনী। ও ছিলো আমার অনুরক্তা, আর আমিও ওকে ভালবাসতাম। বাবা ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলাভিলাষী গৃহকর্তা, বহু সাংসারিক নিয়মকানুনে তিনি ঘিরে রাখতে চাইতেন আমাদের বাড়িটিকে। যেমন সন্ধ্যার পূর্বেই আমাকে গৃহে ফিরে আসতে হতো। দু'বার আমার দেরী হয়েছে আর বাবাও আমাকে রূঢ়ভাবে সাবধান করে দিয়েছেন। আর এক সন্ধ্যায় ফিরতে আবার আমার দেরী হয়ে গেল, বাবা আমাকে ধরে আচ্ছাসে প্রহার করতে শুরু করলেন যা আমি কোনদিন ভুলতে পারি নি। দুলারী মাঝে দাঁড়িয়ে আড়াল করে সে-যাত্রা আমাকে যেভাবে বাবার সেই প্রহার থেকে বাঁচিয়েছে, সে-কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারি নি।

আজকাল পড়ার চাপের দরুণ সন্ধ্যার বহু পূর্বেই খেলা শেষ করে আমি বাড়ি ফিরে আসি। মাস কয়েক পর, স্কুলের কোনও উৎসবানুষ্ঠানের কারণে আমার আবার ফিরতে দেরী হয়ে গেল। বাড়ি ফিরেই যে প্রহারের সম্মুখীন আমায় হতে হবে তার কথা ভেবে আমি ভীত হয়ে পড়েছি। আমার সে-ভীতির কথা আমি বলে ফেললাম আমার শিখ বন্ধু অঙ্গদকে। ও আমাকে সর্ববিপদ মুক্তির জন্য শিখধর্মের ভোরের ভজনা 'জপ্ জী সাহেব' গাইতে বলল, তাতে বলে আমার বিপদ কেটে যাবে। বিশ্বাস হয় নি আমার, তবুও বাঁচার তাগিদে আমি সেই স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে ছুটলাম গৃহপানে। আধ ঘণ্টা আমার লাগল 'এক ওংকার শত্ নাম··· ···কর্তা পুরাখ···' শিখতে। আমি ছুটছি আর সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে গাইছি সেই গান। পা টিপে টিপে যখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করছি, বাড়ির বৃদ্ধ ভৃত্য আমাকে দেখে বলল যে বাবা হঠাৎ এত্তেলা পেয়ে অফিসে গিয়েছেন ঘণ্টাখানেক আগে, সুতরাং প্রহারের ভয় নেই। আমি হতবাক, বিস্মিত! অঙ্গদ, আমার প্রিয় বন্ধু অঙ্গদ ঠিকই বলেছে; ওদের ভজন গান তাহলে সত্যিই আমাকে বিপদমুক্ত করে দিয়েছে। শিখ ধর্মের প্রতি আমার ভক্তির সূত্রপাত সেদিন থেকে।

এক অবস্থাপন্ন ঘরের জনৈক যুবকের সঙ্গে দুলারীর বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথম দিন থেকেই বনিবনা হলো না, মতান্তরের এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে রইল ওদের দু'জনার মধ্যে। নীরবে সহ্য করেছে দুলারী এই মতান্তরের দহন-জ্বালা, ধীরে ধীরে ওর নরম দেহে পড়তে লাগল তারই কৃষ্ণ ছায়া। একদিন ওর লেখা ছোট্ট একখানা চিরকুট এল বাবার কাছে···সহনশীলতার শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে লেখা···'যদি একবার শেষ দেখা দেখতে চাও তোমার দুলারীকে, তবে চিঠি পেয়েই চলে এসো।' চিঠিখানা যেন নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাত। একটা কঙ্কালের ছায়া শুয়ে আছে, কোটরাগত চোখের চারিধারে মসীকৃষ্ণ কালোর গভীরতা, বিষাদের প্রতিমূর্তি। জ্বরে সমস্ত দেহ পুড়ছে। এই অর্থহীন জীবন-বাসে মেয়েকে ফেলে রাখতে চাইলেন না বাবা, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

বাড়িতে নিয়ে এসে চিকিৎসককে দিয়ে ওকে ভালো করে দেখানো হলো। রাজযক্ষ্মায় আক্রান্ত দুলারী, দুটো লাংস্ই গিয়েছে। আদরের দুলারীকে বাঁচাবার জন্য বাবা তাঁর সর্বৈশ্বর্য ঢেলে দিলেন, ভারতের সর্বপ্রান্ত থেকে চিকিৎসক আনিয়ে বাঁচাতে চাইলেন প্রাণের কন্যাকে। কিন্তু দুরাশা। রাজযক্ষ্মার কীটাণু আমাদের দুলারীকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। নৈরাশ্য-ভরা জীবন দুলারীও চায় না আর ধরে রাখতে। ধীরে ধীরে ওর জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল আমাদের চোখের সামনে। বাবার সর্ব-চেষ্টা সত্ত্বেও দুলারী আমাদের ছেড়ে চলে গেল। মাসের পর মাস ওর মৃত্যু যেন আমাদের সবকিছুকে বিষাদাচ্ছন্ন করে রাখলো।

অমৃতসরে নিম্মিরা বাস করতো আমাদের পাশের বাড়িতে। একই বয়সী আমরা—চোদ্দ—নিম্মি ছিল সত্যিই চমৎকার মেয়ে। পরস্পরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ ছিল, ছেলেমানুষী বয়সের উর্ধ্বেও যেন কিছুটা সে-আকর্ষণ। প্রতি শনিবার রাত্রে বাবা আমাকে ও নিম্মিকে তাঁর কাছে ডেকে নিতেন ইতিহাস এবং সমকালীন ঘটনাপঞ্জী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ঝালিয়ে দেবার জন্য। ১৯১৯-এ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশরা যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করেছিল তার বিশদ বিবরণ যখন বাবা বলতে থাকতেন, আমরা তখন দু'জনে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বসে শুনতাম। সেই বিপদ কাহিনী বলতে গিয়ে

আব্রাহাম লিঙ্কনের একটা কথা বাবা উল্লেখ করতেন, 'কোন জাতিই পর জাতির উপর সুশাসন করতে সক্ষম নয়।' তিনি বলতেন, অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার অধিকার প্রত্যেকটি জাতির শাশ্বত অধিকার। ভারতে ব্রিটিশ শাসনারূঢ়ের ইতিহাস বলতে বলতে তিনি মন্তব্য করতেন : এই হচ্ছে একটা জাত যারা বলে, 'আমরা কখনও হবো না গোলাম,' অথচ ভারতবর্ষকে গোলামীর শৃঙ্খলে এরাই বেঁধে রেখেছে এবং তার জন্য এদের এতটুকু লজ্জা নেই। তিনি শেষ করতেন এই বলে, যত সুন্দরভাবেই ওরা বলুক না কেন, ইংরেজদের ভারত-শাসনের ইতিহাস লজ্জায় ভরা।—বাবার এই সব কথা আমার মধ্যে স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা সর্বপ্রথম জাগিয়ে দিল।

কিছুদিন পর বাবা অন্যত্র বদলি হয়ে গেলেন। চোখের জল ফেলে আমি নিম্মির কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম।

বাবার অনেকগুলো অনুশাসন-নিয়মাবলী ছিল। তাঁর সঙ্গে কোনরকম তর্কালোচনা ছিল অচল। তাঁর কথার প্রত্যুত্তর তিনি সহ্য করতেন না। থিয়েটার, সিনেমা, গান, জাঁকাল পোষাক পরা ছিল নিষিদ্ধ। বই পড়ার ব্যাপারেও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে পাঠাভ্যাস আবদ্ধ রাখতে হবে। ব্যায়াম বলতে তিনি বুঝতেন বহু সময়ব্যাপী ঘোড়ায় চেপে দৌড়নো। দশ বৎসর বয়সে বাবা আমাকে ঘোড়ায়-চড়া শেখান, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে বাবা চাইতেন আমি ঘুরে বেড়াই। বহুবার আমি পড়ে গিয়েছি এবং এই ভাবেই অবশেষে আমি ঘোড়ায় চড়া শিখেছি। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আমি যদি আহত হতাম, এবং তা যত গুরুতর আঘাতই হোক না কেন, বাবা কোনরকম কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘোড়ায় চাপতে বাধ্য করতেন। খালের জলে ছুঁড়ে দিয়ে বাবা আমাকে সাঁতার শিখতে বাধ্য করেছিলেন। বাবা দাঁড়িয়ে থাকতেন খালের পাড়ে আর আমি স্রেফ বাঁচার তাগিদে হাবুডুবু খেতে খেতে হাত-পা নেড়ে সাঁতার শিখেছি।

কলেজে ঢুকবার পর বাবা আমাকে সাইকেল কিনে দেন। কিন্তু স্কুল-জীবনে মাথা-ফাটা রোদে, ঝড়-বৃষ্টিতে আর হাড়-কাঁপানো শীতে আমাকে দূর-দূরান্তে হেঁটে চলাচল করতে হয়েছে, কারণ, সব রকম অবস্থার মধ্যেই যাতে আমি মানুষ হয়ে উঠি। স্কুল-জীবনে আমার হাত-খরচ বলে কিছু

দেওয়া হতো না, কারণ, তাতে বদাভ্যাস কিছু হতে পারে বলে বাবার ধারণা ছিল। ৪৪০ গজ দৌড়-প্রতিযোগিতার কথা শুনে বাবা ঠাট্টা করতেন: 'কোথায় ঘোড়ায় চেপে মাইলের পর মাইল দৌড়ুবি, না হাত কয়েক দৌড়!' নাটক-কবিতা-সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বাবা মনে করতেন ক্লীবের আনন্দলাভ। টাকা ধার করা বাবার কাছে ছিল গর্হিত কর্ম।

১৯২৯, জওহরলাল নেহ্‌রু, কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত সভাপতি জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে এসেছেন। আমি তাঁকে সেই সর্বপ্রথম দেখলাম। বিদ্রোহী ভারতের প্রতীক মঞ্চে উঠলেন বক্তৃতা দিতে, শ্রোতৃবর্গের করতালি ধ্বনিতে সভা মুখর হয়ে উঠলো। মনোহর দর্শন, দোহারা চেহারা, সর্ব অঙ্গ যেন বাটাল কুঁদে কুঁদে তৈরী এক মর্মর মূর্তি। সেই বিশাল জনসমুদ্রকে তিনি উদ্দীপনায় নাচিয়ে তুললেন বিপ্লবের কথা বলে। দুঃখে, লজ্জায় ভেঙে পড়তে চাইলেন ভারতের ক্ষুধার্ত জনগণের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে। ভারতবর্ষ ও সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য একই সূত্রে জড়িয়ে নিয়ে একই নিঃশ্বাসে বলে গেলেন কেম্ব্রিজের এই স্বপ্নালু গ্রাজুয়েট, যে বক্তৃতা শুনে বিদ্যুৎ-চমকে সেই বিশাল জনতা উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ-মৈত্রীর প্রতীক এই নতুন নেতা যেখানে স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়েছে সেইখানেই যেন চলেছেন নিজের জীবন হাতে নিয়ে। ভারতবর্ষ ছাড়াও পরবর্তী জীবনে জওহরলালকে আমরা দেখেছি বারসিলোনার ফ্যাসিষ্ট বুলেটের মধ্য দিয়ে বোমাবিধ্বস্ত চুংকিঙের পথে 'ইতিহাসের সঙ্গে কদম কদম চলতে।' আমার পরবর্তী জীবনে এই ব্যক্তিটির ভূমিকা যে কত বড় হয়ে উঠবে, সেকথা কী সেদিন আমি একটুও বুঝেছিলাম!

ভারতের জাতীয় আন্দোলন তখন পূর্ণোদ্দমে চলেছে এবং অনেকের মত আমিও সেদিন সেই অভ্যুত্থানের শরীক হতে চেয়েছিলাম। সেই সময়ে কলেজে রাজ নাম্নী আমার এক সুপরিচিতা সহপাঠিনী আমাকে ওদের বাড়িতে রাত্রে নিমন্ত্রণ করলো। যখন শুধু আমরা দু'জনে—ওর মা শুতে গিয়েছেন—রাজ আমার কাছে জানতে চাইলো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে আমি কী তাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী আছি। সেই মুহূর্তে আমার কানকে আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। জালিয়ানওয়ালাবাগের

সেই অত্যাচার-কাহিনীর পর আমি তো এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম! আমি রাজের প্রস্তাবে উৎফুল্ল হয়ে রাজী হয়ে গেলাম। রাজ আমাকে ভেবে দেখতে বলল, এ জীবন-পথের ঝুঁকি সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে দিল। রাজের এই সাবধান-বাণী আমাকে যেন এই কাজের পথে আরও টেনে নিয়ে গেল। আমার সহপাঠিনীর চোখে স্বাদেশিকতার আগুন আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার স্বীকৃতিতে রাজ খুশী। উষ্ণ আবেগে আমার হাত দু'খানি ঈষৎ স্পর্শে একবার ও ধরল।

কিছুদিন পর আমার জন্য কর্মসূচী এল। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর আবাসের ফটকে জাতীয় ভাবধারা সম্বলিত একখানা দেওয়াললিপি সেঁটে দিতে হবে। ফটকে পাহারা থাকে সর্বসময়ে। এই দেওয়াললিপি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রতীক। এই দুঃসাহসিক কার্যের ভার আমাকে উদ্দীপনানুভূতির মধ্যে যেন টেনে এনে ফেললো। তিন-চার রাত্রি আমি বাড়িটাকে বিভিন্ন দিক থেকে অবলোকন করলাম। লক্ষ্য করলাম, মধ্যরাত্রির পাহারাওয়ালা সাহেবের বাঙ্লোর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। সেই অবসরে আমার কাজ সমাপন করে স্বচ্ছন্দে আমি চলে যেতে পারি। এক নিশীথ রাত্রে আস্তে আস্তে সবার অলক্ষ্যে আমার কাজটা হাসিল করে সাইকেলে চেপে আমি সরে পড়লাম। এ কাজে আমার হাতে খড়ি হলো।

কয়েকদিন পর আমার উপর এলো দ্বিতীয় কাজের ভার। পুরান কেল্লায় গিয়ে এক সাধুকে একটা প্যাটরা দিয়ে আসতে হবে। মধ্যরাত্রে সবার অগোচরে প্যাটরাটা আমি দিয়ে এলাম। কী আমি বহন করলাম আর কে যে গ্রহীতা, সবই আমার অজানা। এ কাজের এই ছিল রীতি।

স্যার জন সাইমন এসেছেন ভারতে। ভারতের স্বায়ত্বশাসনের স্বীকৃতি বা শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা,—কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য এ সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছেন তাঁরই নেতৃত্বে সাইমন কমিশন। এই কমিশনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে জাগলো তীব্র বিরোধীতা। আমাদের মুক্তিস্পৃহাকে কঠিন বাঁধনে আবার বাঁধবার কর্মসূচী নিয়েই যেন প্রেরিত হয়েছে এই কমিশন। সুতরাং যেখানে তাঁরা গিয়েছেন সেইখানেই অভ্যার্থনা পেয়েছেন কৃষ্ণপতাকা সহ 'সাইমন ফিরে যাও' ধিক্কার-ধ্বনি দিয়ে। যখন দিল্লীতে এলেন, আমিও চেঁচালাম হাজার হাজার লোকের সেই মিছিলে, সর্বশ্রেণীর লোকের সেই

শোভাযাত্রায়। সেই প্রতিবাদ মিছিলে তখন অনাহূত পরিদর্শকের প্রতি তীব্র উষ্মা ধ্বনিত হচ্ছে।

আমি প্রায়ই পরিষদ-ভবনে যেতাম পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু, মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলী জিন্নার মত বাগ্মীদের হৃদয়-উদ্বেলিত-করা বক্তৃতা শুনতে। একদিন আমি গিয়েছি নিরাপত্তা আইনের খসড়া নিয়ে যে বিতর্ক চলেছে পরিষদে, তাই শুনতে। ব্রিটিশ শাসনকর্তা এই খসড়াটিকে আইন হিসেবে পাশ করিয়ে নিতে তৎপর। এই আইনটি চালু হলে অনির্দিষ্টকাল যে-কোনও ব্যক্তিকে কারাগারে বন্দী করে রাখা যাবে। সেদিন পরিষদ ভবনের দর্শক গ্যালারী পরিপূর্ণ। আমার মনে পড়ছে পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রুর সেই তীব্র ধিক্কারের ভাষা: 'আমি তাঁদের মধ্যে একজন নই যাঁরা কেঁপে ওঠেন…।' মুহূর্তে সমগ্র ভবনটির অভ্যন্তর যেন আলোড়িত হয়ে উঠলো। দুটি যুবক, আমারই পাশে তারা বসে, আমার অচেনা, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একজন তার কোটের নীচে থেকে এক বাণ্ডিল ইস্তাহার বের করে চারদিকে ছড়িয়ে দিল। ইস্তাহারের শীর্ষে মুদ্রিত: 'ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ…বধিরকেও শোনাতে হবে।' এবং মুহূর্তের মধ্যে পর পর একই সঙ্গে ভগৎ সিং[১] ও বটুকেশ্বর দত্ত দুটি বোমা ছুঁড়ে মারলেন। মেঝেতে পরে বিরাট প্রতিধ্বনি তুলে সে দুটো ফেটে পড়লো। চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো। একজন বিরাট-বপু ভীত মনোনীত সভ্যকে এক বেঞ্চির নীচে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে দেখলাম, আর একজনকে দেখলাম শৌচাগারে গিয়ে লুকোতে। মাত্র দু'জন নেতাকে দেখলাম পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে: বিঠল ভাই প্যাটেল আর পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু। তাঁর নিজের দলের সভ্যদের ডেকে নেহ্‌রু বলছেন: 'আরে ভাই, ভাগতে কীঁয় হো! ইএ তো কই আপনে হি আদমি মালুম হোতে হ্যাঁয়।'

অনেকের সঙ্গে আমিও সন্দেহবশে বন্দী হলাম। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত পরে পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন, কারণ, বহু নির্দোষ ব্যক্তি অহেতুক অভিযুক্ত হচ্ছে। পরিষদ ভবন থেকে যখন এই বিপ্লবীদ্বয়কে

১। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের হিংসাত্মক কাজের দিকে যখন গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'আমি শান্তিতে বিশ্বাসী। তবে যে কোনও মূল্যে শান্তি আমি চাই না। পাথরের শান্তি, গোরস্থানের শান্তি আমি চাই না। যেখানে কাপুরুষতা আর হিংসার মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন, সেখানে আমার পরামর্শ হিংসার পক্ষে।'

পুলিশ হাজতে নিয়ে যাওয়া হলো, তাঁরা পথে চেঁচিয়ে উঠলেন: 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'[২] বাঘের মতন দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাঁরা হেঁটে গেলেন জনসাধারণের মধ্য দিয়ে। তাঁদের দেখে গর্বে আমার মন ভরে উঠলো। যে বোমা তাঁরা পরিষদ-ভবনে ফেলে গেলেন তাতে সমগ্র ভারত কম্পিত হয়ে উঠলো।

পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু সংবাদ আমরা পেলাম। একটা মিছিল পরিচালনা কালে স্যণ্ডার্স নামক পুলিশ অফিসর লালাজীকে এমন প্রহার করে যে তাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনায় সবাই উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিপ্লবী পার্টির ভগৎ সিং পুলিশ প্রধান কেন্দ্রের সামনে স্যণ্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন। চোখের বদলে চোখ। সেই ঘটনার পর ভগৎ সিং লুকিয়ে ছিলেন। উপরে বর্ণিত ঘটনার সময়ে ভগৎ সিংকে আবার দেখা গেল।

ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের বিচার হলো। রায়: প্রথম জনের মৃত্যুদণ্ড ও দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ব্রিটিশ পণ্যের বহ্ন্যুৎসবে যোগ দেবার পথে আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেলাম যে, সেই দিনই জাতীয় আদর্শ-দেবতা ভগৎ সিং-এর ফাঁসী হবে লাহোর কারাগারে। ভাবপ্রবণতার বন্যায় আমি ভেসে গেলাম। আমি ছুটে গিয়ে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম যেখান থেকে লাহোর জেলের প্রাচীর দেখা যায়। সেই প্রাচীরের অন্তরালে ভগৎ সিং-এর জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু তার পরোয়ানা নিয়ে।

সমস্ত জাতীর দুঃখের আর শ্রদ্ধার শরীক হলাম আমি। পরবর্তীকালে সেই বীরের মৃত্যুকাহিনী আমি শুনেছি একজনের কাছে যিনি চাক্ষুষ দেখেছিলেন সেই দৃশ্য। সেই দিনই রাজগুরু আর শুকদেবের ফাঁসী হয়ে গেছে দেশমাতৃকাকে ভালবাসার জন্য। ফাঁসীর মঞ্চে উঠবার পূর্ব মুহূর্তে ভগৎ সিং-কে মুখাবৃতের জন্য একটি আচ্ছাদন দেওয়া হলো। সেই আচ্ছাদন ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থুঁতনি তুলে বীরদর্পে তিনি এগিয়ে গিয়ে উঠলেন ফাঁসীর মঞ্চে। দেশের জন্য জীবনাহুতি দেবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন বলে তিনি খুশী—একথা বলে তিনি রজ্জুতে চুম্বন করলেন; তারপর

২। এই সর্বপ্রথম এই ধ্বনি দেওয়া হলো। পরবর্তীকালে এই ধ্বনি সমস্ত জাতীয় দলের রণধ্বনি হয়ে উঠেছে।

তিনি ভারতীয় কারাধ্যক্ষ, ডাক্তার ও ম্যাজিস্ট্রেটকে বিদায় জানালেন। ফাঁসী তাঁর হয়ে গেল, চোখ ঠিকরে যেন আগুন বের হচ্ছিল, আর মুখে ছিল বিপ্লবের জয়গান। নীরব ভারতীয় কর্মচারীরা দুঃখে, বেদনায়, লজ্জায় অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলো বীর দেশসেবকের ফাঁসীর সাক্ষী হয়ে।

জনক্রোধ ফেটে পড়বার আশঙ্কায় ভগৎ সিং-এর মৃতদেহ আত্মীয়-স্বজনের কাছে তুলে দিতে ব্রিটিশপুঙ্গবদের সাহস হয় নি। শোনা যায় তাঁর আংশিক দগ্ধ দেহ পরদিন প্রত্যুষে শতদ্রু নদীর তীরে পাওয়া যায়। সেই শবাংশ যখন লাহোরে আনা হলো, সমস্ত শহর যেন ফেটে পড়লো। আড়াই লক্ষ ক্ষুব্ধ জনতা বীর শহীদের শেষকৃত্য সমাপনের জন্য শ্মশানে গেল। সমস্ত দেশ কাঁদলো বীরের জন্য।

(ছত্রিশ বৎসর পর আমার কানে এল যে প্রখ্যাত দেশসেবক বটুকেশ্বর দত্ত মরণাপন্ন অসুস্থতায় শয্যাশায়ী আছেন দিল্লীর মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে। ১৯১৫-র ১১ই ফেব্রুয়ারী আমি গেলাম তাঁর সন্দর্শনে।* ১৯২৯-এর পর এই তাঁকে আবার দেখা। আমি তাঁকে বললাম সেদিনের কথা, সেই পরিষদ ভবনে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে বোমা ফেলার কথা। তাঁর চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠলো। তিনি বললেন, ১৭ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। সংবাদপত্রের শিরোনামার বিষয়বস্তু যে তিনি হতে পারেন, কোনদিন তা ভাবেন নি। ভগৎ সিং এবং তিনি মিলে যে কাজের ভার নিয়েছিলেন তার পরিণতি সম্বন্ধে তাঁদের সম্যক্ ধারণা ছিল। দেশের জন্য জীবনাহুতির সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল। আদালতে নিজেরাই আত্ম-সমর্পণের জন্য হাজির হয়েছিলেন, তার আগে তাঁদের কেউ ধরতে পারে নি। দেশের সাধারণ মানুষের উপর অহেতুক অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে দেখেই তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন। অসুস্থতার কারণে কয়েক বৎসর পর বটুকেশ্বর ছাড়া পেয়েছিলেন কিন্তু ১৯৪২-এ আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। কারাগারের অভ্যন্তরে এবং বাইরে ক্রমাগত অসুস্থতায় তাঁর স্বাস্থ্যটি একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। মাস কয়েক হলো তাঁর অসুস্থতা আরও বেড়েছে। তিনি বললেন যে গুলজারিলাল নন্দা চিকিৎসার জন্য তাঁকে এখানে আনিয়েছেন। ভগৎ সিং-এর সম্বন্ধে তিনি বললেন যে ফাঁসী হবার দিনই ফাঁসীর কয়েকঘণ্টা মাত্র আগে সন্ধ্যা পাঁচটায় ভগৎ সিং-কে কর্তৃপক্ষ বলে যে তাঁর ফাঁসী হবে। ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং শুকদেব বীরের মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে ফাঁসীর মঞ্চে গিয়ে

জীবনাহুতি দিয়েছেন। তাঁরই কাছে শুনলাম যে হৃদয়হীন সরকারী কর্তৃপক্ষ এঁদের আংশিক দগ্ধ দেহ নদীর তীরে ফেলে রেখেছিল যার বর্ণনা আমি ইতিপূর্বে দিয়েছি।

সেদিনের সেই বিপ্লবী দত্তকে এই অসুস্থ ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় দেখে আমার দু'চোখ ভরে জল এল। চোখে তাঁর আগুন, মনোবল এখনও দৃঢ়। ১৯২৯-এ তাঁদের সেই কার্যাবলীর জন্য আমাদের মধ্যে যে স্বাদেশিকতার বীজ রোপিত হয়েছিল, তাঁদের একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের এই সৌভাগ্য হওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। বিদায়ের সময় আমি তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যদি কোনরকম কিছুর জন্য আমার সাহায্য দরকার হয় তিনি যেন দ্বিধাহীন-চিত্তে আমাকে জানান। দু'চোখ তাঁর জলে ভরে গেল। বিষাদভরা কণ্ঠে তিনি শুধু বললেন: "কারুর কাছেই আমার কোন প্রয়োজন নেই ভাই।"[৩]

আমাদের দুর্ভাগ্যই বটে যে, বটুক বাবু যখন মারা গেলেন ১৯৬৫-র জুলাইয়ে,—যাঁর অসমসাহসিক কার্যাবলীর জন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে গিয়েছিল, চারিধার থেকে তখনই তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি উপচে পড়লো ঠিকই, কিন্তু ১৯৪৭-এর পরেও তাঁকে দিন গুজরানের জন্য এক রুটি তৈরীর ছোট্ট কারখানা এবং একটি মোটর বাস পরিবহন প্রতিষ্ঠান চালাতে হতো।)

অফিস থেকে একদিন বাবা ফিরে এলেন তীব্র মাথাব্যথা নিয়ে। কিছুক্ষণ পর তাঁর শরীরটা গুলোতে শুরু করল এবং বাক্ ও দৃষ্টিশক্তি দুটোই তিনি হারিয়ে ফেললেন। চিকিৎসকেরা দেখে-শুনে বললেন যে সন্ন্যাস রোগ হয়েছে বাবার, যার সহজ অর্থ হলো বাবা যে কোনও মুহূর্তে আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন। সে দুর্ভাগ্যের দুঃশ্চিন্তায় আমি ও মা দু'জনেই আঁতকে উঠলাম। নিজের অবস্থাটা বাবা বেশ বুঝতে পারছিলেন। তিনি ইঙ্গিতে আমাদের দু'জনকে ডাকলেন বিছানার পাশে। বাক্‌শক্তি হারাবার আগে অতি ক্ষীণ ও ভাঙা কণ্ঠে তিনি আমাদের বললেন: 'সময় পাবো না···সাহস হারিও না···যাবার আগে দু'টো কথা বলছি···হরনারায়ণ ও আজিজ···আমার

দুই পুরানো বন্ধু···তাদের যে টাকা আমি ধার দিয়েছিলাম তা কখ্‌খনো তোমরা চাইবে না। খুব কষ্টে আছে তারা·· ঋণ পরিশোধের মতো অবস্থা তাদের এখন নেই। টাকা শোধ দিতে যে তারা পারবে না একথা জেনেই আমি তাদের টাকা দিয়েছি। তোমরাও খুব কষ্টে পড়বে আমি জানি। কিন্তু তোমার বয়স কম, আমার বন্ধুদের তো তা নয়। আমার শেষ ইচ্ছা যে তাদেরকে টাকার কথা বলো না।'

আমার প্রতি এই উপদেশ দিয়ে বাবা আমার মা'র হাতখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন: 'তুমি নিশ্চয়ই তোমার মার যত্ন নেবে।'

বাবার জীবনীশক্তি দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। বিড়বিড় করে বাবা বললেন:

'মনে রেখো, টাকাই সংসারে যত অনর্থের মূল। কখনও টাকার প্রতি যেন আসক্তি না জন্মায় আর কারও কাছ থেকে টাকা ধার নেবে না। আমি এবার···বিদায় নেব ··।'

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলেন, করুণ দৃষ্টিতে একবার শেষ বারের মতো তাকালেন আমাদের দিকে, তারপর সব শেষ।

বিপদের মেঘ যেন নেমে এল আমাদের ওপর। মা'র সাজানো সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। আমি সান্ত্বনা দিতে চাইলাম আমার দুই ভাই আর বোনকে। এক নৈরাশ্যকর করুণাহীন ভবিষ্যৎ যেন ওঁৎ পেতে রয়েছে আমাদের জন্য। ১৯৩০-এর মার্চ, আমার বয়স তখন আঠারো পেরোয় নি।

দিন কয়েকের মধ্যে সংসারের বাড়তি জিনিস ফেলে দিয়ে, চাকর-বাকরকে বিদায় জানিয়ে, আমরা গুছিয়ে নিলাম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো। চাকর-বাকরেরা বিদায়ের সময় কাঁদলো আমাদের জন্য।

যতো দিন যেতে লাগলো আমাদের বন্ধু-সংখ্যা কমতে লাগলো। দিল্লী-বাস আমাদের কাছে কঠিন হয়ে উঠলো। আমরা ঠিক করলাম লাহোরে গিয়ে বাস করবো। দিল্লী ত্যাগের দিন খুব কম বন্ধুই এলেন আমাদের বিদায় জানাতে। এই প্রথম আমার অভিজ্ঞতা হলো দারিদ্র্যের দিনে বন্ধুত্বের মূল্য-বিচারের এবং এ অভিজ্ঞতা লাভ আমার শেষ নয়।

লাহোরে পৌঁছে কোথায় গিয়ে উঠবো তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিলো না। আসবার আগে ভাবতেও পারি নি। ষ্টেশনে মা বসে রইলেন জিনিস-পত্রসহ ছেলে মেয়েদের নিয়ে আর আমি বেরোলাম বাড়ি ভাড়া করতে।

বিকেলের দিকে একটা বাড়ি পেলাম, মাঝারী ধরনের বাড়ি। ষ্টেশন থেকে আমরা গিয়ে উঠলাম সেই বাড়িতে। সে-রাত্রে অভুক্ত অবস্থায় আমরা শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে বুঝলাম আমাদের এই নতুন আবাসে কীভাবে আমাদের হাত-পা না ছড়িয়ে মাথা গুঁজে দিন কাটাতে হবে। আমাদের পূর্ব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তুলনা এখানে অর্থহীন তবুও আমরা এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিলাম ধীরে ধীরে কিছুদিনের মধ্যে।

বাবার যে জীবনবীমা ছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; দুলারীর চিকিৎসায় যা অর্থ-সম্পত্তি ছিল সে-সব বন্ধকে গিয়েছে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রায় কিছুই আমাদের হাতে এল না। মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে বাবা মারা গেলেন। আমাদের অভাব নিয়ে আমি মার সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমরা ঠিক করলাম যে এ অবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে, না-হয় শেষ হয়ে যাব। আমাদের অবস্থা আমাকে যেন জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়ে জীবন-পথে দাঁড় করিয়ে দিল।

এ অভাবী অবস্থায় বন্ধু পাবার বাসনা স্বাভাবিক কিন্তু দেখলাম পড়শীরা আমাদের এড়িয়ে চলে, আমরা প্রায় একাকী। বহুদিন আমাদের একবেলা খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। আমাদের কাছে জীর্ণ বসন পরিবর্তন এক বিরাট সমস্যা, তার উপর যদি অসুখ-বিসুখ হয় তো প্রায় বিনা চিকিৎসা। বিলাস আমাদের জীবনে এখন স্বপ্ন। সামাজিক অবিচার ও অসম্মান আমাদের সহ্য করতে হয়েছে মুখ বুজে, তবে আমরা তা কোনমতে সহ্য করেছি। মাথা নোয়াব না, আত্মসম্মান রক্ষা করে জীবনপথে চলব—এই প্রতিজ্ঞা আমার মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। ভগবানের নামে—আমার জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার নামে শপথ করলাম, আমি পূর্ণভাবে জীবনসংগ্রামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে যাব এবং সম্ভব হলে একদিন আমার ভাগ্যকে প্রতিষ্ঠা করবো।

আমি লাহোরে গভর্ণমেণ্ট কলেজে[৪] ভর্তি হলাম। গ্যারেট, ডিকেন্সন, ল্যাংহর্ন এবং আমেদ শাহ্ বুখারীর মত প্রতিভাবান অধ্যাপকরা এখানে পড়াতেন। প্রচুর পরিশ্রম সহকারে আমি পড়তাম এবং কলেজের যাবতীয় কাজে-কর্মে, খেলাধুলায়, নাটকে অংশ গ্রহণ করতাম। ক্রিকেট ছিল আমার প্রিয় খেলা।

৪। ইতিপূর্বে দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্সে আমি পড়তাম।

স্যাণ্ড্‌হার্স্টের জীবন ছিল আমার কাছে প্রিয়। আমার কলেজের সমকালীন ছাত্রদের মধ্যে অনেকে, যেমন হরিশ সরকার, যোগ দিয়েছিলেন বিমান বাহিনীতে। তাঁদের উদাহরণ আমি চাইতাম আমার জীবনে অনুধাবন করতে। আমার দু'জন সহপাঠী সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলো, তারা আমাকেও বলল যোগ দিতে। আমি যখন লাহোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি বললেন রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্য আমার দরখাস্ত বিবেচিত হবে কিনা সন্দেহ আছে। আমি তাঁকে জানালাম যে আমি সমস্ত দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের শরীক হয়েছিলাম মাত্র। আর আমি তো চাইছি আমার দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে—বিদেশী সেনাবাহিনীতে নয়। সুতরাং আমার দরখাস্ত কেন বিবেচিত হবে না আমি বুঝতে পারছি না। যে কোন কারণেই হোক, আমাকে সেনাবাহিনীর প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হলো। ব্রিটিশ বিচক্ষণতার প্রশংসা করতে হবে এই কারণে যে আমার জীবনের প্রেক্ষাপট জেনেও তাঁরা আমাকে মৌখিক পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর দিলেন এবং মাস কয়েক পর আমাকে স্যাণ্ডহার্স্টে শিক্ষার জন্য মনোনীত করলেন। ভাগ্যদেবী আমার দিকে একবার তাকালেন এবং আমাদের সমাজও যেন এবার আমার দিকে একটু দৃষ্টি দিল। চারদিক থেকে অভিনন্দন বাণী আসতে লাগল। মার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

স্যাণ্ডহার্স্টের জন্য মনোনীত হওয়া সৌভাগ্য সন্দেহ নেই কিন্তু এর সঙ্গে অন্য প্রশ্নও জড়িত আছে। খরচের টাকা জোগাড় হবে কোথা থেকে। মার হাতে যে কয়েকটা টাকা ছিল, তা তিনি বার করে দিলেন কিন্তু আমি তা গ্রহণ করতে রাজী নই। আমি চাইলাম আর একবার উঠে দাঁড়াতে। নিজের অর্থকষ্টের কথা জানিয়ে আমি সেনাবাহিনীর প্রধান কেন্দ্রের এ্যাড্‌জুটাণ্ট জেনারেলের কাছে চিঠি লিখলাম। আমি চাইলাম অর্থ সাহায্য। দরখাস্তখানা স্বাভাবিকভাবে পাঠিয়ে দিয়ে আমি সিমলায় অবস্থিত হেডকোয়ার্টারে হাজির হবো বলে মনস্থ করলাম। ভারতবর্ষের এই 'পেণ্টাগনে'* একটি লোককেও আমি জানি না। কিন্তু দিনকয়েক সেখানে ঘুরে-ফিরে আমি এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে ফেললাম। আমার যদি ঠিক মনে

* মার্কিন আমেরিকার সেনাবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র।—অনুবাদক

থেকে থাকে, আমি সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেলাম তৎকালীন এ্যাড্‌জুটাণ্ট জেনারেল লেফট্‌নাণ্ট জেনারেল টুইসের সঙ্গে। আমি তাঁর সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তিনি আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—যেন এক বিরাটকায় দৈত্য তাকিয়ে দেখছে ফড়িংকে। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন দংশন থেকেও তীব্র। আমার কাহিনী সংক্ষেপে শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: 'আমি ঠিক কাজ করছি কিনা জানি না। তবে আমার কাছে আসতে হলে যে সব নানাধরনের প্রতিবন্ধক আছে তা যে ভাবে তুমি পেরিয়ে এসেছ, তাতে আমার মনে হয়, পেছনে লাথির পরিবর্তে তোমাকে একটা ফুলের তোড়া দেওয়া উচিত! সুতরাং আমি তোমাকে পাঁচহাজার টাকা দিচ্ছি তোমার দুরবস্থা বিচার করে যাতে তোমার খরচের কিছু সুরাহা হয়। তোমার শুভকামনা করছি।' টুপি খুলে আমি অভিবাদন জানালাম। এই খেলয়াড়ী সহজ চরিত্রের জন্যই সমস্ত বিশ্ব ইংরেজদের প্রশংসা করে।

লাহোরে ফিরে এসে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে আমি বাকী টাকা ধার করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং ইংলণ্ডে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

এই সময়ে হঠাৎ নিম্মির মার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। নিম্মি মরণাপন্ন অসুস্থ। ঘোরের মধ্যে নিম্মি আমার সঙ্গে দেখা করার কথা বার বার বলছে। মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে আমি ছুটলাম নিম্মিদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। নিম্মি বিছানায় পড়ে আছে, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, মুখখানি পাণ্ডুর, জীবনের চিহ্ন যেন নেই চোখের তারায়। ঠোঁট দুটো শুকনো, থর্ থর্ করে কাঁপছে। ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্মির মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানার পাশে বসে নিম্মির দুর্বল কম্পমান হাতখানা আমার হাতে নিয়ে সর্বান্তঃকরণে চাইলাম ও যেন ভাল হয়ে ওঠে। জ্বরের তীব্র উত্তাপে ওর সমস্ত দেহ পুড়ে যাচ্ছে। ওর মা আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন যে ডাক্তার বলছেন মেনিনজাইটিস্ এবং জীবনের কোনরকম আশাই দেন নি। মৃত্যু থেকে মৃত্যুবেদনা যেন অসহনীয়। নিম্মির সমস্ত মুখে তারই পদচিহ্ন ফুটে উঠেছে। অতি দ্রুত ওর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমরা ওর চারপাশে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিম্মি আমাদের ছেড়ে চলে গেল। অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী নিম্মি পড়ে আছে বিছানায়, বয়স মাত্র উনিশ, জীবনহীন। এ দৃশ্য দেখা যায় না।

আমি ভাবতে পারছি না যে নিম্মি আর কথা বলবে না। আজ এতদিন পরেও নিম্মির স্মৃতি যেন আমার মনকে ঘিরে আছে।

পরদিন ইংলণ্ডের পথে আমি বোম্বাই রওনা হয়ে গেলাম। আমাকে বিদায় জানাবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন ছোটখাট এক জনতা। ট্রেন ছেড়েছে, ধীর গতিতে। আমার পুরানো দিনের শিক্ষক ব্রীজলাল বাবু পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সবাইকে সরিয়ে আমার কামরার জানালার কাছে এগিয়ে এলেন, এবং আমার হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ গুঁজে দিলেন। ভাঁজ খুলে দেখলাম একশ' টাকার একখানা নোট, পেন্‌সিল দিয়ে এক কোণে লেখা, "শুভকামনা সহ"। এই আশীর্বাদ এল এমন একজনের কাছ থেকে যিনি নিজের সংসার খরচ চালান অতি কষ্টে। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

এস. এস. মান্তুয়া নামক জাহাজে বোম্বাই বন্দর থেকে এক সুন্দর সকালে আমরা রওনা হলাম। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমারই মতন আরও দশজন ক্যাডেট চলেছে স্যাণ্ডহার্ষ্টে শিক্ষা গ্রহণ করতে, যাদের সবার বয়সই দ্বিতীয় দশকের মধ্যে। কালাপানি পেরোচ্ছি—সুতরাং আমরা সবাই খুশী। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা সবাই বসেছি ককটেল লুঞ্জে। পরিবেশক এসে জানতে চাইল আমরা কে কি পান করবো। সবাই দেখলাম হুইস্কি, জিন কিংবা অন্যান্য মদের অর্ডার দিল, তাদের ভাবটা—এ ব্যাপারে তারা সবাই পাকা রসিক। আমি শুধু চাইলাম একটা ঠাণ্ডা পানীয়। আমার সহযাত্রীরা সবাই কলরবে ফেটে পড়লো, সে কী, মদ নয়! গেঁয়োমি চলবে না, মদ খেতেই হবে। মদের গ্লাস নিয়ে রণং দেহি ভাব তাদের। আমি মৃদু হেসে ডেঁটে রইলাম আমার সিদ্ধান্তে। বলতে কি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মদ, সিগারেট ছুঁই নি। গর্ব করে এ কথা লিখছি না, উল্লেখ করছি শুধু আমার জীবনপঞ্জীর বিবরণ হিসেবে।

লণ্ডনের টিলবারি ডকে নামিয়ে দেবার আগে আমাদের জাহাজ পোর্ট সৈঈদ, জিব্রাল্টার, মার্সাই ছুঁয়ে এল। পরম উৎসাহভরে আমি দেখছি আমাদের চারিধারের দর্শনীয় সব কিছু। রাত্রি হয়ে গেছে, আমরা দ্রুত চলেছি আলোকোদ্ভাসিত ব্রিটিশ রাজধানীর দ্রুত অপসৃয়মান দৃশ্যাবলী

দু'ধারে ফেলে রেখে, চলেছি যেন এক পরীরাজ্যের মধ্য দিয়ে। লণ্ডন থেকে এক ঘণ্টার পথ স্যাণ্ডহার্স্ট। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, মনে হলো যেন এক মৃত্যুপুরী, সব চুপচাপ, একটু শব্দ নেই কোথাও। চারধারে যে কী, কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। স্যাণ্ডহার্স্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কোয়ার্টার-মাষ্টার সার্জেন্ট এলেন আমাদের সামনে। এক পাঁড় লণ্ডনীয়া, মুখে হাসি নেই, মুখখানা ভ্রূকুটি-কুটিল, কথা বলছেন না, যেন কথার লোষ্ট্র নিক্ষেপ করছেন। আমায় শুধু বললেন, 'এক নম্বর কোম্পানী'।[৫] আমার নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে সে-রাত্রে শুয়ে পড়লাম।

পরবর্তী দিনকয়েক শুধু শুনলাম এ স্থান-মাহাত্ম্যের বিবরণ যা এক জায়গায় করলে এই রকম দাঁড়ায়:

স্যাণ্ডহার্স্ট হলো রাজকীয় সেনাবাহিনীর শিক্ষালয়। পৃথিবীর মধ্যে এমনটি আর কোথাও পাওয়া যাবে না, সংক্ষেপে আর-এম্-সি বলা হয়ে থাকে। এর ঐতিহ্য অদ্ভুত। এ স্থানটিকে শৃঙ্খলাবোধের মক্কা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ষাণ্মাষিক শিক্ষাকালের তিনটি স্তর পেরিয়ে আমরা অফিসর-পদে উন্নীত হবো, অবশ্য শিক্ষার ধকল যদি সহ্য করবার সৌভাগ্য আমাদের তখন পর্যন্ত থাকে। আমাদের শিক্ষা-সময়ের মধ্যে দুটো লম্বা অবসর থাকবে। জেণ্টেলম্যান ক্যাডেট বা ভদ্রলোক শিক্ষার্থী অর্থাৎ যারা ফৌজী অফিসর হবার জন্য শিক্ষানবীশি করছে, আমরা হলাম তাই। কিন্তু আমরা না-ভদ্রলোক, না-অফিসর পদবাচ্য। পেণ্টাথ্লন* সহ সব জাতীয় খেলাধূলায় যোগ দেবার ব্যবস্থা আছে স্যাণ্ডহার্স্টে। দুটো বিভাগে কলেজটি বিভক্ত, একটি নতুন বাড়ি, অন্যটি পুরানো। প্রথম এবং তিনটি কোম্পানী নতুন বাড়িতে, আর চতুর্থ ও পঞ্চম কোম্পানী পুরানো বাড়িতে। পুরানো বাড়ির সামনে একটি হ্রদ আর তাতে নৌকো চালানোর ব্যবস্থা। কলেজের পেছনে বারবোসা নামে ঘন বৃক্ষশোভিত গিরিখাত, তারই ভেতর দিয়ে যেতে হয় গল্ফের মাঠে। আমরা শিখলাম রাইফেলকে 'হাইপ' বলতে, আর 'শপ' বললে আমাদের বুঝতে বলা হলো 'উলউইচ্'কে এবং আরও শেখানো

৫। পর পর তিন বৎসর ধরে এ কোম্পানী শীর্ষস্থান অধিকার করেছে বলে সবাই এর উল্লেখ করে 'চ্যাম্পিয়ন কোম্পানী' বলে।

* পেণ্টাথ্লন (Pentatholon): কুস্তি, লৌহবলয় নিক্ষেপ, দৌড়-ঝাঁপ, বর্শা ছোঁড়া।

—অনুবাদক

হলো যখনই পন্টন-পতাকার পাশ দিয়ে আমরা যাব তখনই যেন সেই পতাকাকে অভিবাদন করি।

পন্টন কলেজের অধ্যক্ষ হলেন মেজর জেনারেল স্যার রেজিনাল্ড মে, কে. বি. ই., সি. বি., সি. এম. জি., ডি. এস. ও., পি. এস. সি.। স্কোয়াড্রনের নায়ক যাঁরা, তাঁরা সব সময়েই অত্যন্ত সুনির্বাচিত, চৌখস ও বিজ্ঞ এবং তাঁদের অধীনস্থ শিক্ষকদেরও যত্ন সহকারে নিয়োগ করা হয়।

আমাদের বই, কাগজ, পেন্সিল-কলম ও অন্যান্য জিনিস গ্রহণ করতে যেতে হলো নির্দিষ্ট বিভাগে, তারপর যেতে হলো ফৌজী-পরিচ্ছদের (ইউনিফর্ম) জন্য মাপ-জোখ দিতে; তারপরই ডবল-কদমে দৌড়তে হলো সমস্ত দিন ধরে নানা বিভাগে অন্যান্য বিভিন্ন কারণে। ক্যাডেট বা যুদ্ধ শিক্ষানবীশিদের প্রথমে যেন লেহন ক'রে ক'রে ঠিকমত আকৃতি দেওয়া হয়, তাদের ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে জীবনের আলস্যাভ্যাস দূর করে দেওয়া হয়। নবাগত ক্যাডেটদের স্বাগতম্ জানিয়ে যে প্রথম অতিথি-রজনী পালন করার রীতি পালিত হয়ে থাকে এখানে, তা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে যাবার মতনই ব্যবস্থাবলী; নক্সার মতো সাজানো টেবিলের ধারে ধারে নীলাভ ফৌজী-পরিচ্ছদে সজ্জিত প্রায় হাজার ক্যাডেট বসেছে। আহার সমাপনান্তে পোর্ট আর শেরির ডিকাণ্টার টেবিলের এক ধার থেকে অন্য ধারে এগিয়ে চলতে লাগলো, আমি প্রমাদ গুণলাম। মদের গ্লাসে রাজার স্বাস্থ্যকামনার যে রীতি আছে, মদ পান না ক'রে কী ভাবে তা পালন করবো ভেবে না পেয়ে আমি দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমার পাশে বসেছিলেন জনৈক ব্রিটিশ মেজর শিক্ষক। আমার অবস্থা তিনি বুঝতে পারলেন। আমাকে বললেন দুশ্চিন্তিত না হতে। তিনিও মদ স্পর্শ করেন না। রাজার স্বাস্থ্যকামনা সোডা কিংবা জলের গ্লাস নিয়েও করা যায়। পরম নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলে আমি বসলাম।

ড্রিল, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ এবং ঐ জাতীয় নানা ধরনের সামরিক-জীবনের পরিশ্রমী কাজে আমাদের শিক্ষানবীশি শুরু হয়ে গেল। আমরা হয়তো সেদিন সকালেই চুল কেটেছি, কিন্তু উচ্চ অবর-আধিকারিক বা সিনিয়র আণ্ডার-অফিসর পরিদর্শনে এসে হঠাৎ খুশিমত যদি চেঁচিয়ে ওঠেন—'চুল ছাঁট' বলে, আমাদের কথাটি না বলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হতো নরসুন্দরের কাছে। কোন কথাটি নয়, শৃঙ্খলাবোধের প্রতীক এই দৈববাণী হলো শেষ হুকুম। তাঁর

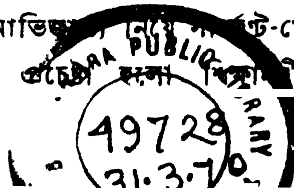
হুকুমের ওপর একটি কথাও বলা যাবে না। যদি বলো তার ফলাফলের জন্য দুশ্চিন্তিত হতে হবে। ফৌজী-জীবনের প্রারম্ভিক এই খেলার মধ্য দিয়েই আমাদের শৃঙ্খলাবোধের হাতে খড়ি। সুতরাং মনে মনে গজরাতে গজরাতে ঐ অপরাহ্ণেই ছুটতে হবে চুল-ছাটতে। আমাদের নাপিত ভায়াও এ খেলার পুরানো খেলুড়ে; সুতরাং মাথাটা প্রায় মুড়িয়ে ছেড়ে দিতো যাতে আবার পরদিন না আসতে হয় তার কাছে। অন্য সময়ে এই অফিসরটি হয়তো হাতের বেতখানা স্কন্ধে ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন: 'ফেঁসুয়া—!' অর্থাৎ ফৌজী-পরিচ্ছদে ধুলো জমেছে, অপরিষ্কার। এমনি সব।

মাথার টুপী না লাগিয়ে, খোলা বোতাম কিংবা পকেটে হাত দিয়ে বাইরে বেরুনো আমাদের মতন অধস্তনদের পক্ষে নিষেধ।

অবর-আবরিক বা আণ্ডার-সেক্রেটারির পদটি কিন্তু বেশ মজার। শিক্ষানবীশদের উপর তাঁর ক্ষমতা অসীম এবং তা তিনি ব্যবহারও করেন। ড্রিল, ব্যায়াম ও লেখা-পড়ার সাধারণ শিক্ষার কিছুটা বেশী অধিকারী তিনি তিনি হলেন আমাদের সামনে ফৌজী-জীবনের অনুকরণীয় উদাহরণ। প্রশ্ন না করে তাঁর হুকুম তামিল করতে হবে ক্যাডেটদের। কর্মজীবনের শেষে এঁরা সাধারণতঃ রাজপদক বা সম্মানের তরবারি পুরস্কার পেয়ে থাকেন।

ক্যাডেটরা ড্রিলের জন্য দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, সব থেকে দীর্ঘ দাঁড়ায় দক্ষিণে আর সবচাইতে খর্ব দাঁড়ায় বামে। কোম্পানীর সার্জেন্ট-মেজর এসে এদের ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম দেন 'হুশি—য়ার', তারপরই ঝড়ের গতিতে বের হতে থাকে নির্দেশাবলী: 'ডাইনে দো কদম। ঘাস-বিচালি, ঘাস-বিচালি…। ও মশাই, দোহাই আপনার একটু জেগে চলুন। মশাই, আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন। কোম্পানী বাঁয়ে ঘুর, ডাইনে ঘুর, একদম ঘুর।' একটা বিরক্তির চাহনি হেনে এই দীর্ঘদেহী সার্জেন্ট আবার শুরু করেন: 'সামনে তাকাও, থুতনি সটান—নীচের দিকে তাকাবে না—হাত দোলাও—বুক চিতিয়ে—ডান-বাঁ, ডান-বাঁ। বেশ! বেশ! চলো চলো!… এবার থামতে হবে… কম্—প্যা—নী—থাম।' দিনের পর দিন, দিনের মধ্যে কয়েক ডজন বার এই ড্রিল চলতে থাকে যাতে ফৌজী-হুকুমের সঙ্গে আমাদের অভ্যাস ও স্বতঃস্ফূর্ত চলন মিশে যায়।

শিক্ষার্থীদের পারিবারিক আভিজাত্য নিয়ে সার্জেন্ট-মেজর মোটেই মাথা ঘামান না। তাঁর একমাত্র প্রচেষ্টা হলো শিক্ষানবীশদের মধ্য থেকে



ভবিষ্যতের নেতা বের করে দেয়া। প্যারেড শুরুর সময়ে সার্জেন্ট শুরু করেন 'স্যার' বলে আর শেষ করেন গালাগালিতে। ভ্রূক্ষেপহীনভাবে ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচুতে অবস্থিত তাঁর মুখ থেকে ঝরে পড়ে: 'স্লিমে, বেশ লাগছে, না? এভাবে চললে তোমার স্থান হবে নর্দমায়। রাজকীয় অশ্ববাহিনী তোমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখবে না!···দেখ, দেখ, হাঁটছে যেন খাঁচার পাখী! গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াও বাপু। কী-হয়েছে তোমার?'

কিছু কিছু ব্রিটিশ ফৌজী-অফিসররা সাধারণের সঙ্গে মার্চ করেন। তাঁরা তাঁদের এক নিজস্ব ভাষায় পা ফেলে চলেন। তাঁরা 'এক, দুই, তিন, চার' বলেন না। বলেন, 'সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক্কা।' এ জাতীয় আরও নানা ধরনের পাগলামো তাঁদের আছে। কর্মের সংগে তাঁরা যেন বাঁধা, যে কোন উচ্চ পদেরই হোক না কেন, পরিদর্শকের উপস্থিতি তাঁদের মধ্যে কোন রকম চাঞ্চল্য আনে না।

ব্রিটেনের বিভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে ক্যাডেটরা স্যাণ্ডহার্স্টে আসে শিক্ষানবীশ হয়ে। তারা আসে অভিজাত সমাজ থেকে: আসে লর্ড, ডিউক পরিবার ও রাজার আত্মীয়রা, ভর্তি হয় ঈটন, হ্যারো, ওয়েলিংটন থেকে আগত ছাত্ররা। এদের কেউ কেউ রাজকীয় অশ্ববাহিনী বা হিম-স্রোত বাহিনীতে কিংবা ঐ জাতীয় অভিজাত বাহিনীতে যোগ দেবার বাসনা রাখে।

আমি শুনেছি স্যাণ্ডহার্স্টে চার্চিল তিন-তিনবার বিফল হয়েছিলেন আর মণ্টগোমারী 'আর-এম-সি' থেকে অতি সাধারণভাবে নগণ্য অফিসর হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং আমি বুঝেছিলাম যে কুসুমাস্তীর্ণ পথ বেয়ে আমার এই ফৌজী শিক্ষা-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। এখানে যাঁরা ভালো করেন, তাঁরা হয়তো কর্মস্থলে মোটেই কিছু করতে পারেন না; আবার যাঁরা এখানে ছিলেন অতি সাধারণ, তাঁরা হয়তো কর্মজীবনে পেয়েছেন গৌরবের মালা। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার বিজয়মাল্য যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের অনেকেই যে আবার বাহিনীতে পদমর্যাদার উচ্চাসনে বসবেন এমন ব্যবস্থা এখানে নেই। উচ্চপদে উন্নীত হলে বহু দায়িত্বের ভাগীদার হয়ে তাঁকে নানা গুণাবলীর পরিচয় বহন করতে হয়।

ব্যায়াম শিক্ষার সময় দড়ি কিংবা বাঁশ বাওয়া, অশ্বারোহণ কিংবা ঐ

জাতীয় নানা কঠিন পরিশ্রমের খেলার মধ্য দিয়ে একসঙ্গে কাজ করার শিক্ষা আয়ত্ব করা হয়ে থাকে। স্যাণ্ডহার্স্টে আসবার অনেক আগেই অশ্বারোহণ আমি শিখেছিলাম।

গল্‌ফ খেলতেও আমি শিখলাম এবং স্কটল্যাণ্ডে যখন আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম, আমি গ্লেনইগ্‌লস্ এবং সেণ্ট অ্যানড্রুজেও গল্‌ফ খেলবার সাহসিকতা দেখিয়েছিলাম। কিন্তু দেশে ফিরে আর এই বিলাসী খেলায় মন দিতে পারি নি।

এক-একটি শিক্ষা-সময় উত্তীর্ণ হলে নতুন ও পুরানো আবাসের দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হতো। বাইসাইকেলে চেপে উন্মত্তের মতো চিৎকার করতে করতে দুই দল ছুটে যেত পরস্পরের দিকে যে পর্যন্ত না চিৎকারে সবার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যেত। ক্ষতবিক্ষতও হতো অনেকে এবং এরই মধ্য দিয়ে উন্মত্ততার পরশ পেয়ে তারা উল্লসিত হয়ে উঠতো। কলেজের ফটক যে সব বন্দুক দিয়ে সাজানো থাকতো, সেগুলো সামনের হ্রদের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিত আনন্দে। যাদের জন্য পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছে যে পক্ষকে, সেইসব ক্যাডেটদের ছুঁড়ে দেওয়া হতো লেকের জলে। লেকের হিমেল জলে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হতো যারা অশ্বারোহণে অকৃতকার্য হতো। হৈ-হুল্লোড় আর দামাল উল্লাসে এ সন্ধ্যা যেন নৃত্য করতো আমাদের মনে।

লক্ষ্য করলাম ভারতীয় শিক্ষার্থীরা মাত্র কর্পোরাল পর্যন্ত সম্মানের পদে উন্নীত হতে পারতো। অন্যান্যদের মতো তার উপরে নয়। তাদের দলও গঠিত হতো ভারতীয়দের নিয়েই। স্যাণ্ডহার্স্টের মতো মহান প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় বিভেদমূলক ব্যবস্থা, ঠেকতো বিসদৃশ।

অবর-আবরিকরা ক্যাডেট ও অফিসরদের মধ্যে যোগাযোগ-বিশেষ এবং শিক্ষার্থীদের উপর এদের প্রভাব প্রভূত ও তার মূলে এদের হস্তে ন্যস্ত শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা।

লক্ষ্য করলাম বহু শিক্ষার্থী মাথায় টুপী চাপিয়ে ঘুরছে। এ টুপীর প্রচলন করেছিলেন প্রিন্স অব ওয়েলস্ (পরবর্তীকালে যিনি ডিউক অব উইণ্ডসর হয়েছিলেন)। এক হপ্তা-শেষে আমি লণ্ডনে বেড়াতে গিয়ে একটা টুপী কিনে মাথায় চাপিয়ে স্যাণ্ডহার্স্টে এলাম ফিরে। এক ইংরেজ অবর-আবরিক আমার মাথায় ঐ টুপী দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'ও-টুপী তুমি মাথায় দিতে পারবে না।'

'অন্যেরা পরেছে। আমি পারবো না কেন?'

'আমার হুকুম ব্যাস্—!' বজ্র-নির্ঘোষের স্বর তাঁর কণ্ঠে।

ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই আমার মাথা থেকে টুপীটা টেনে নিয়ে তিনি দু'পায়ে মাড়িয়ে ভেঙে দিলেন। তাঁর পাশে আরও দু'জন ইংরেজ শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে। তারা হো হো করে হেসে উঠলো।

'যাও, চলে যাও সামনে থেকে।' অবর-আবরিক চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলেন।

ক্রোধের অশ্রু গলাধঃকরণ করেই আমাকে সেদিন ফিরে আসতে হলো। তবে খুব বেশী দিনের জন্য নয়। দু'দিন পর বাঘেল সিং আর আমি আমার ঘরে বসে হারমনিয়াম বাজিয়ে সঙ্গীতচর্চা করছিলাম। হারমনিয়ামটা দেশ থেকে আসবার সময় আমি সঙ্গে এনেছিলাম। ইংরেজ ক্যাডেটরা সন্ধ্যেবেলায় গীটার বাজাত; আমাদের সঙ্গীতচর্চা ওরা সহ্য করতে পারত না। সে-রাত্রে আমাদের খুশীমতন সময়ে মেসে গিয়ে খাবার গ্রহণের ছুটি ছিল। আমি চড়া সুরে সঙ্গীতচর্চা করছি। একটা গোলমালের সূত্রপাত করবো বলেই আমরা শুরু করেছি চড়া সুরের গান। আমার টুপীটি যে অবর-আবরিক সেদিন দু'পায়ে মাড়িয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন, তাঁর কক্ষটি পাশেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমার দরজায় এসে হাজির। চিৎকার করে তিনি বলে উঠলেন:

'থামাও থামাও গর্দভ-রাগিনী—!'

বন্ধু বাঘেল সেই টুপীর ঘটনার দিন উপস্থিত ছিলো আমার অপমানের সাক্ষী হয়ে। আজ ইংরেজপুঙ্গবের হুকুম শুনে সে ভ্রূক্ষেপই করলো না, সে তার সঙ্গীতচর্চার পর্দা আরও উচ্চগ্রামে তুলে দিলো। ইংরেজ অফিসর আরও রেগে উঠলেন:

'যদি বন্ধ না করো, তাহলে ওটাকে তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দেবো।'

আমরা দু'জনেই উঠে দাঁড়ালাম। বাঘেল সিং বাঁ হাতে আমাকে সরিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে অফিসরের দিকে এগিয়ে গেল। চিৎকার করে বললো:

'দেখ সাহেব, এই মুহূর্তে যদি তুমি এ ঘর না ছাড়ো, আমি তোমাকে জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দেবো।'

অফিসর বুঝলেন গতিক ভালো নয়, তিনি দ্রুত সরে গেলেন।

দিন কয়েক পর জনৈক ব্রিটিশ শিক্ষার্থী হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো:

'গান্ধী সম্বন্ধে আমি কি ভাবছি জানো?'

আমার এই প্রশ্নকর্তাকে আমি চিনিও না। আমি উত্তর দিলাম:

'না।'

'গ্যাণ্ডী, যার পা দুটো ব্যাণ্ডী!' অর্থাৎ যার পা' দুটো বক্র যষ্ঠি।

যিশুখ্রীষ্টের নামে কটূক্তি করলে ইংরেজ বালকরাও যেমন চটে যায়, আমিও তেমনি চটে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠতেই ছোকরা নিমেষে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে পালিয়ে গেল।

রাজকীয় শিক্ষানবীশি-পদক (ভারতীয়) যদি কেউ পায় তাহলে সম্মান-পদক ছাড়াও তাকে দেওয়া হয়ে থাকে লোভনীয় অর্থের থলে। স্যাণ্ডহার্স্টে আমার শিক্ষা-জীবন যেভাবে চলেছে তাতে যে এই সম্মান আমি পেতে পারি এ চিন্তা আমি কোন সময়েই করি নি। কিন্তু একদিন সত্যিই ওয়ার-অফিস থেকে একখানা চিঠিতে আমাকে জানানো হলো যে এই পুরস্কারের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। আমার কাছে এ রীতিমত সংবাদ। এ পুরস্কার যে মুদ্রা বহন করে আনবে তাতে আমি একবারেই আমার সব ঋণ পরিশোধ করে দিতে সক্ষম হবো, যে ঋণ পরিশোধের জন্য আমার নিত্যপ্রয়োজনের ব্যয়-দাবী মিটিয়ে বেশ কয়েক বৎসর লাগতো। সত্যিই ব্রিটিশ বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবোধ আনন্দ-বর্ধন ক'রে দেয়।

দু'মাসের গ্রীষ্মাবকাশে একমাত্র ভারতীয়রা ছাড়া প্রায় সবাই যে-যার দেশে ফিরে যায়। ভারতীয়রা এ দু'মাস লণ্ডন, পারী ও অন্যান্য ছুটি-উপভোগের স্থানে গিয়ে ভীড় জমায় আনন্দের জন্য। পাহাড় আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে; আমি তাই চললাম উচ্চভূমি স্কটল্যাণ্ডের পিতলোচরি নামক স্থানে একটি মনোরম কুটিরে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারিত্বে এ স্থান অতুলনীয়। কিন্তু মাত্র দু'জন পরিদর্শকই এসেছেন এখানে। এক স্কট ভদ্রলোক, নাম ম্যাককী এবং তাঁর স্ত্রী। এক পরিত্যক্ত অতিথিশালায় আমরা আবাস গ্রহণ করলাম। বাড়িটার নাম নকেণ্ডারোচ্। পরদিন স্কট-দম্পতির দুই কন্যা, মার্গারেট ও এনা পক্ষকাল ছুটি উপভোগের জন্য এল। এনা যেন টগবগ করে ফুটছে, উদ্দীপ্তা কিশোরী। আর মার্গারেট ঠিক যেন তার বিপরীত। প্রিয়দর্শিনী মার্গারেট, সুন্দর পা দু'খানি ফেলে যখন হেঁটে যায়, মনে হয় সৌষ্ঠবের পুষ্প ছড়িয়ে চলেছে সে চারিধারে, নরম পেলব হাত দু'খানি, কথা যা বলে তার অনেকটাই থাকে না-বলা।

সোনালী রেশমী চুল ছড়িয়ে পড়ছে মাথা ভরে। মার্গারেট ও আমি বহু দূর দূর প্রান্তে হেঁটেছি একসঙ্গে, উঠেছি এক সঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, এক সাথে খেয়েছি বসে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমরা পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করেছি পরমানন্দে। নকেণ্ডারবোচের সংলগ্ন উদ্যানে অর্ধশায়িতাবস্থায় আমরা সোচ্চারে স্মৃতি রোমন্থন করেছি পরস্পরের কাছে। দু'জনার প্রতি দু'জনাই যেন আবিষ্ট হয়ে উঠছি—একথা আমরা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে কথাটি বলি নি আমরা কেউ। এত সুখানুভূতি আমার এই প্রথম, জীবনকে যেন দেখতে পাচ্ছি এক নতুন ভাবে। আকাশ যেন আরও নীল, তারারা যেন হাসছে আরও উজ্জ্বলভাবে, বাতাস যেন সঙ্গীত বহন করে আনছে অহরহ আমার কর্ণকুহরে। পুষ্পের সুগন্ধ যেন ছড়িয়ে দিলে মার্গারেট আমার জীবনে। আমার মনোভাব কবি বায়রণের ভাষায় বলতে হলে :

"আমার জীবন,
আমার ভাবনা নদী উছলিয়া পড়ে—
তোমারই সমুদ্রে ;
যা কিছু আমার সব নিঃশেষে যায় ধেয়ে
তোমারি পানে।"

সময় যেন ছুটে চলেছে, এবং এমনি করেই ছুটে চলে যায় এই সব মুহূর্ত। ম্যাককীদের যাবার দিন ঘনিয়ে এল। আগের রাতে একটা ছোট্ট চিরকুটে মার্গারেটকে অনুরোধ করলাম শেষ রাতে অন্ততঃ পাচ মিনিটের জন্য হলেও যেন একবার সে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি ওকে জানাতে চাই আমার বুক ভরা প্রেম এবং কেন যে সে-কথা বলতে পারছিলাম না তাও আজ ওর কাছে বলতে চাই। সন্ধ্যার মুহূর্তে মার্গারেটের অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে গিয়ে বালিশের নীচে চিরকুটখানা সযত্নে রেখে এলাম। কিন্তু হায়, সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। আয়া বিছানা করতে গিয়ে আমার চিরকুটখানা আবিষ্কার করে ম্যাককী-দম্পতির হাতে তুলে দিল। কোনরকম দৃশ্যের অবতারণা করলেন না তাঁরা, কিন্তু বুঝলাম যে কেমন একটা গাম্ভীর্যের প্রাচীর যেন উঠে গেছে আমাদের মাঝে। পরদিন তাঁদের তুলে দিতে আমি ষ্টেশনে গেলাম। যাত্রার প্রাক্-মুহূর্তে ওঁরা আবার আমার প্রতি নম্র হয়ে উঠলেন, পর্দাটা যেন গেল সরে। পিতলোচরিতে আর আমি একলা কেন থাকছি, তাঁদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েও আসতে

পারি বলে আমায় আহ্বান জানালেন তাঁদের ব্রাউটি ফেরীর গৃহে। নিকটবর্তী সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজ দেখতে পারব, দেখতে পারব স্কটল্যাণ্ডের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান। আমাকে কি অনুরোধ করবার খুব বেশী প্রয়োজন? আমি শীগগিরি ডাণ্ডির তীরে অবস্থিত ব্রাউটি ফেরী গাঁয়ে মার্গারেটদের বাড়ি 'চিমো'তে গিয়ে হাজির হলাম।

মার্গারেটের সঙ্গে আমি যেতাম বাজারে, যেতাম ছবি দেখতে, একসঙ্গে স্কেটিং করতাম। ও আমাকে শেখালো স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত একক 'হী' নৃত্য (পরবর্তীকালে আমি দেখলাম যে এই বিশেষ নৃত্যটি রাজপুতানা-রাইফেলের অফিসারদের শেখানো হতো), শেখালো রবির বার্নস-এর বহু গান। ও আমাকে বললো যে ইংরেজরা কিন্তু সব উচ্চারণ ঠিকমত করতে পারে না। আকাশ-ভাঙা জোছনায় আমরা বসে বসে কত না গল্প করতাম, কিন্তু নিজেদের বক্তব্যটা কিছুতেই বলতে পারছিলাম না। বোধ হয় ও অপেক্ষা করছিলো আমার কাছ থেকে কিছু শোনবার জন্য · ।

একদিন আমরা দু'জন ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। আগুন রাখবার গনগনে চুল্লীর কাছে একটা নীচু আসনে বসে মার্গারেট আমাকে বললো কাছে এসে বসতে। ও বলল:

'বিজ, আমায় কিছু বলবে?'

'অনেক কিছুই তো বলতে চাই, কিন্তু—' কথা আমার হারিয়ে গেল।

'তাহলে থামছো কেন?' অধৈর্য-ভরা কণ্ঠে মার্গারেট বলল: 'বিজ, আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে? হয়তো নাচবার সময় তোমার মনের কথা প্রকাশের সহজ-পথ পাবে।'

'তোমার সঙ্গে নাচা আমার পরম সৌভাগ্য মার্গারেট, কিন্তু নাচের তো কিছুই জানি না আমি।'

'তাতে কি, আমি আজ রাতে নাচতে শিখিয়ে দেব। কিছুমাত্র কঠিন হবে না তোমার পক্ষে। তোমার পায়ে রয়েছে ছন্দ।'

আমার হৃদয় উঠল নেচে ছন্দে ছন্দে, রক্তের নাচন জাগল আমার কপোলে। আমরা বেরুব দু'জনা এক সঙ্গে। এমন সময়ে দরজায় কার আগমনবার্তা বহন করে বেজে উঠল ঘণ্টা। প্রত্যাবর্তনের বহু পূর্বেই মার্গারেটের বাবা-মা ফিরে এলেন। মিঃ ম্যাক্‌কীর শরীর হঠাৎ ভাল না লাগায় তাঁরা ফিরে এসেছেন। এ অবস্থায় আমাদের বেরুনোর কথা ওঠে

না। সে-রাতে মার্গারেটের নৃত্য-শিক্ষকতা আর হয়ে উঠলো না। মার্গারেটের জিজ্ঞাসু মনের কাছে আমার হৃদয় উজাড়-করা আর হয়ে উঠলো না। উর্মি-শিখরে যখন উঠতে যাচ্ছি, ঠিক তক্ষুণি ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়লাম উর্মি-অতলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'শুভরাত্রি' জানিয়ে সবাই সে-রাতের মতো বিদায় নিলেন। একটা দমবন্ধ আবহাওয়ার অবস্থা যেন মনে হলো আমার। মার্গারেট যদি আমায় নৃত্যের প্রথম কলি না শেখায়, আমি আর জীবনে কোনদিন নাচব না—অভিমানক্ষুব্ধ মন আমার প্রতিজ্ঞা করে বসলো সে-রাতে। আমার সে-অভিমানের মান রক্ষা আর হলো না এবং তারই জের ধরে আমার নাচ শেখা আর কখন হয় নি। আমি একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখলাম মার্গারেটকে। লিখলাম, 'অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম মার্গারেট, তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ বিধেয় নয়। আজই শেষ রাতে আমি চলে যাচ্ছি লণ্ডনে। যখন আমি চলে যাব তখন তুমি থাকবে সুপ্তিমগ্ন। এই চিঠিতেই আমার মনের সমস্ত প্রেম নিবেদন করলাম।' আমি ওকে জানালাম কোন্ অন্তর্দ্বন্দ্বে আমি পারছি না ওকে আরও কাছে টেনে নিতে। প্রেমের প্রগল্‌ভতা নেই আমার, যদি পারতাম ওকে জীবনের সাথী ক'রে নিতে! কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে উঠেছে আমাদের মধ্যে যা মার্গারেটের জীবনে অসুখীর কারণ হতে পারে। আমার আছে এক পারিবারিক দায়িত্ব, আছে স্কন্ধের উপর ঋণের বোঝা যা মার্গারেটের জীবনকে সুখহীন করে দিতে পারে। আমি কি পারবো আমার প্রিয়াকে সযত্ন প্রেমে ঘিরে রাখতে? তারপর আছে ভারতে ব্রিটিশ ও আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্ত। ইংরেজ-দুহিতা মার্গারেটকে হয়তো অহেতুক কতো না বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে। হয়তো লজ্জাজনক দরকষাকষির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে মার্গারেট, কোনদিন যা আমার পক্ষে একেবারেই গ্রহণযোগ্য হবে না। এ নিয়ে হয়তো তর্কালোচনা চলতে পারে। কিন্তু গ্রহণ-যোগ্য সিদ্ধান্তে পৌছনো যাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আমার পক্ষে বিপদ-সংকুল অবস্থার মধ্যে আমার প্রিয়া মার্গারেটকে নিয়ে খেলা করা সম্ভব নয়। আমার প্রেমের বাসনাকে তাই প্রারম্ভেই শেষ করে দেওয়া উচিত। আমার আত্মসুখাহরণের মধ্যে মার্গারেটকে এনে না ফেলাই ভাল। অন্যায় হবে বলেই আমি চাই এখানেই এ ঘটনার ইতি টেনে দিতে। ভারাক্রান্ত মনে চিঠিখানা শেষ করে মার্গারেটের দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে নিশাবসানের প্রাক্-

মুহূর্তে আমি চলে গেলাম। আমার প্রিয়া মার্গারেটকে আর আমি দেখবো না। হৃদয় নিঙড়ানো দহন-জ্বালা! কিন্তু হয়তো আমাদের জীবনে এ ভালোই হলো।

লণ্ডনে মার্গারেটের উত্তর পেলাম। আমারই পরমানুভূতির স্রোতে ভেসে এসেছে ওর একই ভাষার পত্রলিপি। বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়ে এভাবে চলে আসায় ও অনুযোগ জানিয়েছে। আমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু মার্গারেট আমার জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে আছে আকাশের সাতরঙা রামধনুর মতো—স্পর্শহীন দিগন্তাকাশে ছড়ানো।

আমার অবকাশ সমাপ্তির এখনো কয়েক সপ্তাহ বাকী। আমি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বেরোলাম ভ্রমণে। ঝড়ের গতিতে আমি গেলাম পারীতে, দেখলাম সেণ্ট মরিজে স্কী, ভেনিসে গিয়ে গোন্দলা দেখলাম, দেখলাম নেপল্‌স্-এ ভিসুভিয়াস, বার্লিনের রাইখস্টাগ দেখে এলাম, ভিয়েনা আর বুদাপেষ্টে গিয়ে শুনলাম অপেরা আর সঙ্গীত। আমি ছুটছি আর ছুটছি। মার্গারেটের স্মৃতি আমি চাইছি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে।

ক্যালে থেকে ভেনিসে চলেছি ট্রেনে। মধ্যরাত্রি। আমার কামরায় বসে বসে তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম একজোড়া চমৎকার নবদম্পতি এসে উঠলো ট্রেনে। দেখেই মনে হয় অত্যন্ত ক্লান্ত। আমরা ওদের স্থান করে দিলাম আর ওরাও কোনমতে চেপে বসলো। ট্রেন চলছে। মেয়েটি ট্রেনের দোলায় মুহূর্তে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। ছেলেটি বসেছে আমার পাশে। উষ্ণ সহৃদয় আলাপনের পর সে আমায় একবার বলল ট্রেনের করিডরে আমার সঙ্গে সে কিছু কথা বলতে চায়। ছেলেটি বলল ইতালীতে সে রেসের মোটর-ড্রাইভার। মাস দুই আগে চিকিৎসকরা তার এই অস্বাভাবিক জীবিকার দরুণ বুকে রাজযক্ষ্মার জীবাণু পেয়েছেন এবং তার ইহজগতবাস যে আর খুব বেশিদিন নেই তাও জানিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়, তার দিন-গুণতির দিনপঞ্জীর কথা ও জানে না। ও চাইছে পরিণয়ে আবদ্ধ হতে, চাইছে ঘর বাঁধতে। তার যে দিন শেষ হয়ে এসেছে, এ কথাটা সে বার বার বলতে চেয়েও বলতে পারে নি। আজ তারা যাচ্ছে ভেনিসে বিয়ে করতে। কিন্তু মনের দিক থেকে ছেলেটি আর পারছে না সহ্য করতে। কিন্তু কী যে করবে তাও বুঝতে পারছে না। আমি তাকে বললাম যে

এই হৃদয়ানুভূতির ব্যাপারে তার এই পরামর্শ চাওয়া আমার কাছে, পরামর্শদাতা হিসেবে তার এই লোকনির্বাচন কিন্তু ঠিক হয় নি। তবুও সে তার মনের ঝাঁপ খুলে দিল আমার কাছে। সে বলল, সে চাইছে এ অবস্থা থেকে মুক্তি। পরবর্তী কোন ষ্টেশনে গাড়ি থামলে সে নেমে যাবে। তার অসুস্থ জীবনে মেয়েটিকে জড়িয়ে নিতে সে পারবে না। কিছুতেই পারবে না। আমি যদি অনুগ্রহ করে তার হয়ে মেয়েটিকে বুঝিয়ে বলি এবং যাবার পথে কর্ণওয়ালে তার দেশে তাকে নামিয়ে দিয়ে যাই! আমি আপত্তি জানালাম। এ অশোভন অবস্থায় আমি পড়তে রাজী নই। সেই মুহূর্তে ট্রেনটি থামলো এবং আমি দেখলাম ছেলেটি দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে সেই ছোট্ট ষ্টেশনের গভীর আঁধারে কোথায় হারিয়ে গেল। মেয়েটি তখনও গভীর নিদ্রামগ্ন। মেয়েটিকে জাগিয়ে ছেলেটির সব বক্তব্য বুঝিয়ে বলবো এত সাহস আমার হচ্ছিল না। আমিও তো পালিয়ে বেড়াচ্ছি এবং এ অবস্থায় আর একটি ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাইলাম না। মনের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমি আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আরেকটি ষ্টেশনে ট্রেনটি এসে থামলো। আমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি সেই অচেনা-অজানা ছোট্ট ষ্টেশনে নিশীথ রাত্রে নেমে দ্বিতীয়বার পালালাম। ট্রেনটি চলে গেল। এই অবস্থায় আমার পক্ষে এ ছাড়া বোধ হয় অন্য উপায় ছিল না। আমার সঙ্গে এদের আর সাক্ষাৎ হয় নি। মেয়েটির কিংবা তার মুমূর্ষু প্রেমিকের যে কি হলো তা আর আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি। ঘণ্টাকয়েক অপেক্ষা করে আমি পরবর্তী ট্রেন ধরে এগিয়ে চললাম আমার গন্তব্যস্থল অভিমুখে। ছুটির শেষে আমি যখন এসে পৌছলাম লণ্ডনে, আমার পকেটে তখন রয়েছে মাত্র পাঁচ শিলিঙ। হঠাৎ পিকাডেলি সার্কাসে আমার এক সাথী কোচ্চারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও আমায় পাঁচ পাউণ্ড ধার দিল যা দিয়ে পরবর্তী তিনদিন আমি কাটিয়ে দিলাম। কোচ্চারের এই বন্ধুত্ব আমি কোনোদিন ভুলি নি।

স্যাণ্ডহার্ষ্টের শিক্ষা আমার চলছিল, একটা থেকে আর একটায় উঠছি সৈনিক জীবনের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে। আমার দ্বিতীয় শিক্ষা-স্তরে আমাদের কোম্পানীর কমাণ্ডার তাঁর রিপোর্টে আমার সম্বন্ধে লিখলেন : 'এই অফিসরটির ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দিহান এবং এর ব্যবহারও সুমধুর; ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র দুটোই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ লক্ষণীয়। কাজকর্ম শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা আছে। জীবনে ভালই করবে।

জীবনারম্ভ সন্তোষজনক। খেলাধুলায়ও পারদর্শী।' অবশেষে আমার তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা শেষ হলো এবং দ্বিতীয় লেফটানেণ্ট-এর পদে আমার কার্যারম্ভ হলো। ১৯৩৩-এর সাফল্যের প্যারেডে আমি পাশ করে বেরিয়ে এলাম।

স্যাণ্ডহার্স্টে আমি পেয়েছি অনেক। পেয়েছি দৃঢ় চরিত্রলিপি, শৃঙ্খলাবোধ, আর পেয়েছি সম্মান-বোধের মূল্য।[৬] সঠিক বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে নীতি মূল্যায়নের পাঠ আমি পেয়েছি এখানে। ফৌজী অধিবিদ্যার ভিত্তিমূল আমি জেনেছি এখানে, শিখেছি আমার কর্মজীবনের মূল প্রযুক্তিশিক্ষা; আর শিখেছি কি কর্মস্থলে কিংবা খেলাধুলায়, সুখকর আবহাওয়া কিংবা বিরুদ্ধ অবস্থায় ধীর মস্তিষ্কে সব বুঝে কাজ করতে। আমি এখানে শিক্ষা পেয়েছি নেতৃত্বের গুণাবলী বলতে কী বোঝায় তা বুঝতে, গুণাবলীর মূল্য বুঝতে এবং নিজের সত্তাবিলীনকারী দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হতে।

ইংরেজ-চরিত্রের দিগদর্শন যন্ত্রটি যেন আমি পাঠ করতে পারছি। ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবির গল্প-কাহিনী, পার্লামেণ্ট ও রাজতন্ত্রের উপর গভীর আস্থা এবং প্রত্যেকের নিজস্ব বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা বোধের উপর বিশ্বাস নিয়ে তারা প্রত্যেকে আছে বেঁচে। মাঝে মাঝে ঘাত-প্রতিঘাতে তার বিশ্বাস যখন ধাক্কা খায়, সে অস্থির হয়ে পড়ে। তার কাছে আদর্শ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাব, যথাযথ উচ্চারণ, জীবনপথে চলার বিশেষ পাথেয়। কোন্ বিশেষ সুরা সে পান করবে তার সুনির্বাচন তার জীবনের অঙ্গ। 'পাঞ্চ' ও 'দি টাইমস্' পত্রিকা সে রসিয়ে পাঠ করে। তার গর্ব বি. বি. সি., বি. ও. এ. সি. ও রোলস্ রয়েস নিয়ে। নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ, পিকাডেলি, টাওয়ার, উইমব্লিডন, ওয়েমব্লে এবং লর্ডস্-এর মাঠে ক্রিকেটের ইতিহাস তার নখদর্পণে। তার কাছে হার-জিতের পরিণতিতে খেলার সমাপ্তি নয়। খেলাধূলা মানে শারীরিক ব্যায়াম।

নিজের জীবিকায় সে আত্মসমাহিত, অন্য ব্যাপারে সাধারণতঃ সে নির্লিপ্ত। ট্রেনে কিংবা বাসে সে অচেনা সাথী, পথের বন্ধু পেতে উদ্‌গ্রীব নয়। বালমোরাল আর বাকিংহামের রাজপ্রাসাদ, ঘোড়দৌড়, ঘোড়া, কুকুর এবং জনিওয়াকার তার প্রিয়। হাইড পার্কে বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে বক্তাদের বক্তৃতা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করতে সে পছন্দ করে। নিজেদের

৬। সম্মানবোধ মানুষের আভ্যন্তরীণ এমন কিছু যা তার বিবেকের সমার্থবোধক এবং যার সাহায্যে তাকে জীবনপথে চলতে হয়।

থিয়েটার সম্বন্ধে সে গর্বিত এবং তাদের সেক্সপীয়রকে বিশ্বব্যাপী সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে রাজী। অন্যান্য পশ্চিমী জাতিগুলোর থেকে ইংরেজ অনেক পরিপাটি, অনেক স্বকীয়। বাউলার হ্যাটটি মাথায় চাপিয়ে সে নিজেকে নিয়েই বিদ্রূপের হাসি হাসে। আমি এখন বুঝতে পারি ইংরেজ কেন 'জন বুল' নামে পরিচিত, কেন জাত হিসেবে সে সুবিন্যস্ত।

সমুদ্র ভ্রমণের আনন্দের মধ্য দিয়ে আমি ফিরে এলাম দেশে। 'ফ্রন্টিয়ার মেইল' ট্রেন যখন এসে থামলো ষ্টেশনে, আমি দেখলাম মা আমার দিকে ছুটে আসছেন। যেন কত যুগ পরে দেখা। চিন্তা, আনন্দ সব কিছুর মিশ্রণে মা প্রশ্নে প্রশ্নে আমার বিদেশ-অভিজ্ঞতার সব কথা মুহূর্তে জানতে চান। যেন কত যুগ পর দুই বন্ধুর দেখা। আমার ছোট্ট ভাইয়েরা[৭] বাব্বু এবং টম্মি, বোন নান্নী আমায় পেয়ে যেন আনন্দে ফেটে পড়ছে। আমার পোষাকের ওপর থেকে মা যেন তাঁর গর্বমাখা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলেন না। সে-রাত্রে আমি আর মা কথাই বলে চললাম, সে-কথার যেন আর শেষ নেই। রাত্রি-শেষের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মা আর ছেলে কত কথাই যে বলে গেল এই ভাবে!

এক বৎসর এক ব্রিটিশ ফৌজী-বাহিনীর নায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। ইংরেজরা জেনে আসে যে কোন ভারতীয়ই কোন ফৌজী-বাহিনীর নায়ক হবার উপযোগী কখনই হতে পারে না। তার উপর ব্রিটিশ বাহিনীর নায়কত্ব করার কথা তো অচিন্তনীয়। এদের ধারণানুযায়ী আমাদের মনটা ছোট এবং বিমান-যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি, ট্যাঙ্ক কিংবা বন্দুকের যান্ত্রিক ব্যবস্থা বোঝবার মত বুদ্ধি আমাদের থাকা সম্ভব নয়। লর্ড এলেনবরোর কথা আমার স্মরণে এল। ১৮৩৩-এ এই লর্ডটি বলেছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির স্থিতি নির্ভর করছে রাষ্ট্রীয় এবং সেনাবাহিনীর থেকে ভারতীয়দের দূরে রাখার মধ্যে।

ব্রিটিশ শক্তির এই প্রেক্ষাপটটি স্মরণে রেখে আমাকে কাজ করতে হবে এদের অধীনে। আমার মনে কোন সন্দেহই ছিল না যে, ব্যক্তিগতভাবে চমৎকার ব্যবহারের বহু ইংরেজ থাকা সত্ত্বেও, অতি সত্বরই ভারতভূমিতে ব্রিটিশ রাজের অবসান ঘটবে এবং আমরা আমাদের দেশ পরিচালনার ভার স্বাধীনভাবে নিজেরাই গ্রহণ করব।

৭। সৎ ভাই-বোন হলেও আমার সহোদর ভাই-বোনেদের মতন এরা।

সুতরাং ১৯৩৩-এর নভেম্বর মাসে একটা চ্যালেঞ্জের মনোভাব নিয়ে আমি কর্তব্যকর্মে হাজির হলাম লাহোরের বার্ডউড ব্যারাকে অবস্থিত ঈষ্ট সারে রেজিমেন্টের প্রথম বাহিনীতে। একুশ বছর বয়সের যুবক আমি, এক নবজীবনারম্ভের দোরগোড়ায় আমি এসে দাঁড়ালাম।

ভারতীয় ফৌজী-বাহিনীর সব অফিসরদেরই প্রাথমিক শিক্ষানবীশি করতে হয় কোন একটা ব্রিটিশ বাহিনীতে, তার নিজস্ব ভারতীয় বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে। আমার নায়ক হলেন লেফটানেন্ট কর্ণেল স্কোর্মবার্গ, ডি. এস. ও.। মধ্য বয়সী। সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতীক। এ হেন ব্যক্তির কাছ থেকে নবাগতরা যে সন্দেহ মিশ্রিত অভ্যর্থনা পেয়ে থাকে, আমার ভাগ্যেও তাই জুটলো।

এ বাহিনীর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত চারটি বিভাগে। চাঁদমারি, ড্রিল, খেলাধূলা-ব্যায়াম এবং 'মেস' ডিউটি। প্রত্যেকটি বিভাগেই আমি কঠিন পরিশ্রম সহকারে আমার কর্তব্য সমাপন করলাম। রাইফেলে পারদর্শীতা লাভ করলাম, ড্রিলে রইলাম টিকে, 'মেসে'র কাজে নিম্নপদে দিলাম কাটিয়ে আর খেলাধূলা-ব্যায়ামে খুব খারাপ করলাম না। ক্রিকেটে প্রথম একাদশের খেলোয়ার আর ৪৪০ গজ দৌড় প্রতিযোগিতায় আমার ভূমিকা নগণ্য নয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রিটিশ ইউনিট অতুলনীয়, বহু ঐতিহ্যে দীপ্ত এক পরিবারের মতো। পিতা-মাতার মতো স্থান গ্রহণ করে থাকেন বাহিনীর নির্দেশক-অফিসর বা কম্যাণ্ডিং অফিসর। তাঁর কথাই আইন এবং তিনি যেন এ বাহিনীর রাজা। তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বগ্রাহ্য, নড়চড় হবার উপায় নেই। সবার উপর এক বিরাট মূর্তির মতো যেন তিনি দাঁড়িয়ে, যদিও তাঁকে আমরা দেখতে পেতাম ক্বচিৎ-কদাচিৎ। তাঁরই পরে যে দ্বিতীয় নির্দেশক অফিসর ছিলেন, তাঁর উপর ভার থাকতো সমস্ত কাজের—অফিসরদের কর্তব্যকর্মে নিয়ম মাফিক যোগদান, মেস, হিসাব ও ব্যাণ্ড—এসবের ব্যবস্থা-ভার তাঁর উপর। পদমর্যাদায় তাঁর নীচে যিনি, তিনি হলেন এ্যাডজুটেণ্ট। তাঁর কাজটি কিন্তু বেশ; ড্রিল, উৎসব-ব্যবস্থা আর জুনিয়র অফিসরদের কাছে ভীতির প্রতীক হয়ে থাকা। শৃঙ্খলা-রক্ষার কাজটির ভার তাঁর উপর এবং তার ফলে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর নীচে সাব-অল্টার্নরা সিনিয়র ও জুনিয়রে বিভক্ত। সিনিয়র সাধারণতঃ বয়ঃবৃদ্ধ, সাত থেকে পনের বৎসর ধরে তাঁদের এই কর্মজীবন। সেকালে ব্রিটিশ সৈন্য-

বাহিনীতে উচ্চপদারোহণ নির্ভর করতো শূন্যপদের উপর, কর্মজীবনের সময়ের উপর নয়। ফলে, সিনিয়ররা সাধারণতঃ নৈরাশ্যের জীবন যাপন করতেন, আর তারই ফলে বিদ্বেষমূলক ব্যবহার করতেন অধঃস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে। ভুল হলে খর রোদে ড্রিলের মধ্য দিয়ে শাস্তি দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর এবং তিনি এই কাজটি করতেন নিজে কোনো ছায়াবৃত স্থানে দাঁড়িয়ে। এই শিক্ষাজীবনে বয়ঃপ্রাপ্ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে তিন থেকে ছয় বৎসর লাগতো। তিন বৎসরের আগে শিক্ষার্থীকে শুধু দেখা হয়, তার কথা শোনা হয় না।

একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমাদেরই একজনকে একবার এ্যাড্-জুটেণ্টের শাস্তি পেতে হয় এমন ভাবে যাতে আমরা সবাই সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠলাম। আমরা ঠিক করলাম যে এ্যাড্জুটেণ্টকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। এর পরের এক রাত্রে অভ্যাগতদের জন্য নির্দিষ্ট আহারে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। সে-সময়ে নানা ধরনের খেলা-ধুলো হতো, কুস্তীর মহড়া চলতো। কুস্তীতে একজনকে চিৎ ক'রে না-ফেলা পর্যন্ত চলতো ধস্তাধস্তি, কসরৎ আর শারীরিক জোরের পরীক্ষা। এ্যাড্জুটেণ্ট রীতিমত লম্বা-চওড়া এবং নিজে যে বিজয়ী হবেন সে-সম্বন্ধে ছিলেন নিশ্চিত। কুস্তী শুরু হয়েছে। হঠাৎ সবাই তাঁর উপর পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁর পা-খানি ভেঙে দেওয়া হলো। অনেকদিন পর্যন্ত আর তাঁকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় নি। এই জাতীয় 'গণ-সংগ্রামের' বিরুদ্ধে কারুর কিছু করা সম্ভব ছিল না। এই ঘটনার পর এই ভদ্রলোক একেবারে ভেঙে পড়লেন, অনেকটা মিইয়ে গেলেন এবং আমাদের এই বাহিনীতে শিক্ষাজীবন মোটামুটিভাবে সহজেই কেটে গেল।

অলিখিত বহু নিয়মই প্রচলিত ছিল এখানে যা আমাদের মানতে হতো, যেমন প্যারেডের পাঁচ মিনিট আগে সবাইকে হাজিরা দিতে হবে। কোনরকম তর্ক করা চলবে না, যদি কেউ তা করে তবে গম্ভীর-মুখ উপরওয়ালার ভীতি প্রদর্শনেই তার শেষ নয়, শাস্তি পেতে হবে; রেজিমেণ্টাল্ ব্যাণ্ডের বিভিন্ন সুর সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান রাখতে হবে, বাহিনীর রীতি-নীতি ও ইতিহাস রাখতে হবে কণ্ঠস্থ। চলনে-বলনে ফৌজী সৌষ্ঠব বজায় রাখতেই হবে। জুনিয়রদের পক্ষে মেসে নিয়মিত আহার গ্রহণ আর সেই সঙ্গে মেসের যাবতীয় সব কিছু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা, সিনিয়রদের সহায়ক হিসেবে কাজ করা—এই হলো মেস-জীবনের রীতি। মেস[৮] হলো তাদের বাড়ী-ঘর। সেখানে আনাড়ির

৮। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সেনাবাহিনীতে মেস ব্যবস্থা চালু হয়।

মতো ব্রিজ খেলা থেকে শুরু করে মদের বোতল নিয়ে তাদের গভীর রাত অবধি অর্থহীন যত সব ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দিতে হতো। ফেরবার কোন তাড়া না রেখেই মেসে আসতে হতো নির্ধারিত সময়ের পূর্বে। এ সবের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির অর্থই ছিল পরের দিন সকালে কর্তৃপক্ষের কাছে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া। তারপর যা ঘটতো তা মোটেই হাসির উদ্রেক করতো না।

প্রতিটি ব্রিটিশ বাহিনীর মেস-জীবনের রীতি-নীতি আলাদা আলাদা। রাজার স্বাস্থ্যপান কোন কোন বাহিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করে, আবার কোন কোন বাহিনী পান করে বসে বসে এবং কেউ কেউ আদৌ পান করে না যেহেতু তাদের আনুগত্য তর্কাতীত। 'ওরচেষ্টার' বাহিনীর লোকেরা শুধু তরবারি বহন করতে পারতো, তাদের রীতিও কিছুটা আলাদা ধরনের। তাদের গার্ডরা পতাকা উড়িয়ে ড্রাম বাজাতে বাজাতে লণ্ডন শহরে বেয়নেট উঁচিয়ে মার্চ করতে পারতো কারণ, লণ্ডনের এই নিজস্ব বাহিনীটি সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৫৬-য়। আর একটি বাহিনী, 'রয়াল ওয়েলশ্ ফিউজিলিয়ার' বাহিনী, সব সময়ে তাদের সামনে একটি ছাগল হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। তার শিং জোড়া স্বর্ণমণ্ডিত আর তাতে জড়ানো থাকে ফুলের মালা। ১৭৭৫-এর ১৭ই জুন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও বাঙ্কার হিল যুদ্ধে এরা এই ছাগল সামনে রেখে প্যারেড করেছে। পতাকা কিংবা প্রতীক চিহ্ন বাঁশের মাথায় লাগিয়ে চলার রীতি মানুষের আদিম যুগ থেকে। এই চিহ্ন দূর থেকে দেখেই অবস্থান বোঝা যেত, যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা অন্যত্র প্রয়োজনে এই প্রতীক জড়ো করাতো তার অনুসরণকারীদের। সুতরাং বাহিনীর আত্মা, তার ইতিহাসের নিশানা বহন করে এই প্রতীক চিহ্ন। বাহিনীর বীরত্ব, তার সম্মানও বহন করছে এই প্রতীক।

প্রত্যুষের শিঙ্গা[১] বা বিউগেল বাজবার পর ইংরেজরা তাদের ছোট হাজরি গ্রহণ করে থাকে। ঔপনিবেশিক সাহেবী অভ্যাসে সে বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় একটু একটু করে চায়ের কাপে চুমুক দেয় আর সেই সঙ্গে কলা কিংবা বিস্কুটে কামড় দেয়। তারপর তারা এসে বসে প্রাতঃরাশের টেবিলে।

১। ফৌজী-জীবনের সংকেত-বংশীধ্বনিগুলোর অন্যতম হচ্ছে শিঙ্গা-র ধ্বনি। পুরানো দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিউগেল-এর সংগীতের মাধ্যমে তাঁদের নির্দেশাবলী প্রেরণ করতেন।

গম্ভীর মুখ, কথাটি থাকে না মুখে, যেন সব পুতুল; সংবাদপত্রের আড়ালে মুখখানা ঢেকে বসে থাকে।

শৃঙ্খলাভক্ত কুকুরের মতো শৃঙ্খলাভক্ত অফিসর হওয়ার রেওয়াজ আছে সেনাবাহিনীতে। কর্তব্যকর্মের দিনটিতে প্রায় প্রত্যুষ হতে অতিক্রান্ত মধ্যরাত্র পর্যন্ত কোয়ার্টার গার্ডের কাজ, ষ্টোর এবং অন্যান্য বিষয় দেখাশুনা করা, এমন কি শৌচাগার পর্যবেক্ষণ করবার কাজেও তাঁকে বোকার মত খাটতে হয়।

ঘোড়ায় চাপা, বক্সিং, খেলা-ধুলো, পলো, ক্রিকেট—এইসবে যোগ দেবার জন্য সেনাবাহিনীতে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। ঘোড়-দৌড়ের মাঠে এবং কুকুরের রেস দেখতে যাওয়া এবং মাঝে মাঝে থিয়েটার-সিনেমাতে যোগদান—তাতে আপত্তি নেই। অল্প-স্বল্প নাচ—তাও চলতে পারে। তবে এ সবই চলতে পারে সেনাবাহিনীর কোনরকম কাজকর্মের ক্ষতি না ক'রে। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে প্রচলিত উৎসবানন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে সেনাবাহিনীতে মনোভাব ছিল উড়িয়ে দেবার, অনেকটা 'ছি ছি' জাতীয়।

'বি' কোম্পানীর ৬ষ্ঠ প্লেটুনের নায়কের কর্মদায়িত্ব পড়লো আমার উপর। এর শক্তি, শ্রেণীবিন্যাস, লোকজনের বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে আমার সম্যক্ জ্ঞান যেমন থাকা প্রয়োজন, তেমনি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে এ প্লেটুন যাতে উদাহরণ স্থাপন করতে পারে, তারই কর্মসাধনার দায়িত্ব আমার। উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এল আমার ফৌজী জীবনারম্ভে সন্দেহ নেই, এবং এর সুষ্ঠু সমাপনের জন্য আমি আমার সর্ব উদ্যম নিয়োগ করলাম।

যাদের আমি পরিচালনা করবো, নিশ্চয়ই তাদের থেকে আমাকে হতে হবে অনেক শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং নীতি-সচেতন। ফৌজী প্যারেডে হতে হবে যেমন চটপটে, তেমনি নির্দেশ দিতে হবে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায়, খেলা-ধুলো এবং গুলিচালনায় প্রদর্শন করতে হবে পারদর্শীতা। সর্ব ভারত বক্সিং প্রতিযোগিতায় এই প্লেটুন চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং আমি কখনও জীবনে বক্সিংএ নামি নি; এ জিনিসটি মোটেই শোভনীয় নয়। একদিন সাহসে বুক বেঁধে আমি বক্সিং-রিঙে হাজির হলাম বক্সিংয়ের প্রথম পাঠ নিতে। প্রথম প্রথম সাটল-ককের মতো আমি ধাক্কা খেয়ে ফিরতাম আমার বক্সিং-এর সাথী খেলোয়াড়ের হাতে, ফিরতাম রক্তাপ্লুত নাক নিয়ে, তবু আমি রইলাম অবিচল নিষ্ঠায় ঠোঁটজোড়া চেপে এই বাহিনীর সঙ্গে আমার শেষস্থিতির দিন পর্যন্ত।

প্রায় অফিসররাই সাইকেলে চেপে বেড়াতেন। কমাণ্ডিং অফিসর শুধু গাড়ি চড়তেন মাঝে মাঝে, গাড়িখানা ঝড়ঝড়ে যার মূল্য হাজার তঙ্কাও হবে না। আমি একদিন একটা মোটর-সাইকেল কিনে ফেললাম। তাতে চেপে প্রাতঃরাশের সময় আমি এসে হাজির হলাম শিবিরে। শব্দ শুনে কমাণ্ডিং অফিসর অর্ধসমাপ্ত সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন আমার সামনে। মোটর সাইকেলে আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন :

'কার হুকুমে এটা কিনেছ ?'

কি দোষ করেছি আমি বুঝলাম না।

'ঐ বাজে জিনিসটায় যেন তোমাকে আর আমি চাপতে না দেখি। হ্যাঁ, ওটার বদলে যদি চাও তো ঘোড়ায় চাপতে পার।'

তর্ক নিষেধ। এইভাবেই সেকালে শৃঙ্খলাবোধের দৃঢ়ভিত্তি রচিত হতো।

একদিন কমাণ্ডিং অফিসর আমাকে তাঁর সঙ্গে নিলেন হাঁস শিকারে যাবার সময়। নিরীহ পাখী কিংবা জন্তু আমি মারতে রাজী নই। বন্য বরাহ কিংবা মানুষ-খেকো বাঘ অবশ্য আলাদা। আমি সে-কথা বললাম আমার সাহেবকে। সাহেব আমার দিকে ক্রোধের দৃষ্টি হেনে হাঁস শিকার একলাই চালিয়ে গেলেন।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের একটা রীতি আছে এখানে এবং সম্ভ্রান্তদের এই বিশেষ তালিকাটি তৈরি হতো সেনাবাহিনীতে। ফৌজী-বাহিনী এবং সাধারণ নাগরিক জীবনের থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত এই তালিকাটি।

ফৌজী জীবনের দিনটি শুরু হয় অতি প্রত্যুষে। ড্রিল সমাপনান্তে অফিসের কাজে গিয়ে বসা—সাধারণ সৈন্যদের দৈনন্দিন ব্যবহার-লিপি পাঠ, শস্ত্রবাহিনীর লোকেদের কর্মকুশলতার রিপোর্ট পাঠ, ছুটি, পরিচ্ছদ, দোষ-বিচার, সম্মান এবং পুরস্কার প্রদান, তাদের কীট দেখা, খেলা এবং তাদের মেসে একসঙ্গে খাওয়া।

গ্রীষ্মকালে সাবধানী ব্যবস্থা প্রত্যেককে গ্রহণ করতে হতো। কারণ ইংরেজরা সাঙ্ঘাতিকভাবে গ্রীষ্মের গরম এবং রোগ সম্বন্ধে ভীত। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তারা খাবার জল ফুটিয়ে নিত, মাথায় চাপাতো মস্তবড় শোলার হ্যাট। প্রচুর পরিমাণে বরফ চাই তাদের। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে জামার আস্তিন টেনে দিত সম্পূর্ণভাবে হাত দু'খানা ঢেকে এবং মশারী ছাড়া তারা শুতো না।

প্রায় প্রতি শনিবারই আমি আমার মাষ্টার-মশাই ব্রীজলাল বাবুকে আহারে নিমন্ত্রণ করে আনতাম। ইনিই আমার স্যাণ্ডহার্ষ্টে যাবার দিনে সবার অলক্ষ্যে শুভাশীর্বাদের প্রতীক হিসেবে একশ' টাকার একখানা নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। ভাগ্যবিড়ম্বিত, জীবনে বহু আঘাতপ্রাপ্ত মাষ্টার মশাই শুধু একটি অদ্ভুত অনুরোধ করেছিলেন। পান, আকণ্ঠ মদ্য পান তিনি করতে চান। কোন কথাটি না বলে আমি বৃদ্ধের সেই অনুরোধ রক্ষার ব্যবস্থা করেছি প্রায় প্রতি শনিবার। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যাবার আগে পর্যন্ত এই আমন্ত্রণ-ব্যবস্থা আমি চালিয়ে গিয়েছি। ব্রীজলালবাবুর মদ্যপানের সাথী হয়েও আমি শুধু 'শীতল সরবৎ' গ্রহণ করেছি এবং তিনিও আমার এই পানীয় মেনে নিয়েছিলেন।

গ্রীষ্মের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বহু বিদেশীদের মতো এই বাহিনীও কোন পাহাড়ে চলে যায় এবং আমরাও কসৌলী থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত দাগশাই নামক স্থানে গেলাম। সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য কর্তব্য ছাড়াও এখানে আমাদের প্রায়ই খাদে ওঠা-নামা করতে হতো—প্রায় দু'হাজার ফুট ওঠা-নামা। আমাদের শারীরিক কুশলতা ঠিক রাখবার জন্যই এই খাদ পরিক্রমা। আমার কাছে এই পরিক্রমা অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং অনেক সময় ক্লান্তিতে আমার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতো।

দাগশাইতে যখন আমি অবস্থান করছি, আমার বন্ধু হাকসার আই. সি. এস্. হয়ে এসেছে তখন কসৌলীতে। একই সঙ্গে আমরা কলেজে পড়েছি। ওর বোন ধনরাজ কিশোরী ওর সঙ্গেই বাস করতো। বহু গুণসম্পন্না সুন্দরী ধনরাজের সঙ্গে আমার আলাপ হলে, ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। আমি এসেই তাকে খুঁজতাম। আমার কসৌলী ভ্রমণও বেড়ে গেল। চোদ্দ মাইল পাহাড়ী পথ, ট্যাক্সিতে আসা-যাওয়া—আমার আর্থিক ক্ষমতার বাইরে। অন্য উপায় ছিল—এই দুর্গম পার্বত্য পথে হেঁটে আসা-যাওয়া করা। অবস্থার চাপে আমাকে এই শেষোক্ত পন্থাই গ্রহণ করতে হলো। দিনমানে কসৌলী যাবার পথে কোন অসুবিধাই হতো না, কিন্তু ফেরার পথের যাত্রা একেবারে ভিন্ন। ফিরতাম অনেক রাত্রে, নিশীথ রাত্রে, বনের ধার ঘেঁসে যে-পথ গিয়েছে তাই ধরে। সেই মধ্যরাত্রিতে এই পরিভ্রমণ সেকালে ছিল ভয়াবহ। একদিন হাকসারকে মন খুলে জিজ্ঞেস করলাম ওর বোনকে আমি বিয়ে করতে পারি কিনা। ও বললে যে ধনরাজ শীগগিরই বাগদত্তা হতে চলেছে

ওর এক খেলার সাথীর সঙ্গে। মাস কয়েক পর হাকসার আমাকে জানাল যে ধনরাজ আমার প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হয়েছে।

সেকেণ্ড লেফট্‌নাণ্ট হিসেবে আমার মাইনে এখন সাড়ে চারশো টাকা। এর থেকে আমার মেসের খরচ, ব্রিটিশ রেজিমেণ্টের অফিসরের ঠাঠ-ঠমক বজায় রাখার জন্য অর্থব্যয় এবং মা'কে মাসে মাসে দেড়শো টাকা পাঠাতে হতো। সুতরাং আমার অনাড়ম্বর জীবন, কোনরকম বিলাস-ব্যসনের নেই সুযোগ এ জীবনে। আমার রুগ্না বৃদ্ধা মা'র ওষুধ, ভাইবোনদের শিক্ষাব্যয় এবং অন্যান্য খরচ-খরচা আমার আয়ের উর্ধ্বে উঠে গেছে। আমি বাধ্য হলাম উচ্চ হারে সুদে টাকা ধার করতে। আগামী বেশ কয়েক বৎসর এই ঋণের ঘাড়ভাঙা বোঝা আমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

সেনাবাহিনীর জীবন-দর্শন আমি অবলোকন করেছি অতি নিকট থেকে। সেকালে ভারতীয়দের অবস্থা মোটেই সুখকর ছিল না। ঠাট্টা ক'রে ভারতীয় অফিসরদের বলা হতো 'ওগ্‌স্' অর্থাৎ 'বিলিতি প্রাচ্য ভদ্রলোক'। ব্রিটিশ আর্মি অফিসরদের থেকে একটা দূরত্ব রেখেই এঁদের চলতে হতো। এ অবস্থান একটা রীতিমত সংগ্রাম। অনেকে মাথা নুইয়ে এ দূরত্বের অবস্থান মেনে নিয়েছে, অনেকে ফৌজী পারদর্শীতার ক্ষেত্রে নিজেদের স্বীকৃতি আদায় ক'রে মাথা উঁচিয়ে থেকেছে।

ইংরেজরা সাধারণতঃ নিজেদের মধ্যেই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে; মোটা মাইনে, গ্রেটব্রিটেনে তৈরী সব পণ্য ব্যবহার, বড় বড় বাঙ্‌লোতে নামমাত্র খরচায়—খানসামা, মশালচি, ভিস্তি, মেথর এবং আয়া রেখে নবাবী জীবনে বাস। তারা নিজেরা রান্নাও করে না, কাপড়-জামা ধুইয়েও নেয় না।

প্রতি সকালে সাহেব যখন প্যারেডে যান, মেমসাহেব তখন ব্রিজ, মা-জং কিংবা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হাসি-ঠাট্টা-গল্পে সময় কাটিয়ে দেন। এ কদাভ্যাসটি সম্প্রতিকালে ভারতীয় মহিলারাও আয়ত্ব করেছেন এবং করছেন দ্রুত গতিতে। অপরাহ্ন পর্যন্ত ঝিমনো, মদ্যপানের জন্য ক্লাবে যাওয়া কিংবা সাঁতারে নামা এবং রাত্রের আহার সমাপনান্তে সিনেমা হলে বসে বসে ঘুমনো—এই হলো মেমসাহেবদের জীবন। সুখের দরিয়ায় জীবনাবগাহন, কিন্তু ভাবটা—এ দেশে বাস করে তাঁরা যেন শহীদের আত্মোৎসর্গ-জীবন যাপন করছেন! মশা-মাছি, ধুলো, রোগ, অতিগ্রীষ্ম—সব মিলিয়ে এ দেশে বাস রীতিমত কঠিন, সাম্রাজ্যের কারণেই তাঁদের এই

উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন![10] আমাদের দেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতা, জীবনাভ্যাস, রীতি-নীতি এবং সাধারণভাবে পেছিয়ে-পড়া জীবন সম্বন্ধে তাঁদের নাক-সিঁটকানো—এ সবের মূলে কিন্তু একটি কারণই আছে। তাঁরা নিজেদের অন্ততঃ বোঝাতে চান যে এদেশে তাঁরা বাস করছেন বিশেষ এক মহান উদ্দেশ্যে। তাঁরা বিশ্বাস করতে চান যে, ভারতের সর্বরীতির বিরুদ্ধে নিন্দা ঘোষণা দ্বারা তাঁরা এদেশের অ-সভ্য মানুষদের সভ্য মানুষে পরিণত করার ব্রত উদ্‌যাপন করছেন ; এদেশে ব্রিটিশ রাজের স্থিতি ও রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিততার ভাব-প্রস্তুতি অন্ততঃ নিজেদের কাছে এ উপায়েই তাঁরা করে থাকেন। তাঁদের ধারণা তাঁরা যা বলেন তাই হলো খাঁটি, ভারতের জাতীয় নেতাদের সর্বরকমের কাজ বে-আইনী। স্বাধীন ভারতের কথা যারা বলে তাদের প্রতি এঁদের ঘৃণা। কিন্তু এঁদের দেশেরই বার্ক বলেছিলেন : 'একটা সমগ্র জাতিকে দোষারোপ করা যে কীভাবে হতে পারে, আমি তা জানি না।'

প্রায় ত্রিশজন অফিসর এবং সাতশ' সৈনিকের এই ব্রিটিশ বাহিনীতে আমি হলাম একমাত্র ভারতীয়। একাধিকবার আমার তীব্র তর্ক হয়েছে অন্যান্য ব্রিটিশ অফিসরদের সঙ্গে যাঁরা ব্রিটিশ-রাজের ভারত-অবস্থানের মধ্যে মানবতা দেখে থাকেন, যে ভারত তার কুসংস্কার, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং অন্যান্য পেছিয়ে-পড়া ভাবধারায় ডুবে আছে। আমি বলতাম যে আমাদের এই অনগ্রসরতার মূল কারণ হলো বিদেশী শাসন যার স্বপক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না, এবং আমাদের আত্ম-শাসনের অধিকার মেনে নেওয়াই সঙ্গত। এই কারণে আমার অনেক সঙ্গী-সাথী অফিসররা এবং বিশেষ ক'রে ইংরেজরা আমাকে 'রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন' ব'লে অভিহিত করতেন।

'ঈষ্ট সারে'তে আমার শিক্ষানবীশি শেষ হবার প্রাক-মুহূর্তে আমাকে নির্বাচন করতে হলো কোন্ ভারতীয় বাহিনীতে আমি যোগ দিতে ইচ্ছুক। ৬ষ্ঠ রাজপুতানা রাইফেলস্-ভুক্ত[11] ৫ম বাহিনীতে (নেপিয়ার্স) যোগ দেওয়া

১০। কিন্তু কে তাদের এদেশে আহ্বান করেছে ?

১১। ১৭৭৫ সালে 'রাইফেল' বাহিনীর সূচনা হয়। কুচকাওয়াজের সময়ে বাম পার্শ্বে নিজেদের স্থান করে নেবার এবং প্রতি মিনিটে ১৪০ পদক্ষেপ অগ্রসর হবার অধিকার তাদের ছিল।

ঠিক করলাম কারণ, ঐতিহ্যপূর্ণ এই সেনাবাহিনী বহু বিজয়ের জয়মাল্যে বিভূষিত। তারপর রাইফেল রেজিমেণ্টে যোগ দেওয়া রীতিমত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। চটপটে পরিচ্ছদ, দ্রুত চলন, বিশেষ সম্মান এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে এই বাহিনীর। এই বাহিনীতে যোগ দেবার সুযোগ পেয়ে আমি ভাগ্যবান। রাজমাকের ওয়াজিরিস্তানে এই বাহিনীর অবস্থান।

সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে ভারতীয় অফিসরদের সম্বন্ধে একটা অপপ্রচার ছিল যে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ এবং সেই কারণে জওয়ানদের প্রমোশন, উন্নতি ও অন্যান্য ব্যাপারে সঠিক ব্যবহার ও সুবিচার 'সাহেব'দের কাছে যেভাবে পাওয়া যায় তা এঁদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমার প্রতি প্রাথমিক স্বাগতমের দিনে জওয়ানদের মনে একটা কিন্তু ভাব থেকে গেল। সাহেবদের সঙ্গে সব বিষয়ে এই দেশী অফিসর পারবেন কী?—এ প্রশ্নও তাদের মনের কোণে ছিল। কারণ, আজ পর্যন্ত 'সাহেব'দের সমকক্ষ কোন ভারতীয়কে তারা দেখে নি। সুতরাং জওয়ানদের ভাল করার ব্রতকর্মে অতি কঠিন পরিশ্রম সহকারে আমাদের কাজে লাগতে হলো। সাহেবী শ্রেষ্ঠতার যে কাহিনী গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে, তা ভাঙতে শুরু হলো এবং এই কাহিনী একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ আমরা খাড়া করেছি।

আমার এই বাহিনী ভারতীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানের মেসে ভারতীয় ভাষায় কথা বলা, রেডিওয় ভারতীয় সঙ্গীত শ্রবণ, বিশেষ দিন ব্যতীত ভারতীয় খাদ্য গ্রহণের খুব রেওয়াজ নেই। খেলা-ধুলো কিংবা অ-বিতর্ক-মূলক বিষয় নিয়ে আলাপ চলে এখানে। সপ্তাহে চারটি রাত্রিতে আমাদের মেসে খাদ্যগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক এবং তখন 'রেজিমেণ্ট্যাল পাইপ' বাজানো হতো। আমাদের কাজ সম্বন্ধে কোন আলোচনা (shop)[১২] কিংবা মেয়েদের নাম নিয়ে কোন কথা বলা এখানে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যদি কেউ তা ভঙ্গ করতো, তা হলে তাকে মদ্যপানের খরচ বহন করতে হতো। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, আমি এবং অন্যান্য কিছু ভারতীয়—সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য—যখন মেসে কিংবা অন্যত্র জাতীয় স্বার্থ এবং আমাদের জাতির নেতাদের সমর্থনে কিছু বলতাম, তখন আমাদের অনেকেই, যাঁরা পরবর্তী জীবনে মিলিটারীর

১২। shop—কার্য সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা।

সর্বোচ্চাসনে আরূঢ় হয়েছেন, অহেতুক বক্রোক্তি করতেন আমাদের জাতীয় নেতা গান্ধী বা নেহ্রু সম্বন্ধে; শুধু তাই নয়, তাঁরা ব্রিটিশরাজ এবং ব্যক্তিদের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতেন তাঁদের প্রভুদের মনোরঞ্জন এবং সস্তায় নাম কেনার জন্য। মেকলে এই দৃশ্যটি কল্পনা করেই ১৩০ বৎসর পূর্বে বলেছিলেন:

> যে কোটি কোটি লোকদের আমরা শাসন করি তাদের এবং আমাদের মধ্যে একটা শ্রেণী তৈরি করার জন্য আমাদের বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। এই শ্রেণী হবে রক্তমাংসে ভারতীয় কিন্তু আচারে-বিচারে, রুচি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।

অশোভন চাটুবাক্যে যারা পা মেলাতে পারত না, যারা 'বিপথগামী' স্বাধীনসত্তার বিকাশ দেখতে চাইত, তারা ব্রিটিশ অফিসরদের ক্রোধ আহ্বান করতো এবং তার ফলও হাতে হাতে পেত।

সেনাবাহিনীতে ক্রমশঃই ভারতীয় অফিসরদের নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, আবহাওয়াটা যেন অনুকূল হয়ে উঠছে। কিন্তু এ সময়েও ভারতীয় অফিসররা অনেকেই ইংরেজ আনুগত্য দেখাতে পরাঙ্মুখ হতো না, বিরত হতো না ভারতীয়দের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র এবং চুকলি কাটতে। এই ভাবে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকতো যাকে বলা যেতে পারে সর্বভারতেরই একখানা ফৌজী সংস্করণের ছবি।

মাকে নিয়ে আমি চ'লছি লাহোর থেকে রাওলপিণ্ডি। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে উঠতে যাচ্ছি, দেখি ভেতর থেকে কামরা বন্ধ। দরজা ধাক্কালাম। জানালার শার্সীর পেছন থেকে জনৈকা ইংরেজ মহিলা ঘুষি দেখিয়ে বললেন যে দরজা খুলবেন না। আমি ক্রোধে ফেটে পড়লাম। আমাদের ভারতীয় ষ্টেশন মাষ্টারকে ডেকে আমি বললাম কামরার দরজা খুলে দিতে। ষ্টেশন-মাষ্টার মেমসাহেব দেখে ভীত হয়ে পড়লেন, কিন্তু আমি জোর করায় এবং বহু ভারতীয় কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে—ইংরেজরা আবার লোক সমাগম দেখলে বিরক্ত হয়—দরজাটা খুললেন অবশেষে মেমসাহেব। তাঁর সে-দাপট চুপ্‌সে গেল। সে-কালে ইংরেজরা ভারতীয়দের সঙ্গে ভ্রমণ করতে চাইত না। তাদের কাছে ভারতীয়রা ঘৃণ্য জীব।

লেফটেনান্ট কর্ণেল ফার্গুসন ছিলেন আমাদের অধিনায়ক। এক পাগলাটে স্কটম্যান যিনি তাঁর নিজস্ব মনগড়া এক দুনিয়ায় বাস করতেন।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বলতেন যে, নতুন অফিসররা রাজপুতানায় গিয়ে তাদের আংশিক ছুটি কাটিয়ে আসবে, কারণ এই বাহিনীর বেশীর ভাগ জওয়ানরা সব রাজপুতানার বাসিন্দা। যখন কারও ছুটি তিনি বন্ধ ক'রে দিতেন, তিনি বলতেন: 'ছুটিটা হলো স্থবিধে-বিশেষ, পাওনা নয়।'

নতুন অফিসর, স্থতরাং সবরকম ধন্যবাদহীন কাজ-কর্ম চাপতো আমার উপর। আমি হলাম মেসের তৃতীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসর। হিসাব পরীক্ষক, খেলা-ধূলোর অফিসর—এবং সবগুলো কাজ একই সঙ্গে। ফার্গুসন আমাকে বললেন যে ওয়াজিরিস্তান হকি এবং ব্যায়ামে কিন্তু বিজয়মাল্য আনতেই হবে। 'যদি না পার,' সাবধান ক'রে দিয়ে বুড়ো বললেন: 'তোমার কপালে কিন্তু অশেষ দুঃখ।' কয়েক মাস ধরে অসম্ভব পরিশ্রম ক'রে আমরা জিনে নিয়ে এলাম জয়মাল্য এবং অধিনায়ক ফার্গুসনের হাতে গর্বের সঙ্গে এনে দিলাম সেই বিজয় প্রতীক। তারই প্রতিদানে বৃদ্ধ আমাকে নিয়োগ করলেন উমরাও সিং-এর স্থলে অস্থায়ী কোয়ার্টার মাষ্টারের পদে। উমরাও সিং[১৩] তখন ছুটিতে। উমরাও আমাকে ফৌজী রীতি-সহবৎ সব শিখিয়েছিল।

খবর পেলাম মা'র কিডনি অপারেশন করতে হবে। আমি তাঁর কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু যাই কিভাবে এই লম্বা পথ। বিমূঢ় হয়ে রইলাম। আমার পক্ষে রাজমাক থেকে লাহোর যাওয়া আর মস্কো থেকে লণ্ডন যাওয়া একই ব্যাপার। উমরাও এগিয়ে এল আমার সাহায্যে। ট্যাঙ্কে তেল ভর্তি করে সে তার মরিস গাড়িখানা আমাকে ছেড়ে দিলো। সঙ্গে দিলো ড্রাইভার এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ব্যবস্থা করে দিলো যাতে আমি গিয়ে ফিরে আসতে পারি।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ওয়াজিরিস্তানের প্রাণকেন্দ্র হলো রাজমাক। দুটি প্রধান উপজাতি, মাশুদ আর আফ্রিদীদের বাস এ অঞ্চলে। রাজমাক থেকে সাত মাইল দূরে 'আলেক্সান্দ্রা পিকেট'-এ এক-একমাস করে ডিউটি পড়ে অফিসরদের। এখানে আসা মানে ৩০ দিনের নির্বাসিতের জীবন যাপন আর সেই সঙ্গে দিকচক্রবালের চারিদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে বসে থাকা। হাঙর সংকুলিত দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের মাঝে আলোঘরে যেন সে বসে আছে। এ স্থান হলো নিষেধাঞ্চল। চারধারে আতিথ্যবিমুখ উপজাতিদের বাস। সামান্য

১৩। উমরাও সিং আমার থেকে ১৮ মাস সিনিয়র। ফৌজী রীতি-সহবৎ আমি জেনেছি তার কাছ থেকে। আমার ক্যামেরা যখন হারিয়ে যায়, উমরাও আমাকে আর একটা উপহার দিয়েছিল। অন্যান্য বহুরকম সাহায্য আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি।

একটু ভুল যদি জওয়ানরা করে, সঙ্গে সঙ্গে মাশুদদের অব্যর্থ গুলির উত্তর আসবে, যে গুলি তারা করে অনুশোচনাহীন অতি সহজভাবে। বন্ধু হিসেবে তারা ভাল এবং শত্রু হিসেবে সাংঘাতিক। হাতের মুঠোয় তারা জীবন নিয়ে ফেরে। নিজেদের মধ্যে মেয়েদের নিয়ে কিংবা জমি বা বংশানুক্রমিক যে উপজাতি-উপজাতিতে লড়াই চলেছে তার জন্য অতি সহজেই সে এই হাতের মুঠোয় রাখা জীবনটিকে পণ করে যুদ্ধে নামতে এতটুকু দ্বিধা করে না। ব্রিটিশদের তারা জাত-শত্রু, কারণ তাদের অঞ্চলে এবং তাদের নিজস্ব জীবন-রীতির মধ্যে ইংরেজদের এই অনুপ্রবেশ তারা মেনে নিতে রাজী নয়। সুতরাং ইংরেজদের কোনরকম সুবিধা তারা দেবে না, কোনরকম সুবিধার প্রত্যাশীও তারা নয়। শিবির-কর্তব্য ব্যতীতও আমাদের বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে সশস্ত্র অবস্থায় কয়েকদিনের কর্মসূচী অনুযায়ী পরিভ্রমণে বের করা হতো পাঠান অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হতো, তবে গুরুত্বের বিচারে সেগুলো সাধারণ সংঘর্ষ মাত্র। এই 'মার্চে' আমিও গিয়েছি অনেকবার এবং একাধিকবার এই গুলিবিনিময়ের মধ্যে পড়েও গিয়েছি। এখানে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা জীবনে কোনদিন ভুলবার নয়।

আমি পুস্তো ভাষা শিখতে শুরু ক'রে এ ভাষার প্রাথমিক বই 'হাঘা-দাঘা'র সাহায্যে অক্ষর পরিচয় ক'রে ফেললাম। উর্দু ও ফার্শী ভাষা জানা থাকার ফলে এ ভাষা শিখতে আমার বেশ মজাই লাগতো।

নয়া অফিসরের অভিজ্ঞতা অর্জনের শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ওয়াজিরিস্তান আদর্শস্থানীয়। শারীরিক দৃঢ়তা, কষ্টে জীবনযাপন, বিপদের মুখে পড়ে কোনরকম পরামর্শ বা উপদেশের সুযোগ না পেয়ে এক লহমার মধ্যে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ—নয়া অফিসরের আত্ম-অভিজ্ঞতালব্ধ এ শিক্ষা তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে।

ফৌজী শিবির ছাড়াও ইংরেজদের কাছে রাজমাক হলো সাম্রাজ্যবিস্তারের বর্শামুখ। এখানে বসে সে তার দেশ ও রাজার প্রতি আনুগত্যবোধে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। জাতিবিদ্বেষের অনলে উপজাতির বিরুদ্ধে উপজাতিকে ক্ষেপিয়ে তোলে, ঢালে টাকা আর সেই সঙ্গে মিশ্রণ করে তাদের কলাকৌশল-শঠতা। 'বিভেদ ও শাসন'—রাজনীতির এ খেলা তারা যেন প্রতিশোধের জ্বালা নিয়েই খেলে। ভারতেও বহু ভারতীয় যেমন এ খেলার শরীক, এখানে উপজাতিরাও পরস্পরের বিরুদ্ধে ইংরেজদের খেলার শরীক হয়েছে। কিন্তু

সে-সংখ্যা নগণ্য, বেশীর ভাগ লোকই তাদের নিজস্ব মুক্ত জীবনধারায় থাকতে চেয়ে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, যেমন চালিয়ে চলেছে ভারতীয়রা ভারতে। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন কিন্তু পাঠানরা আজও সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তার অগ্নিপরীক্ষার যেন শেষ নেই। কিন্তু স্বাধীনতা কিছুদিনের জন্যই আটকে রাখা যায়, সর্বকালের জন্য কাউকে অধীন রাখা যায় না।

আমার বাহিনীর সর্বকর্মে আমি উৎসাহ গ্রহণ করতাম। সাধারণ বাহিনীতে যে রাইফেল শিক্ষা প্রচলিত ছিল তার থেকে এখানে সে-শিক্ষা ভিন্ন। সুবেদার আমির আলি ও জওয়ানা রাম আমাকে রাইফেলের এই বিশেষ শিক্ষা দিল। বিশেষ বিশেষ নির্দেশসূচক হুকুম এখানে আমি প্রথম শিখলাম। যেমন, 'বি কোম্পানী হুঁশিয়ার'—এই হুকুমের পরিবর্তে এখানকার হুকুম হলো: 'সামনে তাকাও, বি কোম্পানী।' কাঁধে বন্দুকের পরিবর্তে এখানে বন্দুক পিঠে ঝোলান রীতি। একশ' কুড়ি কদমের পরিবর্তে এখানে চালু একশ' চল্লিশ। এখানে বৃদ্ধ সুবেদার দীন সিং সবার প্রিয়, সত্যিই দীন, বিনম্র তার ব্যবহার। শিবিরাধ্যক্ষ কথা বললেই তার বিনম্র জবাবটি ছিল: 'ঠিক আছে, হুজুর।' একদিন দীন সিং যখন একদল জওয়ানদের নিয়ে গুলি পরিচালনা তদারক করছিল, শিবিরাধ্যক্ষ এসে তাকে বললেন: 'দীন সিং···মেশিন গান ··ছে আঙাল · সম্‌ঝ্‌টে? ফ্‌···শ্‌স্‌।' অর্থাৎ, 'দীন সিং তোমার মেসিন গান ছয় আঙুল তোলো। বুঝেছ? চালাও।' শিবিরাধ্যক্ষের একটি কথাও না বুঝে দীন সিং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল: 'ঠিক আছে, হুজুর।' শিবিরাধ্যক্ষ চলে যাবার পর আমি যখন তাকে বললাম যে হুকুমের কোন কথাই কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি, দীন সিং স্বীকার করলো যে সেও বুঝতে পারে নি। কিন্তু শিবিরাধ্যক্ষকে তো জিজ্ঞেস করা চলবে না, সুতরাং 'হাঁ হুজুর' দিয়েই তাঁর সব কিছু কথার উত্তর সারা।

ভারতীয়দের সংস্কারবোধে আঘাত না দেবার নিয়ম চালু থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা কিন্তু প্রায়ই তা করে ফেলতো। রাজমাকে গরু জবাইয়ের জায়গায় তারা এক হিন্দু সৈনিককে ডিউটি দিল। ব্রিটিশ ও মুসলিম সৈন্যদের জন্য এই মাংস আসতো। সুতরাং 'পবিত্র' গরু নিধনের সামনে এই ডিউটি দেওয়ায় আমাদের বাহিনীর হিন্দু সৈনিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। একদিন এক শাস্ত্রীকক্ষ থেকে ঐ হিন্দু সৈনিকটি পর পর গুলি চালিয়ে জনকয়েক

কসাইকে খতম করে দিল। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই বিক্ষুব্ধ ভাব কিন্তু অতি সহজেই বিদূরণ করা সম্ভব ছিল যদি কসাইখানায় মুসলিম কিংবা ইংরেজ জওয়ানদের নিয়োগ করা হতো।

সেই দোষী খুনীকে অবশ্য ফৌজী-বিচারের পর ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের দ্বিতীয় অধিনায়ক হলেন কেন্নেথ গাই। 'বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের' মতো তাঁর অবস্থা, কেউই তাঁকে চায় না। মেস-জীবনে কিংবা প্যারেডের সময় তিনি উপদ্রব বিশেষ। সব সময়েই নতুন অফিসরদের সিনিয়রদের সামনে ধূমপান কিংবা পকেটে হাত দেওয়া কিংবা অন্য যে-কোনও ছোট-খাট ত্রুটি দেখলেই তিনি শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতেন শৃঙ্খলাভঙ্গের অজুহাতে। শিবিরাধ্যক্ষ তাঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। ভদ্রলোকের ফৌজী-জীবন শেষ হয়ে যায় মেজরের পদ থেকে এবং তারপর তিনি ভাইসরয় প্রাসাদের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থার হিসাব-পরীক্ষকের কাজে পুনঃনিযুক্ত হন।

আমি একদিন অসম্মানের মধ্যেই পড়লাম যখন আমার এক বন্ধু সহ মেসে আমরা হাসি-ঠাট্টা করছিলাম। আমাদের বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা স্যার চার্লস নেপিয়ারের পূর্ণাবয়ব ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছিন্ন পরিচ্ছদ, লম্বা দাড়ি স্যার নেপিয়ারের। স্যাণ্ডহার্স্টের মেজর সার্জেণ্টের মতো আমি এই সম্মানিত ব্যক্তির ছবির সামনে ফৌজী কায়দায় পা ঠুকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম: 'মিঃ নেপিয়ার! তোমার চুলটা ছাঁটা দরকার। আর এই ছিন্ন জামা-কাপড় পরনে। এই অনবধানতার জন্য দুটো অতিরিক্ত প্যারেড করতে হবে তোমাকে, বুঝলে! ওঠো, মি-স্-টা-র নেপিয়ার।' চরম তামাসা হিসেবেই আমি এই ভাবে কথা বলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম দরজা খুলে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কেন্নেথ গাই মহান ফৌজী-নেতাকে নিয়ে এই যে ঠাট্টা-মস্করা করছিলাম তার সব কথা শুনছেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে আমার এই কুকর্মের জন্য সেনাবাহিনী থেকে যাতে আমাকে বিতাড়ন করা হয় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

'কুত্তার বাচ্চা, এই মহান নেতাকে নিয়ে এইভাবে ঠাট্টা!'

এই বোকামীর জন্য যে ধাক্কা আমি খেয়েছিলাম তার জন্য আমি নিজেই দায়ী। তার কথা আমি কখনও ভুলবো না।

আমাদের ফৌজী-পরিচ্ছদ তৈরির জন্য লীচ্ ও এবোরনে নামক দরজী-প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত ছিল। পরিচ্ছদের সঠিক মাপ, তার ছাট শুধু তারাই

জানতো। আমার নিজের জন্য যখন একটা পরিচ্ছদ বানাবার অর্ডার দিতে যাচ্ছিলাম ওদের কাছে, বন্ধু কিরপালের সঙ্গে দেখা। সে বললো অর্ডারটা পিটম্যান দরজীকে দিতে—তারা লীচ্ ও এবোরনের মতোই ভাল দরজী—এবং তারটা সে পিটম্যানকে দিয়ে করিয়েছে। তাছাড়া লীচ্-এবোরনে সেই দিল্লীতে আর পিটম্যান হলো লাহোরে, অনেক কাছে। ঝুট-ঝামেলাও অনেক কম। পিটম্যানকে দিয়ে করিয়ে আমি নির্বুদ্ধিতার কাজই করলাম। এর পরের অতিথি আপ্যায়নের নিমন্ত্রণ-রজনীতে আমি এই নতুন পরিচ্ছদ গর্বের সঙ্গে পরে হাজির হলাম মেসে এবং গিয়ে বসলাম একেবারে কেন্নেথ গাইয়ের পাশেই। কেন্নেথ গাই দ্বিতীয় শিবিরাধ্যক্ষ তো বটেই, তিনি আবার মেস কমিটির প্রেসিডেন্টও। মুহূর্তকাল আমার নতুন পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞেস করলেন :

'কাকে দিয়ে বানিয়েছ ?'

'পি-পি-পিটম্যান, স্যার।'

'পিটম্যান ? ওটা আবার কে ? ওনাম তো শুনি নি কোনদিন !'

'চমৎকার দরজী, স্যার···।'

'তুমি জানো না আমাদের বাহিনীর দরজী কে ? লীচ্ ও এবোরনে ছাড়া আর কেউ আমাদের ফৌজী-পরিচ্ছদ তৈরি করতে পারে না। অ-অনুমোদিত দরজীর কাছে কে যেতে বলেছিল ?'

'কেউ না, স্যার—।'

'বেশ, তা হলে আমি হুকুম দিচ্ছি, তুমি লীচ্ ও এবোরনেকে দিয়ে শীগগিরই পোষাক তৈরি করিয়ে নেবে। দুটোই আমার কাছে নিয়ে আসবে যাতে আমি দুটোই মিলিয়ে দেখে নিতে পারি।'

'আ-চ-ছা, স্যার···।' আমি তো-তো করে বললাম।

এ অবস্থা আমারই সৃষ্টি এবং এর থেকে বেরুবার অন্য উপায়ও নেই।

ফৌজী বাহিনীতে সুবেদার মেজরের পদটি বহু সম্মানিত। কি যুদ্ধে কি শান্তির সময়ে তাঁর অবদান স্মরণীয় এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে তাঁর ইজ্জৎ ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী। শিবিরাধ্যক্ষ কোন কিছু করবার আগে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে নেন

সুবেদার মেজরের সঙ্গে। শিবিরাধ্যক্ষের দক্ষিণ হাতও বলা চলে সুবেদার মেজরকে এবং সেই কারণে তাঁর সম্মানও সেই পর্যায়ের।

কেলির বাবা আগে ছিলেন আমাদের বাহিনীর প্রধান কর্ণেল। এই পদটি সৈন্যবাহিনীতে আকাঙ্খিত পদ। সেই কারণে সিনিয়র সাবঅল্টার্নের পদমর্যাদা ছাড়াও এ বাহিনীতে কেলির অবস্থাটা আরও বিশিষ্ট ছিল। যা সাধারণতঃ কেউই কোনদিন করে না, কেলি একদিন সুবেদার মেজরকে অপমান করে বসলো। সুবেদার মেজর কর্কশ ভাষায় কথা শুনতে অভ্যস্ত নন, কেলির কথা শুনে তাঁর মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠলো। কোমরের বেল্ট্‌টা খুলে ফেলে শিবিরাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে বেল্ট্‌খানা নামিয়ে দিয়ে তক্ষুনি বিদায় চাইলেন। অফিসররা যদি তাঁর সম্মান না রেখে ব্যবহার করে, তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। কর্ণেল তাঁকে শান্ত করলেন, কেলিকে ডেকে শাসন করে বললেন যে তাকে সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি সরিয়ে দেবেন। কেলিকে ক্ষমা চাইতে হলো শিবিরাধ্যক্ষ এবং সুবেদার মেজরের কাছে, এবং এইভাবে সেদিন তার চাকুরি রক্ষা হয়েছিল ঔদ্ধত্যের লাঙ্গুলখানা গুটিয়ে নিয়ে। আর এইভাবেই সুবেদার মেজরের সম্মান রক্ষা করা হতো বাহিনীতে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে জওয়ানদের কর্তব্যকর্মে বিশ্বস্ততার উপরে, যে বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নানা কাহিনী চালু আছে। ভারতীয় জওয়ানের হাসিখুশিভাব, তার চরিত্রের সরলতা, তার নির্দেশ-সচেতনতা যাঁর কাছে, বিশেষ করে যাঁর অধীনে সে কাজ করে, তাঁর কাছে তাকে অত্যন্ত প্রিয় ক'রে তোলে। জীবনের সব কিছু এই ভাবে যে ঢেলে দিলো, তার পরিবর্তে সে চায় মাত্র সামান্য কিছু—তার পাওনা ছুটি, যাতে সে বাড়িতে ফিরে তার সমস্যাসঙ্কুল গার্হস্থ্য-জীবনের বহুকিছু অসমাপ্ত কাজের সুরাহা করে আসতে পারে, যা তার অনুপস্থিতির জন্য হয় না। তার সরলতার জন্য সে হয়তো বোঝে না যে তার মধ্যে অনেকেই এই ছুটি নিয়ে যায় নানা ধরনের কারণ দর্শিয়ে, তবে তাদের দর্শানোটা হয় বেশ সুষ্ঠুভাবে। সরল জওয়ান তার উপরওয়ালাকে বোঝাবার জন্য মাঝে মাঝে কিছু তার-বার্তা আনিয়ে থাকে যার ভাষা হয়তো হয় এই রকম: 'বাড়ি ভেঙে পড়েছে, মোষটা মারা গেছে, অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, শীঘ্র এস।' সে হয়তো আশা করে যে তার দুরবস্থার সংবাদ পেয়ে উপরওয়ালার হৃদয় নিশ্চয়ই বিগলিত

হবে। কিন্তু উপরওয়ালা তো এই জাতীয় একই সংবাদ পাঠ করছেন এবং সেই কারণে তাঁকে বিচার করতে হচ্ছে এক-একজনের বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে।

আমাদের বাহিনীর 'সি' কোম্পানীর অধিনায়ক ছিলেন ইংরেজ অফিসর মেজর 'পেতে' রীজ। ছোট-খাট মানুষটি, কিন্তু ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে তাঁর চেহারায়। রণ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত। কথাবার্তায় সংযমী। ১৯৩৪ এর নভেম্বরে তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখে মনে হতো বয়স অনেক কম। ভদ্রলোকের কর্মশক্তির যেন শেষ নেই, এবং শরীরখানাও ক্লান্তিহীন, দৃঢ়। অভ্যাসে স্পার্টান এবং মদ ছুঁতেন না। পর্বতারোহণ এবং খেলাধুলোয় পারদর্শী। বীরত্বের জন্য তিনি ডি. এস. ও. এবং এম. সি. দ্বারা বিভূষিত। শান্তির কাজের জন্য তিনি সি. আই. ই. দ্বারা সম্মানিত। তাঁর পক্ষে কোন কিছুই বোধ হয় অসম্ভব ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিলে তা তিনি রক্ষা করতেনই। ধার্মিক এবং সত্যবাদী। তাঁর বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল থাকা যায় এবং তাঁকে সবাই ভালবাসতো। কর্তব্যকর্মে তাঁর নিষ্ঠা ছিল উদাহরণযোগ্য। তিনি ছিলেন দয়ালু, হৃদয়বান এবং তাঁর প্রাণটা ছিল অগ্নিশিখার মতো তপ্ত। সাহসী এবং নিয়ম-নিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি ক্ষমাহীন। কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ থাকতেন তিনি এবং লাল ফিতার বেড়াজালে কর্মদক্ষতার বাঁধন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমাদের সংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাসকে তিনি সম্মান করতেন। সত্যিই তিনি আদর্শ-স্থানীয় পুরুষ এবং আমার সমগ্র ফৌজী-জীবনে তাঁকেই আমি উদাহরণ হিসেবে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি।

এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সংস্পর্শ আমার জীবনে এসেছে অনেকবার। অনেক রাত্রে তিনি আমার কক্ষে এসে রণকৌশল, ইতিহাস এবং বাহিনী সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। ছুটি এবং সন্ধ্যেগুলো আমি কী ভাবে কাটাই তা তিনি একবার জানতে চাইলেন। খেলাধুলোর পর আমি রেডিও শুনি এবং উপন্যাস পড়ি। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মিলিটারী বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির কোন কর্মসূচীই আমার নেই শুনে তিনি হতবাক হয়েছিলেন সেদিন। তিনি আমাকে জানালেন যে কুড়ি

বৎসর ধরে এই বিষয় নিয়ে চলা সত্ত্বেও তাঁর প্রায়ই মনে হয়েছে যে তাঁর জ্ঞান অতি সীমিত, এবং জ্ঞান বৃদ্ধির কোনরকম চেষ্টা আমার নেই দেখে কুড়ি বৎসর পর আমার ভবিষ্যৎ যে কী হবে ভেবে তিনি সত্যিই বিচলিত বোধ করছেন। আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে ভবিষ্যতে রেডিও শোনা আর উপন্যাস পাঠে সময় অপচয়ের কথা বলে গর্ব করা ছাড়া আমার আর কিছুই থাকবে না। আমার যেন চোখ খুলে গেল এবং তার পরদিন থেকে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মিলিটারী বিষয়ে পাঠ শুরু করলাম। মিলিটারী ইতিহাস ও রণচাতুর্যের উপর পাঠ ছাড়াও আমি পড়লাম প্রখ্যাত সেনানায়কদের জীবনগাথা, পড়লাম জুলিয়স সীজার, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, কামাল আতাতুর্ক এবং অ্যারেবিয়ার লরেন্সের জীবনী।

'বি' কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে আমি আছি রাজমাক শিবিরে। এক রাত্রে তিনি এলেন আমার কাছে। সমস্ত রাত্রি ধরে রাজমাকের চারধারে ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য তিনি আমাকে তাঁর সাথী হতে বললেন। মাইল পনের দু'জনে এক নাগারে ঘুরলাম। পিঠে ঝোলানো ভারী কীট ব্যাগ। সমুদ্র থেকে ৭০০০ ফিট উচ্চ স্থানে ঐ ওজন পিঠে নিয়ে ১০ ঘণ্টা ধরে ঘোরা রীতিমত সহনশীলতার পরীক্ষা। এই ভাবেই রীজ উদাহরণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কাজ করতেন। এই ভাবেই সিনিয়র অফিসরদের কাজের ধরন হওয়া উচিত যা তাঁর দেশের বেশীর ভাগ সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁরা শুধু আসেন তাঁদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে, জনস্বার্থ রক্ষার জন্য মোটেই নয়।

মা টেলিগ্রাম করেছেন, তাঁর শারীরিক অসুস্থতা নিবারণের জন্য শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনে দু' হাজার টাকা দরকার। কিছু টাকা ধার করলাম আর বাকী টাকা জোগাড় করলাম আমার গ্রামোফন, কার্পেট প্রভৃতি কিছু জিনিস জলের দামে বিক্রী করে। আমার শিবিরাধ্যক্ষ যখন জানতে পারলেন যে আমি বাইরে থেকে টাকা ধার করেছি, তিনি আমাকে ডেকে জানালেন যে ফৌজী-কানুন অনুযায়ী আমার এ কাজ গর্হিত হয়েছে। বিনয়াবনত হয়ে তাঁকে জানালাম যে এই কানুন আমি জানি, তবে পুত্র হয়ে মা'র এই দুস্থাবস্থার সংবাদ পেয়েও কিভাবে চুপ থাকা যায় বুঝতে পারি নি। ব্রিটিশ শিবিরাধ্যক্ষ আমার উত্তরে খুশী হলেন এবং রেজিমেন্ট থেকে মোটা টাকা ধার পাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এ টাকা দিয়ে আমার ঋণই শুধু শোধ

করে দিলাম না, মা'র শল্য চিকিৎসার পর অন্যান্য খরচেরও নিশ্চিন্তে ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলাম।

তারপর থেকে মা আর খুব সুস্থ হয়ে উঠলেন না। তাঁর চিকিৎসার খরচ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলো। আমি যে টাকা পাঠাতাম তাঁর চিকিৎসা এবং ভরণ-পোষণের জন্য তা দিয়ে তিনি আর কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। কিছু ধারও তিনি করলেন। উত্তমর্ণের চাপে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং এবার তারা আমাকেও চাপ দিতে শুরু করলো। মা'র খরচ-খরচা চালিয়ে আবার যদি এই ঋণ আমাকে শোধ দিতে হয় তবে আমার প্রয়োজন অতিরিক্ত আয়ের। তা করার মানে হলো সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করে অন্য কোন চাকুরিতে ঢোকা। রাজপুতানা রাইফেলস্-এ থাকাই আমার বাসনা যেখানে আমি মোটামুটি খুব খারাপ কাজ করছি না। সুতরাং দুশ্চিন্তিত হলাম, হলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও। সেনাবাহিনীতে থাকা এবং সেই সঙ্গে আবার বাইরে কোথাও চাকরী করা—এই পরস্পর বিরোধী দু'টির কোন্‌টা? দিনের পর দিন দুশ্চিন্তিত হয়ে কাটাতে থাকলাম। এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে কাটাতে কাটাতে অবশেষে আমার পুত্রের কর্তব্যের ভাবপ্রবণতা বিজয়ী হলো। 'আর্মি অর্ডারে' দেখলাম সেনাবাহিনী বহির্ভূত ফ্রন্টিয়ার-স্কাউট্‌স, বর্মা মিলিটারী পুলিস, আর্মি সার্ভিস কোরে কাজ করা যেতে পারে এবং এই কাজগুলোর জন্য অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়। প্রথম দুটিতে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ, তৃতীয়টিতে আমাকে গ্রহণ করা হলো। শাঁখের করাতে পড়েছি—আয় বাড়বে বটে কিন্তু রাজপুতানা রাইফেলস্ ছেড়ে দিতে হবে। যে দিন বাহিনী ছেড়ে দেবার কথা, সেদিনও দোদুল্যমান অবস্থায় দুলছি। বললাম আমার মনের অবস্থা বন্ধুদের কাছে। কিন্তু যে সব বন্ধুরা আমার সাংসারিক অবস্থা জানতো, তারা আমাকে বললো আর নতুন করে না ভাবতে। মেসে যখন খেতে বসেছি তখনও ভারাক্রান্ত মনে প্রতিজ্ঞা করছি, ধাক্কা একটু সামলিয়েই আবার পদাতিক বাহিনীতে আসবো। অবস্থার চাপে পড়ে আমাকে যে বাহিনী ছাড়তে হলো তাতে আমি আবার ফিরে এসেছি একটু অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং বাহিনীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেয়ে।[১৪]

১৪। বাহিনী পরিত্যাগের পর আমাকে বারকয়েক চেষ্টা করতে হয়েছিল কয়েক বৎসর ধরে, বাহিনীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের জন্য।

তিন মাসের শিক্ষার জন্য আমি গেলাম রাওলপিণ্ডি। ১৯৩৬-এর নভেম্বরে আমার বিয়ে হলো। আমার বয়স সাড়ে চব্বিশ। সাধারণ, ধুমধামহীন বিবাহ যা সাধারণতঃ আমাদের দেশে হয় না। দু'পক্ষই এ ব্যাপারে রাজী। আমার স্ত্রীর ডাকনাম ধান্নু। অপূর্ব সুন্দরী, সহজ সরল অমায়িক ব্যবহার। অত্যন্ত ধার্মিক। বিয়ের দু'এক দিন পর আমার শিক্ষার ক্লাসে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে 'বর্তমান অবস্থার' উপর এক বক্তৃতা শুনতে হলো। সদ্যবিবাহিত আমার এক বৃটিশ সাথীকে এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ঠিক করতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পক্ষে সে-বক্তৃতা তৈরী করা সম্ভব হয়নি। সে দিয়েছিল তার স্ত্রীকে এই কাজটি। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তেল পুড়িয়ে সেই ইংরেজ-কন্যা এক বক্তৃতার খসড়া তৈরী করে ফেললেন। স্বামীকে দিয়ে সেই বক্তৃতা মুখস্ত করালেন। তার ধারণা হলো যে বক্তৃতাটি সে মোটামুটি মুখস্ত করে নিয়েছে। পরদিন সকালে যখন সে বক্তৃতা দেবার জন্য দাঁড়াল, সে দেখলো যে সে সব বেমালুম ভুলে গেছে।

তো-তো করে সে শুধু বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, গতরাত্রে আমি আর আমার স্ত্রী এই বক্তৃতাটি দু'জনেই জানতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু আমার স্ত্রীই শুধু জানেন।'

সমস্ত ক্লাশ হাসিতে ফেটে পড়ল। শুধু হাসলেন না ক্রুদ্ধ কমাণ্ডিং অফিসর। পরের ট্রেনেই সেই দুর্ভাগা ইংরেজ অফিসরটিকে অসম্মানের পত্র-চিহ্ন নিয়ে ফিরে যেতে হলো

রাওলপিণ্ডি থেকে আমি এলাম জব্বলপুরে। এ শিবিরের অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রিগেডিয়ার লক্‌হার্ট আর ব্রিগেড মেজর ছিলেন মেজর ম্যাক্‌কে। প্রথমজন এসেছেন শিখ বাহিনী থেকে আর দ্বিতীয়জন এসেছেন রাজপুতানা রাইফেলস্ থেকে। দু'জনেই অফিসর হিসেবে অত্যন্ত ভাল এবং তাঁদের অধীনে খুশীতে কাজ করেছি। পরবর্তীকালে লক্‌হার্ট হয়েছিলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি আর ম্যাক্‌কে মেজর জেনারেলের পদ থেকে কর্মজীবন শেষ করেন।

আমার বয়স এখন পঁচিশ। এ বয়সে মানুষ চায় কিছুটা সাজানো জীবন অতিবাহিত করতে, চায় স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন। চায় একখানা গাড়ি, রেডিও, রেফ্রিজারেটর, মাঝে মাঝে সিনেমা দেখা, বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়ন করা এবং একটু পানের ব্যবস্থা (আমার পক্ষে অবশ্য পানের সমস্যা ছিল না)। সাত বৎসর আগে বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা'র ভরণপোষণের জন্য আমার

জীবন থেকে সমস্ত রকম বিলাস তখন পরিত্যাগ করেছি। বহুদিন সিনেমা দেখার আগে তু'তুবার আমি ভেবেছি এ ব্যয় উচিত হবে কি না। ইচ্ছে থাকলেও গাড়ি, রেডিও, রেফ্রিজারেটর, বন্ধু-বান্ধব আপ্যায়নের কথা আমি ভাবতেও পারি নি। তবুও মানুষের মনের একটা শেষ সীমাও আছে। চোখ-কান বুঁজে আমি একটা ব্যবহৃত মোটর কিনে ফেলব ঠিক করলাম। একদিন বোম্বে গ্যারেজে গিয়ে নশ'টাকা মূল্যে—এবং তাও ধারে আমি একখানা 'উলস্‌লে হরনেট' কিনে বসলাম। গাড়ি চালানোর কিছুই আমি জানতাম না। তবুও পারদর্শী চালকের মতো আমি গিয়ে বসলাম সীটে এবং গাড়ী-বিক্রেতাকে বললাম যন্ত্রপাতি আমাকে বুঝিয়ে দিতে। মেসিন গর্জে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমি গাড়ি চালালাম। হাত কাঁপছে, গাড়ির হাল বা ষ্টিয়ারিং হুইল আমি ধরে রাখতে পারছিলাম না, তবুও আমি চালালাম। বোম্বে গ্যারেজের দেওয়ালে সামান্য ধাক্কা খেয়ে আমি বেড়িয়ে পড়লাম। পরদিন গাড়িখানা মেরামত করা হলো, এবং আমিও প্রথম দিনের চাইতে অনেক উন্নতি করলাম গাড়ি চালানোয়। সাঁতার এবং ঘোড়া চালানো আমি যে ভাবে শিখেছি শিশু বয়সে, গাড়ি চালানোও যেন আমি শিখলাম সেই ভাবে।

১৯৩৮ সাল। জব্বলপুর থেকে আহ্‌মেদনগর। ব্রিগেডিয়ার ম্যাক্‌ফারসনের অধীনে জাঠ বাহিনীর একাদশ ব্রিগেডে আমি প্রেরিত হলাম। পরবর্তীকালে এরই কর্ণেল কমাণ্ডারের পদে উন্নীত হলাম। আহ্‌মেদনগর তুর্গে আমাদের শিবির। এখানেই আমাদের জাতীয় নেতারা বন্দীজীবন যাপন করেছেন পরে। আমি যতদিন এখানে ছিলাম, ছুটির দিনে আমি ঘুরে ঘুরে দেখতাম সেইসব স্থান যেখানে ৩০০ বৎসর পূর্বে বীর বিজয়ী শিবাজী বহু যুদ্ধ পরিচালনা করে কালজয়ী সম্মানের জয়মাল্য পেয়েছিলেন।

ভারতীয় পদাতিক বাহিনী ১৯৩৯-এ যন্ত্রভিত্তিক বাহিনীতে পরিণত করা হয়। ফলে ভারবাহী পশুদের পরিবর্তে আনা হয় পরিবহন লরী, ট্যাঙ্ক এসে সরিয়ে দেয় অশ্ববাহিনীকে। যান্ত্রিক যুদ্ধ পরিবহন স্কুলের শিক্ষক হিসেবে আমার নিয়োগ হলো। কমাণ্ডিং অফিসর লেফট্‌নাণ্ট কর্ণেল শেলটন সত্যিই অতি কঠোর কর্মী। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি কাজ করতেন, মাঝে শুধু পনের মিনিটের খাবার ছুটি। সেই সময়ে আমরা কোনমতে ঠাণ্ডা স্যাণ্ডউইচ্ গলাধঃকরণ করে নিতাম। অতি-পরিশ্রমের দরুন তিনি অকালে

মাস কয়েকের মধ্যেই মারা যান। আমার মনে হয় হাসতে না জানাও ভদ্রলোকের অকালমৃত্যুর একটি কারণ।

খবর পেলাম আমার বোন কাশ্মীরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং ১৩০০ মাইল দূরে শ্রীনগরে ছুটলাম। গিয়ে শুনলাম নান্নীর বাঁ পায়ের পাতার হাড়ে যক্ষ্মার বীজাণু পেয়েছেন চিকিৎসক। যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে, পা-টা ফুলে উঠেছে। শ্রীনগরের ডাক্তাররা ওখানেই নান্নীর চিকিৎসা করবেন বললেন, কিন্তু আমার মনে হলো ভাল চিকিৎসার জন্য ওকে শ্রীনগরের বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার। চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও আমি ওকে লাহোরে আনব মনস্থ করলাম। এইরকম অবস্থায় দোদুল্যমান চিত্ত ক্ষতিকর, সুতরাং বিশেষজ্ঞদের মত এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া প্রথমেই উচিত বলে সাব্যস্ত করলাম। সুতরাং কালবিলম্ব না করে নান্নীকে গাড়িতে চাপিয়ে আমি শ্রীনগর থেকে সোজা লাহোরে এসে হাজির হলাম। চিকিৎসকরা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা দিলেন। ডাঃ পাসরিচা নান্নীর পা খানা রক্ষা করতে পারলেন বটে, কিন্তু পায়ের পাতার একটা অংশ বাদ দিতে বাধ্য হলেন।

নান্নী ভাল হয়ে উঠছে। কেবিনের বাইরে মাটিতে বিছানা পেতে আমি রাত কাটাতাম। ডাক্তার আমাকে সে-অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নান্নীর ভাল-হয়ে-ওঠা যেন শ্লথগতি। সুতরাং আমি ওকে নিয়ে এলাম দিল্লীতে অন্য বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখাতে। অনেক দিন ভুগবার পর নান্নী একেবারে রোগমুক্ত হয়ে উঠল। আমার আর্থিক অবস্থায় এ চিকিৎসা-ভার বহন করা খুবই মুস্কিল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ওকে বিপদমুক্ত আমাকে করতেই হবে।

এ সময়ে আমাদের হাস্য-কৌতুক যে ছিল না তা নয়। মাত্র দুটো উদাহরণ আমি এখানে উল্লেখ করবো। লেফট্‌নাণ্ট মহম্মদ মুশা—যে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছে—সে সময়ে ছিল ৬।১৩নং সীমান্ত রাইফেল বাহিনীতে সাবঅল্টার্ন। সৈনিক হিসেবে মুশা ছিল উঁচু দরের এবং সে ছিল অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ। প্রত্যূষে কার্যারম্ভের পূর্বে সৎ পাঠানদের মতো মুশা প্রার্থনা করতো। একদিন আমরা তিনজন (সবাই লেফট্‌নাণ্ট), কানহাইয়া অটল, সৌকত আর আমি মিলে পরামর্শ

করে আমাদের ঘড়ির কাঁটা পাঁচঘণ্টা আগে ঘুরিয়ে রাখলাম। মধ্যরাত্রে আমরা মুশাকে ডেকে তুললাম।

চোখ মুছতে মুছতে মুশা জিজ্ঞেস করলো: 'কটা বেজেছে?'

'পাঁচটা বেজে গেছে। ওঠ, প্রার্থনায় বসো।'

নিজের ঘড়িটা বের করে একবার দেখে নিয়ে মুশা আমাদের দিকে সন্দেহবিজড়িত চোখে তাকালো। আমরা আমাদের ঘড়িগুলো বের করে নিয়ে ওকে দেখালাম। দু'চার মিনিটের তফাতে সবগুলো ঘড়ির কাঁটাই পাঁচটার কোঠায়। স্থতরাং তার ঘড়ি ঠিক নেই ভেবে বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে সে প্রার্থনায় বসলো। আমরা বারান্দায় অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বহুক্ষণ প্রার্থনার পরও যখন নিশীথ রাত্রির অন্ধকার কাটলো না, দেখা গেল না উষার আলো, ওর মনে সন্দেহ জাগলো। আমাদের ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে আমাদের দিকে জুতোটা ছুঁড়ে দিয়ে ও বলে উঠলো: 'ব্যাপার কীরে ফাজিল! তা এখন সত্যি সত্যিই কটা বেজেছে?'

'মধ্য রাত্রি রে', আমরা বললাম।

রুসি বিল্লিমরিয়া,[১৫] যাকে আমরা আদর করে ডাকতাম বিল্লি বলে, ছিল ৭নং অশ্বারোহী বাহিনীতে। আমি আর একবার হায়দ্রাবাদ ষ্টেশন থেকে দিল্লীর ট্রেণ ধরবো বলে অপেক্ষা করছি। যাচ্ছি ছুটিতে। ও আমাকে তুলে দিতে এসেছে। আমাদের আসতে দেরী হয়ে গেছে, ট্রেন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে। বিল্লী কিন্তু শান্ত। আর আমি ট্রেনটা চোখের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। গার্ড যে মুহূর্তে সবুজ বাতি দেখিয়ে তার কক্ষে উঠতে যাবে আমি আর বিল্লি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে রাখলাম। বললাম: 'আমাদের ফেলে রেখে যেতে নাহি দেব বন্ধু।' বিল্লি শক্ত বাঁধনে ধরে রাখলো গার্ডকে। হতচকিত গার্ড লাল বাতি দেখিয়ে গাড়ি রুখলো। জনতার ভীড়, হৈ হৈ চারদিকে। কিছুটা মুস্কিল হলো আমাদের সন্দেহ নেই, কিন্তু আমারা ট্রেনখানা অবশেষে পেলাম। ছুটি অন্তে শিবিরে প্রত্যাবর্তনের পর শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে আমাদের অভিযুক্ত হ'তে হলো। আমাদের অন্যায় কাজের জন্য যতরকম গালাগাল আছে ব্রিগেডিয়ার তার সদ্ব্যবহার করলেন এবং অবশেষে হাসতে হাসতে আমাদের ছেড়ে দিলেন।

১৫। এই ঘটনাগুলো এখানে সুবিধার্থে উল্লেখ করা হলো যদিও তাদের সময়ানুক্রমিক ক্রমবিন্যাস ছিল পরস্পর সামান্য কিছু আগে-পরে।

২

রূপান্তরের পথে

ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভাঙ্গাগড়া

দি বুক অফ কমন প্রেয়ার

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরের কথা। পুণাতে সেদিন সস্ত্রীক একখানা ইংরেজী ছায়াছবি দেখছিলাম। এমন সময় বাধা পড়ল। তারপরই শোনা গেল ভয়াল একটি ঘোষণা :

ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাগণ : দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আজ থেকে গ্রেটব্রিটেন এবং জার্মানী পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলো।

আরম্ভ হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রেক্ষাগৃহে নেমে এল কঠিন নিস্তব্ধতা। বাইরে তখন ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনার উত্তাল তরঙ্গ। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে কারুরই কোন ধারণা ছিল না। তাই শুরু হয়ে গেল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার আধিপত্য। যুদ্ধকালে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়তে লাগ . চারদিকে।

আমার কমাণ্ডিং অফিসরের কাছে গিয়ে হাজিরা দিতেই আদেশ হলো ৫নং ডিভিশনের যান্ত্রিক কর.ের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সেকেন্দ্রাবাদ চলে যেতে। সে সময় আমি একজন সিনিয়র সাবঅলটার্ন। অথচ এমন একটা দায়িত্বভার আমাকে দেওয়া হলো যা সাধারণতঃ মেজর পদাধিকারী কোন অফিসরকেই দেওয়া হয়। কথাটা স্তাবকতা গোছের শোনালেও, যুদ্ধের সময়ে এটা কোন অসাধারণ একটা ব্যাপার নয়। অফিসরের স্বল্পতার দরুন উর্ধ্বতন পদের দায়িত্বভার প্রায়শঃই গ্রহণ করতে হয় আমাদের।

যা হোক, এই দায়িত্বের মধ্য দিয়েই কয়েকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলাম। তাঁরা হলেন ৫নং ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল 'পিগি' হিথ্; অন্যতম ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার 'মো' মেইন; আমাদের প্রথম গ্রেডের স্টাফ অফিসর কর্ণেল 'ফ্রাঙ্ক' মেসেরভি এবং এ. কিউ. (A/Q)

কর্ণেল 'রেজিনাল্ড' স্যাভরি।[১] আমার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ হবার কয়েক মাস পর মেসেরভি এবং মেইন উভয়েই আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। নিজের ব্যাটেলিয়নে ফিরে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অন্যথায় ইচ্ছা ছিল ৫নং ডিভিশনের সঙ্গে মধ্য-প্রাচ্যের রণাঙ্গনে যেতে। সে কথা তাঁদের বললাম। চেষ্টাও করলেন তাঁরা; কিন্তু সামরিক সদর-দফ্তরের (Army Headquarters) মিলিটারী সেক্রেটারী রাজী হলেন না। অগত্যা ৬/১৩নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেল বাহিনীতে বদলির প্রার্থনা জানালাম। সেই সময় এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন লেফট্‌নাণ্ট কর্ণেল রাসেল (পাশা)। কিন্তু এই প্রার্থনাও নাকচ করে দিলেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। পদাতিক বাহিনীতে ফিরে যাবার প্রচেষ্টা আমার আবার ব্যর্থ হল। কিন্তু হাল ছাড়লাম না তবুও।

৫নং ডিভিশনের যান্ত্রিক-করণের কাজ শেষ করে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল শীহ্যানের অধীনে দেওলালীর একটি মোটর ব্যাটেলিয়নের শিক্ষণ কেন্দ্রে অ্যাড্‌জুটেণ্টের পদে যোগ দিলাম। শীহ্যান ছিলেন আইরিশ এবং কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ। তাঁর অধীনে কাজ করার অর্থই ছিল শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া। এরপর সৌগড়ে একটি নিম্নপদস্থ অফিসরদের (Non-commissioned officer) স্কুলে অল্প কিছু দিন শিক্ষকতার কাজ করে ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে কোয়েটার স্টাফ্‌ কলেজে যুদ্ধবিদ্যার একটি বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থায় যোগদানের জন্য মনোনীত হলাম। এই উন্নত ধরনের প্রতিষ্ঠানটির অধিনায়ক ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর ব্রিটিশ অফিসর মেজর জেনারেল 'জেফ্' ইভান্স্‌, ডি. এস. ও.।

আমি এবং আকবর খান একই সময়ে স্যাণ্ডহার্স্টে ছিলাম। বহুদিন পর কোয়েটাতে পুনরায় একত্র হলাম দু'জনে। এককভাবে প্রতিটি ইংরেজের প্রতি আমাদের মনোভাব বন্ধুত্বপূর্ণ থাকলেও, আকবর খান এবং আমি উভয়েই ভারতে তাদের 'সাম্রাজ্য'কে সুনজরে দেখতাম না। কোয়েটাতে আমাদের জনৈক সহপাঠীর ব্রিটিশ-আনুগত্য বোধ করি ইংলণ্ডের রাজার চাইতেও অধিক ছিল। সে আমাদের উল্লিখিত রাজনৈতিক মতবাদের[২]

১। মেসেরভি এবং স্যাভরি উভয়েই পরবর্তীকালে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

২। আশ্চর্যের কথা, সেই সময়ে স্বদেশপ্রেমিক প্রতিটি ব্যক্তিকেই ব্রিটিশ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হতো।

সংবাদ জানিয়ে দেয় বালুচিস্তানের গোয়েন্দা দফতরের ব্রিটিশ প্রধানকে। ভাগ্যবশতঃ উক্ত ব্রিটিশ প্রধানের ব্যক্তিগত দফ্‌তরে কাজ করতেন আকবরের জনৈক বন্ধু। সংবাদদাতার নাম তিনিই আমাদের জানিয়ে দেন। সেই রাত্রেরই শেষের দিকে অপরাধীর কাছে গেলেন আকবর; এবং গুপ্তভাবে একজন ইংরেজের কাছে দু'জন স্বদেশবাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য তাকে ধিক্কৃত করলেন। কাজটা কারও অপেক্ষায় ফেলে রাখবার তর সইল না তাঁর।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানীরা এইচ. এম্. এস্. প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ এবং রিপাল্‌স্ নামে জাহাজ দু'টিকে ডুবিয়ে দিল। এর কয়েকদিন পরেই পতন হলো সিঙ্গাপুরের। ভারতে ব্রিটিশ সম্মানের উপর পড়লো প্রচণ্ড আঘাত (কারণ লোকে দেখলো এশিয়াবাসীরাও 'সাহেব'দের পরাজিত করতে পারে)। ভারতীয় হিসাবে জার্মাণ এবং জাপানীদের যুদ্ধে পরাজিত করতে উদগ্রীব হয়েছিলাম আমরা ঠিকই; কিন্তু সমপরিমাণেই ব্যগ্র ছিলাম ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করে স্বাধীনতা অর্জন করতে। তাই আমাদের ধারণা ছিল রাজনৈতিক এবং সামরিক উভয় দিক থেকে যত দুর্বল হয়ে পড়বে ইংরেজরা, তত শীঘ্র তারা ত্যাগ করবে ভারতবর্ষ। শেষপর্যন্ত অবশ্য আমাদের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।

মালয় এবং আফ্রিকাতে ব্রিটিশ-বিপর্যয়ের কাহিনী আমাদের কানে পৌঁছুতেই, পাঁচজন বাছাই করা ব্রিটিশ এবং ভারতীয় অফিসরকে আমন্ত্রণ করে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি গোল-টেবিল বিতর্কসভার আয়োজন করলেন আকবর খান। বিষয় হলো : ব্রিটিশরা কেন ভারত ত্যাগ করবে না? উভয় পক্ষ থেকেই উত্তেজিতভাবে নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হলো। অবশেষে সভা সমাপ্ত হলো গভীর রাত্রে। সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সকলে বিদায় নিলেন।[৩]

কোয়েটা থেকে করাচিতে বদলি হয়ে এলাম সেখানকার গুপ্ততথ্য শিক্ষণ-কেন্দ্রের শিক্ষকরূপে। কোয়েটার স্টাফ কলেজ এবং বর্তমান শিক্ষণকেন্দ্র উভয় প্রতিষ্ঠানেরই কমাণ্ডিং অফিসরদের অনুরোধে আমাকে এবং অপর

৩। আমাদের ব্রিটিশ কমাণ্ডান্টের কাছে এই বৈঠকের কথাও জানান আমাদেরই কয়েকজন স্বদেশবাসী।

কয়েকজনকে আমাদের সেনাবাহিনীর বিশেষ একটি দিক নিয়ে সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ লিখতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। লিখলাম; কিন্তু কর্তৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি আমার প্রবন্ধগুলির বক্তব্য সুনজরে দেখলেন না। ফলে, দিল্লীর সামরিক সদর-দফ্তর থেকে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, বদলিও করা হলো সেখানকার জনসংযোগ শাখায় ব্রিগেডিয়ার আইভর জেহু'র অধীনে। কারণ, প্রবন্ধগুলির একটিতে আমি ইংরেজদের প্রচার-নীতির সমালোচনা করেছিলাম। সেই সমালোচনা অনুযায়ী সম্ভব হ'লে ত্রুটিগুলির সংশোধন করতে বলা হলো আমায়।

ব্রিটিশ গভর্ণর স্যার রজার লুমলের পক্ষে একবার ক্রিকেট খেলতে আমায় বোম্বাই[৪] যেতে হয়। সেই সুযোগে ভালসা মাথাই নাম্নী জনৈক বিপ্লবী নেত্রীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যও আমার ছিল। মেয়েটির বয়স ছিল উনিশ বছরের কাছাকাছি। উভয়েরই বন্ধুস্থানীয় জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। ব্রিটিশদের আজ্ঞাবাহী সৈন্য বিভাগে চাকরী করি বলে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমার দেশপ্রেম সম্বন্ধে কুৎসা গাইতে শুরু করলেন। তাঁর এই ধরনের আচরণের প্রতিবাদ করে বললাম, দেশকে তিনি যতখানি ভালবাসেন, আমিও ততখানিই ভালবাসি; এবং দেশভক্তির অধিকার তাঁরই কেবলমাত্র একার নেই। আমাদের এই বাদানুবাদের কয়েকদিন পরেই ব্রিটিশ বিরোধী একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়, এবং আমার সাহস পরীক্ষার জন্য ভালসা সেই সভায় আমাকে ভাষণ দিতে আহ্বান জানান। ভাষণ দিলাম। ভাষণে তরুণদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যোগদানের জন্য এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতে তার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করলাম। ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকে 'রাজদ্রোহ' বলে তেমন অনেক স্বদেশী মনোভাবের প্রকাশ করলাম আমার বক্তৃতায়। কর্মচারীদের মারফত ভাষণটির সংক্ষিপ্তসার যথা সময়ে গভর্ণরের কাছে দাখিল হলো। ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে আমাকে পছন্দ করলেও, ভাষণটিতে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, এবং গুরুতর আপত্তি প্রকাশ করলেন। সে কথা জানিয়েও দেওয়া হলো আমাকে। ব্যাপারটার এখানেই শেষ হলো না। এই 'হঠকারিতা'র জন্য বেরেসফোর্ড পিয়ার্সও আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। যাই হোক, যে রকম

৪। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন তখন চূড়ান্তপর্যায়ে পৌঁছেছে।

সাহসের সঙ্গে এই সামান্য পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে স্বীয় কার্য সম্পাদন করলাম তাতে ভালসা সন্তুষ্ট হলেন। এই ঘটনার পর থেকে, কোন অন্যায় কোনদিন আমি তাঁর প্রতি করতে পারিনি। একদিন গভীর রাত্রে আমার কাছে এসে একটি গোপন বেতার-প্রেরক যন্ত্র মেরামত করে দিতে তিনি আমায় অনুরোধ করেন। তাঁর কাছেই জানতে পারি গোপন বেতার কেন্দ্রটি থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী বহু অবৈধ স্বদেশী বেতার-ঘোষণা প্রচার করা হয়ে থাকে। সেই বেতার কেন্দ্র এবং তাঁকেও পুলিশ অনুসন্ধান করছে। সেনাবিভাগের জনৈক ভারতীয় কারিগরের সঙ্গে আমার ওখানেই আলাপ হয়েছিল। তাকে গোপনে সংবাদ পাঠালাম। দেশের জন্য স্বীয় দায়িত্বটুকু পালন করতে গুপ্তভাবে এল লোকটি এবং বিকল বেতার-প্রেরক যন্ত্রটিকে মেরামত করে দিল। গুপ্ত আন্দোলনের আরও কয়েকটি তৎপরতার মধ্যে ভালসার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম, এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে উপভোগও করেছিলাম পুরোপুরিভাবে।

বোম্বাইয়ে একদিন এক বন্ধুর কাছে শুনলাম বিখ্যাত আত্মগোপনকারী বিদ্রোহী অচ্যুত পট্টবর্ধন 'টাইম্‌স্‌ অফ ইণ্ডিয়া'র তৎকালীন সংবাদদাতা ফ্রাঙ্ক মোরেসের সঙ্গে এক গভীর রাতে সাক্ষাৎ করবেন। যে লোকের মাথার উপর ব্রিটিশ সরকার মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তাঁকে দর্শনের এই সুযোগ ছাড়লাম না। নির্ধারিত রাত্রিতে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলাম। চকিতের জন্য দেখতে পেলাম তাঁকে। শুনলাম পুলিশ তাঁর গুপ্ত আস্তানায় হানা দিতে পারে। অচ্যুত তাই একটি মোটর গাড়ীতে করে অজ্ঞাত স্থানে অন্তর্হিত হলেন। আমরাও ফিরে এলাম নিজেদের আস্তানায়।

বাঙ্গালোরে সাদার্ন কমাণ্ডের জেনারেল অফিসর কমাণ্ডিং-ইন-চীফ জেনারেল স্যার নোয়েল বেরেসফোর্ড পিয়ার্স ছিলেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর একজন অফিসর। এদেশে তিনি ছিলেন নবাগত, এবং ভারত তথা ভারতীয়দের সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল ধারণাও পোষণ করতেন না। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে সাময়িকভাবে লেফটেনান্ট কর্ণেলের পদে[৫] আমার

৫। অপর যে একজন মাত্র ভারতীয় সেই সময় এই পদ অধিকার করেছিলেন, তিনি ছিলেন কারিয়াপ্পা। বয়সে এবং চাকরীতে তিনি ছিলেন আমার চাইতে তের বছরের সিনিয়র। এই অপ্রত্যাশিত পদোন্নতিতে তাই নিজের উপর সন্তুষ্টই হয়েছিলাম আমি। পরবর্তীকালীন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান সেনাপতি কারিয়াপ্পা ছিলেন বহু বিষয়েই পথ প্রদর্শক, ছিলেন

পদোন্নতি হল, এবং তাঁরই অধীনে জনসংযোগ শাখায় আমি নিযুক্ত হলাম। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অসাধারণ সহানুভূতিশীল ছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে একবার তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বকে কোন ক্রমেই সমর্থন করা যেতে পারে না। কারণ, এটা হলো বিশৃঙ্খলার অজুহাতে কারও গৃহস্থালি দখল করে নেবার সামিল। এ ধরনের অধিকার কাউকে প্রয়োগ করতে দেওয়া যায় না। দিলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কিছুই আর থাকবে না জীবনে। দৈনন্দিন জীবনে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের অসহনীয় বৈষম্যমূলক আচরণের একাধিক উদাহরণও তাঁকে আমি দিয়েছিলাম। তার মধ্যে মাদ্রাজ ক্লাবের কথাও ছিল। সে সময় ভারতের অন্যান্য স্থানে এ ধরনের বহু ক্লাবই ছিল যেখানে ভারতীয়দের সভ্য হবার অধিকার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখতে মনস্থ করলেন পিয়ার্স। পরের দিনই মাদ্রাজে উপস্থিত হয়ে উক্ত ক্লাবে তাঁর সঙ্গে আমায় মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো মাদ্রাজের য়ুরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে। কিন্তু ব্যাপারটি নিয়ে মাদ্রাজের ব্রিটিশ গভর্নর স্যার স্টানলে জ্যাকসনের কাছে শোরগোল না ওঠা পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে স্বদেশবাসীদের অবজ্ঞা করে চললেন পিয়ার্স। গভর্নরের সামনেও দমলেন না। অগত্যা বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কাছে জেনারেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন গভর্নর। এবার প্রত্যাশিত ফল হলো। পিয়ার্স এটাকে একটা সৎ উদ্দেশ্য বলে মনে করলেও, ভারতে ব্রিটিশরাজের সোনার তরী ডুবতে বসেছিল এরই জন্যে। বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন ইংরেজরা। বেরেসফোর্ডকে তাই নিবৃত্ত করলেন ওয়াভেল। সৎকার্যে সাহায্য করতে গিয়ে এইভাবে প্রথম পর্যায়ে পরাজয় বরণ করতে হলো বেরেসফোর্ড পিয়ার্সকে।

আমার এক ইংরেজ সহকর্মীর সঙ্গে একদিন একত্রে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলাম। পথপার্শ্বস্থ ছোট্ট একটা স্টেশনে ট্রেনখানা থামতে, দূর থেকেই কঙ্কালসার

ব্যক্তিগত চরিত্রের উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা একজন সৎ ভারতবাসী। রাজনীতির জটিলতা তিনি বুঝতেন না বললেই চলে। প্রাথমিক পর্যায়ে সামরিক বাহিনীর জন্য তিনি কতকগুলি কর্তব্য-নীতির প্রবর্তন করেন। সেনাবাহিনীতে ভারতীয়েরা কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করা পর্যন্ত নীতিগুলি তাদের উত্তম পথপ্রদর্শকের কাজ করে। সমগ্র সেনাবাহিনীর উপর চমৎকার প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কারিয়াপ্পা।

একটি ভিক্ষুকের প্রতি আমাদের চোখ পড়লো। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিদেশী বন্ধু আমায় সতর্ক করে দিলেন: 'তোমাদের দাবী মতো এখানকার সব কিছু তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি ভারত ত্যাগ করে যাই, তা'হলে এ দেশের প্রতিটি মানুষই দু'দিনে অনাহারে শুকিয়ে ওই অবস্থায় পৌঁছুবে।' সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিক্ষুকটিকেই নির্দেশ করে উত্তর দিলাম: 'যে ব্রিটিশ সরকার দু'শো বছরে আমাদের এই অবস্থায় এনেছে, তাকে ধন্যবাদ ছাড়া আর আমাদের কিছুই দেবার নেই।' অনেকদিন আগে সোভিয়েত লেখক এম. ভি. মিখিভ্ 'আমরা ভারতের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম' নামে একখানি ভ্রমণ-নিবন্ধে যা লিখেছিলেন সেটাও শুনিয়ে দিলাম আমার বিদেশী সহকর্মীকে:

> রোগে জরাজীর্ণ দেহ; বুকখানা গর্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে; কাঠির মত দু'খানা পা; এবং পাঁজরার হাড়গুলো বেরিয়ে আসছে চামড়া ফুঁড়ে—বুভুক্ষু মানুষগুলির এই যে করুণ দৃশ্য আমরা দেখলাম তার স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে···।

এটাও মনে করিয়ে দিলাম যে স্বাধীনতার বিকল্প কিছু হয় না।

এই ধরনের কাহিনী শুনে দুঃখ অনুভব করতেন বেরেসফোর্ড পিয়ার্স। ভারত স্বাধীন হোক এ কামনা তিনি করতেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর বাণীকে করে দিতেন মূক।

বাঙ্গালোরে আমরা মৃণালিনী এবং বিক্রম সরাভাইয়ের বাড়ীর পাশেই থাকতাম। মৃণালিনী ছিলেন দক্ষ নৃত্যশিল্পী; এবং বিক্রম ছিলেন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। উভয়েই আবার ছিলেন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী। শুনেছিলাম ফেরারী তরুণ বিপ্লবী মিনু মাসানীকে[৬] আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁরা। মাসানীকে সেই সময় পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মোটামুটি বলতে গেলে আন্তরিকতার সঙ্গেই দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন সরাভাই পরিবার।

এই সময়েই টম ট্রেনর নামে জনৈক আমেরিকান সমর-সাংবাদিক এবং

৬। পরে তিনি স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগদান করেন।

আমি একত্রে কেরালার ত্রিবান্দ্রাম ও কন্যাকুমারী ভ্রমণে যাত্রা করে রাজ্যের দেওয়ান স্বনামধন্য সি. পি. রামস্বামী আয়ারের আতিথ্য গ্রহণ করি। সি. পি. নামেই সবাই তাঁকে জানত। সূক্ষ্ম রসবোধ এবং ক্ষিপ্র জবাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন সি. পি.। ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষার হার এত অধিক হবার কারণ টম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সি. পি. প্রশ্ন করলেন, 'অক্ষরজ্ঞান এবং শিক্ষার পার্থক্যটা কি আপনার জানা আছে?'

'না, স্যার'; মিথ্যা উত্তর দিলেন টম।

'একটা উপমা দিয়ে তা'হলে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর্মগ্রন্থগুলি আমার মায়ের কণ্ঠস্থ। কিন্তু কোন ভাষাতেই একটা শব্দও লিখতে অথবা পড়তে পারেন না তিনি। আমি তাঁকে বলি উচ্চশিক্ষিত কিন্তু অক্ষরজ্ঞানহীন। কী বলতে চাইছি বুঝেছেন?'

'না'; এবার কিন্তু অকপটে স্বীকার করলেন টম।

'প্রিয় বন্ধু! ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে লর্ড মেকলে যে জায়গাটায় জোর দিয়েছিলেন, আমি তা দিই না।'

এরপর টম আর সি. পি.-কে কোন প্রশ্ন করেন নি।

কয়েকমাস পরে 'লস্‌এঞ্জেল্‌স্‌ টাইম্‌স্‌' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধিরূপে মিত্রপক্ষের সামরিক তৎপরতার সংবাদ সংগ্রহ করবার সময় মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে টম নিহত হন।[৭] লস্‌এঞ্জেল্‌সে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করব বলে কথা দিয়েছিলাম তাঁকে। কিন্তু দেখা হবার আগেই চিরবিদায় নিলেন তিনি।

৭। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমার অন্যতম বন্ধু উইং কমাণ্ডার 'জাম্বো' মজুমদার বিমান দুর্ঘটনায় বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেন। চাকুরী জীবনে একাধিক সামরিক সম্মান লাভ করেছিলেন তিনি। তাই আশা করেছিলাম, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর দেশসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলিকে যথোচিত প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু হতাশ হয়ে লক্ষ্য করলাম মজুমদারের মৃত্যু সংবাদ প্রায় অগোচরেই থেকে যাচ্ছে সকলের। ব্যাপারটি আমার ভাল লাগলো না। তাই নিজেই তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বগুলি সম্বন্ধে বেতারে কয়েকটি কথা বলতে সঙ্কল্প করলাম। নিয়ম অনুসারে এ সমস্ত ব্যাপারে বিভাগীয় অনুমোদন নিতে হয়। সেটা পাবো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল আমার। তাই স্থির করলাম অনুমোদন ছাড়াই বেতার ভাষণ দেব। আকাশবাণীর পরিচালক জেড. এ. বোখারিও এ ব্যাপারে আমাকে সোৎসাহে অনুমতি দিলেন। যেমন আশঙ্কা করেছিলাম, দিল্লীর ব্রিটিশ বেতারবার্তা পরীক্ষণ বিভাগ (Monitoring Section) আমার বেতার ভাষণটি ধরে ফেলে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই এমন একজন ভারতবাসীর আমি প্রশংসা করেছিলাম যিনি তাদের প্রিয় 'নীল-চক্ষু' কেউ নন। ফলে বোখারি এবং আমি, উভয়কেই জবাবদিহি করতে হয়।

১৯৪২ সনের শেষের দিকে মেজর জেনারেল রীসের সঙ্গে আবার আমার দেখা হল। তখন সবেমাত্র তিনি মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বললেন, আফ্রিকার সোল্লামের কাছে একটি ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনে অধিনায়কত্বের সময়ে উপযুক্ত সংস্থান ব্যতিরেকেই নিজের ঘাঁটি রক্ষা করতে বলা হয় তাঁকে। সেই অবস্থায় তা' করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেকথা জানাতেই আতঙ্কিত কোর কমাণ্ডার (Corps Commander) অধিনায়কের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেন। পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য রীসের বক্তব্যেরই যথার্থতা প্রমাণিত করে। যুদ্ধকালে অসমসাহসী সেনাপতিকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেবার নজীর এই প্রথম নয়। ব্রিগেডিয়ারে পদাবনত রীস সাময়িকভাবে নেপথ্যে চলে গেলেন। দিল্লীর সামরিক সদর দফ্‌তরে আর্মি এস্‌টাবলিশমেণ্ট্‌ কমিটির (Army Establishment Committee) সভাপতিরূপে একপাশে ফেলে রাখা হলো তাঁকে। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে বেরেসফোর্ড পিয়ার্সের অধীনে তাঁকে ব্রিগেডিয়ার করে পাঠানু হল। কিছুদিন পর মাদ্রাজের কাছে এক সামরিক মহড়ার সময়ে জনৈক মেজর জেনারেল গুলিবিদ্ধ হন। রীসকে তখন ১৯নং ডিভিশনের অধিনায়কত্বের ভার দেওয়া হলো। এই ডিভিশনই পরে জাপানীদের হাত থেকে মান্দালয় পুনরুদ্ধার করে; এবং সেই যুদ্ধের পুরোভাগে থেকে অধিনায়ক হিসাবে অপূর্ব সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দেন রীস। সেই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব এবং দুর্জয় সাহস সর্বসাধারণ্যে সুপরিচিত হয়ে পড়ে।

ব্রহ্মদেশ যাত্রার প্রাক্কালে আবার অনেকগুলি ব্যক্তিগত আসর বসাবার সুযোগ পাই তাঁর সঙ্গে। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পরই আসরগুলি বসত। এবং সেই আসরে আমাদের সৈনিকবৃত্তি সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতেন রীস। বিজয়ী সেনাধ্যক্ষদের জীবনী পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন প্রায়ই। রাতের পর রাত ধরে তিনি বর্ণনা করে গেছেন বিখ্যাত রণনায়কদের বীরত্ব কাহিনী। বলেছেন অক্ষরজ্ঞানহীন চেঙ্গীস খাঁর কথা, যিনি তিন-তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন এবং আইন সঙ্কলন করেছিলেন পঞ্চাশটি জাতির জন্য। স্তব্ধ হয়ে শুনে যেতাম।

কিন্তু লরেন্স অফ অ্যারেবিয়ার কাহিনী যেদিন বললেন সেদিন সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি। মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম তাঁর অপূর্ব বর্ণনা। ইচ্ছামত নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন লরেন্স; এবং আপন বিবেকের

প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। কথিত আছে মহাযুদ্ধের পর তাঁকে 'কমাণ্ডার অফ্ দি বাথ' সম্মানে ভূষিত করার প্রস্তাব হলে, ব্রিটিশ সম্রাটের সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন লরেন্স। এ সম্মান বিবেক-বিরুদ্ধ মনে হয়েছিল তাঁর। কারণ, ব্রিটেনের পক্ষ থেকে তিনি আরবদের যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলেন সেগুলিকে পালন করতে সম্মত ছিল না ব্রিটিশ সরকার। লরেন্স ছিলেন মহাপণ্ডিত[৮] এবং নির্ভীক হৃদয়। যেমন অসীম ছিল তাঁর ত্যাগ স্বীকারের ক্ষমতা, তেমনি সীমাহীন ছিল তাঁর সাহস। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছিলেন বহুবার, এবং দুঃখ যন্ত্রণা ইত্যাদিকে আমলই দিতেন না কোন দিন। তাই তাঁর নাম আজ হয়ে গেছে ইতিহাসের একটা অংশ।

রীসের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধের ব্যাপারে অন্যান্য কারণের সঙ্গে ভাগ্যও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে (যদিও মনে হয় ভগবান অধিকতর শক্তিশালী বাহিনীর পক্ষই অবলম্বন করেন)। নেপোলিয়ন তাই কোন সেনানায়ককে উচ্চতর পদে উন্নীত করতে হলে পূর্বাহ্ণেই জিজ্ঞাসা করতেন লোকটি ভাগ্যবান কি না। যুদ্ধ সম্বন্ধে রীসের আর একটি অভিমত ছিল সম্ভাব্য ঘটনার যথাযথ হিসাবই হলো যুদ্ধ। সেনানায়কদের সম্বন্ধে প্রায়ই অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, তাঁরা যে যুদ্ধটির জন্য প্রস্তুত হন সেইটাকেই মনে করেন শেষ যুদ্ধ। পরে যে আরও যুদ্ধ করতে হতে পারে সেটা খেয়ালই থাকে না তাঁদের। কিন্তু এই অভিনন্দনের জবাবে আবার এও বলা যায় যে, কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা আদৌ কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই হন না। সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য গর্বিত ছিলেন রীস। বলতেন, বেঁচে থাকার মূল্য যেমন অনুভব করা যায় এই বৃত্তির মধ্য দিয়ে, তেমনি প্রয়োজন হলে দেশকে রক্ষার জন্য বরণ করা যায় মৃত্যুকেও।

সক্রিয় যুদ্ধের কাজে ১৯৪৩ সালে[৯] আমাকে ব্রহ্মদেশের আরাকানে যেতে আদেশ করা হলো। জরুরী অবস্থায় সহজে বহনযোগ্য সামান্য কিছু জিনিসপত্র

৮। তাঁর লেখা 'প্রজ্ঞার সপ্তস্তম্ভ' (Seven Pillars of Wisdom) পুস্তকটি ইংরাজি ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির মধ্যে অন্যতম।

৯। ব্রহ্মদেশে রওনা হবার পূর্বে ১৯৪৩ সালে আমি যখন কয়েক মাসের জন্য আগ্রায় সেন্ট্রাল কমাণ্ডের সদর দফতরের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তখন ব্রিগেডিয়ার উইংগেটের সঙ্গে

তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নিয়ে বিদায় নিলাম আমার স্ত্রী এবং তিন ও এক বৎসরের শিশুসন্তান তুটির কাছে। কলকাতা থেকে জাহাজ ধরলাম চট্টগ্রামের। জাহাজে প্রত্যেকটি মানুষকেই কেমন যেন উত্তেজিত এবং বিব্রত মনে হলো। অনেকের ঘন ঘন পায়চারি করা দেখে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। অনেকে আবার তা চেপে রেখেছিল বহু চেষ্টায়। আনন্দ-ভোজনে যে যাচ্ছি না সেটা সবাই জানতাম। গুজব রটে গিয়েছিল জাপানী ডুবোজাহাজ নাকি আমাদের বেশ কয়েকখানা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। ফলে, দূর সমুদ্রবক্ষে যখনই কোন কাল রংয়ের জিনিস নজরে পড়েছে আমরা সেটাকেই মনে করেছি শত্রুর ডুবোজাহাজ।

একই জাহাজে যাচ্ছিলেন আমার দীর্ঘদিনের প্রিয় বন্ধু লেফট্‌নাণ্ট কর্ণেল 'ব্রহ্ম' কপূর। একদিন ভোরে উপরের ডেকে দাঁড়িয়ে তু'জনে সমুদ্রের মহিমান্বিত রূপ দেখছি, এমন সময় বিপদসঙ্কেত হলো। প্রত্যেকেই ছুটে গেলাম নিজের নিজের জায়গায়। জানা গেল, শত্রু পক্ষের ডুবোজাহাজ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে। কঠিন নিস্তব্ধতা নেমে এল আমাদের জাহাজের উপর, এবং আমাদের রক্ষী জাহাজগুলি হয়ে উঠল তৎপর। কিন্তু ডুবো-জাহাজটির আর কোন হদিস পাওয়া গেল না।

চট্টগ্রামে নেমেই একটি মোটর ট্রান্সপোর্ট রেজিমেন্টের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলাম। টমি মোশ্যাম্প নামে চটপটে, দক্ষ এবং সুদর্শন একজন ফরাসী-কানাডিয়ান অফিসর ছিলেন আমার সহকারী (Adjutant)। আরও অনেক ব্রিটিশ অফিসরই আমার অধীনে ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার জনৈক মেজরের মতো অতটা ঝঞ্ঝাটে আমাকে কেউ ফেলেন নি। তাঁকে যাতে কোন ভারতীয়ের আজ্ঞাধীনে না রাখা হয় তজ্জন্য তিনি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের এই অপরাধের জন্য শাস্তি দেবার

দেখা করি। তিনি সেই সময় 'চিন্‌ডিট্‌স্‌' নামে একটি বাহিনী গঠনে ব্যস্ত ছিলেন। সংগোপনে দূরবর্তী এলাকার শত্রুব্যূহ ভেদ করাই ছিল বাহিনীটির কাজ। আমার অভিপ্রায় ছিল উইংগেটের অধীনে এই বাহিনীর সঙ্গে কাজ করি। কিন্তু রাজী হলেন না উইংগেট। জানালেন, তাঁর অধীনে কেবলমাত্র গোর্খা ছাড়া আর কোন ভারতীয় সৈনিক নেই (ভারতীয় কোন অফিসরের অধীনে গোর্খাদের রাখা হতো না), এবং একমাত্র যে ভারতীয়কে তিনি জনসংযোগ অফিসররূপে সঙ্গে নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ক্যাপ্‌টেন কাটজু। কয়েকমাস বাদে যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

পরিবর্তে সেই অনুরোধ অনুযায়ী তাঁকে অন্যত্র একজন ব্রিটিশ অফিসরের অধীনে বদলী করা হলো। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এই ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ যুদ্ধক্ষেত্রেও দুর্লভ ছিল না।

কর্মোপলক্ষে প্রায়ই আমাকে বুথিডং, মংড প্রভৃতি রণাঙ্গণের অগ্রবর্তী এলাকাগুলিতে যেতে হতো। একদিন জীপ নিয়ে বুথিডং যাচ্ছি, এমন সময় মাথার উপরে এরোপ্লেনের গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। সামনে ছিল পথের একটা বাঁক। সেখানে পৌছুতেই জাপানী 'জিরো' জাতীয় একটি যুদ্ধ-বিমান সোজা নেমে এল আমার জীপের দিকে। এক ঝাঁকানিতে উঠেই নিকটবর্তী একটি ঝোপের পেছনে লাফিয়ে পড়লাম। শিকারী পাখির মতো বিমানটি দুই একবার নীচের দিকে ছোঁ মেরে গুলির ঝাঁক উজার করে দিল জীপটির উপর। তারপর আমরা শেষ হয়ে গেছি মনে করে চলে গেল অন্য লক্ষ্যবস্তুর সন্ধানে।

আর একবার বুথিডংয়ের কাছে আমাদের ২৬নং ডিভিশনের সদর দফ্‌তরে যাবার পথে ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর পাল্টা বোমাবর্ষণের মধ্যে আটকা পড়ে যাই। চারদিকে ধাতুর টুকরো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ শীষের শব্দ তুলে ছুটে যেতে থাকে কামানের গোলা।

সেই এলাকাতেই কয়েকদিন পরের ঘটনা। প্রায় আধ ঘণ্টা হলো সূর্য অস্ত গেছে। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তার চারদিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্প্রতিক যুদ্ধের চিহ্নস্বরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ নানা সমর-সম্ভারের অবশিষ্টাংশ। অকস্মাৎ সেই পথেরই নিকটবর্তী কোন এক স্থান থেকে জাপানীরা আক্রমণ করে বসল। অঞ্চলটিতে নতুন গিয়েছিলাম। রাস্তা-ঘাট ভালো করে জানা ছিল না। তাই সূচীভেদ্য অন্ধকারে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল সেদিন।

মংডতে তখন জাপানীদের সঙ্গে আমাদের তুমুল যুদ্ধ চলছে। তারই মধ্যে ২৫নং ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের তৎকালীন এস-জি-ও-২ মেজর (পরবর্তীকালে ইনি জেনারেল হয়েছিলেন) কে. এস. থিমায়ার[১০] সঙ্গে দেখা করতে যেতে হলো আমায়।

১০। সুভাষচন্দ্র বসুর অধীনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হয়ে এঁর ভাই লড়ছিলেন আমাদের বিরুদ্ধে।

আনুগত্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে সেটা এমন কিছু অপরিবর্তনীয় নয়। এইরূপে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভটিকেই ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। (১৯৪৬ সালে ভারতীয় নৌ এবং বিমান বাহিনীর বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যু ঘোষণা করল। অবশেষে তারা স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে ভারতীয় নাবিক, বৈমানিক এবং সৈনিকদের সাহায্যে ভারতবাসীদের আর অবদমিত করে রাখা যাবে না।) এই ব্যাপারে তিনি সন্দেহের কোন অবকাশই রাখেন নি। তাঁর এই স্বাধীন চিন্তাধারা এবং সঙ্কল্পকে জাপানী সেনানায়কগণ মেনে নিয়েছিলেন। চার্চিল একবার বলেছিলেন, 'আমার দেশকে রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হলে শয়তানের সঙ্গেও হাত মেলাতে রাজী আছি।' আর, রেঙ্গুন থেকে একটি বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন :

> এতবড় শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধিকারী ইংরেজ যদি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে পারে, তবে আমাদের মত দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিরস্ত্র একটি জাতির পক্ষে বাইরে থেকে ঋণ গ্রহণে দোষ কীসের ?

'বিদ্রোহ' শব্দটি আপত্তিকর হলেও অধিকাংশ দেশই বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বুয়োর যুদ্ধ বিদ্রোহ ছাড়া কিছুই ছিল না। জেনারেল স্মাট্‌স্ ছিলেন একজন বিদ্রোহী। ডি. ভ্যালেরা এবং ওয়াশিংটনও ছিলেন তাই।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারে সারা ভারত উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রতিটি ভারতবাসীই যেন মনে হলো আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজরা ভেবেছিল, এই বিচার সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ভারতীয়দের উপর কঠোর প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু অনুমানে ভুল হয়েছিল তাদের। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল সারা ভারতব্যাপী অভূতপূর্ব এক স্বদেশপ্রেমের জোয়ার এসে গেছে। সৈনিক হিসেবে শপথ-ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছিল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ছিল এই যে জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করবার অঙ্গীকার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়ে গিয়েছিল পূর্বেকার শপথ। কারণ, এটা হলো এমন

একটা মহান ব্রত' যার তুলনায় জীবনের অন্য সমস্ত উদ্দেশ্য কিংবা বিচার-বিবেচনাই তুচ্ছ হয়ে যায়। আর একটি অভিযোগ আনা হয়েছিল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার। ভারতবাসীকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছেন যে বিদেশী ব্রিটিশ নৃপতি তাঁকে ভারতবাসীর নৃপতি বলার কোন যুক্তিই নেই। বস্তুতঃ ডি. গ্যল এবং অন্যান্য স্বাধীনতাকামী মানুষ যেমন য়ুরোপ এবং অন্যান্য স্থানে স্বাধীনতাকল্পে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সদস্যগণও ছিলেন তেমনই দেশপ্রেমিক।

অভিযোগগুলির উপস্থাপনভঙ্গী এবং প্রকৃতির দিক থেকে এই সামরিক বিচার এবং ১৮৫৭ সালে দিল্লীর তথাকথিত সম্রাট বাহাদুর শাহে্র বিচারে অনেকাংশে মিল ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই মামলা পরিচালনা করেছিল ইংরেজরা, এবং উভয় বিচারই অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লীর লাল-কেল্লায়। উভয় বিচারেই আসামী পক্ষের যুক্তি ছিল, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ দেশপ্রেমিক না রাজদ্রোহী সেটা স্থির হয় তাদের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা দিয়ে।

আসামীপক্ষ সমর্থন করেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, স্যার বি. এন. রাও এবং ভুলাভাই দেশাইয়ের মতো (মুখপাত্র) বিখ্যাত ভারতীয় আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ। তাঁদের সহকারীরূপে দাঁড়ান জওহরলাল নেহ্রু ও আসফ আলী। বিচার চলাকালীন সময়ে একদিন একটি বার্তা পাই ভুলাভাই দেশাইয়ের কাছ থেকে। আসামীদের পক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে মূল্যবান বলে পরিগণিত হতে পারে এমন একখানা দলিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের অধিকারে ছিল। বার্তাটিতে, সম্ভব হলে দলিলখানা আমায় সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন ভুলাভাই। সেই সময় সামরিক সদর-দফ্তরে কর্ণেল রুদ্র নামে জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসর কাজ করতেন। যে সাহায্য তিনি আমায় করলেন তার জন্য শ্রদ্ধা জানাই তাঁকে। অতীব দক্ষতার সঙ্গে দলিলখানাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সরিয়ে এনে আমাকে পড়তে দিলেন। তারই ফলে, প্রতিশ্রুতি মতো দলিলখানার বিষয়বস্তু ভুলাভাই দেশাইকে জানাতে সমর্থ হই।

এই বিচার দেখার জন্য প্রতিদিন বিপুল জনসমাবেশ ঘটত লাল-কেল্লায়। আমিও যাই একদিন। তার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরে একদিন আমার কাছে জবাবদিহি চায়। উত্তরে জানাই, উক্ত বিচার সভায় উপস্থিত থাকা

সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকার দরুন সেখানে যাবার অধিকার আমার রয়েছে। ব্যাপারটা সেখানেই চেপে যায় তারা। কিন্তু জানতাম, তাদের কোপদৃষ্টিতে পড়ে গেছি।

ততদিনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interim Government) ক্ষমতা গ্রহণ করেছে; এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বন্দীকৃত আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সদস্যদের মুক্তির দাবীতে আসমুদ্র-হিমাচল হয়ে উঠেছে উত্তাল। কিন্তু অকিনলেক বিপরীত পরামর্শ দিলেন নেহ্রুকে। বন্দীদের মুক্তি দিলে নাকি নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে এবং সামরিক বাহিনীর সংহতিও বিনষ্ট হবে। সমর বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসরও এই মতের সমর্থনে নিজ নিজ অভিমত নেহ্রুকে জানান। অতঃপর নেহ্রু পরামর্শ চান আমার কাছে। ইংরেজদের অনুমান যে ভুল সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। বিচারাধীন আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সদস্যগণ একদিন ভারতীয় পতাকার নীচে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করেছে। আজ তাদের মুক্তি দিলে প্রকৃতপক্ষে দেশব্যাপী সবাই অভিনন্দনই জানাবে। অভিমতটা নেহ্রুকে জানিয়ে বললাম, যে সমস্ত ভারতীয়রা ব্রিটিশ অভিমতের প্রতিধ্বনি তুলছে তারা কেবল 'কর্তা-ভজা' ব্যক্তি। এমন লোকদের উপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। নেহ্রুর দূরদর্শীতাকে ধন্যবাদ, আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সদস্যদের মুক্তি দিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি সম্মত করান।

এই সময়েই একটি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশরাজের অনুগত সমর্থক দেশীয় রাজবংশোদ্ভূত কর্ণেল এম. এস. হিম্মতসিংজী ছিলেন অকিনলেকের দীর্ঘদিনের বন্ধু। কিন্তু এই সময়েই তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে পড়েন। অসন্তোষের কারণ ছিল চাকুরীজীবনের ইতিহাস প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও সামরিক সদর-দফ্তর তাঁকে একটি নিরীহ কর্ণেলের পদাধিকার দিয়ে বসিয়ে রেখেছিল। কাজ ছিল কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের লোকজনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা। এ ব্যাপারে হিম্মতসিংজী আমার পরামর্শ প্রার্থনা করলে, প্রথমে সব কিছু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলি; এবং তাতেও কোন প্রতিকার না হলে চাকুরী থেকে পদত্যাগ করতে পরামর্শ দিই। সেই অনুসারে হিম্মতসিংজী সব কিছু অকিনলেককে জানান। কিন্তু প্রতিকার না হওয়ায় পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। এই ধরনের কঠোর মনোভাবের প্রদর্শন এর আগে কখনো তিনি করেন নি।

কয়েকদিন পরেই সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিরূপে তাঁকে বিধানসভার সদস্য মনোনীত করা হয়। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন অন্ততঃ বিধান সভায় তাঁদের কথা মত তিনি চলবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজদের প্রতি তাঁর মনোভাব যে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে সেটা তাঁদের কল্পনায় আসে নি। দেশপ্রেমের পরিবেশের মধ্যে ইদানীং চলাফেরা করতে শুরু করে দেশভক্তির উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চ অনুভব করতে পেরেছিলেন হিম্মতসিংজী। ফলে, হয়ে উঠেছিলেন তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী। বিধান সভায় আজাদ হিন্দ্ বাহিনী নিয়ে আলোচনা হবার কথা ছিল। হিম্মতকে পরামর্শ দিলাম ওজস্বিনী ভাষায় জাতীয়পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে। কিছুটা আপত্তির পর সম্মত হলেন; কিন্তু আমাকেই অনুরোধ করলেন তাঁর বক্তৃতা লিখে দিতে। সানন্দে সে অনুরোধ রক্ষা করলাম। বক্তৃতাটি তাঁকে দিয়ে বার বার আবৃত্তিও করালাম। ইংরেজদের আতঙ্কিত করে নির্ধারিত দিবসে সাহসে বুক বেঁধে ভাষণ দিলেন হিম্মৎ। স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনলেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তথা বিধান সভার সদস্যগণ। কংগ্রেস দলের সদস্যগণ জানালেন সাদর অভিনন্দন। সঙ্গে সঙ্গে পুরোভাগে এসে গেলেন হিম্মতসিংজী। আমার পরামর্শের ফলেই বহুবিধ সম্মানের অধিকারী হন তিনি; এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হয়ে একখানা চিঠিতে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেন আমায়।

ভারতের স্বাধীনতার দৃঢ় সমর্থক স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্ এসেছিলেন দিল্লীতে। নেহ্রুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হবার কথা ছিল। একদিন সন্ধ্যায় নেহ্রু আমায় ডেকে পাঠালেন; এবং ক্রীপসে্র সঙ্গে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার কোন বিশেষ বক্তব্য রয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। (অনুরূপভাবে আরও অনেকের সঙ্গে নিশ্চয়ই তিনি পরামর্শ করেছিলেন।) বললাম, একটিমাত্র বক্তব্য আমার রয়েছে। তা'হলো ব্রিটিশ শক্তি ভারত ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভারতীয় বাহিনীর জাতীয়করণের কাজ শেষ করে ফেলা হয়। অনেকে যে এই ব্যাপারে বিলম্ব করতে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটা অনুচিত হবে।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারে কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী হবার পর নেহ্রু উঠে এলেন নয়াদিল্লীর ১৭নং ইয়র্ক রোডের

ভারতীয়রা গুর্খা সৈনিকদের উপর কর্তৃত্ব করবে ব্রিটিশরা তা কখনই চায় নি। কমিটির সামনে অকিনলেক বলেছিলেন নেপালের রাজা এবং গুর্খা সৈনিকেরা সকলে না কি চান যে বর্তমান ব্যবস্থামত কেবলমাত্র ইংরেজ অফিসররাই গুর্খা সৈনিকদের উপর কর্তৃত্ব করুক। ভারতীয় অফিসরদের সম্বন্ধে এই ধরনের কটাক্ষ আমার ভালো লাগে নি। সত্যিই যদি নেপালের এই মনোভাব হয়, তবে তা আমাদের পক্ষে অসম্মানজনক। তাই কথাটা নেহ্‌রুকে জানাই। অনুরোধ করি ব্যাপারটা নেপালের রাজার গোচরে আনতে। শুনেই বিচলিত হয়ে পড়েন নেহ্‌রু; এবং সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব (Foreign Secretary) স্যার গিরজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে কাঠমাণ্ডু পাঠান। দু-তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসেন বাজপেয়ী। জানান, নেপালের রাজা প্রতিবাদ করেছেন ব্যাপারটার। তাঁর নাম করে যে কথা প্রচার করা হয়েছে সে কথা আদৌ তিনি বলেন নি। রাজা বরং জানিয়েছেন গুর্খা সৈনিকদের ভারতীয় কর্তৃত্বাধীনে রাখা হলে তিনি খুশীই হবেন। মনে হয়, ব্যাপারটা সম্বন্ধে অকিনলেকের ধারণা আগাগোড়া ভুল ছিল।

কমিটির প্রধান স্তম্ভ ছিলেন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কুঞ্জরু, থিমায়া এবং মুসা। মুসাকে সহকর্মী হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম আমি নিজে।[২]

প্রতিরক্ষার মতো বিরাট একটা সংগঠন ইংরেজদের কব্জা থেকে ধীর, স্থির গতিতে বেরিয়ে এসে ভারতীয় সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীরূপে তিনজন ভারতীয় সর্বাধিনায়কের কর্তৃত্বাধীনে চলে এল।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। সে-জন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তিনিও সময়ে সময়ে কাশ্মীর সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতেন। প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময় সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন তিনি। উনিশশ' সাতচল্লিশের প্রথম দিকে একদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময় আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গে। প্রসঙ্গক্রমে প্যাটেল জানালেন ভারতের প্রতি মহারাজা হরি সিংহের মনোভাব স্পষ্ট নয়। মহারাজা হরি সিং-এর সঙ্গে

২। ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমার পরিচয় ছিল ; এবং কাশ্মীরের ব্যাপারেও আমার আগ্রহ কম ছিল না। প্যাটেল সে কথা জানতেন। তাই অনুরোধ করলেন আমি যেন মহারাজাকে বুঝিয়ে বলি ভারতের সঙ্গে ছেলেখেলা না করে যা হোক একটা কিছু স্থির করে নিতে। সেই অনুসারে হরি সিং-এর সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি ; কিন্তু স্পষ্ট কোন উত্তর আদায় করতে পারি নি। কিছুদিন পরই ঘটনাচক্র দ্রুতগতিতে আবর্তিত হতে থাকে এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে স্থির হয়ে যায়। এই ঘটনার পরই আমি কঠিন অসুখে পড়ি। সর্দার প্যাটেল আমায় দেখতে আসেন এবং খোঁজ খবর নেন। আমি সে সময় ছিলাম লেঃ কর্ণেল।

বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সর্দার প্যাটেল এবং নেহ্‌রুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মতপার্থক্যও ছিল দুস্তর। প্যাটেল ছিলেন বাস্তববাদী। অন্যদিকে নেহ্‌রু ছিলেন আদর্শবাদী। উভয়েরই অনুগামী ছিল অনেকে। কঠিনতম সমস্যায় কারোরই গুরুত্ব কম ছিল না। ভারতবর্ষের পক্ষে উভয়েই ছিলেন অপরিহার্য। জটিলতম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্যাটেল ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। দেশীয় রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে মিলিয়ে নিয়ে যেন যাদুর প্রভাবে কত সহজে অখণ্ড এক ভারতবর্ষের রূপদান করলেন তিনি। এ ব্যাপারে তাঁর বাস্তব কৌশলী-পন্থাকে নির্মমতা সত্ত্বেও সমর্থন করতেই হয়। বিস্ময়কর এই রাজনৈতিক ব্যাপারটি ঘটাতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তিনজন সুদক্ষ অসামরিক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ; ভি. পি. মেনন, বিশ্বনাথন এবং ভি. শঙ্কর। ইংরেজদের কাছ থেকে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরেও অনুরূপ সাহায্য করেছিলেন আরও দু' জন : এইচ. এম. প্যাটেল এবং এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার।

হায়দ্রাবাদের পুলিশ অভিযানের পেছনেও ছিলেন সর্দার প্যাটেল। এ ব্যাপারে বিশ্রী একটা পরিণতি সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই নেহ্‌রুকে সাবধান করে দিয়েছিলেন জেনারেল বুচার। নেহ্‌রুও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দৃঢ়চেতা প্যাটেল টললেন না। ফলে, উনিশশ' আটচল্লিশ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে পুলিশ অভিযান হলো। অথচ নেহ্‌রু পক্ষপাতী ছিলেন নরম পন্থার। আমাদের নেতাদের অনেকেই প্যাটেলকে করতেন ভয় এবং ভক্তি ; কিন্তু নেহ্‌রুকে করতেন শুধু শ্রদ্ধা।

উনিশশ' সাতচল্লিশ সনের তেইশে মার্চ তারিখে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। প্রথম, এশিয়ান রিলেশন্স্ কনফারেন্স। এশিয়ার নবজাগরণের প্রতীক হিসেবে মহতী এই অধিবেশনের গুরুত্ব ছিল অসীম। এই অধিবেশনেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটলো নেহ্রুর। দ্বিতীয়, ওয়াভেলের স্থানে এলেন রিয়ার এডমিরাল দি ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন।[৩] সমর-কুশলী, স্বনামখ্যাত এই সৈনিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় কমাণ্ডের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। ব্রিটিশ রাজপরিবারের আত্মীয়; তার উপর চার্চিলের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠতা। ফলে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। চল্লিশোর্ধ এহেন ব্যক্তিটিকে উনিশশ' সাতচল্লিশ সনের একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের শেষ বড়লাট হিসেবে নিযুক্ত করলেন এট্লী। এরই আগের দিন, উনিশশ' আটচল্লিশ সালের তিরিশে জুনের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের শাসনভার হস্তান্তর করবার ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এই ঘোষণাকে অনেক ইংরেজ আখ্যা দিয়েছিলেন—অপারেশন স্কাট্ল (Operation Scuttle)।

অতীব দক্ষতা, উদ্যম এবং সুষ্ঠুতায় সুকঠিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। উদ্ভাবন-দক্ষতার সঙ্গে মৌলিকতার মিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর কার্যপ্রণালীতে।[৪] একটা নিয়ম করে নিয়েছিলেন তিনি। প্রতি এক ঘণ্টা রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার পর এবং পরবর্তী সাক্ষাৎকারের আগে,

---

৩। ব্রহ্মদেশে এঁর অধীনে আমি কাজ করেছিলাম।

৪। স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর মামলায় আমি স্যার এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হই ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে। সেই সময় মাউণ্টব্যাটেন নেহ্রুকে অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন আমেরিকা যাবার পূর্বে তাঁর মুখ্য প্রচার-সচিব এলেন ক্যাম্পবেল জনসনের সঙ্গে দেখা করি। সেই অনুসারে ১৯৪৮ সালের ৫ই জানুয়ারী আমি দেখা করেছিলাম। কাশ্মীর সমস্যা এবং তার সমাধানে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনাও হয়েছিল। জনসন আমাকে এই পরামর্শগুলো দিয়েছিলেন—রাষ্ট্রপুঞ্জ মহলে আয়েঙ্গার অপরিচিত। অতএব যথোচিত খ্যাতি সহকারে সেখানে তাঁকে পরিচিত করান দরকার; শেখ আবদুল্লার তৎপরতাকে প্রশমিত করতে হবে; এবং আমেরিকার সংবাদপত্র মারফৎ সুকৌশলে তাঁর মর্যাদা নামিয়ে দিতে হবে। উভয়েই একমত হয়েছিলাম যে, আমাদের সুযোগ্য প্রেস ইনফরমেশন অফিসর বি. এল. শর্মাকে আমাদের সঙ্গে জন-সংযোগ অফিসর হিসেবে নেওয়া উচিত। আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো পরে আমি নেহ্রুকে জানাই। (এলেন ক্যাম্পবেল জনসনের 'Mission With Mountbatten' পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।)

পনের মিনিট সময় তিনি লেখার জন্য ব্যয় করতেন। ফলে, পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারের পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকতো। স্বীয় দায়িত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। দিল্লীতে নিজের অনেক দপ্তরে একটা করে দিনপঞ্জী টাঙাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। দিনপঞ্জীর উপরে বড় বড় হরফে লেখা থাকত—'ক্ষমতা হস্তান্তরের অবশিষ্ট দিন'। সেই বিশেষ দিনটির কথা তাঁর নিজের এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের মনে সবসময় জেগে থাকত। ফলে, বহুবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও হস্তান্তরের মতো কঠিন একটা কাজকে তিনি অসম্ভব দ্রুততা এবং সুষ্ঠুতায় সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

ভারতবাসীর কাছে মাউণ্টব্যাটেনের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। তাই ১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জনতা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সমস্বরে বলেছিল—'পণ্ডিত মাউণ্টব্যাটেন কী জয়।'

সময় সময় এমন হয়েছে যে ভারতীয় রাজনৈতিক সহকর্মীরা নেহ্রুকে কোন বিষয়ে একরকম পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন দিয়েছেন অন্য। ফলে, কখন কখন বিরোধ, এমনকি অচল অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন হয়ে উঠেছিলেন নেহ্রুর পরামর্শদাতা। যে কোন ব্যাপারে নেহ্রুর মত পরিবর্তন করাতে পারতেন তিনি। তাই ভারতের নতুন শাসন পরিচালনা যেমন একদিকে হয়েছিল অনেক সহজ, অন্যদিকে তেমনি হয়েছিল কঠিন।

মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহ্রুর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৪৫-৪৬ সালে। প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের উপর প্রগাঢ় ব্যক্তিগত ছাপ রাখতে সমর্থ হন। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল মাউণ্টব্যাটেনের, এবং ভারতীয় দৃশ্যপটে নিজেকে অদ্ভুতভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন তিনি। মানসিক গঠনের দিক থেকে নেহ্রু ছিলেন ইংরেজ। উভয়ের যোগাযোগ যেন হলো সোনায় সোহাগা। বহুবিধ বিষয়ে ঐক্যের ফলে উভয় পরিবারে গড়ে উঠল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।[৫]

৫। ভবিষ্যতের দিনগুলোতেও এই বন্ধুত্ব ছিল অম্লান। নিয়মিত মিলনের মধ্য দিয়ে সজীব রাখা হয়েছিল এই সখ্যতাকে। নেহ্রু অথবা তাঁর কন্যা যখনই ইংলণ্ডে গেছেন, অথবা মাউণ্টব্যাটেন পরিবার এসেছেন প্রাচ্যে, পরস্পরের সান্নিধ্যে তাঁরা কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে ভোলেন নি। এই রকমই একটা ঘটনার কথা মনে আছে। নেহ্রুর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন লেডী মাউণ্টব্যাটেন। তাঁদের সঙ্গে খাবার নিমন্ত্রণ ছিল আমার। খাবার টেবিলে

উভয় পরিবারই ছিল সৌন্দর্যবিভূষিত, অভিজাত এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল নেহ্‌রু এবং মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যে, কারণ, উভয়ের ব্যক্তিত্ব ছিল একই ধরনের। ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল লেডী মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহ্‌রুর মধ্যে, কারণ, নেহ্‌রুর নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন লেডী মাউণ্টব্যাটেন।

বিদায়ের প্রাক্কালে মাউণ্টব্যাটেন দম্পতিকে মর্মস্পর্শী ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানান নেহ্‌রু। মাউণ্টব্যাটেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

অসাধারণ খ্যাতির পসরা নিয়ে আপনি এখানে এসেছিলেন। এই খ্যাতির ভাণ্ডার কতজনেরই ত ভারতের মাটিতে ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু কঠিন প্রতিবন্ধকতা এবং সঙ্কটের মধ্যে এখানে থাকা সত্ত্বেও আপনার খ্যাতি রয়েছে অম্লান। এ একটা অসাধারণ কৃতিত্বের কথা…।

এবং লেডী মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যে বললেন নেহ্‌রু :

স্বর্গের দেবতারা অথবা পরীরা আপনাকে দিয়েছেন সৌন্দর্য, অসাধারণ মেধা, মাধুর্য, আকর্ষণ এবং প্রাণ-প্রাচুর্য। দিয়েছেন অসাধারণ গুণরাজি। যে নারীর মধ্যে সমাবেশ হয়েছে এতগুলো ঐশ্বর্যের, সর্বকালে এবং সর্বস্থানে তিনি মহীয়সী। কিন্তু এ সবের চাইতেও দুর্লভ এবং মানবিকতার স্পর্শে ধন্য কতগুলো ঐশ্বর্য তাঁরা দিয়েছেন আপনাকে। তা হলো মানুষের প্রতি সমবেদনা এবং দুর্গতের প্রতি সেবার ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা। এবং, এই দুর্লভ ঐশ্বর্যরাশির বিস্ময়কর সমাবেশের ফলশ্রুতি হলো নিপীড়িতের আশ্বাস স্বরূপ একটি কল্যাণময়ী ব্যক্তিত্ব। যেখানেই আপনি পদার্পণ করেছেন, সেখানেই এসেছে শান্তি, এসেছে সান্ত্বনা।…অতএব, ভারতবাসীরা যে আপনাকে ভালবেসেছে,

গুরু-গম্ভীর কোন বিষয়ই উঠল না। অস্বাভাবিক লঘু এক মুহূর্তের মধ্যে ছিলেন নেহ্‌রু। আমার মুখ থেকে মাঝে মাঝে তিনি কৌতুকজনক ঘটনা শুনতে চাইতেন। সেদিনও চাইলেন শুনতে। অনেকগুলো মজার মজার গল্প বললাম। তারমধ্যে একটা ছিল চেম্বার্স অভিধানে 'White Cap'-এর ব্যাখ্যা : 'a member of a self-constituted Vigilance Committee who under the guise of purifying the morals of the community deal violently with persons of whom they disapprove.'

আপনাকে তাদের আপনজন করে নিয়েছে, এবং আপনাকে বিদায় দিতে তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে, এতে আশ্চর্যের কিছু আছে কি? মাউণ্টব্যাটেন পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধন অচ্ছেদ্য, এবং যেখানেই হোক, আবার আমাদের দেখা হবেই।...

মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ, উভয় দেশেরই অশেষ মঙ্গল সাধন করেছিলেন।

আমার চাকুরী-জীবন আরম্ভ হয়েছিল পদাতিক বাহিনীতে। তাই, পদাতিক বাহিনীতে বদলীর জন্য বারংবার আবেদন করেছি। অবশেষে ১৯৪৬ সনে আমাকে এমনি একটি বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রদান করা হলো। এই সময়েই জাতীয়করণ কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে আমি মনোনীত হয়েছিলাম। এর কিছুদিন পর, ওয়াশিংটনে আমাদের রাষ্ট্রদূতের সামরিক সহযোগী হিসেবেও আমাকে মনোনীত করা হয়। এই অবস্থায় স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্যার আর্থার স্মিথ সদর দপ্তরে আমায় ডেকে পাঠান। জানতে চান, আমি কোন পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব নিতে চাই, অথবা ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূতের সামরিক সহযোগীরূপে যেতে চাই। পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়াই ছিল আমার আন্তরিক অভিপ্রায়। সেই কথাই জানালাম তাঁকে। অতঃপর, বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার শেষে আমাকে জানান হলো যে, জাতীয়করণ কমিটির কাজ শেষ করবার পর ওয়াশিংটনে যেতে হবে আমায়। উপরওয়ালার আদেশে, অতএব, পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়া আমার ভাগ্যে হলো না।

১৯৪৭ সনের জুন মাসে যাত্রার পূর্বে নেহ্‌রুর কাছে গেলাম বিদায় নিতে। যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছি জেনে খুশী হয়েছিলেন নেহ্‌রু। সে কথা আমায় জানালেন। বললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকা যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছে, সেকথা তিনি বিস্মৃত হন নি। তাই তাঁর ঐকান্তিক কামনা স্বাধীন ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যেন একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিজের স্বাক্ষর সম্বলিত একখানা কার্ডে সামান্য কয়েক কথায় বিদায়-বাণী লিখে দিয়ে নেহ্‌রু আমার শুভযাত্রা কামনা করলেন। কার্ডখানা এখনও আমার কাছে রয়েছে।

১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে এস্. এস্. কুইন মেরী জাহাজে স্ত্রী এবং দুই কন্যা

সহ নিউইয়র্ক পৌঁছুলাম। স্বাধীনতার মূর্তি (Statue of Liberty), গগনচুম্বী অট্টালিকাশ্রেণী এবং দ্রুতধাবমান গাড়ীর মেলা দেখে আমরা গেলাম ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে।

ওয়াশিংটনে যখন নিজেকে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছি, সেই সময় ভারতবর্ষের আকাশে ঘনিয়ে উঠছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। কোনরকম গণ্ডগোল বেধে ওঠার আগেই ইংরেজরা চেষ্টা করছিল অক্ষত অবস্থায় ভারত ছেড়ে চলে যাবার। অনেক বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল নেহ্‌রুকে। মুসলীম লীগের দাবী ছিল স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন নেহ্‌রু। সর্ত ছিল, ভারতের যে সমস্ত অংশ প্রস্তাবিত পাকিস্তানে যেতে রাজী হবে না, তাদের বাদ দিতে হবে। জাতি, কৃষ্টি এবং ভাষার দিক থেকে এক হওয়া সত্ত্বেও, দুটো পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে গেল একটা জাতি। ধর্মীয় দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক প্রচার এবং সর্বশেষে এই সিদ্ধান্তের ফলে পঞ্জাব, বাংলা এবং সিন্ধু থেকে দলে দলে মানুষ গৃহহারা হয়ে গেল। সেই উদ্বাস্তু স্রোত জন্ম দিল অকথ্য সাম্প্রদায়িক বিষ এবং অবর্ণনীয় দুর্গতির। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হত্যার সব চাইতে হতাশাপূর্ণ দিকটি ছিল আমাদের অন্তর্নিহিত ব্যর্থতার চেতনা। যে মহান আদর্শ নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা নেমেছিলাম, যে আদর্শ গান্ধীজী আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে সমস্ত জলাঞ্জলি দিলাম। ফলে, মানুষের জীবন এবং অর্থনৈতিক যে ক্ষয়-ক্ষতি হলো তার পরিমাপ হয় না। বিকারের একটা প্রচণ্ড স্রোত যেন সারা দেশটাকে প্লাবিত করে দিল। পেছনে ফেলে গেল হাজার হাজার মৃতদেহ। এই ঘটনার উল্লেখ করে প্রায় এক বছর পর নেহ্‌রু বলেছিলেন, অত্যধিক মূল্য দিতে হলেও ভারত-বিভাগে আমরা সম্মতি দিয়েছিলাম কারণ আমাদের আশা ছিল তাতে ফিরে পাওয়া যাবে শান্তি এবং শুভবুদ্ধি।

অবশেষে, ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা-দিবস এসে গেল। ব্রিটিশ পতাকা নেমে এল নীচে। উপরে উঠে গেল ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। একশ' পঞ্চাশ বছর ধরে শ্বেতকায়দের ব্রিটিশ রাজত্বের পাষাণভার অবশেষে ভারতের বুকের ওপর থেকে অপসারিত হলো। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে দিল্লী থেকে বেতারে জাতীর উদ্দেশ্যে নেহ্‌রু বললেন :

নিয়তি-নির্ধারিত সেই দিন আজ এসে গেছে। বহুযুগের নিদ্রাভঙ্গের পর এবং অনেক সংগ্রামের শেষে, জাগ্রত, প্রাণোচ্ছল, মুক্ত, স্বাধীন ভারত আবার বিশ্বের সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অতীতের কবল থেকে এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারি নি ; এবং যে ব্রত আমরা গ্রহণ করেছিলাম তা থেকে দায়মুক্ত হতে হলে এখনও অনেক কিছু আমাদের করতে হবে। তবু, সন্ধিক্ষণ পার হয়ে গেছে, এবং আমাদের জন্য ইতিহাস শুরু হয়েছে নতুন করে। এ ইতিহাস হলো আমাদের বেঁচে থাকবার, আমাদের কর্মের। এ ইতিহাস লিখবে অন্য মানুষেরা…। আজকের দিনে প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করি আমাদের এই স্বাধীনতার জন্মদাতাকে, জাতির জনককে, যিনি ভারতের শাশ্বত বাণী অন্তরে নিয়ে স্বাধীনতার মশাল জ্বেলে আমাদের চারপাশের অন্ধকারকে দূরীভূত করেছিলেন… ।

নয়াদিল্লীর গণ-পরিষদে (Constituent Assembly) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন ঃ

নিয়তির সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য বহুদিন থেকে প্রস্তুত হয়ে ছিলাম আমরা। ব্রত গ্রহণ করেছিলাম, নিয়েছিলাম শপথ। সেই ব্রত থেকে আংশিক হলেও, দায়মুক্ত হবার সময় আজ সমাগত। মধ্যরাত্রিতে বিশ্ব যখন থাকবে নিদ্রামগ্ন, ভারত তখন জেগে উঠবে জীবন-চাঞ্চল্যে এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। ইতিহাসে এমন শুভ মুহূর্ত কদাচিৎ আসে যখন পুরাতনকে ছেড়ে নতুনকে আলিঙ্গন করি আমরা ; যখন শেষ হয় একটা যুগের এবং দীর্ঘদিনের অবদমিত জাতির আত্মা ভাষা খুঁজে পায় ··। ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে ভারত তার যাত্রা শুরু করেছিল অন্তরে অসীম জিজ্ঞাসা নিয়ে, এবং চিহ্নহীন কত শতাব্দী পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে তার অক্লান্ত সংগ্রাম, মহৎ সাফল্য আর ব্যর্থতার কাহিনীতে··· ।

(সেই দিনই ওয়াশিংটনে আমাদের দূতাবাসে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে উত্তোলন করে সম্মান জানাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে অসীম এক ভাবাবেগ এবং গর্বের পুলক শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল আমার সমস্ত অন্তরে। আশা জাগছিল, যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত প্রাণহীন জড়ত্বের অবসান হবে এবার, এবং স্বাধীনতার এই শুভমুহূর্তে জন্ম নেবে শক্তিশালী এক নতুন ভারতবর্ষ··· ।)

ইতিহাসে এই প্রথম হিমালয়[৬] থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল এই দেশ একই শক্তির ছত্রছায়াতলে এসে দাঁড়াল, বাঁধা পড়ল এমন এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানসূত্রে যার মূল লক্ষ্য হলো গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ; যার মৌলিক মানবিক অধিকার হলো :

(ক) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা[৭] এবং সরকারের সমালোচনা ;

(খ) প্রশাসনিক আওতা তথা রাজনৈতিক কোন দলের সংস্রবমুক্ত বিচার বিভাগ ; যেখানে ধনী-দরিদ্র, সরকারী কর্মচারী অথবা সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার পাবে ;

(গ) নিপীড়নের ভয়মুক্ত হয়ে সাধারণ শ্রমিক অথবা কৃষক রোজগার করতে এবং দৈনন্দিন শ্রমের ফলভোগ করতে পারবে।

বাতাসে যেন ভেসে আসছিল পাখীদের গান। সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝলমল করছিল আকাশ। আশা-প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বাতাস। আলোর ঝিকিমিকি খেলছিল আমাদের চোখে। পরস্পরকে অভিনন্দন জানালাম আমরা। স্বাধীন বিশ্বে আমরা এবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। সমস্ত স্বপ্ন আমাদের সফল হবে এবার। মধুময় হয়ে উঠবে আমাদের জীবন। সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্টের অবসান যেন দেখতে পাচ্ছিলাম চোখের সামনে। দেখতে পাচ্ছিলাম নতুনের পুনরাবির্ভাব। নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা আমরা নিজে। বলতে পারব যা বলতে চাই, করতে পারবো যা কর্তব্য মনে করবো। বহুযুগ পর নির্ভয়ে নিতে পারব নিঃশ্বাস। নিজেদের সমস্যার মোকাবিলা করব নিজেরা। দ্রুতগতিতে সমাধান করব ক্ষুধার, নিরক্ষরতার এবং পরিবার পরিকল্পনার। নির্ধারণ করব নিজেদের স্বাধীন নীতি। জোট নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিশ্ব-সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যক্ত করব নিজেদের স্বাধীন মতামত। নৈতিকতার একটা নিজস্ব মান প্রতিষ্ঠা করব

৬। 'কুমারসম্ভবে' কালিদাস হিমালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—'পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় আসমুদ্র বিস্তৃত, দেবতাদের পূজ্য নাগাধিরাজ হিমালয় ভারতের উত্তরে অবস্থিত।

৭। উড্রু উইলসন বলেছেন : 'অবাধ বাক-স্বাধীনতা হলো সব চাইতে বড় রক্ষাকবচ, কারণ মূর্খকে নিজের নির্বুদ্ধিতা জাহির করবার জন্য কথা বলতে উৎসাহিত করা উচিত।

আমরা। ভেবে অবাক লাগল, এত সব কাজ এবার থেকে আমরা নিজেরাই করতে পারব।

ভারতের অন্যতম বড়লাট লর্ড কার্জন বড় গর্ব করে একবার বলেছিলেন :

গোড়াতেই এ কথাটা নিঃসংশয়ে জেনে রাখলে ইংলণ্ডের পক্ষে সন্তোষ-জনক, ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক, এবং সমস্ত প্রগতিশীল সভ্য জাতির পক্ষে সব চাইতে ভাল হবে যে,…ভারত-সাম্রাজ্য হাতছাড়া করবার ইচ্ছে আমাদের বিন্দুমাত্র নেই, এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোন চিন্তা আমাদের মনে জাগরিত হবে না।

সেই ব্রিটিশই শেষ পর্যন্ত ভারত ছাড়ল।

প্রথম স্বাধীনতালগ্নে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আছড়ে পড়তে লাগল আমার মনের তটভূমিতে। আজ পায়ের বেড়ী আমাদের যখন ভেঙে গেছে, আমরা যখন স্বাধীন হয়েছি, তখন কি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বালি দিয়ে ভিত গড়ে তুলব, না বাস্তব-সচেতন হয়ে গড়ে তুলব পাথরের ভিত? হব কি ঐক্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ? জাতীয় চরিত্র উন্নত করতে এগুব কোন্ পথে? এতদিন ধরে যে সমস্ত উপদেশ আমরা দিয়ে এসেছি, তা কি সত্যিই নিজেরা পালন করব, না এখনও দিয়ে যাব শুধু উপদেশ? স্থির যুক্তির পরিবর্তে এখনও কি আসর গরম করব বক্তৃতা দিয়ে? নিজেদের ব্যাপারেই আমরা সীমিত থাকব, না নিযুক্ত হব অন্যদেশের ছিদ্রানুসন্ধানে? জনসাধারণের প্রতি কি গ্রহণ করব উন্নাসিক মনোবৃত্তি? দেশে আমাদের তাত্ত্বিকের অভাব নেই। সেই তাত্ত্বিকদেরই কি উৎসাহিত করব, না গ্রহণ করব বাস্তব নীতি? আমাদের অগণিত সমস্যাগুলোকে কি সমাধানের চেষ্টা করব দৃঢ় চিত্তে, না ছেড়ে দেব যেমন রয়েছে তেমনি? আমরা কি বাস্তবোচিত নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করব? আমরা কি নিজেদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করব অথবা নবলব্ধ শক্তির মদমত্ততায় এবং মোসাহেবীতে বুঁদ, অন্ধ হয়ে থাকব?

কে. এম. পানিকর বলেছেন ইংরেজরা না কি এক সময় ভগবদ্গীতাকেও বে-আইনী ঘোষণা করার মতলব এঁটেছিল। এদেশে তাদের অতীত কার্য-কলাপও প্রশংসনীয় ছিল না। তবু আশ্চর্য, স্বাধীনতার এই মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে

আমার তথা সাধারণ ভারতবাসীর চিত্ত-বিক্ষোভ বহুল পরিমাণে প্রশমিত হয়ে এসেছিল। এর প্রকৃত কারণ ছিল গান্ধীজী এবং নেহ্‌রুর[৮] তিক্ত অতীতকে ভুলে যাবার উদার মনোভাব। আরও একটা কারণ ছিল। আমাদের মধ্যে অনেকেই সেটা ধরতে পারেন নি। সুদীর্ঘ দেড়শ' বছর ইংরেজেরা আমাদের দেশে ছিল। এরই মধ্যে শুরু হয় আমাদের নব-জাগরণের (Renaissance) আন্দোলন। সেই আন্দোলনে ইংরেজদের (এবং কিছু সংখ্যক য়ুরোপীয়েরও) প্রভূত অবদান ছিল। আমাদের লুপ্ত গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে পুনরাবিষ্কার করবার ব্যাপারে তাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ জেগেছিল বহু পূর্বেই। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল'-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স্। কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যেরও অনুবাদ করেছিলেন তিনি। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম নামে আর এক ভদ্রলোক ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৩৭ সনে প্রিন্সেপ ব্রাহ্মীলিপির রহস্য উদ্ধার করেন। এর ফলে, যা পূর্বে কারও দ্বারা সম্ভব হয় নি, তাই হয়েছিল। অশোকস্তম্ভে এবং পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। ফিরোজশাহ্ তুঁঘলক দুটি অশোকস্তম্ভ দিল্লীতে আনিয়ে তাদের লিপিগুলির মর্মোদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। (মোহেঞ্জোদরো লিপির পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয় নি।)

প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রেও মহৎ অবদান ছিল তাঁদের। অনেকের মধ্যে দু'জনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, জেনারেল কানিংহাম এবং স্যার আলফ্রেড মার্শাল। লর্ড কার্জন কুখ্যাত হয়ে রয়েছেন তাঁর কতগুলো মতবাদ এবং কাজের জন্য। কিন্তু তাঁর মতো ব্যক্তিও আমাদের দেশে পুরাতত্ত্বের গবেষণাকে নবজীবন দান করেছিলেন। তদানীন্তন ভারত সরকারের উৎসাহ এবং আনুকূল্যে তারপর থেকে অক্লান্তভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন ডক্টর ভোগেল, ডক্টর ব্লচ, স্যার অরেল ষ্টেইন,[৯] স্যার আলফ্রেড মার্শাল[১০] (দয়ারাম সাহ্নী

৮। সবশুদ্ধ ৩২৬২ দিন নেহ্‌রুর কেটেছিল ইংরেজদের কারাগারে।

৯। এই নিঃশঙ্ক, মহাপণ্ডিত ব্যক্তিটি বালুচিস্তান, ইরাণ এবং চাইনীজ তুর্কীস্তানে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েছিলেন, এবং কল্হনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে বর্ণিত বহুস্থান আবিষ্কার করেছিলেন।

১০। হরপ্পা এবং মোহেঞ্জোদরোতে।

এবং মজুমদার)। তাঁদের গবেষণা আমাদের সভ্যতার প্রাচীনত্ব এবং পারম্পর্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইংরেজদের দৌলতেই আমরা পেয়েছিলাম শিল্পোদ্যোগ, জলসেচ, যোগাযোগব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। তারাই আমাদের দিয়েছিল আধুনিক একটি সামরিক বাহিনী যার রাজনৈতিক আনুগত্য ছিল একটিমাত্র দলের প্রতি। তারাই আমাদের দিয়ে গেছে ইস্পাতের মতো কঠিন একটি অসামরিক প্রশাসনিক কাঠামো। সেই কাঠামোই আজও রয়েছে, এবং সেইটাকেই আমরা প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে তুলেছি। সব চাইতে বড় কথা, তারাই আমাদের নিয়মানুবর্তিতা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবার শিক্ষা দিয়ে গেছে।

কুখ্যাত প্রশাসকরূপে যেমন কিছু সংখ্যক ইংরেজ এদেশে এসেছিলেন, তেমনি এসেছিলেন কিছু সংখ্যক সদাশয় কর্মী। ভারতের কর্মক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তাঁরা। তরবারির শক্তিতে ইংরেজ যেমন একদিন ভারতভূমি জয় করেছিল, তেমনি ১৯৪৭ সালে ভারতত্যাগও করে গেল কলমের একটিমাত্র খোঁচায়।

বহুদিন পূর্বে চার্চিল একবার বলেছিলেন: 'অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে যদি আমরা একটা বিরোধ বাধিয়ে বসি, তবে ভবিষ্যৎকেও হয়তো আমাদের হারাতে হবে।' অতএব, 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ'-এর মধ্যে থাকার আমরা যে সিদ্ধান্ত নিলাম, তাতে অন্যান্য ভারতবাসীদের মতো আমিও আনন্দিত হয়েছিলাম। নেহ্‌রুর মতে, (যাঁকে অতীতে ইংরেজরা তেরোবার কারারুদ্ধ করেছিল) এই সিদ্ধান্ত ছিল সমান-সমানে অংশীদারী, যা উত্তেজনা প্রশমন এবং শান্তিস্থাপনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। অবশ্য, ব্রিটিশ-রাজের কাছে আনুগত্য গ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন নেহ্‌রু। তাই ১৯৫০ সালে একটা পন্থা আবিষ্কার করলেন তিনি। সেই সূত্র অনুযায়ী ভারত হলো 'কমনওয়েলথের' মধ্যে অবস্থিত প্রথম গণতন্ত্র।

পরিতাপের বিষয়, স্বদেশে যখন চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী একের পর এক ঘটে যাচ্ছিল, আমি তখন ছিলাম বিদেশে। যাই হোক, আমার নতুন দায়িত্বভার তথা ওয়াশিংটনের আন্তর্জাতিক সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলাম। কিছু কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা আমার ছিল। যেমন

সন্তোষজনক একটা বাসস্থান ঠিক করা এবং মেয়েদের[১১] ভালো একটা স্কুলে ভর্তি করা। সেগুলো সেরে ফেললাম।

কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলাম ওয়েষ্ট পয়েণ্টের ইউ. এস. মিলিটারী একাডেমীতে। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্য এবং প্রশাসনিক কাঠামো বুঝতে বুঝতেই চলে গেল দিনগুলো। প্রতিষ্ঠানের সেনাপতি ছিলেন জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর। পরবর্তীকালে সামরিক এবং কূটনৈতিক জগতে স্বনামধন্য হয়েছিলেন ইনি। একাডেমীর সৌভাগ্য যে এঁর মতো একজন অক্লান্ত স্বদেশ-সেবী এবং সৈনিকশ্রেষ্ঠের প্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব লাভ করেছিল। সামরিক এবং সাধারণ-শিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব দেখে চমৎকৃত হলাম আমি।

জর্জিয়ার ফোর্ট বেনিং-এর সামরিক বিদ্যালয় এক মহড়ার আয়োজন করেছিল। নেতৃত্ব করছিলেন একাধিক সামরিক সম্মান-ভূষিত, কঠোর-দর্শন মেজর জেনারেল 'মাইক' ও'ডেনিয়েল। সেই মহড়ায় আমি গেলাম যোগদান করতে। সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন বিশেষ একজন রাষ্ট্রদূতের সামরিক সহযোগী (Military Attache)। একদিন আমার সামনেই আমেরিকানদের সম্বন্ধে কতগুলো অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করলেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথার প্রতিবাদ করলাম। আমেরিকার বিশেষ বন্ধু বলে যে প্রতিবাদ করলাম তা' নয়। করলাম এই জন্য যে, নীতিগতভাবে নিমন্ত্রণ-কর্তার নিন্দা করা অতিথির পক্ষে সুরুচির পরিচায়ক নয় বলেই আমার মনে হয়েছিল। ও'ডেনিয়েলের কানে যখন উঠল কথাটা, অমনি দ্রবীভূত হয়ে গেল তাঁর অমন কঠোর গাম্ভীর্য। এবং, সেই বোধহয় প্রথম তাঁকে হাসতে দেখা গেল।

সাধারণ আমেরিকাবাসীদের খুবই রসিক বলে মনে হয়েছে আমার। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা ট্যাক্সি

১১। ওয়াশিংটনে ম্যারেট স্কুল নামে একটি ফরাসী শিক্ষায়তন ছিল। কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা এটির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আমার দুই মেয়েকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। কয়েক মাস পরের কথা। স্কুলের পাঠ্য-ক্রমের (Term) শেষে আমার বড় মেয়ে অঙ্গুরাধার ফলাফলের বিষয় প্রধানা শিক্ষিকার কাছে জানতে গিয়ে অবাক হয়ে শুনলাম, সে ডবল প্রমোশন পেয়েছে।

থামিয়ে চালককে বলেছি আমায় ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টে নিয়ে যেতে। সবিস্ময়ে চালক জিজ্ঞাসা করল: 'ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট্?'

উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।'

'দেখুন মশাই, আমাদের দেশে কোন ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট্ নেই। সেটা রয়েছে লণ্ডনে', একটা সিগার চিবুতে চিবুতে ব্যঙ্গ ভরে বললো ট্যাক্সি-চালক, 'আমাদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয় সেইখানেই।'

আর একদিনের একটা ঘটনা বলি। ট্রেনে করে আমরা ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিলাম। আমার কন্যাদ্বয় ততদিনে আমেরিকার স্কুলে পড়ে ইয়াংকি উচ্চারণ বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। 'রেষ্টুরেণ্ট কার'-এ দুপুরের খাওয়া সেরে নিচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ, চার বছর বয়সের কনিষ্ঠা কন্যা চিত্রা অবাক হয়ে দেখল এক আমেরিকান দম্পতি স্যালাড খাচ্ছেন। লেটুসগুলোর দিকে তাকিয়ে নিরীহভাবে চিত্রা জিজ্ঞাসা করলো—'তোমরা ঘাস খাচ্ছো কেন?' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধু হয়ে গেলেন সেই দম্পতি।

নেহ্রুর স্বনামধন্য ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত একাধিকবার বিচক্ষণতার সঙ্গে বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন অপূর্ব দক্ষতায়, অর্জন করেছেন ভারতের সুনাম। সে বছর সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেত্রীরূপে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন। টি. এন. কল ছিলেন তাঁর একান্ত-সচিব (Private Secretary)। অপূর্ব মর্যাদাসহকারে বক্তৃতামঞ্চে গেলেন শ্রীমতী পণ্ডিত, এবং ভারত তথা অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করলেন। পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিজীবীদের জমায়েত হয়েছিল সেই সভায়। সভার মনোভাবও ভারতের পক্ষে ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু অপূর্ব বাগ্মীতা এবং অকাট্য যুক্তি দিয়ে সেই অনিশ্চিত সভাকেই আমাদের অনুকূলে আনলেন শ্রীমতী পণ্ডিত। বক্তৃতার শেষে সভাগৃহ যেন প্রশংসায় ফেটে পড়লো। ছোট্ট এই মহিলাটির জন্য সেদিন সত্যিই সকলে গর্ববোধ করেছিলাম। তাই, কয়েকদিন পরের একটা ঘটনা আমায় অবাক করে দিয়েছিল। সেদিন সকালে ওয়াশিংটনে তিনি আমায় টেলিফোন করলেন, এবং সেই রাতেই নিউইয়র্কে তাঁর সঙ্গে সস্ত্রীক একটা ভোজসভায় যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। বললেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদেরও ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেই অনুসারে সস্ত্রীক ছুটলাম নিউইয়র্কে

সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। ডিনারের মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। টি. এন. কলের কামরায় আমরা অপেক্ষা করছি। এমন সময় শ্রীমতী পণ্ডিত খবর পাঠালেন, শেষ মুহূর্তে অতিরিক্ত এক দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে বলে খাবার টেবিলে আর স্থান সঙ্কুলান হবে না। অতএব আমরা যেন অন্যত্র খাবার ব্যবস্থা করি। প্রস্তাবটা অপমানজনক লাগল আমার; এবং তাঁকে জানিয়েও দিলাম সে কথা। বলে পাঠালাম, তাঁরই অনুরোধে ওয়াশিংটন থেকে এতদূর এসেছি ভোজসভায় যোগ দিতে। তাই অন্যত্র খাবার অভিপ্রায় আমাদের নেই। আশ্চর্য, কয়েক মুহূর্ত পরেই শ্রীমতী পণ্ডিত নীচে নেমে এলেন। কিছুই যেন হয় নি এমনিভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানালেন আমাদের। একটু আগেই তিনি যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। নির্বিকার শান্তভাবে আহ্বান জানালেন খাবার টেবিলে। তাঁর আত্মসংবরণের ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা। টি. এন. কল এই ঘটনার একজন সাক্ষী। সত্যিই একজন পাকা-পোক্ত কূটনীতিজ্ঞ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

১৯৪৭ সনের ২১শে অক্টোবর তারিখে পাকিস্তানের প্ররোচনায় পাঠান উপজাতীয় হানাদারেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল কাশ্মীরের উপর। ওয়াশিংটনে থাকতেই এই খবর পেলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির করে নিলাম। এই সময় বিদেশে পড়ে না থেকে কর্তব্য সাধনের জন্য যে করেই হোক কাশ্মীরে যাওয়া উচিত আমার। তাই অনুরোধ পেশ করলাম ভারতের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। কিছুদিন বাদেই ডাক এল নেহ্‌রুর কাছ থেকে। দিল্লী পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে নেহ্‌রু জানালেন পরদিনই তিনি পুঞ্চ যাচ্ছেন, কারণ, সেখানকার সৈন্যবাহিনীর অবস্থা সুবিধের নয়। আমাকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন নেহ্‌রু। কাশ্মীরের যুদ্ধ তখন তীব্রতম হয়ে উঠেছে এবং পুঞ্চ হয়ে পড়েছে বিপন্ন।

পরের দিন ভোরেই প্রধানমন্ত্রীর দল এরোপ্লেনে রওনা হলো দিল্লী থেকে। দলের মধ্যে ছিলেন স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, শেখ আবদুল্লা, ব্রিটিশ উপদেষ্টা জেনারেল রাসেল, জেনারেল কারিয়াপ্পা এবং এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার। জম্মুতে নেমেই সাক্ষাৎ হলো লেঃ জেনারেল কলবন্ত সিং-এর সঙ্গে। যদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হলাম। অনেক আলোচনা হলো আমাদের

মধ্যে। তার মধ্যে একটা ছিল ডোমেলের সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে হানাদারদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দেওয়া। স্বেচ্ছায় এই কাজটির ভার নিতে চাইলাম আমি। আলোচনাগুলো উৎসুক হয়ে শুনছিলেন নেহ্রু। অনেক বাদানুবাদের পর অবশ্য প্রস্তাবটি বাতিল করে দেওয়া হয়।

পুঞ্চে পৌঁছুতেই সেখানকার সামরিক কর্তৃপক্ষ নেহ্রুকে জানালেন যে, প্রশাসনিক দিক থেকে পুঞ্চের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। অতএব, পুঞ্চ ত্যাগ করাই মঙ্গল। শুনেই জ্বলে উঠলেন নেহ্রু। স্মরণ করিয়ে দিলেন, স্থানীয় অধিবাসীরা যতক্ষণ স্বেচ্ছায় ছেড়ে না যায়, ততক্ষণ যে কোন মূল্য দিয়েই হোক না কেন পুঞ্চকে রক্ষা করতে ভারত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুদ্ধের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা এবং বিভীষিকাকে বীরত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করে বাসিন্দারা যখন মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে, তখন ভারতকে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই হবে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নেহ্রু আদেশ দিলেন পুঞ্চকে রক্ষা করতে। তার জন্য যাই মূল্য দিতে হোক না কেন। আদর্শগত কোন প্রশ্নে নেহ্রু যখন রুখে দাঁড়াতেন, সে-দৃশ্য সবসময়েই হতো আনন্দ এবং প্রেরণাদায়ক।

কয়েকদিন পর আমাকে জলন্ধর যেতে হলো। সেখান থেকে টেলিফোন করলাম লেঃ কর্ণেল মুসাকে। মুসা তখন ছিলেন লাহোরে, সেখানকার পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে। বললাম, আমি দেখা করতে চাই তাঁর সঙ্গে। অতএব, ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত যাতে পার হতে পারি সে ব্যবস্থা যেন তিনি করে রাখেন। মুসা কিন্তু সীমান্ত পার হবার চেষ্টা করতে বারণ করলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন, বর্তমানে দুই পৃথক যুদ্ধমান রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে রয়েছি আমরা। মুসার পরামর্শ কিন্তু উপেক্ষা করলাম আমি। মোটরে পৌঁছুলাম আত্তারি সীমান্ত চৌকিতে। সীমান্ত অতিক্রম করবার চেষ্টা করতেই অনুমতিপত্র দেখতে চাইল পাকিস্তানী প্রহরী। অনুমতিপত্র আমার কাছে ছিল না ; এবং না থাকার একটা যুক্তি দর্শানোর জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি, সেই মুহূর্তে আকর্ণবিস্তৃত হাসি নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল অধিনায়ক, একজন জুনিয়র কমিশনড্ অফিসর। দু'জনেরই মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগে একই সঙ্গে কাজ করেছিলাম। এই কারণেই তার ব্যবহার ছিল অমন বন্ধুসুলভ। সীমান্তে পরীক্ষার ব্যবস্থাও বোধহয় বর্তমানের মতো এতো কঠোর ছিল না সে সময়ে। তাই পুরানো বন্ধু লেঃ কর্ণেল মুসাকে দেখতে যাচ্ছি শুনে কোন হৈ-চৈ না করে সীমান্ত পার করে দিল আমায়। আমার

কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয়েছিল তার। মূসা এবং আমি যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ তথ্য তার অজ্ঞাত ছিল না। অতএব, নিশ্চিন্ত মনে লাহোরের আঞ্চলিক সমর দপ্তরের (Lahore Area Headquarters) সীমানায় প্রবেশ করলাম। পাকিস্তানী প্রহরী কল্পনাও করতে পারলো না যে আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোক। কারণ, তখনকার দিনে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় সেনাবাহিনীরই পোষাক ছিল একই ধরনের। তাই, একই ধরনের পোষাক এবং পদমর্যাদার চিহ্ন আমার পরিধানে দেখে পাকিস্তানী অফিসর বলেই মনে করল বেচারা, এবং চট্‌পট্‌ একটা সামরিক সেলাম (Salute) দিয়ে বসলো। পর মুহূর্তেই মূসার দফ্‌তরে প্রবেশ করে মুখোমুখি দাঁড়ালাম তাঁর। আঞ্চলিক অধিনায়ক মেজর জেনারেল ইফ্‌তিকার খান্‌ বসে ছিলেন পাশের কামরাতেই। মূসা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকলেও বর্তমানে তিনি পাকিস্তান বাহিনীতে, এবং পাকিস্তান আমাদের সঙ্গে যুদ্ধরত। তাঁর কাছে যাতে না আসি সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন মূসা, অথচ সেই মুহূর্তে রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে লাহোরে তাঁর সামনে হাজির ছিলাম। মূসা দৃঢ়স্বরে জানালেন বিনা-অনুমতিতে পাকিস্তানে প্রবেশ করে আমি অন্যায় করেছি, এবং অবিলম্বে আমাকে ভারতে ফিরে যেতে হবে। ইচ্ছা করলেই তিনি আমায় গ্রেপ্তার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে একজন রক্ষীর সঙ্গে জীপে তুলে দিয়ে যথাশীঘ্র আত্তারির পরিবর্তে ফেরোজপুর[১২] চলে যেতে বললেন। আত্তা.রি এবং ফেরোজপুরের দূরত্ব ছিল অনেক, এবং দুটোই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। বাদানুবাদ করে কোন লাভ হতো না। নেহাৎ ভাগ্যবশতই ভালয় ভালয় ভারতে ফিরে এলাম।

দিন সাতেক পর বলদেব সিং আদেশ দিলেন পঞ্জাব সীমান্ত বরাবর দশহাজার লোকের এক অনিয়মিত গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। পাকিস্তানের তরফ থেকে আমাদের বিপদের আশঙ্কা ছিল বলেই এটার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অবিলম্বে কাজে লেগে গেলাম। প্রচুর সাহায্য করলেন আই. এন. এ.-খ্যাত জেনারেল মোহন সিং। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই বাহিনীকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করবার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পক্ষান্তরে, নিরস্ত্র একটা বাহিনী গড়ে তোলার কোন সার্থকতা আছে বলে আমার মনে হলো না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করবার

১২। ফেরোজপুরে একটা ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করছিলেন ব্রিগেডিয়ার কে. ওমরাও সিং।

জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি ঠিক সেই সময় নেহ্‌রু আমায় দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর মামলায় ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার। দু'দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর সামরিক উপদেষ্টারূপে লেক সাকসেসে রওনা হতে বললেন নেহ্‌রু। বললেল, কাশ্মীর যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে দেশের যে সেবা আমি করব, তার চাইতে অনেক বেশী করতে পারব রাষ্ট্রপুঞ্জে আমাদের প্রতিনিধিদলকে পরামর্শ দিয়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অতএব, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমাকে আকাশপথে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে হলো।

ওয়াশিংটন যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে (প্রায় তিন মাস হলো কাশ্মীরের যুদ্ধ চলছিল) আমাকে এবং এয়ার ভাইস মার্শাল এস. মুখার্জিকে এক সন্ধ্যায় স্বীয় বাসভবনে নেহ্‌রু ডেকে পাঠালেন। মুখার্জি এবং তাঁর মধ্যে সম্প্রতিতম এক আলোচনার কথা উল্লেখ করে আমায় বললেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু মাঝারি মিচেল-বম্বার (Mitchel bomber) জাতীয় উড়োজাহাজ কেনবার চেষ্টা করে দেখতে। ওয়াশিংটনে আমাদের রাষ্ট্রদূত আসিফ আলীর হাতে এই জটিল লেন-দেনের ভার না দিয়ে আমাকে কেন দেওয়া হলো সেটা আজ অবধি রহস্যাবৃত রয়ে গেছে আমার কাছে।

ওয়াশিংটনে ফিরে এ ব্যাপারে সরকারীভাবে কোন কথা-বার্তা চালাবার আগে দেখা করলাম লুই জনসনের[১৩] সঙ্গে। কারণ, সরকারীভাবে কিছু করতে গেলেই নানা দিক থেকে নানারকম চাপ আসতো। জনসন সাগ্রহে আমার প্রস্তাব শুনলেন। যুদ্ধের সময়ে মজুত করে রাখা এই বম্বারগুলো আমেরিকার ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছিল, এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সে সময় পাওয়াও যাচ্ছিল। জনসন ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তারই সুযোগে সেই উদ্বৃত্ত থেকে তৎক্ষণাৎ কিছু সংখ্যক উড়োজাহাজ আমাদের কাছে বিক্রীর ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। লেন-দেনের এই ব্যাপারটা না জানি কী ভাবে ষ্টেট-ডিপার্টমেণ্ট এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কানে পৌছে যায়। ফলে,

১৩। ১৯৪২ সালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বিশেষ দূত হিসেবে ইনি ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে জোর সমর্থন জানান। যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন জনসন, এবং পরবর্তীকালে সেখানকার প্রতিরক্ষা সচিব (Defence Secretary) হয়েছিলেন।

নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের নেতা ওয়ারেন অষ্টিন এবং বৃটিশ প্রতিনিধিদলের সামরিক উপদেষ্টা লর্ড ইসমে[১৪] অনতিবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। ইসমে বললেন, দুই দেশের অতীত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত যদি ব্রিটেনের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য চাইত তা' হলেই ভাল হতো। পক্ষান্তরে ওয়ারেন অষ্টিন জানতে চাইলেন, আমি অথবা আমাদের রাষ্ট্রদূত এই ব্যাপারে যে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে অগ্রসর হই নি, তার কোন বিশেষ কারণ রয়েছে কি না। জবাবে বললাম, আমলাতান্ত্রিক (Official Channel) পদ্ধতির মারফৎ কাজ এগোয় শ্লথগতিতে। অথচ আমাদের প্রয়োজন অবিলম্বে। তাই জানাশোনা লোকের মাধ্যমেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রয়োজনের সময় সকলেই এ রকম করে থাকে। অষ্টিন শুনলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন, লুই জনসনের সঙ্গে বেসরকারীভাবে যে লেন-দেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাকে অনিচ্ছার সঙ্গে নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হবেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার। কারণ, ন্যায় বিচারের দিক থেকে ভারত কিংবা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের প্রতিই পক্ষপাতমূলক আচরণ তাঁরা করতে পারেন না। জবাবে তর্ক তুললাম আমি। পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা কার্যতঃ যুদ্ধরত; কারণ পাকিস্তান আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। এমত অবস্থায় দেশকে চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই রয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম, নিয়মতান্ত্রিক চুক্তি (Protocol) না থাকার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে এ ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করা অত্যন্ত দুঃখজনক। অবশ্য ওয়ারেন অষ্টিনের মত পরিবর্তিত হল না তাতে, এবং বম্বারগুলোও আমরা পেলাম না।

বৈদেশিক দপ্তরের (Foreign Service) 'বাবু' হাকসার এবং আমি বিনিদ্র সারাটা রাত ধরে খেটে বহুবিধ বাস্তব তথ্যমূলক বিষয়বস্তু জোগাড় করে আয়েঙ্গারের উদ্বোধনী বক্তৃতা তৈরী করলাম। আয়েঙ্গার অবশ্য তার অনেক কিছুই কেটে-ছেঁটে বাদ দিলেন। শেষ পর্যন্ত যেটা রয়ে গেল সেটাকে বড় জোর একটা ভদ্রলোকের বক্তৃতা বলা যেতে পারে। নির্মম আন্তর্জাতিক আদালতের মনে কোন রেখাপাতই করতে পারলো না সে বক্তৃতা। পক্ষান্তরে,

১৪। ১৯৪৭-৪৮ সনে দিল্লীতে মাউণ্টব্যাটেনের দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা (Chief of Staff) ছিলেন ইসমে।

পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতা স্যার জাফরুল্লা খাঁ জবাবে যে বক্তৃতা দিলেন, তার ফল হলো মারাত্মক। বক্তব্যে অবশ্য অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল তাঁর। আয়েঙ্গারকে বললাম জোরালো যুক্তি দিয়ে সেগুলোকে খণ্ডন করতে। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। বললেন, কাদা ছোড়াছুড়ি করতে তিনি রাজী নন। বরং জাফরুল্লার শূন্যগর্ভ বাকপটুতাকে উপেক্ষা করে ভারতের মর্যাদা[১৫] অক্ষুন্ন রাখারই তিনি পক্ষপাতী।

নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার মুখ্য বক্তা গ্রোমিকোর[১৬] সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁরই বাসভবনে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের নিমন্ত্রণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল আমারই অনুরোধে। জিজ্ঞাসা করলাম কাশ্মীর প্রশ্নে রাশিয়ার তরফ থেকে তিনি আমাদের সমর্থন করবেন কি না। গ্রোমিকোর জবাবটা কিন্তু হেঁয়ালীর মতো লাগলো। বললেন, প্রায় দু'শ বছরের যোগাযোগ সত্ত্বেও বৃটিশের মতো একটা চতুর জাতি ভারতের সমস্যাগুলোকে ভাল করে বুঝতে পারে নি, এবং ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। পক্ষান্তরে, ভারতের সমস্যার সঙ্গে রাশিয়ার পরিচয় মাত্র সে দিনের। সে ক্ষেত্রে, কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে ব্রিটিশদের চাইতে বেশী কি-ই বা তাঁরা করতে পারেন। আর, তড়িঘড়ি এ ব্যাপারে কোন একটা পক্ষকে তাঁরা নিশ্চিতভাবে সমর্থন করবেন, এ আশাই বা কী ভাবে করা যেতে পারে। দীর্ঘ আলোচনার শুরু থেকেই অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন গ্রোমিকো। শেষে বললেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার প্রতিনিধি ভারতকে সমর্থন অথবা বিরোধিতা কিছুই করবেন না; এবং ভোটদানে বিরত থাকবেন। [কাশ্মীরের ব্যাপারে রাশিয়া কিংবা যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশই প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মত-ভিত্তি (Ground) সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না।]

কাশ্মীর সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করবার বহু চেষ্টা করেছিলেন শেখ আবদুল্লা। কিন্তু আয়েঙ্গার প্রতিবারই বাধা দিয়েছেন।

১৫। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো যখন নিরাপত্তা পরিষদে আমাদের গালি-গালাজ করছিলেন, তখনও উপযুক্ত কোন জবাব আমরা দেই নি। প্রতিবাদস্বরূপ কেবল বেরিয়ে এসেছিলাম সভা ছেড়ে।

১৬। শেষ মুহূর্তে স্বেচ্ছায় গ্রোমিকোর নিমন্ত্রণে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শেখ আবদুল্লা। সে সময় তিনি ছিলেন আমাদের দৃঢ় সমর্থক; এবং প্রতিনিধিদলের সঙ্গেই আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন।

শের-এ-কাশ্মীরকে অবশ্য আটকানো মুস্কিল ছিল। বাধা পেলেই মরিয়া হয়ে উঠতেন তিনি, এবং সুযোগ খুঁজতেন বিদ্রোহ করবার। ফেব্রুয়ারী মাসে সেই রকমই একটা সুযোগ এসে গেল। কোন রকম প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই দৃপ্ত এক ভাষণের মাধ্যমে কাশ্মীর প্রশ্নের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন শেখ আবদুল্লা। পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

কোন্ উদ্দেশ্যে আজ আপনারা আমাদের মুক্তির সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছেন? ১৯৪৬ সালে আমি যখন 'কাশ্মীর ছাড়ো' আওয়াজ তুলেছিলাম, তখন পাকিস্তানের মহান নেতা মহম্মদ আলী জিন্না সে আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, বলেছিলেন সে আন্দোলন নাকি ছিল সামান্য কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের, এবং সে ব্যাপারে যে তাঁর কিছুই করণীয় ছিল না সে কথাটাও ঘোষণা করতে ছাড়েন নি। এ সমস্ত কথা আমাদের মনে আছে···।

নেহ্রুর প্রসঙ্গে আবদুল্লা বললেন, 'নেহ্রুর মতো মহান একজন মানুষ যে তাঁকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছেন, এতে তিনি ধন্য। নেহ্রু হলেন একজন কাশ্মীরী। জলের চাইতে রক্তের সম্বন্ধের জোর অনেক বেশী।'

দিনের পর দিন মোকদ্দমা চললো। সবাই বক্তৃতা দিলেন অনেক, কিন্তু আমাদের বিরোধে মীমাংসা করতে পারলেন না কেউ। নিরাপত্তা পরিষদে চারমাস আমাদের থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে অনেককেই দেখেছি দু'মুখো নীতি অনুসরণ করতে, দেখেছি শক্তি গোষ্ঠীর নিকৃষ্টতম দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্র-পুঞ্জের সনদে অনেক নীতিকথা রয়েছে, কিন্তু মূল নীতিকেই অমান্য করা হলো। মোট ফল হলো এই যে আক্রমণকারী পাকিস্তানকে কাশ্মীর-ভূমি ত্যাগ করতে বলাই হলো না।

এসে গেল ১৯৪৮ সালের তিরিশ জানুয়ারী। ভোরের আলো তখন সবে ফুটতে শুরু করেছে। প্রভাতী নিদ্রার আবেশে মগ্ন রয়েছি আমার হোটেলের বিছানায়। এমন সময় জাগিয়ে তুলল টেলিফোনের ডাক। ইউনাইটেড প্রেস অফ আমেরিকার জনৈক সংবাদদাতা অপর প্রান্ত থেকে জানালেন এইমাত্র গান্ধীজী নিহত হয়েছেন দিল্লীতে। সারা বিশ্বকে প্রকম্পিত করে দিল সংবাদটুকু। আমাকেও। শান্তির দূত, যীশুখ্রীষ্টের পর সম্ভবতঃ মহত্তম

মানব, আমাদের জাতির জনক, ভারতের মুক্তিদাতা নিহত হলেন একজন স্বদেশবাসীরই হাতে।

আয়েঙ্গার অসুস্থ ছিলেন। হতচেতনকারী সংবাদটা শুনেই যেন পঙ্গু হয়ে গেলেন।

দুই মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করল নিরাপত্তা পরিষদ। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ মস্তক অবনত করল সবাই। যে নীতির উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল গান্ধীজীর, রাষ্ট্রপুঞ্জের নীতিও সেই একই। গান্ধীজীর মৃত্যু বিশ্বের অতগুলি জাতির প্রতিনিধিদের যেন নিঃসাড় করে দিল। সে দৃশ্য ছিল অপূর্ব, মহান।

মর্মান্তিক বেদনার স্রোতে প্লাবিত হয়ে গেল সারা ভারতবর্ষ। আবেগ-মথিত হৃদয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করল সবাই। অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবরুদ্ধ স্বরে নেহ্‌রু বললেন:

বন্ধু এবং সহকর্মীগণ! জীবন থেকে আজ আমাদের চলে গেছে আলোর রশ্মি। চারদিকে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। ভাষা আমার মূক হয়ে গেছে। জানি না কী বলবো, কী ভাবে বলবো···আমাদের প্রিয় নেতা আর নেই···।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য এর পর থেকেই পীড়াপীড়ি শুরু করলাম আমি। শেষ পর্যন্ত আয়েঙ্গার রাজী হলেন। একদিন এস্. এস্. কুইন এলিজাবেথ জাহাজে চড়েও বসলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে তারবার্তা (Cable) এল নেহ্‌রুর স্বনামধন্য মুখ্য একান্ত সচিব (Principal private secretary) এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গারের কাছ থেকে। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা আমাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আরও কয়েকটা দিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাই আমি। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার আর সুযোগই থাকল না। অগত্যা আরও কয়েকটা দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়লাম। সোজা ফিরে এলাম লেক সাকসেসে। এই সময়টুকুর মধ্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত জোগাড় করলাম কাশ্মীরের পথে দিল্লী যাবার অনুমতি।

এই অবসরে কাশ্মীর তথা সেখানকার কিছু কিছু ঘটনার কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাশ্মীরের আয়তন ৮৫,০০০ বর্গমাইল,

লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের উপর, এবং এর মধ্যে তিন ভাগ মুসলমান ও একভাগ হিন্দু। তুটো নগর, চল্লিশটা শহর এবং ন'হাজার গ্রাম রয়েছে এখানে। খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা চাষ-বাস।

ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে যাবার আগে ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৬৫ টি। ইংরেজদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ছিল তাদের উপর। স্থির হলো, এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে হয় ভারত নতুবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। এতদিন অবধি এই রাজ্যগুলির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল ভারতের। নতুন সংবিধানে স্থির হলো, যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য ভারতের সঙ্গে যোগ দেবে তারা ভারতের, এবং যারা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবে তারা পাকিস্তানের অংশরূপে গণ্য হবে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এই ব্যাপারে সঙ্কল্প স্থির করতে বিলম্ব করে, এবং ১৯৪৭ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের সঙ্গেই মধ্যবর্তীকালীন একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পন্ন করতে আগ্রহী হয়। এই স্থিতাবস্থা চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান সেই বছরেই কাশ্মীরে তেল, চিনি, কেরোসিন, লবণ এবং খাদ্যশস্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের অনাহারে রাখবার কৌশল অবলম্বন করলো। উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করা। কিন্তু প্রচেষ্টাটি যখন ব্যর্থ হলো, পাকিস্তান তখন অবলম্বন করলো অন্য এক পন্থা; যার ফলে এই ব্যাপারে সমস্ত আপোষ-মীমাংসার পথই বন্ধ হয়ে গেল। স্বীয় নিয়মিত বাহিনীর বহু লোককে 'অনুমতি' দিয়ে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয়দের উত্তেজিত তথা আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে মানকি শরীফের পীর ও পাক বাহিনীর নিয়মিত বাহিনীর পরিচালনায় লেলিয়ে দিল কাশ্মীর আক্রমণ করতে।[১৭] এই যুক্ত-বাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হলো 'জেনারেল তারিখ' ছদ্মনামে, ব্রিগেডিয়ার আকবর খানকে। ২১শে অক্টোবর প্রত্যুষে তারা মুজাফ্ফরাবাদ শহরে প্রবেশ করলো, এবং চালালো

১৭। পাকিস্তান যে এই দুষ্কার্যে সহযোগিতা তথা উপজাতীয় হানাদারদের সক্রিয় সাহায্য করেছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। হানাদারী আক্রমণের সময় কাশ্মীরে পাক-সৈনিকদের উপস্থিতির কথা পরে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান স্বীকার করে। সেই বছরের মে মাসে উরির যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম, এবং সেই প্রথম পাকিস্তান সীমান্ত বাহিনীর (Frontier Force Units) একজন নিয়মিত সৈনিক আমাদের হাতে ধরা পড়ে।

নির্বিচারে লুঠ-তরাজ এবং হত্যাকাণ্ড। রাজ্যের সেনাবাহিনীকে (State troops) আকস্মিক আক্রমণে পঙ্গু তথা শেষ করে ফেলা হলো। ২৩ তারিখে চিনারি এবং ২৪ তারিখে উরি পৌঁছে গেল হানাদারেরা। ২৭ তারিখের মধ্যে চলে এল রামপুর এবং বারামূলায়।[১৮] সেখানকার গীর্জাটিকে তছনছ করে লুঠ-তরাজ চালালো। সেণ্ট্ জোসেফ কনভেণ্টের সন্ন্যাসিনীদের করল ধর্ষণ এবং হত্যা। কর্ণেল ডাইক্‌স্ নামে এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক সস্ত্রীক এবং দু'টি সন্তান সহ অবসর যাপন করছিলেন। তাঁদেরও হত্যা করা হলো। তারপর লুঠ-তরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যাকাণ্ড চালাতে চালাতে বারামুলা থেকে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে চললো হানাদারেরা। স্ত্রীলোক, শিশু কিংবা অথর্ব কাউকেই রেহাই দিলো না। এই বর্বরোচিত অত্যাচার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুললো সারা কাশ্মীরকে; এবং আমাকেও, কারণ আমি কাশ্মীরের অধিবাসী। কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা তখন ছিলেন শেখ আবদুল্লা। হানাদারদের বিতাড়িত করবার জন্য ভারতের সাহায্য চাইতে এবং কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে তাঁরা বাধ্য করলেন মহারাজ হরি সিংকে। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবরের কথা। ভারতের বড়লাট এই আবেদন মঞ্জুর করলেন, এবং সেই তারিখ হতেই ভারতভুক্ত হয়ে কাশ্মীর হলো ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য। ভারতের অভিপ্রায় ছিল হানাদারদের সমূলে উচ্ছেদের পর আইন-শৃঙ্খলা ফিরে এলেই সেখানে গণভোট গ্রহণ করা হবে। সে কথাটাও মহারাজকে জানিয়ে দেওয়া হলো।[১৯] ভারত অতঃপর তাড়াহুড়া করে বিমানযোগে নিজের সৈন্যবাহিনীকে পাঠালো কাশ্মীরে। শ্রীনগর এবং তৎসংলগ্ন বিমান-অবতরণ ক্ষেত্রটির উপর হানাদারদের প্রচণ্ড আক্রমণ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। সেটাকে রোধ করা হলো। বারামুলা পুনরুদ্ধার করা হলো ৮ই নভেম্বর, এবং উরি ১১ই নভেম্বর তারিখে।

পাকিস্তানের তরফ থেকে প্রায়ই যুক্তি দেখানো হয় যে, তার সঙ্গে যোগ দেবার অভিপ্রায়েই কাশ্মীরের জনগণ মহারাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

১৮। হানাদারদের পৈশাচিক অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ বারামুলায় মোহম্মদ মকবুল শেরওয়ানী নামক জনৈক যুবকের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে এই যুবকটিকে তারা হত্যা করে।

১৯। সর্তটা কিন্তু আজ অবধি পালন করা হয় নি।

করেছিল। এটা যদি সত্যি হতো তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীনগর বিমান-বন্দরে অবতরণ করতে পারতো না, এবং কাশ্মীরীদেরই বিরুদ্ধে নিজেদের সুদীর্ঘ যোগাযোগ ব্যবস্থাও রক্ষা করতে পারতো না। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানী হানাদারেরাও সাদর অভ্যর্থনা লাভ করতো কাশ্মীরীদের কাছে। কিন্তু তা হয় নি। পরিবর্তে, কাশ্মীর-স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী তথা স্থানীয় কাশ্মীর মিলিশিয়ার কাছ থেকে তারা পেয়েছিল প্রচণ্ড প্রতিরোধ। হানাদারদের সাহায্য না দিতে ভারত বারংবার পাকিস্তানের কাছে আবেদন করেছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। পাকিস্তানের অভ্যন্তরস্থ হানাদারী ঘাঁটিগুলোর উপর কোনরকম আক্রমণের চেষ্টা ভারত করলেই শুরু হয়ে যেত সর্বাত্মক যুদ্ধ। (যেমন হয়েছিল ১৯৬৫ সালে)। তা' না ক'রে ভারত পাকিস্তানকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেয় যে, হানাদারদের নানারকম সাহায্য দেওয়া থেকে পাকিস্তান যদি বিরত না হয়, অথবা পাকিস্তানী এলাকা থেকে ভারতের উপর হানাদারদের আক্রমণ চালাতে দেওয়া হয়, তবে নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এর কোন জবাবই পাকিস্তান দেয় নি। অবশেষে নিরাপত্তা পরিষদে ভারত বিধিসম্মত অনুযোগ দাখিল করে।

[এই আক্রমণের সঙ্গে নিজের কোনরূপ সম্পর্কের কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে পাকিস্তান। নি 'পত্তা পরিষদও অবস্থার উন্নতিকল্পে উভয় পক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে নিরীহ একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভারত এবং পাকিস্তানে একটা কমিশনও প্রেরণ করে নি.রাপত্তা পরিষদ। এই কমিশন কাশ্মীরে উপস্থিত হয় ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে, এবং জেনে আশ্চর্য হয়, সেই বছরেরই মে মাস থেকে পাকিস্তানের নিয়মিত (Regular) সামরিক বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরে যুদ্ধরত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এর বহু পূর্ব থেকেই পাক-বাহিনী উপস্থিত ছিল জম্মু ও কাশ্মীরে। ভারত এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি স্যার ওয়েন ডিকসন্ পরে একবার বলেছিলেন :

শত্রুভাবাপন্ন দলগুলো কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রমণ ছিল আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী,

এবং পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনী কর্তৃক জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশও ছিল আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন।

এ ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য হলো জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানই[২০] আক্রমণকারী, এবং তাকে আক্রান্তভূমি পরিত্যাগ করতে হবে। অন্য সমস্ত যুক্তি-তর্কই এই প্রসঙ্গে অবান্তর।]

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে সেনাবাহিনীর সদর-দফ্‌তরে (Army Head Quarters) সমর-সচিব (Military Secretary) মেজর জেনারেল পি. এন. থাপারের সঙ্গে দেখা করলাম। থাপার জানালেন, জম্মু ও কাশ্মীরে কার্যরত (Operation) একটি পদাতিক সৈন্যবাহিনীর (Infantry Battalion) সেনাপতি হিসেবে আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। দিন দুই-তিন পর থাপার আবার জানালেন জম্মু ও কাশ্মীর সরকার তাঁদের মিলিশিয়া বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে বিশেষ করে আমারই নাম সুপারিশ করেছেন, এবং আমাদের প্রধান তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেই সুপারিশ মেনেও নিয়েছেন। থাপার আরও বললেন, অনেকগুলো অনিয়মিত পদাতিক মিলিশিয়া বাহিনী (Irregular Infantry Militia Battalions) নিয়ে গঠিত হলেও এর অধিনায়কত্ব (Command) নিয়মিত পদাতিক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্বের সমতুল্য বলেই পরিগণিত হবে। এই বন্দোবস্ত হতে রেহাই পাবার জন্য শেষ চেষ্টা হিসেবে নেহ্‌রুর সঙ্গে তাঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখা করলাম। পেশাদার একজন সৈনিকের পক্ষে পদাতিক সৈন্য-বাহিনীর সেনাপতিত্ব করার গুরুত্ব যে কতখানি তা বিশদভাবে ব্যাখ্যাও করলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর নেহ্‌রু ক্লান্ত ছিলেন। স্পষ্ট ভাষায় বললেন, সামরিক গুরুত্বের কথা যা-ই কিছু থাক না আমার মনের মধ্যে, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে, দেশের স্বার্থের খাতিরে মিলিশিয়া বাহিনীর জন্য কাশ্মীর সরকারের সাহায্যার্থে আমাকে পাঠানো প্রয়োজন। আমার

২০। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সতের বছর পর পাকিস্তানে প্রথম এবং পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাও হয়েছে সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্যে।

কোন যুক্তি-তর্কই কাজে লাগলো না, এবং ব্যাপারটার সেখানেই ইতি হলো।[২১]

নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করবার জন্য ২৫শে এপ্রিল তারিখে দিল্লী থেকে বিমানযোগে কাশ্মীর রওনা হলাম। জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত আমাদের সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে একই বিমানে যাচ্ছিলেন মেজর জেনারেল থিমায়া। দু'দিন পর থিমায়ার সঙ্গে পুঞ্চ পৌছুলাম। বিমানযোগে এখানে আসা সর্বদাই ছিল একটা কঠিন ব্যাপার। কারণ, একটা পাহাড়ী নদীর (নালা) উপর দিয়ে আশঙ্কাজনকভাবে মোড নিয়ে এবং অদূরবর্তী শত্রু ঘাঁটিগুলোর বিপজ্জনক সীমানা ঘেঁষে অতীব কুটিল এক পথ ধরে বিমান-গুলোকে অবতরণক্ষেত্রে পৌছতে হতো।

থিমায়া সংবাদ পেয়েছিলেন, যুদ্ধবাজ পাঠানেরা বিরাট সংখ্যায় পুঞ্চের সন্নিকটে এক 'জিরগা'য় (উপজাতীয় মন্ত্রণাসভায়)মিলিত হতে চলেছে। দিল্লীর সেনা এবং বিমান বাহিনীর সদর-দফ্তরে এই তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদটি পাঠিয়ে এই জমায়েতটির উপব বিমান আক্রমণ চালাতে অনুরোধ জানালেন থিমায়া। অনুরোধ পেয়েই সেনাবাহিনীর ভারতীয় প্রধান জেনারেল বুচার এবং পাকিস্তানী প্রধান জেনারেল গ্রেসী তৎক্ষণাৎ নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলেন। কি পরামর্শ হলো কেউ জানলো না। এই গোপন আলোচনার পর বুচার[২২] আমাদের সরকারকে সাবধান করে দিলেন, পাঠানদের উপর প্রস্তাবিত বিমান আক্রমণ করা হলে পাকিস্তান এই প্রতিশোধমূলক ঘটনাকে গুরুতরভাবে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। (অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পাকিস্তানের সঙ্গে তাসের বাজি ধবেছিলাম আমরা!)। অতএব, নিজেদের সুযোগ-সুবিধা মতো আমাদের উপর হামলা চালাবার জন্যই যেন এই পাঠানদের অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হলো, এবং আমরাও এই ব্যাপারে জেনারেল কারিয়াপ্পা অথবা জেনারেল থিমায়াব মতো নিজেদের কোন লোকের

২১। জাতীয় স্বার্থের বিবেচনায় পদাতিক বাহিনীর কর্তৃত্ব থেকে আমায় বঞ্চিত করার এরূপ ঘটনা বছর দেড়েকের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার ঘটলো।

২২। এই ব্যাপারে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবার জন্য থিমায়া নেহ্রুকে চাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। বুচারের যুক্তির অসারতা, এবং থিমায়ার যুক্তির বাস্তব সারবত্তা অনুধাবন করতে অপারগ হয়েই নেহ্রু বুচারের পক্ষপাতমূলক বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

কাছ থেকে পরামর্শ না নিয়ে, নিতে থাকলাম একজন বিদেশী জেনারেলের কাছ থেকে। [নেহ্‌রুর সঙ্গে সমসাময়িক এক আলোচনায় আমিও পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলোকে আক্রমণের প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে প্রসারিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। উপদেষ্টাগণ তাঁকে না কি নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বসে পড়বে, কারণ ঘুণে-ধরা আর্থিক অবস্থা নিয়ে লড়াইয়ের এই বোঝা বেশী দিন সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। মনে আছে, জবাবে নেহ্‌রুকে আমি বলেছিলাম, অর্থের অভাবে পাকিস্তান যাতে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় সে-জন্য বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর কেউ না কেউ তার পাশে এসে দাঁড়াবে। যত ক্ষুদ্র দেশই হোক না কেন, সুবিধাবাদী শক্তিগুলো কখনই তাকে অর্থাভাবে মরতে দেবে না। প্রয়োজনের সময় কোন না কোন দেশ নিজের স্বার্থেই এগিয়ে আসবে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে পাকিস্তান দুর্বল তো হয়ই নি, বরং যতো দিন গেছে ততোই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।]

সেদিন উরির পথে থিমায়ার জীপ চালাচ্ছিলাম আমি। বাতাসে ছিল শীতের তীব্রতা এবং চারপাশে ছিল পাইনের সৌরভ। মাহুরা নামে একটি জায়গায় পৌঁছুতেই স্থানীয় সেনাপতি সতর্ক করে দিলেন, নদীর অপর পার থেকে প্রচ্ছন্ন শত্রুপক্ষ মাহুরা-উরি পথের উপর গুলি চালাচ্ছে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে অনুরূপ অবস্থায় প্রবীণ সেনাপতিরা এখানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সাঁজোয়া গাড়ীতেই গমনাগমন করে থাকেন। কিন্তু থিমায়ার অভিমত ছিল সাঁজোয়া গাড়ীর অভ্যন্তরে আশ্রয় না নিয়ে সৈনিকদের চোখের সামনে থেকেই সেনাপতির উচিত রণাঙ্গন পরিভ্রমণ করা। অতএব, জীপে করেই আবার যাত্রা শুরু হলো আমাদের। চালক আমি। আঁকা-বাঁকা এই চড়াইয়ের পথে যখন একটা বাঁক নিচ্ছি, সেই মুহূর্তে অদূরস্থিত একটি মাদ্রাজ বাহিনীর জনৈক দক্ষিণ-ভারতীয় সৈনিক ছুটতে ছুটতে সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। অবিন্যস্ত মাথায় তার টুপী ছিল না। বললো, একটু আগে তার সেনাপতি লে. কর্ণেল মেনন শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হয়েছেন। ঘটনার যে বিবরণ লোকটি দিল তাতে জানা গেল, সেইদিন প্রত্যুষে একজন 'বন্ধু ভাবাপন্ন' বকরওয়াল (যাযাবর রাখাল) এসে লেফটনান্ট কর্ণেল মেননকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে এবং জানায়,

পাকিস্তানীরা রাতারাতি তাঁর সেনা দফ্তরের (Battalion Headquarters) কাছাকাছি একটা স্থান অবধি অনুপ্রবেশ করেছে। স্থানটিকে দেখিয়ে দিতেও সে রাজী হয়। লোকটি আসলে ছিল শত্রুপক্ষের একজন চর। মেনন ছিলেন যেমন সাহসী তেমনি অনুসন্ধিৎসু। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংবাদদাতাকে অনুসরণ করতে রাজি হয়ে শত্রুর মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েন। কয়েক শত গজ মাত্র বোধ হয় গিয়েছিলেন, এমন সময় সেই বকরওয়াল নিজে একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে মেননকে ইঙ্গিতে এগিয়ে যেতে বলে। বেচারা মেনন কোনরকম সন্দেহ না করে সোজা এগিয়ে যান শত্রুর ফাঁদে এবং অনুচরবর্গ সহ নিহত হন। বিবরণদাতাই ছিল একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। ঘটনাটা শুনেই জেনারেল থিমায়া এবং আমি উভয়েই লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে পড়লাম এবং ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে গেলাম। কাজটা বোধহয় অদূরদর্শীর মতোই হয়েছিল, কারণ অতর্কিত আক্রমণ আমাদের উপরেও হতে পারতো। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিটি কাজই কিছু যুক্তিমাফিক করা যায় না। অধীনস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর স্থানটি দেখবার তথা যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যদের সামনে উপযুক্ত একটা আদর্শ স্থাপন করবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন থিমায়া।

শ্রীনগরে প্রথম উপস্থিত হয়ে যেদিন মিলিশিয়া বাহিনীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করছি, সেদিন শেখ আবদুল্লা উক্ত বাহিনীর এক বিশাল সমাবেশের (Rally) আয়োজন করেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে বাহিনীর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দেন। কাশ্মীরে পাক আক্রমণের সময় কীভাবে তাড়াহুড়ার মধ্যে এই বাহিনী গড়ে তোলা হয় সেই ঘটনা বিবৃত করে কাশ্মীরীদের বহুবিধ বীরত্ব-কাহিনীর কথা বলেন শেখ আবদুল্লা, এবং এই প্রসঙ্গে জনৈক যদুর নামও উল্লেখ করেন। এই ব্যক্তি টিথওয়ালের কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল। আমি দেখলাম, নিয়মানুবর্তিতা, রণকৌশল এবং লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি ব্যাপারে এই বাহিনীকে ঢেলে সাজানো দরকার। সেই অনুসারে বাহিনীর সামরিক মান উন্নয়নের জন্য যত্ন নিলাম। [এ কথা অবশ্যই স্বীকার করবো যে, সঙ্কট-মুহূর্তে হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাই দিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় বাহিনীটি গড়ে তুলে কাশ্মীর নেতারা উল্লেখযোগ্য প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছিলেন।]

ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ (Army High Command) শত্রুপক্ষের উপর এক দ্বিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেনঃ একটি উরি এবং

অন্যটি হাণ্ডওয়ারার কাছে। উদ্দেশ্য ছিল উভয় অভিযানই ডোমেল-মুজাফ্‌ফরাবাদের কাছে গিয়ে মিলিত হবে। এই অভিযানে আমাকে মিলিশিয়া পদাতিক বাহিনীর (Militia Infantry) দু'টি দল (Battalion) পাঠাতে বলা হলো। জরুরী প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে দু'টি বাহিনী (Unit) গঠনের কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু দেখলাম, দৈহিক সামর্থ্য, অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার এবং ছোট-খাট রণকৌশলের ব্যাপারে তাদের অনেকেরই আরও উৎকর্ষতা লাভ করা দরকার। তথাপি একদিন কাজ আরম্ভ করতেই হলো তাদের। একটি দল যোগ দিলো উরিতে ১৬১নং ব্রিগেডের সঙ্গে, এবং অন্যটি হাণ্ডওয়ারায় ১৬৩নং ব্রিগেডের সঙ্গে।

থিমায়া এবং আমি নাগি[২৩] চৌকিতে (Picquet) উপস্থিত হলাম। একটা শৈল-শিখরের (Spur) উপরে অবস্থিত এই চৌকিটি ছিল ১৬৩নং ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার (বর্তমান লেঃ জেনারেল) হরবক্‌স্ সিং-এর অধীনে। শৈল শিখরটির অর্ধেক ছিল আমাদের অধীনে এবং বাকীটা ছিল পাকিস্তানের। অনেক কষ্টে পাহাড়ের উপর আরোহণ করে শষ্প হীন (dead ground) কতকগুলো স্থান পার হয়ে এলাম। জায়গাগুলোর উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করছিল শত্রুরা।

১৬ই মে তারিখে হাণ্ডওয়ারায় আক্রমণ শুরু করা হয়। তার আগের দিন নাজির নামে জনৈক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যতদূর সম্ভব শত্রুপক্ষের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির খবরাখবর জোগাড় করবার উদ্দেশ্যে তাদের অগ্রবর্তী প্রতিরোধ ঘাঁটিগুলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। লোকটি আগে ছিল বনবিভাগের একজন অফিসর। বর্তমানে কাজ করছিল সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রাধীনে। সাঙ্ঘাতিক পরিবেশের মধ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করে পরের দিন বিজয়ীর বেশে ফিরে এল নাজির। নিয়ে এল শত্রুপক্ষের অমূল্য কতগুলো গোপন সংবাদ। হরবক্‌স্ সিং সঙ্গে সঙ্গে ১৬৩নং ব্রিগেডের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন এবং শত্রুবাহিনীকে হটিয়ে দিলেন টিথোয়ালে। আমার মিলিশিয়া বাহিনীর একটা দল (battalion) এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল। তাই ১৬ এবং ১৭ তারিখের উল্লিখিত আক্রমণের সময় আমি হরবক্‌স্ সিং

২৩। নাগি ছিলেন একজন জুনিয়র কমিশন্‌ড্ অফিসর। বেশীদিন আগের কথা নয়, এই চৌকিটিকে তিনি সুদৃঢ়ভাবে আগলে রাখেন। তাঁরই নামানুসারে চৌকিটির নামকরণ করা হয়।

তথা সৈন্যদলের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সৈন্যচলাচল এবং সরবরাহ-ব্যবস্থা সুষ্ঠুতর হলে আরও বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারতেন হরবক্স্ সিং।

১৮ই মে আমি উরি পৌঁছুলাম। পরিকল্পনাটা ছিল এই রকম। উরির বিপরীত দিকে ইসলামাবাদের উচ্চ স্থানগুলো ছিল শত্রুর অধিকারে। সেগুলো দখল করবার ভার দেওয়া হলো ১৬১নং ব্রিগেডকে। দখল করবার পর তারা এগিয়ে যাবে ডোমেলের দিকে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছিল যে, ইসলামাবাদের সর্বোচ্চ অবস্থানগুলোকে (Positions) শত্রুরা প্রকৃতপক্ষে পরিত্যাগ করেছে, এবং সেগুলোকে অধিকারে রাখতে তারা বিশেষ আগ্রহী নয়। বিপরীত দিকের ক্রমাবনত এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন তথা উষ্ণ উচ্চতায় তারা নেমে যায় রাত্রি অতিবাহিত করতে। অতএব, স্থির হলো, রাত্রিবেলা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এই জায়গাগুলোকে দখল করে নিতে হবে। ২নং ডোগরা বাহিনীর উপর ভার দেওয়া হলো এই কাজের।

পরিকল্পিত আক্রমণের পূর্বদিন আমি[২৪] উরি পৌঁছিয়েছিলাম। সেই দিনই শত্রুর মর্টার এবং কামানের গোলাবর্ষণের মুখে পড়ে যায় আমাদের লোকেরা। ক্ষয়-ক্ষতিও হয় প্রচুর। 'দুর্গ' নামে অভিহিত একটা এলাকা থেকে আক্রমণটা আসছিল। সঠিক স্থানটা নিরূপণ করতে গিয়ে ব্রিগেড অধিনায়ক এবং আমি দু'জনেই পড়ে যাই সেই গোলাবর্ষণের মুখে, এবং মাটিতে শায়িত অবস্থায় গোলাবর্ষণের কিছুটা তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করি। আক্রমণের নির্ধারিত দিনটিতে ডোগরা বাহিনীই ছিল নাটকের নায়ক। উরি সেতুর কাছে নিঃশব্দে একত্রিত হলো তারা। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দেখলো ঘড়ির দিকে। সূচীশব্দ স্তব্ধতা এবং উত্তেজনার ভেতর দিয়ে সময় চলে যাচ্ছিল। রাত দশটায় আক্রমণের সময় ঠিক করা হয়েছিল। ঘড়িতে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ চরণে, চুপিসারে তারা বিন্যাস-স্থল (Forming up place) পার হয়ে বেরিয়ে এল এবং ইসলামাবাদের বিশাল-বিস্তৃত আরোহ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলো। পরিকল্পনা অনুসারে অতি দ্রুত আরোহণ করে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই শিখরগুলোতে পৌঁছে অজ্ঞাতসারে ঘিরে ফেলবার কথা ছিল শত্রুদের। কিন্তু যে কারণেই হোক, হামাগুড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে উঠতে বেশী সময় লেগে গেল। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করে

২৪। এখানেও আমার মিলিশিয়া বাহিনীর একটা দল ছিল। তাদের যুদ্ধ-কৌশল দেখার তথা তাদের সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্যে এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে যাচ্ছিলাম।

শত্রুপক্ষ গোপনে উপরে উঠে গেছে এবং উপর থেকে আমাদের অগ্নিস্রাবী অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। ফলে, লক্ষ্যস্থল অধিকার করবার পরিবর্তে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো ডোগরারা। অবশেষে অবস্থা আয়ত্বে আনতে ৬/৬নং রাজপুতানা রাইফেল বাহিনীকে পাঠাতে বাধ্য হলেন ব্রিগেড অধিনায়ক। ইসলামাবাদের লক্ষ্যস্থলগুলো অধিকার করতে যদি এই বিলম্ব না হতো এবং পূর্ব-পরিকল্পনা মতো আক্রমণটাকে চালান যেত, তা'হলে শত্রুপক্ষ বাধ্য হতো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে এবং আমরাও অনায়াসে ডোমেল অধিকার করে নিতে পারতাম। কিন্তু এখন আমাদের গতিপ্রকৃতি অনুমান করে পরিকল্পনাটাকে তারা বানচাল করে তো দিলই, উপরন্তু আগাগোড়া পথটিতে নিজেদের অবস্থা সুসংহত করবারও সময় পেয়ে গেল।

ঘটনার দিন, ব্রিগেড অধিনায়ক এবং আমি সারাটা রাত রক্ত-জমানো ঠাণ্ডায় অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে বসে ২নং ডোগরা বাহিনীর আক্রমণের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহদোলায় দুলছিলাম। বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য রাজপুতানা রাইফেলস্‌কে তখনও পাঠানো হয় নি। ডোগরা বাহিনীর সেনাপতির কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে সংবাদ পাবার আশা করছি। তিনি কিন্তু সে সময় নিজের বাহিনীর কাছ থেকে বহুদূরে পথ আঁকড়ে পড়ে ছিলেন। অতএব, আক্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাঠানোই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই অবস্থাতেই হাজীপীর গিরিপথের অভিমুখে অসংখ্য আলোর বিন্দু যেতে দেখলাম আমরা। সব কিছু যেন আরও গুলিয়ে গেল। শত্রুপক্ষ কি পশ্চাৎ কিংবা পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ করতে আসছে আমাদের? অথবা, সরে যাচ্ছে অন্য কোন জায়গায়? পরে আবিষ্কার করেছিলাম, আমাদের মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই কৌশলটা অবলম্বন করেছিল তারা।

পরবর্তী দিন তিনেক ধরে তুমুল লড়াইয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম আমি। আগাগোড়া প্রধান সড়কে শত্রুপক্ষ শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসলো। সেদিন, তাদের প্রবল গুলিবর্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন একটা টিলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি এবং লেঃ কর্ণেল (বর্তমানে মেজর জেনারেল) 'স্প্যারো' রাজীন্দর সিং। এমন সময় ব্রিগেড অধিনায়কের খোঁজে এসে উপস্থিত হলেন গোর্খা বাহিনীর লেঃ কর্ণেল ওবেরয়। থিমায়ার দফতর থেকে অধিনায়কের নামে জরুরী একটা সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ব্রিগেডিয়ার সেন সে সময় নিকটবর্তী একটা কুঁড়েঘরেই ছিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের মেসিনগানের গুলির মুখে

অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সে কথা জানিয়ে সবাই একত্রে যাবার উদ্দেশ্যে ওবেরয়কে একটু অপেক্ষা করতে বললাম। তিনি কিন্তু আমাদের এই সতর্কতাকে বিদ্রূপ করে এগিয়ে গেলেন। বাহাদুরী দেখাবার ঝোঁকে রাজীন্দর সিং এবং আমি উভয়েই বিপদের কথা বিস্মৃত হয়ে পা বাড়ালাম সামনের দিকে। রাস্তা দিয়ে কয়েক গজ মাত্র বোধ হয় আমরা গেছি এমন সময় সাঁ সাঁ শব্দ তুলে দমকা এক ঝাঁক মেসিনগানের গুলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলাম। শিলাবৃষ্টির মতো আসছিল বুলেটগুলো। এড়াবার জন্য চক্ষের পলকে মাটির উপর শুয়ে পড়লাম। সেই অবস্থায় দুঃসাহসী ওবেরয় দেখলেন পূর্বাহ্ণে তাঁকে বৃথা সতর্ক করা হয় নি।

৭নং শিখ বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ২১শে মে রাত আটটায় সড়কের বাঁ দিক থেকে অগ্রসর হয়ে একটা নির্দিষ্ট চূড়া দখল করতে। কিন্তু প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মুখে বিশেষ সুবিধা করতে পারল না তারা। আমাদের প্রধান শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল সড়কটির উপর। সেখানেও তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো। দক্ষিণ দিকের ভার ছিল কুমাওন বাহিনীর উপর। লেঃ কর্ণেল (বর্তমানে লেঃ জেনারেল) এম. এম. খান্নার অকুতোভয় পরিচালনায় তারা অবশ্য সন্তোষজনক ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু থামতে হলো তাদের, নতুবা মধ্যের ব্যবধান বেশী হবার দরুন সংযোগ এবং সরবরাহ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়তো। প্রকৃতপক্ষে সামান্য আর কিছুটা ব্যর্থ সংগ্রামের পর সম্পূর্ণ ব্রিগেডটাই নিশ্চল হয়ে পড়লো, এবং উরি-ডোমেল সড়কের ৫৮ মাইল-নির্দেশক পাথরের অদূরেই স্তব্ধ হয়ে গেল আমাদের অগ্রগতি।

ডোমেল অধিকার করতে দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছিলেন থিমায়া। নিজে তিনি ছিলেন একজন উপযুক্ত সেনানায়ক। অধীনস্থ কয়েকজন সেনানায়ক দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রাম চালানো সত্ত্বেও অভীপ্সিত পুরস্কার লাভ করতে তিনি ব্যর্থ হলেন।

লেহ নগরীতে অবস্থিত আমাদের বাহিনীর নায়ক (Garrison Commander) লেঃ কর্ণেল পৃথ্বীচাঁদের কাছ থেকে আগষ্ট মাসে একটা ব্যাকুল তার-বার্তা পাওয়া গেল। বক্তব্য ছিল, কর্তৃপক্ষ যদিও তাঁকে শেষ

রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন, তথাপি তিনি জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে, দৃঢ় সংকল্প থাকা সত্ত্বেও সেই অনুযায়ী কিছু করবার সামর্থ তাঁর নেই। সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সৈন্য-সংখ্যা, গোলাবারুদ, খাদ্যসামগ্রী এবং পোষাক-পরিচ্ছদের অভাব যদি পূরণ করা না হয় তবে শত্রুর অত্যধিক চাপের মুখে বেশীদিন লেহ নগরীকে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। এই ধরনের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা শুনলে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সর্বদাই সহানুভূতিপরায়ণ হয়ে উঠতেন থিমায়া। তার-বার্তাটি থিমায়ার হাতে পৌছুবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য একটি ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। বার্তাটি তিনি আমায় পড়ে শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে লেহতে গিয়ে সেখানকাব প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবার অভিপ্রায় জানালাম। থিমায়া রাজী হলেন, এবং পরের দিন ভোরের বিমানেই আমি লেহ রওনা হয়ে গেলাম। সেখানে যাবার বিমানপথটি জোজি-লা গিরিবর্ত্মের উপর দিয়ে গেছে। জোজি-লা তখন পর্যন্ত ছিল শত্রুপক্ষের অধিকারে। আমাদের ডাকোটা বিমানখানা যখন এই গিরিবর্ত্মের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে শত্রুর মেশিনগান গর্জন করে উঠল। আঘাত লাগল বিমানের একটি পাখায়। কিন্তু সাহসী বিমানচালক কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের নিরাপদে নামিয়ে দিল লেহতে।

লদাখের রাজধানী লেহ'র উচ্চতা হলো ১১,৫০০ ফুট। চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে ১৬,০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত ছিল আমাদের চৌকিগুলো। যে সময়ের কথা বলছি তখন লেহ-তে সাময়িক বিরতির সময় আমাদের বিমান-গুলির ইঞ্জিন কখনই বন্ধ করা হতো না, এবং পনের মিনিটের মধ্যেই তারা ফিরে যেত শ্রীনগরে। কারণ, ইঞ্জিন বন্ধ করলেই ঠাণ্ডায় জমে যাবার আশঙ্কা থাকতো।

লেহ-তে পৌছেই লেঃ কর্ণেল পৃথ্বীচাঁদের সঙ্গে দেখা করলাম। অকুতোভয় এবং কুশলী এই সৈনিক বিগত শীতকালে অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ লেহ দখল করে নিয়েছিলেন। সেখানে শত্রুপক্ষের ১,৩০০ সৈন্যের তুলনায় আমাদের ছিল মাত্র ৪০০। তাদের মধ্যে ছিল ২।৪ নং গোর্খা বাহিনীর দুটো দল (Company), এবং পাকিস্তান ও কারগিল থেকে সরিয়ে আনা বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীর মিলিশিয়া বাহিনীর অবশিষ্টাংশ।

সরবরাহ তথা পোষাক-পরিচ্ছদের নিদারুণ অভাব ছিল তাদের। এই উচ্চতায় রান্না করা অথবা জল ফোটান একটা সমস্যা। মাসের পর মাস ধরে কোন চিঠি-পত্র না পেয়ে পরিবারবর্গের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সৈনিকরা। চিকিৎসার সুযোগ ছিল না। ওষুধের অভাবে ক্ষত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। তবু, এই নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত শৌর্য এবং বীরত্বের উদাহরণের অভাব হয় নি।

২।৮ নং গোর্খা বাহিনীর একটা দলের (Company) নায়ক মেজর হরিচাঁদের সঙ্গেও দেখা করলাম। নির্ভীক এই সৈনিকের সামরিক কৃতিত্ব ছিল একাধিক। লেহ-তে অবস্থিত আমাদের বাহিনীর (Garrison) ভাণ্ডারে ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র এবং সামান্য কিছু গোলাগুলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পক্ষান্তরে, শত্রুরা একখানা ৩·৭ ইঞ্চি হাউট্‌জার কামান টেনে এনে বসিয়েছিল সুবিধামত একটা জায়গায়। মেজর হরিচাঁদ সেটাকে নিষ্ক্রিয় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। অসতর্ক শত্রুপক্ষকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে কামানটিকে নষ্ট করে ফেললেন তিনি, এবং পার্শ্ববর্তী আশ্রয়স্থলে নিদ্রামগ্ন গোলন্দাজদের নিহত করলেন। অসমসাহসিক এই কাজটি ছাড়াও আরও অনেক কৃতিত্ব ছিল হরিচাঁদের। যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে তিনি কাজ করেছিলেন তা আমি স্বচক্ষেই দেখলাম। সেই সমস্ত উল্লেখ করে পরে তাঁকে মহাবীর-চক্র দেবার সুপারিশ করলাম জেনারেল থিমায়ার কাছে। জেনারেল থিমায়াও সেই সুপারিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্থন করে পাঠালেন। যথা সময়ে হরিচাঁদকে মহাবীর-চক্র দেওয়া হয়েছিল।

লেহ-র প্রায় ১২ মাইল দূরে খারু নামক একটা সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটিতে ছিলেন সুবেদার ভীমচাঁদ। তাঁর সঙ্গেও দেখা করলাম। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাঁকে নিজেদের রক্ষাকর্তা বলে মনে করতো। কারণ, শত্রুর অনেক আক্রমণ থেকে তিনি তাদের গ্রামগুলোকে রক্ষা করেছিলেন। একদিন খবর এল, দুটি শিশুসন্তান রেখে তাঁর স্ত্রী গ্রামের বাড়ীতে মারা গেছেন। সংবাদটা যেন মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল তাঁর। পারিবারিক সমস্যাগুলোর একটা সুরাহা করার জন্য তিনি কয়েকদিনের ছুটি প্রার্থনা করলেন। ছুটি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে গেল কিন্তু মুস্কিল বাধলো অন্য দিক থেকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই খারুর অধিবাসীরা তাদের রক্ষাকর্তাকে দল বেঁধে ঘিরে ধরে যাত্রা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করতে লাগল। তাদের আশঙ্কা ছিল

শত্রুপক্ষ আবার আক্রমণ করবে, এবং তিনি ছাড়া আর কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলেন ভীমচাঁদ। একদিকে মাতৃহারা সন্তান, অন্যদিকে চরম সঙ্কট মুহূর্তে নিজের ঘাঁটিতে উপস্থিত থেকে এতগুলো নিরীহ মানুষকে রক্ষা করবার দায়িত্ব। অনেক চিন্তা করলেন ভীমচাঁদ। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠাই জয়ী হলো। গভীর হৃদয়াবেগকে চেপে রেখে স্থির করলেন আরও কিছুদিনের জন্য ঘাঁটি আগলে থাকতেই থেকে যাবেন। এবং, আসন্ন যুদ্ধে মুগ্ধ ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন তিনি। এই কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অন্যান্য বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে বীরচক্র সম্মানে ভূষিত করতে সুপারিশ করেছিলাম। সে সুপারিশও যথাসময়ে রক্ষা করা হয়।

অবরুদ্ধ এই নগররক্ষী-বাহিনীর (Garrison) সঙ্গে কয়েকদিন অবস্থান করে তাদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তথা সেই পরিস্থিতিকে অসীম সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করবার প্রয়াস দেখে, ১৯নং ডিভিসনের সদর-দফ্‌তরে বিমানযোগে ফিরে এলাম, এবং মেজর জেনারেল থিমায়ার কাছে সবিস্তারে আমার বিবরণ পেশ করলাম।

কতগুলো বকরওয়াল রামবানের অদূরস্থিত সম্বল গ্রাম থেকে সীতা এবং সুখন্ত নামে দু'টি ডোগরা যুবতীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেই সময় লেঃ কর্ণেল রণবীর সিং, এম. সি. ছিলেন বানিহালের নিকটস্থিত একটি রাজপুত বাহিনীর সেনাপতি। যুবতী দু'টির পিতা তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাল। দুর্বল-ত্রাণ মনোভাবের প্রেরণায় (Chivalrous) তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে উঠলেন রণবীর সিং। যুবতী দু'টিকে যেখান থেকেই হোক উদ্ধার করে আনবার জন্য কয়েকজন সৈনিককে পাঠিয়ে দিলেন। অনুসন্ধান কার্য চালাবার সময় সশস্ত্র বকরওয়ালদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে গেল, এবং যুবতী দু'টিকে উদ্ধারের পরিবর্তে নিজেরাই হলো বন্দী। অতঃপর যথোচিত তদন্ত করে সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ চেয়ে পাঠানো হলো দিল্লী থেকে, এবং তদন্তকারী আদালতের সভাপতি নিযুক্ত হলাম আমি। কয়েকজন সাক্ষীর কোন হদিসই পাওয়া যাচ্ছিল না। শেখ আবদুল্লাও কোনরকম সহযোগিতা করছিলেন না আমাদের সঙ্গে। বরং ঘটনাটি নিয়ে একটি রাজনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। পদত্যাগ করবার হুমকি দিলেম নেহ্‌রুকে, এবং সতর্ক করে দিলেন, ভারতীয় বাহিনীর

সংশ্লিষ্ট দলটির বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হ'লে কাশ্মীরের জনগণের উপর প্রতিক্রিয়া হবে গুরুতর। (অভিযোগগুলোর একটিও কিন্তু প্রমাণিত হয় নি।) সুবিধা অনুযায়ী এই ধরনের যুক্তি-তর্কের অবতারণা প্রায়ই করতেন শেখ আবদুল্লা। তৎসত্ত্বেও তদন্তের কাজ যথারীতি চালিয়ে গেলেন ভারত সরকার।

অভিযোগ করা হয়েছিল, যুবতী দু'টিকে তাদের গ্রাম থেকে অপহরণ করে পীরপাঞ্চাল পাহাড়ের উপর দিয়ে পদব্রজে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং বিগত কয়েক মাসের মধ্যে একাধিক বকরওয়ালের সঙ্গে তাদের বিবাহ দেওয়া হয়। আমি আরও শুনেছিলাম শম্ভুনাথ নামে জনৈক ব্যক্তিকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিলেন আবদুল্লা; এবং সেই সময় লোকটি শ্রীনগরেই বন্দী ছিল। তখনকার দিনে স্বীয় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে অসমর্থ হলে, শেখ আবদুল্লা তাদের বিরুদ্ধে আনতেন রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের[২৫] কর্মী হবার অভিযোগ। তারপব 'ধর্মনিরপেক্ষতার' (Secular) দোহাই দিয়ে শাস্তি দিতেন তাদের। শম্ভুনাথকে অবশেষে সাক্ষী হিসেবে আমাদের সামনে হাজির করবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। দুর্দশার কাহিনী শুনলাম তার। বেচারা 'ন্যাশনাল কনফারেন্সের' ভেরীনাগ শাখার সভাপতি ছিল। সাম্প্রতিক একটা দাঙ্গার তদন্তের ব্যাপারে কয়েকজন ভারতীয় সৈনিকের পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করার দরুন হঠাৎ একদিন তার 'গুরুত্ব' কমে যায়, এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের কর্মী হবার অভিযোগ দায়ের করে তাকে গ্রেপ্তার করে বেড়ি পরা অবস্থায় খালি পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কাল্পনিক এবং মিথ্যা কতগুলো অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে অমানুষিক প্রহারও করা হয়েছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রহারের গভীর দাগগুলোও শম্ভুনাথ দেখাল আমাকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো কাশ্মীর যেন মধ্যযুগে ফিরে গেছে। ঘটনাটা বেসরকারীভাবে সর্দার প্যাটেলকে জানালাম। অবশেষে রেহাই পেল শম্ভুনাথ। কিন্তু জীবনহানির আশঙ্কায় কাশ্মীরে থাকতে ভরসা পেল না বেচারা। অগত্যা দিল্লীর কাছে একটা কারখানায় চাকরী জোগাড় করে দিয়ে একদিন সামরিক লরীতে চুপিসারে কাশ্মীর থেকে তাকে সরিয়ে দিলাম। তারপর ঘটনাটা সম্বন্ধে একটা জ্বালাময়ী বিবরণ লিখে দাখিল করে

২৫। মুসলীম লীগের অনুরূপ একটি সংস্থা

দিলাম কর্তৃপক্ষের কাছে। নিয়মমাফিক বহু দপ্তর ঘুরে অবশেষে সেটা পৌঁছোয় ভারত সরকারের হাতে। এদিকে খবর পেলাম, জেনারেল বুচারের কাছে আবদুল্লা সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। বুচার আমার বিবরণ তথা সুপারিশগুলোকে অগ্রাহ্য করলেন। আমাদের রাজপুত সৈনিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের কৈফিয়তও তলব করে বসলেন। সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে লোকগুলো অবশ্য পরে ছাড়া পেয়ে যায়। আবদুল্লার তুষ্টির জন্য বুচার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করারও চেষ্টা করেছিলেন রাজপুত বাহিনীর সেনাপতি লেঃ কর্ণেল রণবীর সিং, এম. সি. এবং ব্রিগেড অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার (পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল) বিক্রম সিং-এর বিরুদ্ধে।

ভারতের প্রধান সেনাপতিরূপে জেনারেল বুচারের নিয়োগ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কেউই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নি। লকহার্ট এবং রাসেলের মতো প্রখ্যাত ব্রিটিশ সেনাপতিদের এই পদে নিয়োগ করা হয় নি সম্ভবতঃ তাঁরা স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং স্পষ্টবক্তা ছিলেন বলে। পক্ষান্তরে, বুচারের সামরিক পারদর্শীতা ছিল সাধারণ শ্রেণীর এবং কর্মজীবনে বিশেষ কোন সেনাপতির কাজও তিনি করেন নি।

একটা মন্ত্রণাসভায় যোগ দেবার জন্য কাশ্মীর থেকে দিল্লী এসেছিলাম। নেহ্‌রুর সঙ্গে প্রাতরাশের অবসরে সাধারণ কয়েকটা কথা-বার্তার পর আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে অস্বস্তিকর (delicate) একটি বিষয়ের অবতারণা করলাম। বিষয়টি ছিল বুচারকে নিয়ে। রয় বুচার ছিলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি। অথচ পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতির সঙ্গে প্রায়ই তিনি টেলিফোনে সামরিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত তথ্যাদির আদান-প্রদান তথা বিভিন্ন সামরিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। এদিকে দু'টি দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে রয়েছে যুদ্ধরত। ব্যাপারটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে নেহ্‌রুকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে যুদ্ধে বিপক্ষীয় দুই প্রধান সেনাপতির মধ্যে রয়েছে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা, সেটা কোন্ ধরনের যুদ্ধ? জিজ্ঞাসা করলাম, পুঞ্চে আমাদের সৈন্যব্যূহের সন্নিকটে প্রচুর সংখ্যায় জমায়েত আক্রমণোদ্যত পাঠানদের উপর বিমান আক্রমণ করতে বাধা দিয়ে বুচার সঙ্গত কাজ করেছিলেন কি না। বিশেষ করে এটা যখন জানাই ছিল যে অব্যাহতি দিলে তারাই আবার পরে আমাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বাধা যে কারণেই দেওয়া হয়ে থাকুক না

কেন, আসল প্রশ্ন হলো যে শত্রু সুযোগ পেলেই আমাদের হত্যা করবে, তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অব্যাহতি দেওয়াটা আদৌ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কি না। অবশেষে বললাম, আমার ধারণায় ভারতীয় বাহিনীতে বুচারের খ্যাতি নগণ্য; এবং বৃটিশ সমর দপ্তরেও তাঁর বিশেষ কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। অতএব, কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁকে এখানে রাখা হয়েছে? সমর-সম্ভার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বুচার লণ্ডন যাচ্ছেন শুনেছিলাম। সে প্রসঙ্গে বললাম. যদি তিনি লণ্ডনে যান তা'হলে আমাদের প্রয়োজনীয় কিছুই তিনি আনতে পারবেন না। কারণ, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুমাত্রও প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর নেই।

বুচারের বিরুদ্ধে এই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি নেহ্রুর প্রীতিকর হয় নি। তাই আর কোন আলোচনার প্রশ্রয় তিনি দিলেন না। অপ্রীতিকর কোনও আলোচনা পছন্দ না হ'লে নেহ্রু প্রায়ই এই ধরনের ব্যবহার করতেন। পরে শুনেছিলাম অবিলম্বে সমর সম্ভার জোগাড়ের উদ্দেশ্যে বুচার ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন; কিন্তু ফিরে এসেছিলেন অনেক বাধা-নিষেধের সর্ত নিয়ে এবং শূন্য হাতে। পরে এক সময় এ ব্যাপারে নেহ্রুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে বুচার বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কয়েকমাস পর বুচার চলে গেলেন এবং কারিয়াপ্পা গ্রহণ করলেন প্রধান সেনাপতির পদ। ভারতীয় বাহিনী পূর্ণ সমর্থন জানালো এই নিয়োগের।

আমার অধীনস্থ মি.লিশিয়া বাহিনীর ব্যাপারে যখন আবদুল্লা হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে একটা বিরোধ বেধে উঠলো আমার। বাহিনীর মধ্যে পদোন্নতি এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমার উপর চাপ দেওয়া হতো। এই অনধিকার হস্তক্ষেপ আমার সহ্য হতো না। ফলে, আবদুল্লার কাছে হয়ে উঠলাম একজন 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি'। ব্যাপারটা ক্রমশঃ চরমে উঠলো। মিলিশিয়ার একজন সৈনিককে গুরুতর অপরাধের জন্য বন্দী করা হয়েছিল। সামরিক আদালতে যেদিন তার বিচারের ব্যবস্থা করা হয় সেদিন আবার ছিল ঈদ; এবং আমি গিয়েছিলাম অগ্রবর্তী একটা ঘাঁটিতে। অনুপস্থিতির সুযোগে আবদুল্লা স্বীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে আমার অধীনস্থ লোকদের আদেশ দিলেন পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে সমস্ত অপরাধীদের ব্যাপক ক্ষমা করবার যে সঙ্কল্প করা হয়েছে সেই অনুসারে সংশ্লিষ্ট অপরাধী লোকটিকেও মুক্ত করে দিতে। পরে খবর পেলাম,

অপরাধীটিকে তার প্রাপ্য দৃষ্টান্তস্থাপনকারী সাজা দেবার পরিবর্তে আবদুল্লা তাকে পুলিশ বিভাগে একটা চাকরী দিয়েছেন। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক হৈ-চৈ করলাম, কিন্তু সে সমস্তই অরণ্যে রোদন হলো। সৈন্য বিভাগের উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তিই আমার কথায় কান দিলেন না। আসলে, সামরিক ব্যাপারে তখন চলছিল রাজনীতির নিরঙ্কুশ আধিপত্য।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। অপরাধী এবং সাজাপ্রাপ্ত একজন সৈনিক প্রতিবাদস্বরূপ অনশন শুরু করেছিল। সেনা বিভাগের মধ্যে আবার গোপনে অনুপ্রবেশ করছিল রাজনীতির চমকপ্রদ কৌশল। স্থির করলাম এ ধরনের প্রবণতাগুলোকে নির্মম হস্তে দমন করতে হবে। আমার সুযোগ্য ষ্টাফ অফিসর লেঃ কর্ণেল জি. এস. পুরীকে আদেশ দিলাম অনশন ভঙ্গের পরও দুই-তিন দিন লোকটিকে যেন একমাত্র জল ছাড়া কোন খাদ্যবস্তু না দেওয়া হয়। শাস্তিটা কঠিন হলেও কিছুটা শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য এটুকু দরকার ছিল তার। ইতিমধ্যে, অনশনরত অবস্থাতেই এবং অসুস্থতার ভাণ করা সত্ত্বেও পিঠে একটা ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে খেলার মাঠের চারধারে তাকে দৌড় করালাম। এই 'রাজনৈতিক' সৈনিকটির সাজা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় আবদুল্লার একজন মুখপাত্র তার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে বললেন আমায়। তাঁকে বললাম, সৈনিকদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার অনুপ্রবেশকেই কেবল দমন করা হচ্ছে, এবং যেখানে দৃষ্টান্ত স্থাপনের দরকার সেখানে অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত নয়। ব্যাপারটা ছিল একটা নীতির প্রতি নিষ্ঠার। শোভনতার কোনও প্রশ্ন ছিল না সেখানে। কিন্তু নীতি-নিষ্ঠাকে শোভনতার উপরে স্থান দিয়ে প্রায়শঃই ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে একদিন শেখ আবদুল্লা আমায় ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন কিশ্‌ত্‌ওয়ার-এ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। তাই সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে জম্মু ও কাশ্মীর মিলিশিয়ার বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল (unit) গঠন করে তাদের নিয়ে আমায় সেখানে যেতে হবে। উত্তরে বললাম, ভারতীয় বাহিনীতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সৈন্য নির্বাচন করার তথা সেই অনুসারে বিশেষ বিশেষ কাজে তাদের নিযুক্ত করার প্রথা নেই। এমত ক্ষেত্রে প্রাপ্তি-সাধ্য যে কোনও সৈনিককে আমি সঙ্গে নেব। মনে হয়, আবদুল্লা এই ব্যাপারটাকে আমার এক দুষ্কর্মের নজিররূপে

ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছিলেন। কারণ, অনেক রকমের জবাবদিহি আমার কাছে চাওয়া হয়েছিল। শেষে তাঁরা যখন শুনলেন সামান্য একটা ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার রঙ্ দেওয়া হচ্ছে, তখন তাঁরা নিরস্ত হন।

সংবাদ পেয়েছিলাম, আদালত খান্ নামে জম্মু ও কাশ্মীর বাহিনীর একজন প্রাক্তন লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল পাকিস্তানে চলে যান। আবদুল্লা তাঁকে আবার ডেকে এনেছেন এবং কিশ্‌ত্‌ওয়ারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে আবদুল্লা যা বলেছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা তথ্য আমি পাই শ্রীমতী কৃষ্ণা মেহতার কাছ থেকে। শ্রীমতী মেহতা নেহ্‌রুর গৃহস্থালির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁর পিতা বাস করতেন কিশ্‌ত্‌ওয়ারে।

১/২নং পঞ্জাব ছত্রী বাহিনীর প্রায় শ'খানেক সৈনিক নিয়ে বটোট থেকে রওনা হলাম এবং প্রবল বর্ষণের মধ্যে আড়াই দিনে ৬৫ মাইল পথ অতিক্রম করে কিশ্‌ত্‌ওয়ার পৌছুলাম। লেঃ কর্ণেল (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) 'কিম' যাদব সেখানকার একটি মিলিশিয়া বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। অসাধারণ এই সৈনিক ১৯৪৬-৪৭ সালে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত সাহায্যকারী-রূপে (Aid-de-Camp) কাজ করেছিলেন। কিশ্‌ত্‌ওয়ারে দেখলাম প্রবল অসন্তোষ। এর কারণ স্বরূপ আবদুল্লা যা বলেছিলেন, মোটেই তা ছিল না। বরং ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং আদালত খান্‌ও ছিলেন একজন অকর্মণ্য শাসক।

'কিম' যাদবের সাহায্যে অবিলম্বে কতকগুলি নিরপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম; এবং জনসাধারণের মধ্যে আস্থার ভাব ফিরে আসতেই পীরপাঞ্চালের পথে শ্রীনগর অভিমুখে রওনা দিলাম। পথে তিন-চার দিন লেগে গেল। এদিকে, আমি শ্রীনগর পৌছুবার আগেই আদালত খান্ আমার কিশ্‌ত্‌ওয়ার পরিদর্শন তথা স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আবদুল্লার কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন। আত্মরক্ষার খাতিরেই এটা করেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর কুশাসনের কাহিনী এই প্রথম প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আবদুল্লা। কিশ্‌ত্‌ওয়ারে এমন কিছুই আমি করি নি যাকে অনুচিত বলা যেতে পারে। এবং অভিযোগগুলিও ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সে কথা তাঁকে বললাম। আবদুল্লা অবশ্য অতিরঞ্জিত একটা বিবরণ নেহ্‌রুকে পাঠিয়ে সাবধান করে দিলেন যে, ভারত যদি এই ধরনের কার্য-কলাপের প্রশ্রয় দিতে থাকে তবে

কাশ্মীরীদের অব্যাহত রাজনৈতিক সমর্থনের নিশ্চিত কোন আশ্বাস আর তিনি নেহ্রুকে দিতে পারবেন না। আরো জানালেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁর মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যও পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন। (sic.—দায়িত্বসহকারে এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করা হচ্ছে।) প্রকৃত ঘটনা না জানার দরুন স্বভাবতই নেহ্রু ক্রুদ্ধ হলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমায় দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। দেখা হওয়া মাত্রই আমার কোন বক্তব্য না শুনেই রাগান্বিতভাবে বললেন : 'কিশ্ত্ওয়ারে তোমার সাম্প্রতিক কার্য-কলাপের সারমর্ম শেখ আবদুল্লা আমায় জানিয়েছেন। আমি তো ভেবেই পাই না কী মনে করেছো তুমি নিজেকে ? এই ভাবে যদি চলতে থাকো, তা'হলে তোমার কারণেই ভারতকে একদিন কাশ্মীর হারাতে হবে।'

'কিন্তু স্যার, প্রকৃত ঘটনা কী আপনি জানেন ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

রাগে ফুলতে ফুলতে নেহ্রু চীৎকার করে উঠলেন, 'ঘটনা যাইহোক, শেখ আবদুল্লার সঙ্গে তুমি একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসেছো এইটুকু জানাই আমার কাছে যথেষ্ট। তাঁর সঙ্গে আমরা ঝগড়া বাধাতে পারি না। ভেবেছিলাম অন্য সবার চাইতে তুমি এটা ভালো করেই জানো।'

নির্বাক হয়ে রইলাম। যেখানে প্রকৃত তথ্যের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, এবং বিবেকের উপরে স্থান দেওয়া হয় রাজনীতিকে, সেখানে আমার বলবার কিছুই ছিল না।

'জবাব দিচ্ছো না কেন ?' নেহ্রু জিজ্ঞাসা করলেন।

অবরুদ্ধ ক্রোধে মুখ কালো হয়ে উঠেছিল আমার। বললাম, 'স্যার, যদি প্রকৃত ঘটনা না জানতে চান, এবং কোন বক্তব্য না শুনেই কিশ্ত্ওয়ারে আমার কার্য-কলাপকে অসঙ্গত বলে বিচার করতে মনস্থ করে থাকেন, তবে আমার পক্ষে কিছু বলার কোন অর্থই হয় না।'

আরো কিছু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলেন নেহ্রু। কিন্তু কিছু না বলে রাগের মাথায় হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে আবার আমায় ডেকে পাঠালেন তিনি। এবার কিন্তু বেশ আন্তরিক ভাবেই অভ্যর্থনা করলেন, এবং সম্প্রতি কিশ্ত্ওয়ারে যা যা দেখেছি সব কিছু সবিস্তারে জানতে চাইলেন। আজ যেন তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। সন্দেহ হল, ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে কিছু বলেছে। যাই হোক, বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শুরুতেই বললাম,

আমেরিকা থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের পর জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের সুপারিশে এবং জাতীয় প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি নিজেই আমাকে কাশ্মীরে পাঠিয়েছিলেন। আর, কিশ্‌ত্‌ওয়ারে আমাকে পাঠানো হয়েছিল আবদুল্লার অনুরোধে। এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম, কিশ্‌ত্‌ওয়ারে ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি বিচ্ছিন্ন সেই জেলা কুশাসনে ছেয়ে গেছে; আমাদের সামরিক বিভাগের বহু রাইফেল পড়েছে অনধিকারী ব্যক্তিদের হাতে; সেই সব রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা বহুবিধ ক্ষয়-ক্ষতি করেছে; বহু যুবতীকে জোর করে অপহরণ করা হয়েছে এবং বিবাহ দেওয়া হয়েছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গে, এই ধরনের আরো বহু অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বক্তব্য শেষ করে বললাম, কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সব অপরাধ এবং অন্যান্য আরো অনেক ঘটনা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে যাচ্ছিলাম আমি। আবদুল্লার[২৬] শাসনে এই দুরবস্থার প্রতিবিধান যদি না করা হয় তবে একদিন এগুলো হয়ত আমাদেরই ঘাড়ে এসে পড়বে।

এই সুযোগে আবদুল্লার কুশাসনের আওতায় অন্যান্য বহু যে সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা কাশ্মীরে ঘটেছে সেগুলোও বিবৃত করলাম। ধৈর্য সহকারে সব শুনলেন নেহ্‌রু। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। তারপর, কাশ্মীর রাজনীতির বিভিন্ন জটিলতাগুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুল্লার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন। বললেন, আমার বক্তব্য শুনে তিনি দুঃখিত; কিন্তু বিভিন্ন বাস্তব জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হল কাশ্মীব থেকে আমাকে সরিয়ে নিতে আবদুল্লা অনুরোধ করেছেন; কারণ সেখানে আমার উপস্থিতি তাঁর কাজের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো বললেন, আবদুল্লা হলেন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁরই সঙ্গে আমি ঝগড়া বাধিয়ে বসেছি। এমত ক্ষেত্রে আমার বিশেষ কোন দোষ না থাকলেও, আবদুল্লার অনুরোধ

২৬। নেহ্‌রুকে আর একটা কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত আবদুল্লা ছিলেন কাশ্মীরেব একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতা। পরে, ১৯৩৮ সালে যখন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব গঠিত হল, তখন দেয়ালের লিখন পড়ে বুঝলেন একদিন না একদিন ভারতের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে আসবেই। অতএব, রাতারাতি তিনি হয়ে গেলেন জাতীয়তাবাদী।

উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে মুস্কিল। আবদুল্লাকে সরানোর চাইতে তাঁর পক্ষে আমাকে সরানো[২৭] সহজ। কারণ, সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিরোধ বাধলে সাধারণতঃ সেই বিশেষ ব্যক্তিকেই সরে যেতে হয়। বর্তমান অবস্থায় অন্য কোথাও আমাকে বদলী হতেই হবে। তবে যতদূর সম্ভব কাশ্মীরের কাছাকাছিই থাকতে পারব। অতঃপর স্বীয় সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে প্রধান সেনাপতিকে একখানা চিঠি লেখেন নেহ্রু; এবং সেই চিঠির একখানা প্রতিলিপি আমাকেও দেন। ফলে, ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে কাশ্মীর[২৮] ত্যাগ করতে হল। ঘড়ির দোলকের মত একটা যুদ্ধের মধ্যে পড়ে অনেক কিছু সেখানে শিখেছিলাম আমি; এবং এমন একটা রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম যার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কাশ্মীর থেকে ফেরবার পর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে জলন্ধরে অবস্থিত ১১নং পদাতিক (Infantry) ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব দেওয়া হল। পদাতিক বাহিনীতেই আমার কর্মজীবনের শুরু, এবং আগাগোড়া সেই বাহিনীরই লোক ছিলাম আমি। তবু, মধ্যে বেশ কিছুদিন এর থেকে দূরে দূরে থাকতে হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে যদিও আর্মি সার্ভিস কোর-এই নাম ছিল আমার, তবু সামরিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বহুবিধ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। উদাহরণস্বরূপ এইগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে: কোয়েটায় অবস্থিত একটা সামরিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ শিক্ষণে যোগদান (Staff College course); করাচির সামরিক গোয়েন্দা সংস্থায় (Intelligence school) স্বল্পস্থায়ী শিক্ষণের কাজ, জনসংযোগের

২৭। পাঁচবছর পর জাতীয় নিরপত্তার খাতিরে বাধ্য হয়ে আবদুল্লাকে অপসারিত করতে হয়।

২৮। এ কথাটা অবশ্যই বলব যে, ১৯৪৮ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলির জন্য বকসী গুলাম মহম্মদকে দায়ী না করে, করা উচিত ছিল শেখ আবদুল্লাকে। প্রকৃতপক্ষে, যত দিন যেতে থাকে ততই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যান বকসী এবং শেখ। বহু ব্যাপারে অন্যান্যদের মতো আবদুল্লাকে মৌন সম্মতি জানাতে বাধ্য হয়েছেন বকসী, অথবা বিরোধিতা করেছেন। দু'জনে একমত হয়ে কোন কাজ করেছেন, এমন ঘটনা বিরল।

দায়ীত্ব; সামরিক সদর দপ্তরে সহকারীর কাজ (staff job); জাতীয়করণ কমিটির সেক্রেটারীর কাজ; ওয়াশিংটনে সামরিক সহকারীর কাজ, লেক সাকসেসে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রতিনিধিদলের সামরিক উপদেষ্টার কাজ; বর্মা অভিযানে একটা মোটর ট্রান্সপোর্ট ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কত্ব; এবং সবশেষে জম্মু ও কাশ্মীর অভিযানে বহু মিলিশিয়া বাহিনীর অধিনায়কত্ব করতে হয়েছিল আমায়।

আমার অধীনে প্রায় ৪০০০ লোক ছিল। এদের মধ্যে ছিল ২নং মারাঠা, ১নং ডোগরা এবং ২নং গাড়োয়াল বাহিনী এবং তাদের মান অনুযায়ী বিভিন্ন পরিপূরক সাহায্যকারী বিভাগ এবং দপ্তর। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের ফেরোজপুর থেকে পাঠানকোট অবধি অংশের প্রতিরক্ষার ভার ছিল আমার উপর। এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এই প্রথম পতাকা ব্যবহার করবার তথা যাতায়াতের সময় গাড়ীতে একটি তারা প্রদর্শন করবার সুযোগ পেলাম আমি।

প্রথমেই আমার ব্যূহ রচনার কৌশলগুলিকে ঝালিয়ে নেবার এবং আমাদের সামরিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারনা গড়ে নেবার কাজে হাত দিলাম। এই উদ্দেশ্যে বারংবার ভারত-পাক সীমান্তে যেয়ে সেখানকার ভূপ্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করলাম পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। আমার সেনাপতিরাও যাতে এই ব্যাপারে মনোযোগ দেন সে দিকেও লক্ষ্য রাখলাম। উপলব্ধি করলাম, ছোটখাটো ব্যূহ রচনার কৌশল ভালভাবে রপ্ত করা ছাড়াও, গুলি-চালনা এবং কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে দক্ষতা অর্জন করাও আমার সৈনিকদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সেই উদ্দেশ্যে জলন্ধর থেকে বিয়াস অবধি এক নাগাড়ে যাওয়া-আসা মিলিয়ে ৫৬ মাইল পথ কুচকাওয়াজ (Route march) করালাম তাদের দিয়ে। অফিসবদের নিয়ে আমিও তাতে যোগ দিলাম। মধ্যে মধ্যে কিছু সময়ের জন্য মাত্র বিশ্রাম নেওয়া হয়েছিল। এরপর সমগ্রভাবে আমার ব্রিগেড যাতে গুলিচালনা (shooting) এবং সামরিক শিক্ষায় (training) উৎকর্ষতার একটা বিশিষ্ট মান অর্জন করতে পারে সেদিকে মনোযোগ দিলাম। ব্যবস্থা করলাম একাধিক মহড়ার (exercise)। এই সমস্ত মহড়ায় নৈশকালীন সৈন্য চলাচল (night operation) এবং পর্যবেক্ষণের কাজ (patrolling) ছাড়াও বিভিন্ন সামরিক তৎপরতা (operations of war) এবং গুরুত্বপূর্ণ সমর-ড্রিলের কলা-কৌশলের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রাখলাম। সৈনিকদের স্বল্প রেশনে থাকতে, বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে এবং কঠোর শারীরিক পরিশ্রম সহ্য করতে অভ্যস্ত করে তুললাম। এবং, পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই অপ্রত্যাশিত সমস্যাগুলিকে[২৯] উপস্থিত মত মোকাবিলা করবার অভ্যাসও রপ্ত করলাম আমরা।

৪নং ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল সন্ত সিং-এর অধীনে ছিলাম আমি। কয়েক মাস বাদে নদী পারাপারের কলাকৌশল ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শনের জন্য তিনি আমায় নির্বাচিত করলেন। এটা শেষ হতে না হতেই আর একটি প্রদর্শনীর জন্য আদেশ এল। এবারকার বিষয় হল ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড কর্তৃক মাইন পাতা মাঠ অতিক্রম করার কলাকৌশল, এবং তাও সক্রিয় বিস্ফোরকের সাহায্যে। এই সমস্ত কর্মতৎপরতার ভিতরেই ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে হল জম্মু ও কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতি। মনে হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জনের আশাতেই যুদ্ধ-বিরতি আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের তুষানল অবিরাম যন্ত্রণাদায়করূপে চেপে বসল আমাদের ঘাড়ে। সারা বিশ্বকে আমরা সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু সেই আগুন সবাইকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টই করে তুলল শুধু।

সাম্প্রতিক দেশ বিভাগের সময় অগণিত মানুষ নিহত হয়েছিল, বহু হয়েছিল গৃহহীন এবং লুট-তরাজও হয়েছিল অনেক। সৈন্য বিভাগের অফিসরদের জন্য মোটামুটি বাসস্থানের ব্যবস্থা যদিও ছিল কিন্তু শান্তিপূর্ণ এলাকায় কর্মরত সাধারণ সৈনিকদের অধিকাংশকেই স্ত্রী-পুত্রাদি ছাড়াই থাকতে হতো। কারণ তাদের জন্য বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। অধীনস্থ অফিসর এবং সাধারণ সৈনিকের মধ্যে এই প্রভেদ উদ্বিগ্ন করে তুলল আমায়। সেদিন সস্ত্রীক দু'টি সন্তানসহ সান্ধ্যভ্রমণে বার হয়েছিলাম। জনৈক সৈনিক সেখান দিয়ে যাবার সময় আমায় স্যালুট্ করল। একটু খোশগল্প করার উদ্দেশ্যে ডাকলাম তাকে। পরিজনবর্গ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতে সৈনিকটি জানাল স্ত্রী এবং একটি সন্তান রয়েছে তার, এবং তারা গ্রামের বাড়ীতেই থাকে। ছুটির সময় ছাড়া গত সাত বছরের মধ্যে সে তাদের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারে নি। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ নিয়ে

২৯। নিয়ম-শৃঙ্খলা, আনুষ্ঠানিক ড্রিল, শাসন পরিচালনা, আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধূলার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম।

বাইরে গিয়েছিল, এবং ফিরে এসেছে মাত্র সেদিন, ১৯৪৭ সালে। সব শুনে নিজেকে বড় হীন মনে হল। পরিজনবর্গের সাহচর্যে সানন্দে আমার দিনগুলি অতিবাহিত হচ্ছে। অথচ এই সৈনিকটি, এবং বিভিন্ন কমাণ্ডে এর মত অনেকেই বছরের পর বছর ধরে বিচ্ছিন্ন সামরিক এলাকায় কাটাবার পরও আপন আপন পরিজনদের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারল না আজও। কয়েক রাত বাদেই অ্যান র‍্যাণ্ডের 'ফাউনটেন হেড' নামে একখানা বই হাতে এল। কাহিনীটি ছিল একটি স্থপতির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লেখা। গল্পটা পড়ে হঠাৎ একটা পরিকল্পনা মাথায় এসে গেল। নিজেরাই ছোট্ট একটা শহর গড়ে তুললে কেমন হয়। সেই শহরে আমার সৈনিকেরা নিজ নিজ পরিজনদের সঙ্গে সুখে বসবাস করতে পারবে। গৃহনির্মাণের ব্যাপারে কোন ধারনা আমার নেই মানি। কিন্তু অবসর সময়ে এ বিষয়ে খানিকটা চেষ্টা তো নিশ্চয়ই করতে পারি। অনেক পরিশ্রম করে বিশদ একটা পরিকল্পনা খাড়া করলাম। কিন্তু তারপর সন্দেহ হল অর্থ, জমি ইত্যাদির কিছুমাত্র সংস্থান ব্যতিরেকে পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সত্যিই পারব কি না। ভেবে ভেবে নিদ্রাহারা সারাটা রাত অতিবাহিত হয়ে গেল।

পরের দিন সকালেই অধীনস্থ সমস্ত সেনানায়কদের একত্রিত করে পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম। বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে তাঁরাও চিন্তিত ছিলেন। তাই, এই বিষয়ে কিছু একটা করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করলেন। আমাদের সদর দপ্তরের সংলগ্ন একখণ্ড সরকারী জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। সেটাকে অবিলম্বে দখল করা স্থির হল। এরপরই জোগাড় করা হল সিমেণ্ট, ইট, কয়লা, বালি, কাঠ এবং কাঁচ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র। সেনানায়কদের ভিতর থেকেই একটি কর্মীদল গঠন করলাম। তাঁদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছাড়া এ কাজে কখনই আমি সাফল্য লাভ করতে পারতাম না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমার ব্রিগেডের যে-সমস্ত অফিসর এবং সৈনিক প্রাণদান করেছিলেন, তাঁদের সম্মানার্থে এই পংক্তি কয়টি খোদাই করে দিলাম উপনিবেশের প্রবেশ-পথের উপর :

তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল;

যাঁরা অন্যদের জীবন রক্ষার জন্য দান করেছিলেন,

নিজেদের জীবন।

আকবরের দীন-এ-ইলাহির অনুকরণে হিন্দু, মুসলমান, শিখ এবং ক্রীশ্চান সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার জন্য একটি সর্বজনীন উপাসনাগৃহ তৈরী করা হলো। এই হলঘরে পরস্পরের ধর্মোৎসবগুলিকে একত্রে পালন করতে নির্দেশ দিলাম আমার ব্রিগেডের সবাইকে। এতে পরস্পরের মধ্যে মিলন-সূত্রের একটা ভিত রচিত হল। ধর্মীয় বিরোধের নয়, সমন্বয়ের মহান উপদেশ অন্তরে নিয়েই ধর্মোৎসবের দিনগুলিতে সবাই সমবেতভাবে উপাসনা করত। সর্বধর্মের ঐক্যের প্রতীক স্বরূপ একটি অশোকস্তম্ভ এই হলঘরের মধ্যস্থলে স্থাপন করলাম। দিল্লীর জনৈক প্রখ্যাত ভাস্কর পাথর খোদাই করে এই স্তম্ভটি আমাদের জন্যে তৈরী করেছিলেন।

উপনিবেশটির নাম দিলাম 'জওয়ানাবাদ' যার অর্থ হল সাধারণ সৈনিকদের আবাস স্থল। কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট করার একটা রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল; এবং এখনো রয়েছে। সেই রীতি অনুযায়ী কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা অথবা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর নামে এই উপনিবেশের নামকরণ করতে আমার কিন্তু মন চাইল না। রাস্তাগুলির নামকরণ করলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই ব্রিগ্রেডের যে সমস্ত সৈনিক নিহত হয়েছিল তাদের নামে। সৈনিকদের পরিজনবর্গের চিকিৎসার সুযোগের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization) সঙ্গে পরামর্শ করে মোটামুটি চলনসই একটা হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করলাম। এ ছাড়া সাঁতারের জন্য একটি জলাশয় (Swimming pool), মুক্তাঙ্গন অভিনয়মঞ্চ ইত্যাদি সুবিধা-সুযোগেরও ব্যবস্থা করলাম তাদের জন্য। আমার উদ্দেশ্য ছিল কোন প্রকার আর্থিক চাপ না দিয়ে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যতখানি সম্ভব ব্যবস্থা করা।

এই সমস্ত কাজের খরচ বাবদ বেশ কিছু বিল আমার কাছে জমা পড়ে গেল। সেগুলি মিটিয়ে ফেলতে প্রয়োজন হয়ে পড়ল অর্থের। তাই অর্থ সংগ্রহের সর্বপ্রকার উপায় পরীক্ষা করে দেখলাম। এমন কি নাটক লিখে, সেই নাটককে মঞ্চস্থ করেও। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর জওয়ানাবাদকে ঋণশোধক্ষম (solvent) উপনিবেশে পরিণত করবার আমার চেষ্টাটি সার্থক হল।

যথারীতি ড্রিল, ব্যায়াম, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি অনুশীলনগুলি বজায় রেখেই এই পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করেছিলাম। গৃহনির্মাণের কাজ যখনই আমাদের মূল কর্তব্য পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত

সময় ধরে (overtime) কাজ করে সেই ক্ষতি আমরা পূরণ করে দিয়েছি। পুরো পাঁচটা মাস আমরা অবিরাম কাজ করেছি ঘড়ির কাঁটা ধরে, রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে। বহুবিধ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে আমায়। কিন্তু সর্বস্তরের সৈনিকেরা দৃঢ়সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একখণ্ড পাথরের মত আমার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। এর জন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কাজে নামবার আগে সেদিনের ঘটনা আমার আজও মনে রয়েছে। প্যারেডে উপস্থিত চার হাজার সৈনিকের সেই জমায়েতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাদের পরিজনবর্গের জন্য যে কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, তাতে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কি না। সবাই নিজের নিজের রাইফেল মাথার উপর তুলে ধরে একবাক্যে উৎসাহোদ্দীপক কণ্ঠে সমর্থনসূচক আওয়াজ তুলেছিল। সেদিন তাদের সেই গর্জন প্রেরণার উৎস দিয়েছিল আমার হৃদয়ে। আর আজ, দীর্ঘ পাঁচ মাসের ঐক্যবদ্ধ কঠোর পরিশ্রমের শেষে তাদের হাতে তুলে দিলাম সাধনলব্ধ ধন।

জওয়ানাবাদের গৃহগুলি অধিকাংশ মাটির গাঁথুনী হলেও অবশেষে সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এবং, এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল ১১নং ইনফ্যানট্রি ব্রিগেডের সর্বস্তরের সৈনিকদের। তাদের দৃঢ়তা, কঠিন সঙ্কল্প, দলের প্রতি আনুগত্য এবং লক্ষ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তিই ছিল এই সাফল্যের অন্তর্নিহিত কারণ। জওয়ানাবাদ সম্পূর্ণ হল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সেই সমস্ত নর-নারী এবং শিশুদের জন্য যারা সহকর্মী হিসাবে জীবনধারণের একটা উপযুক্ত মান অনুযায়ী এখানে বসবাস করবে; যে মানের নীচে জীবনধারণ করতে দেওয়া উচিত নয় আমাদের দেশের কোন মানুষকেই। বস্তুতঃ, আমাদের স্বপ্নের ভারতেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলাম এই জওয়ানাবাদে।

জওয়ানাবাদের, বিশেষ করে সর্বধর্মের সমন্বয়রূপে যে উপাসনাগৃহটি আমরা নির্মাণ করেছিলাম, সেটার কথা শুনে নেহ্‌রু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর সঙ্গে ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন আমায়। সেই অবসরে বহু বিষয়েরই আলোচনা হলো। আমাদের পক্ষে মুসলমানদের বন্ধুত্ব অর্জনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করলেন নেহ্‌রু। বললেন, ভারতবর্ষ ব্যতীত রাশিয়া, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান; ইন্দোনেশীয়া এবং পাকিস্তানে বহুল সংখ্যায় মুসলমানেরা বসবাস করে। অতএব এই সম্প্রদায়কে মোটেই অবহেলা করতে পারি না আমরা।

জলন্ধরস্থিত পাকিস্তানের ডেপুটী হাইকমিশনার মেজর জেনারেল আবদুল রহমান ছিলেন আমার দীর্ঘকালের বন্ধু। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যখন ক্রমশ: উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেই সময় নিজের পরিজনবর্গের নিরাপত্তার জন্য স্বভাবতই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এবং প্রকৃতই যুদ্ধ বেধে গেলে পরিজনদের জলন্ধর থেকে পাকিস্তানে নিরাপদ অপসারণের প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করেন আমার কাছে। সে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম।

দেশ বিভাগের কালে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশেরই বহু নারী নিজ নিজ পরিজনবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমান্তের উভয় দিকে নিরাশ্রয় অবস্থায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে। দু'টি দেশই এই জটিল সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করছিল। কিন্তু কাজের অগ্রগতি যৎসামান্যই হয়। ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন মানুষগুলি হয়ে পড়তে থাকে আরো অধৈর্য।

এই ধরনেরই একটা ব্যাপারে একদিন অধীনস্থ একজন সাধারণ সৈনিক (Other rank) আমার সাহায্য প্রার্থী হয়ে এল। যুবতী বধূটিকে তাকে পাকিস্তানেই ফেলে আসতে হয়; এবং সেই অবধি নিদারুণ মর্মবেদনায় সৈনিকটি অস্থির হয়ে উঠেছে। আমলাতান্ত্রিক পথে বধূটিকে পুনরুদ্ধারের সমস্ত প্রচেষ্টা এ যাবৎ ব্যর্থ হওয়াতে শেষ পর্যন্ত আমার শরণাপন্ন হয় বেচারী। সব শুনে আবদুল রহমানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। অনুরোধ করলাম বেসরকারীভাবে এই ব্যাপারে কিছু একটা করতে। কারণ কূটনৈতিক কতগুলি সুযোগ-সুবিধা তাঁর ছিল (Diplomatic immunity)। এই ধরনের একটা সৎকার্যে সেগুলিকে নিয়োগ করলে ফলও হয়তো কিছুটা পাওয়া যেত। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করার মতো একটা ব্যাপার এটা মোটেই ছিল না। আমিও একথা জানতাম। আবদুল রহমানও সেই কথাই বললেন। তবুও প্রতিশ্রুতি দিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। সেই সময়েই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Chief of the General Staff) ছিলেন আমার স্যাণ্ডহার্স্টের সহপাঠী মেজর জেনারেল আকবর খান্, ডি. এস. ও। তাঁর নামে একখানা চিঠি দিলাম আবদুল রহমানের হাতে। তাতে লিখলাম, আবদুল রহমান স্বয়ং তাঁকে সব কিছু জানাবেন, এবং তিনি যেন এ ব্যাপারে রহমানকে যথাসম্ভব সাহায্য করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ব্যাপারটির একটা সুরাহার জন্য চিঠিখানা আবদুল রহমানকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

চিঠিখানা নিয়ে আবদুল রহমান লাহোরে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আকবর খানের সঙ্গে দেখা হ'ল না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ একটা সামরিক অভ্যুত্থান করে তার আগের দিনই কারারুদ্ধ হয়েছিলেন আকবর খান্। সঙ্গে সঙ্গে জলন্ধরে ফিরে এলেন রহমান। সন্ত্রস্তভাবে আকবর খানের ঘটনাটি আমায় জানালেন। চিঠিখানা যে তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন সে কথাও বললেন। এমত অবস্থায় আর কিছু করার কথা আমি বলতে পারলাম না তাঁকে।[৩০]

মেজর জেনারেল আকবর খানের দৃঢ় ধারণা ছিল একমাত্র সামরিক একনায়কত্বের দ্বারাই পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব। ব্যাপারটা পূর্বেই আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছিলাম। জেনারেল 'তারিখ' ছদ্মনামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দুঃসাহসিকভাবে কাশ্মীরে পরিচালনা করে জনসাধারণের চোখে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বীরত্বের একটি প্রতীক। সামরিক অভ্যুত্থানের স্বপ্ন তাই তাঁর হৃদয়ে জেগে ওঠে। প্রচেষ্টার ধরনটা ছিল এই রকম :

সাধারণ বার্তালাপের অবসরে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থার নানারকম প্রতিকারের পন্থা তিনি সেনানায়কদের সম্মুখে উপস্থাপিত করতেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত হতেন ; এবং আবেগ ভরে সে কথা প্রকাশও করতেন। সেই সুযোগই নিতেন আকবর খান্। যাঁদের আন্তরিকতা অকৃত্রিম বলে মনে হ'ত তাঁদের তিনি নিয়ে যেতেন নিজের বাসায়। তারপর সেখানে একটা

৩০। আবো কতকগুলি ক্ষেত্রে অধী-স্থ সৈনিক অথবা তাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করতে গিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সফলতাও এসেছে। যেমন ল্যান্‌স্ নায়েক পিয়ারা সিং-এর ক্ষেত্রে। দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল পিয়ারা সিং। চিকিৎসকেরা যখন দাঁতটা তুলে ফেলার চেষ্টা করছেন সেই সময় রক্তক্ষরণে পিয়ারা সিং মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যখন তাব যুবতী বিধবা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখনই কেবল ব্যাপাবটা জানতে পা্নি আমি। তাদের জীবিত কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। সবাই নিহত হয়েছিল দেশ বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। আশ্রয় দেবার মত পৃথিবীতে কেউ ছিল না স্ত্রীলোকটির। খানিকটা চেষ্টার পর আমার বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে তার জন্য দশহাজারের উপর টাকা সংগ্রহ করালাম। সেই টাকা থেকে কিছু দিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ী কিনে দিলাম তাকে। এবং বাকীটা তার নামে জমা করে দিলাম পোষ্টাপিসে। একটা চাকরীও তাকে জোগাড় করে দিলাম। মেয়েটির বয়স ছিল মাত্র ২৩ বৎসর। তাই দ্বিতীয়বার বিবাহ দেবার চেষ্টাও করেছিলাম, সে রাজী হয় নি।

'পবিত্র' কক্ষে উদযাপন করা হ'ত 'ভর্তি' হবার অনুষ্ঠান। কক্ষের আবহাওয়াটাকে করা থাকতো প্রেরণাদায়ক এবং গুরুগম্ভীর। দেওয়ালে টানানো থাকতো পাকিস্তানের জনক জিন্নার একখানা বিশাল প্রতিকৃতি। তার ঠিক নীচেই রাখা হ'ত একখণ্ড কোরান। জিন্নার ছায়ায় পবিত্র কোরান চুম্বন করে প্রার্থীদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হ'ত। তারপর নিজের রক্ত দিয়ে নাম সই করতে হ'ত একখানা খাতায়। এই অনুষ্ঠানের পরই প্রার্থী হতে পারতেন গোষ্ঠীর একজন পুরাদস্তুর সভ্য। যাবার সময় তাঁদের একটি করে রক্তগোলাপ উপহার দেওয়া হ'ত। অনুষ্ঠানটি সত্যিই ছিলো চমকপ্রদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রই বিজয়ী হ'ল। কোন প্রকার আঘাত হানবার পূর্বেই এই উচ্চাভিলাষী একনায়ক বিপত্তিতে পড়লেন। পাকিস্তান মন্ত্রীসভার তাবৎ সদস্যদের বন্দী করার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। কিন্তু সেই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার বেশ কয়েকদিন পূর্বেই এক প্রত্যুষে নিজেই হলেন কারারুদ্ধ।

জনৈক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসরের বিরুদ্ধে আনীত কতগুলি অভিযোগের অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্তকারী আদালত (Court of Inquiry) গঠিত হয়। সেই আদালতের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত করা হলো আমায়। কাশ্মীর যুদ্ধের সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরঞ্জিত সব রিপোর্ট পাঠানোর অভিযোগ ছিল অফিসরটির বিরুদ্ধে। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, শত্রুপক্ষ তাঁর গ্যারিসনকে (Garrison) প্রচণ্ড আক্রমণ করেছে এবং তিনি মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য এক উপলক্ষ্যে শত্রুপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করা হয়েছে বলে দাবী করে এক হাল বিবরণী[৩১] (Situation Report) পাঠান হয়। কিন্তু বর্ণিত স্থান পরিদর্শন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণই খুঁজে পান না। আবার,

৩১। উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি, কাশ্মীর যুদ্ধের সময় অসংখ্য অফিসর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরঞ্জিত হাল-বিবরণী প্রেরণ করতেন। স্বীয় কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ প্রকৃত ঘটনাকে পল্লবিত করে দেখানোর একটা ঝোঁক এসে গিয়েছিল যেন। অনেক ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন অধিনায়কদের নির্দিষ্ট আদেশও অসঙ্গত অজুহাতে পালন করা হয় নি। বিশেষ কয়েকজন অধিনায়ককে এও দেখেছি যে, সামরিক স্বার্থের ক্ষতি করে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছেন।

পরবর্তী এক রিপোর্টে এই অফিসরটি তাঁর সৈন্য সংখ্যার ঘাটতির অভিযোগ করে (প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিরোধ ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি ছিল) অতিরিক্ত সৈন্য বাহিনী চেয়ে পাঠান। কিন্তু আসলে তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল শত্রুপক্ষের চাইতে অধিক; এবং এই সত্যটি পূর্ববর্তী এক রিপোর্টে তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন। বস্তুতঃ, সাফল্যগুলি নিজের হলে অতিরঞ্জিত এবং অধীনস্থ ব্যক্তিদের হলে অসঙ্গতভাবে হীন প্রতিপন্ন করবার একটা অভ্যাস ছিল তাঁর।

আলোচ্য গ্যারিসনটি শত্রুর বহু আক্রমণ প্রতিহত করে। এর প্রকৃত কারণ ছিল অধিকাংশ অফিসর এবং সাধারণ সৈনিকের ব্যক্তিগত শৌর্য, এবং স্থানটির তুলনামূলক অজেয় অবস্থান। চারপাশের পরিবেষ্টন রচনাকারী পর্বতগুলি ছিল আমাদের অধিকারে। তাই, সেই সমস্ত স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ-সুবিধাও আমাদেরই ছিল অধিক।

অফিসরটি ছিলেন উক্ত গ্যারিসনের সামরিক তথা অসামরিক প্রশাসনের মুখ্য ব্যক্তি। কিন্তু সদাশয়তার অভাব ছিল তাঁর মধ্যে। ফলে তাঁর শাসন-কালকে কোন প্রকারেই আদর্শ বলা চলে না। নিজে তিনি বাস করতেন বিলাসের ক্রোড়ে। অথচ তাঁর অধীনস্থ সৈনিকেরা গুলিবৃষ্টির মুখে পড়ে থাকতো গর্তের মধ্যে (Bunker)। যে অট্টালিকাটিতে তিনি থাকতেন তার মালিক নগদ অর্থ এবং অলঙ্কারাদিসহ বহু মূল্যবান সম্পত্তি সেখানে রেখে চলে যান। অকস্মাৎ যুদ্ধ বেধে ওঠার দরুন এগুলি তিনি অন্যত্র সরাতে পারেন নি। ব্যাপারটা জানবার পর থেকেই সম্পত্তিগুলির প্রতি অসঙ্গত কৌতূহল প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেন অফিসরটি। অথচ এগুলি রক্ষা করাই তাঁর কর্তব্য ছিল। সম্মানিত ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে পরিদর্শনের জন্য আসতেন এখানে। তাঁদের খাতিরে জমকাল ভোজসভার আয়োজন করা হতো এই গৃহটিতে। গভীর রাত অবধি প্রবাহিত হতো সুরার স্রোত। এগুলি ছাড়া আরও বহু অসঙ্গত কাজ তিনি করেছিলেন।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও চমৎকার কতকগুলি মানুষের উপর অধিনায়কত্ব করবার অপূর্ব সুযোগ ভাগ্যই তাঁকে দিয়েছিল। বহু লোকের জীবন এবং শুভাশুভ নির্ভর করেছে তাঁর উপর। এসব দিকে মনোযোগ দিলে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতেন তিনি। কিন্তু সেই সুযোগ হারালেন নিজের দোষেই। বহু দুর্নীতিমূলক কার্য-কলাপ ছিল তাঁর। সেইগুলিরই একটির জন্য পরে সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হয় এবং চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন।

কাশ্মীর প্রশ্ন নিয়ে পাকিস্তান এবং ভারতের সম্পর্ক দ্রুত অবনতির দিকে চলেছিল। সীমান্তের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও জলে উঠছিল বিরাট আকারে। অবস্থা এই পর্যায়ে এসে পড়েছিল আমাদেরই অব্যবস্থিত চিত্ততার দরুন। অধিকাংশ দেশই তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা রাষ্ট্রপুঞ্জে নিয়ে যায় না। আমরা গিয়েছিলাম। পাকিস্তানই এক্ষেত্রে ছিল আক্রমণকারী। অথচ আন্তর্জাতিক সংস্থা এই মুখ্য প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেল। ভারত এবং পাকিস্তানকে বিবাদরত দু'টি দেশ হিসাবে একই পর্যায়ে ফেলে বিরক্তিকর ভাবে চালিয়ে গেল আলোচনার পর আলোচনা। এতে উভয় দেশের সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে ওঠা ছাড়া আর কোন লাভই হলো না।

আমাদের পঞ্জাব সীমান্ত বরাবর পাকিস্তান যে বিশাল সৈন্য সমাবেশ করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৫১ সালেই। কাশ্মীরের মতোই এখানেও তারা চালিয়ে যাচ্ছিল প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ। যুদ্ধ বাধাবার কিংবা ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করাই হয়তো তাদের উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, তাকে কার্যে পরিণত করলে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা সুবিধা অবশ্যই হতো তাদের। সোজা চলে আসতে পারত অমৃতসর কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন স্থান অবধি। পক্ষান্তরে এই সুযোগ গ্রহণ করে পঞ্জাব সীমান্তে আমরা যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠতাম, তবে সমস্যাটির সহজেই একটা মীমাংসা হয়ে যেত। এই ধরনের সুযোগ সবদা আসে না। কিন্তু আমরা অবলম্বন করলাম আত্মরক্ষামূলক পন্থা। কোন স্থানেই অগ্রসর না হয়ে, ফেরোজপুর থেকে পাঠানকোট অবধি বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রাখলাম আমাদের বাহিনীকে। কিন্তু তার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক তৎপরতার পন্থা গ্রহণ করলে (তার যথেষ্ট প্ররোচনাও ছিল) পাকিস্তানের রেল তথা রাজপথের প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র এবং রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাহোর আমরা অধিকার করে নিতে পারতাম। সীমান্তের আত্তারি-ওয়াগাহ্ চৌকির যেমন মাত্র ষোলো মাইল দক্ষিণে অমৃতসরের অবস্থান, তেমনি মাত্র ষোলো মাইল উত্তরে রয়েছে লাহোর। অতএব যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষেরই লক্ষ্যস্থলের দূরত্ব হতো সমান। সমর-কৌশলে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল আমার ব্রিগেড; এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের সব রকম দায়িত্ব গ্রহণে ছিল প্রস্তুত হয়ে।

উল্লিখিত অবস্থায় ভারত সীমান্তের উত্তরে ওয়াগহ্ এবং লাহোরের মধ্যবর্তী

ইছোগিল খাল হয়ত অতিক্রম করতে হতো আমাদের। এটা ছিল একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। তাই এর বিভিন্ন দিকগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতে মনস্থ করলাম। খালটির বহুবিধ বর্ণনা আমাদের কাছে ছিল। অতএব প্রতিবন্ধকটির যথাসম্ভব বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চলে গেলাম বনিয়ান গ্রামে। গ্রামটি ছিল আমাদের সীমান্তের মধ্যে অথচ ইছোগিল খালের নিকটে। এই অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এমন লোকদের খুঁজে বার করে পাঠালাম বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে। আমার প্রয়োজন ছিল খালটির প্রস্থ, গভীরতা, স্রোতের বেগ, পারগুলি কংক্রীটের কিনা, উভয় তীরে কি কি রয়েছে এই সমস্ত তথ্য। এই ভাবে যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ হ'ল তাতে জানা গেল ইছোগিল খালটি প্রস্থে ১০০ থেকে ১২০ ফিটের মধ্যে, গভীরতায় প্রায় ১৫ ফিট, পারগুলি কংক্রীটের এবং খাড়া, আর প্রবেশ ও নির্গমন পথগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে মাইন দ্বারা সুরক্ষিত। বিদেশী একটি পত্রিকা এবং আমাদের নিজস্ব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলে গেল এগুলো। অতঃপর এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে খালটির একাংশের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নক্শা প্রস্তুত করালাম, এবং সেই নকশার অবিকল একটি প্রতিরূপ খনন করিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি খালের জল দিয়ে ভরে ফেললাম। এ ধরনের প্রচেষ্টা এর পর আর কেউ এ অঞ্চলে করে নি, এবং এটি করতে আমাকে এবং আমার লোকজনদের একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সবাই যাতে খালটির বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত হতে পারে এবং হাতে কলমে এই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রতিরূপটিকে অতিক্রম করবার নিজ নিজ ভূমিকা যথোচিত অনুশীলন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই করলাম এত সব। কাগজের উপর অনুশীলনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। তাই লোকজন, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি পারাপারের বাস্তব অনুশীলন করালাম আমার সৈনিকদের। সমস্যাটির মুখোমুখি একদিন হয়তো হতেই হবে আমাদের। তাই প্রত্যক্ষভাবে অভ্যাস করে পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত হয়ে রইলাম। এতে আত্মবিশ্বাসও আমাদের সুদৃঢ় হ'ল। এ ঘটনা হলো আজ থেকে প্রায় পনের বছর পূর্বের।

বিভিন্ন প্রকারের প্রতিরূপ (model) নিয়ে সামরিক তৎপরতার অনুশীলন করতে হতো আমাদের। পরবর্তীকালে একটি অনুশীলনীর সময় আমাদের মহড়া করতে হয় বালুকাবৃত ভূমির উপর (sand model exercise); এবং সেই

মহড়ায় পাক প্রধান সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় আমায়। পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণাত্মক সম্ভাবনাকে বিচার করতে বলা হয় আমাকে। শত্রুপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধের এই খেলাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল।

ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এল ১৯৫২ সালে। সীমান্ত থেকে সরিয়ে নেওয়া হল আমাদের সেনাবাহিনীকে; আর একবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমার ব্রিগেড চলে গেল স্বাস্থ্যকর কসৌলী শৈলাবাসে। এবং, এর কিছুদিন পরেই আমার বদলী হল সামরিক সদর দপ্তরে (Army Head Quarter)।

১১নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডে[৩২] সাড়ে তিন বৎসর অধিনায়কত্বের কালে এমন একটি শক্তিশালী দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ দল গঠন করেছিলাম, যারা শৃঙ্খলা, একতা এবং সামরিক শিক্ষায় ছিল আদর্শস্থানীয়।

সামরিক সদর দপ্তরে সংগঠন বিভাগের অধিকর্তা (Director of Organization) হয়ে এলাম। কয়েক মাস বাদেই মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর অস্থায়ী বদলী (officiating) হিসাবে প্রধান সেনাপতির সহকারীর (Adjutant General) পদে যোগ দিতে হ'ল। জেনারেল কারিয়াপ্পা তখন প্রধান সেনাপতি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে কোন এক উপলক্ষ্যে কারিয়াপ্পা কিছু মন্তব্য করেছিলেন। দিল্লীর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সেই মন্তব্যের একটি বিকৃত বিবরণ প্রকাশিত করে। কারিয়াপ্পা তখন উক্ত পত্রিকাকে একখানা পত্র দিয়ে সেই বিকৃত বিবরণের প্রতিবাদ প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে ঘটনাটি আমাকে বললেন কারিয়াপ্পা। সরকারের ইচ্ছা ছিল উক্ত পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন তিনি। তাই সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন কারিয়াপ্পা।

৩২। এই সময়েই সামরিক সদর দপ্তর থেকে ছত্রী ব্রিগেডের জন্য (Parachute Brigade) স্বেচ্ছা সৈনিক (Volunteers) চেয়ে পাঠান হয়। আমার নাম দিয়েছিলাম। তারপর কিন্তু কোন সংবাদই এ বিষয়ে পাই নি। পরবর্তী এক সময় তৎকালীন সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ (Chief of General staff) মেজর জেনারেল এস. এস. পি. থোরাট লিখিতভাবে সদর দপ্তরে তাঁর অধীনে ডাইরেকটর অফ্ মিলিটারী ইন্‌টেলিজেন্সের পদ আমায় দিতে চান। কিন্তু সবিনয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করি। কারণ যতদিন সম্ভব কর্মতৎপর কোন ব্রিগেডের সঙ্গে কাজ করাই আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল।

সরকারের ইচ্ছা মত মামলা দায়ের করতে হলে চিঠিখানা ফেরত আনা প্রয়োজন। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করলাম যে করেই হোক চিঠিখানা ফেরত আনতে হবে। পণ্ডিত দেবী দত্ত এবং ক্যাপ্টেন ওরারিয়রকে সঙ্গে নিয়ে সেই পত্রিকার দপ্তরে উপস্থিত হলাম। সম্পাদক অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ভদ্রলোকটি আমরা চাওয়া মাত্র বিনা ওজর আপত্তিতে ফেরত দিয়ে দিলেন চিঠিখানা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম সামরিক সদর দপ্তরে। এখানা ফেরত না পেলে নিরীহ প্রধান সেনাপতিকে অত্যন্ত বিশ্রী একটা পরিস্থিতিতে পড়তে হ'ত। এর পর উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে যথারীতি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, এবং অনেকগুলি শুনানীর পর ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি নিষ্কৃতি পান।

দিল্লীর কুশক রোডে আমার প্রতিবেশী ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আর. বি. চোপরা। ১৯৫২ সালে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। রোগটা একটা ফুস্‌ফুসের খানিকটা অংশে সংক্রামিত হয়ে পড়ে, এবং আক্রান্ত অংশটুকুকে কেটে বাদ দেবার জন্য চিকিৎসকেরা রোগীকে পুণার নিকটবর্তী আউন্ধে পাঠাতে সঙ্কল্প করেন। সামরিক হাসপাতালে যখন তাঁকে দেখতে গেলাম, মিসেস চোপরা তখন আকুল হয়ে কাঁদছিলেন। এমন আশঙ্কাজনক রোগীকে বিমানযোগে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা বাদ দিতে হয়েছিল। কারণ কিছু না কিছু ঝাঁকানি লাগতই। অথচ ট্রেনে করে বোম্বাইয়ের পথে পুণা নিয়ে যাবার ব্যাপারেও দেখা দিয়েছিল মুস্কিল। কারণ গাড়ীর সময়-সূচী ছিল এমন বিশ্রী যে পুণার গাড়ী ছেড়ে যাবার মাত্র কয়েক মিনিট বাদে ফ্রনটিয়ার মেল বোম্বাই পৌছয়; এবং অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করে পরবর্তী গাড়ী ধরা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। শ্রীমতী চোপরাকে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে দেখে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আমি নিজের হাতে নিলাম। প্রচলিত নিয়মের মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের কোন উপায় ছিল না। কারণ ফ্রনটিয়ার মেলকে নিয়মভঙ্গ করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কিছুতেই বোম্বাই পৌছুতে দেবে না। অনেক চিন্তা করে একটা মতলব বার করলাম। ইগাতপুরী ছাড়বার পর বোম্বাইয়ের আগে আর কোথাও থামে না ফ্রনটিয়ার মেল। অতএব এই অংশটুকুতেই যা কিছু সময় সংক্ষেপ করবার সুযোগ রয়েছে। গাড়িটিকে এই অংশের মধ্যে পূর্ণবেগে চালিয়ে আধঘণ্টা আগে বোম্বাই পৌছুতে পারলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ব্রিগেডিয়ার চোপরাকে দিল্লী স্টেশনে

গাড়ীতে তুলে দিয়ে তারপর এই উপায়টা শেষ মুহূর্তে একবার পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সেই মত স্টেশনে উপস্থিত হয়ে দেখা করলাম ইঞ্জিন-চালকের সঙ্গে। করুণ অবস্থার কথাটা সমস্ত খুলে বললাম তাকে। তারপর তার সাহায্যের জন্য অগ্রিম কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এক বোতল হুইস্কি হাতে দিয়ে জানালাম আমার অদ্ভুত অনুরোধ। ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতেই খানিকটা সময় লেগে গেল ইঞ্জিন চালকের। পরক্ষণেই উৎফুল্লভাবে সাধ্যমত চেষ্টা করবার প্রতিশ্রুতি দিল সে; এবং, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করল শেষ পর্যন্ত। নির্ধারিত সময়ের তিরিশ মিনিট পূর্বেই গাড়ীটিকে পৌঁছে দিল বোম্বাই। সেখানে আবার স্থানীয় এরিয়া কমাণ্ডার মেজর জেনারেল দৌলত সিং-এর সাহায্যে চোপরাকে পুণার গাড়ীতে তোলবার ব্যবস্থা করলাম। অবশেষে যথাসময়ে পুণা হয়ে আউন্ধ নিয়ে যাওয়া হল চোপরাকে। বক্ষ সংক্রান্ত রোগের প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক কর্ণেল চাক[৩৩] সাফল্যের সঙ্গে তাকে অস্ত্রোপচার করলেন। দ্রুত আরোগ্যলাভ করলেন ব্রিগেডিয়ার চোপরা।

প্রধান সেনাপতির সহকারীর পদে থাকা কালেই, সৈন্যবাহিনীর এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে জনৈক অফিসরকে বদলীর অনুরোধ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Ministry of Defence) থেকে একদিন একটি লিখিত বার্তা পাই[৩৪]। অফিসরটির চাকরীর ইতিহাস নিষ্কলঙ্ক না থাকার দরুন অনুরোধটি রক্ষা করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম। পরদিনই প্রধান সেনাপতি রাজেন্দ্রসিংজী আমায় ডেকে পাঠালেন। একই বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে অনুরূপ একটি বার্তা তিনিও পেয়েছিলেন। সেকথা জানিয়ে ব্যাপারটিতে কিছু করতে বললেন আমায়। এ বিষয়ে আমার আপত্তি আগের থেকেই ছিল। আপত্তির কারণগুলি প্রধান সেনাপতিকে সবিস্তারে জানালাম। আর কোন প্রকার পীড়াপীড়ি করলেন না রাজেন্দ্র-সিংজী। কিছুদিন পর চৌধুরী ফিরে এলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অনুরোধে তিনিও আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে বললেন। সামরিক মহলে প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনেছি, সামরিক স্বার্থের বিনিময়ে কথনই তিনি কোন

৩৩। আমার জামাতাকেও সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার করেছিলেন কর্ণেল চাক।

৩৪। এই ধরনের বদলীর ব্যাপারগুলি প্রধান সেনাপতির সহকারীর দপ্তরে পেশ করতে হ'ত।

সরকারী সুপারিশের কাছে নতিস্বীকার করেন নি। তাঁর নিজস্ব নীতিটিকেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, এ ব্যাপারে কোন প্রকার চাপ মেনে নিতে আমি প্রস্তুত নই। চৌধুরী তখন প্রধান সেনাপতির সহকারী। সে কথাটা মনে করিয়ে দিযে তাঁর হুকুম তামিল করতে আদেশ দিলেন আমায়। এ কথার পর তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিই যে আমিও একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছি, কেবলমাত্র 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' নই; এবং সেই কারণেই আমাদের বিভাগীয় স্বার্থের পবিপন্থী কোন আদেশ আমি পবিপালন করতে প্রস্তুত নই। এর পর ব্যাপাবটি চৌধুরী সেখানেই চেপে যান।

উক্ত ঘটনাব কিছুদিন পবেই চৌধুরী সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন (Chief of General Staff)। সেই সময় সর্বসাকুল্যে দু'টি মাত্র সাঁজোয়া (Armoured) ব্রিগেড ছিল আমাদের। এই দু'টির পরিবর্তে একটি মাত্র রাখার একটি পরিকল্পনা চৌধুবী পেশ করলেন সবকারের কাছে। এ ব্যাপারে সৈন্যাধ্যক্ষদের সম্মতিও আদায় করেছিলেন। ব্যয় সঙ্কোচনের যে কোন প্রস্তাব সে সময় সবকারের কাছে ছিল অতি আকাঙ্ক্ষিত; এবং আলোচ্য প্রস্তাবটিতে মিতব্যয়ীতাব কিছুটা অলীক সম্ভাবনাও ছিল। সাঁজোয়া বাহিনীতে চৌধুবীর সহকর্মীবা কোন প্রকারে ব্যাপারটি জানতে পারেন। কিন্তু যত যুক্তি তর্কের অবতারণাই করুন না কেন প্রস্তাবটি যে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক হবে এ কথাটা চৌধুবী তাঁদের কথনই বোঝাতে পারেন নি। লাভজনক একটি দিক অবশ্য ছিল, তা' হলো ব্যয়সঙ্কোচের একটা পন্থা সরকারেব সামনে তুলে ধবা। চৌধুরীর সহকর্মীদের তাই অভিমত ছিল যে প্রস্তাবটি কেবলমাত্র আমাদেব কার্যকরী ক্ষমতা তথা আঘাত হানবার শক্তিকেই দুর্বল কবে ফেলবে। এবং, যে সময় আমাদের সাঁজোয়া শক্তিকে আবো পরিবর্ধিত কবা প্রয়োজন সেই সময় এ ধরনের একটা পরিকল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চৌধুরীর পক্ষে অনুচিত হয়েছে। (১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে এই সাঁজোয়া বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।)

সমসাময়িক কালেই প্রতিরক্ষা এবং অর্থমন্ত্রক সৈন্যবাহিনীর রেশনও কমিয়ে দেয়। যুক্তি ছিল, রেশনে নাকি ক্যালোবির পরিমাণ অনেক বেশী রয়েছে। ব্যাপারটি সেনাবাহিনীও মেনে নিতে পারে নি; এবং উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষেরও উচিত হয় নি নীরব সম্মতি দেওয়া।

(কয়েক বৎসর পর এই ব্যবস্থার রদ করে পূর্বেকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়।)

চৌধুরী যে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা ছিলেন সে খবরটি ১৯৫৩ সালের কোন এক সময় আমি জানতে পারি উক্ত পত্রিকারই কর্মচারী প্রেম ভাটিয়ার কাছে। খবরটা যথার্থ কিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই চৌধুরী হতচকিত হয়ে পড়েন, এবং সংবাদদাতার নাম জানতে চান। প্রেম ভাটিয়ার নাম উল্লেখ করতেই চীৎকার করে ওঠেন : 'এ কথাটা আপনাকে জানানোর কোন অধিকার ভাটিয়ার নেই'।

১৯৫২-৫৪ সালেও কিছু সংখ্যক এমন জেনারেল ছিলেন যাঁরা রাজনৈতিক নেতা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের খোশামোদ তথা এমন কতগুলি ব্যাপারে লিপ্ত থাকতেন যেগুলি চাকুরীর ঐতিহ্য এবং সামরিক শিষ্টাচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটা দেখাবার জন্যই উপরোক্ত ঘটনাটিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলাম।

দিল্লীতে পরলোকগত রাষ্ট্রদূত আসীফ আলীর শবানুগমনে সাহায্য করতে নেহ্‌রু আমায় নিযুক্ত করেন।[৩৫] কারণ, ওয়াশিংটনে আসীফ আলীর অধীনে কাজ করেছিলাম এবং দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এ কথাটা নেহ্‌রু জানতেন। শহরের ভিতরে বিশাল জনতাকে আয়ত্তে আনতে যখন চেষ্টা করছি এবং বিশেষ একটি প্রবেশ দ্বার থেকে শুরু করে পুরো পথটিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছি সেই সময় জনৈক প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতার মোটর গাড়ী সেই প্রবেশ পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। বাধা-নিষেধের কোন ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম যাতে না হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। ফলে, বাধাদানকারীদের কাছে কোন সুবিধা করতে পারলেন না নেতাটি। ক্রুদ্ধ হয়ে অগত্যা গাড়ী থেকে নেমে ভীড় ঠেলে আমার কাছে উপস্থিত হলেন এবং রাগতস্বরে তাঁর গাড়ীটিকে পথ ছেড়ে দিতে বললেন। কী একটা বিশেষ জরুরী কাজ না কি ছিল তাঁর। সবিনয়ে জানালাম, বর্তমান মুহূর্তে আসীফ আলীর শবানুগমনের চাইতে জরুরী আর কোন কাজ নেই ; এবং নিয়মের কোন ব্যতিক্রমও করা যেতে পারে না ;

৩৫। দিল্লীর চীফ্ কমিশনার পূর্ব থেকেই সমস্ত বন্দোবস্ত করেছিলেন।

করলেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। ভারতবর্ষে কিছু সংখ্যক এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা দুই ধরনের নিয়ম-নীতি পছন্দ করেন: প্রথমটি অন্যদের জন্য, এবং দ্বিতীয়টি নিজের জন্য। তাঁদের ধারণা, প্রতিষ্ঠা এবং পদমর্যাদার দৌলতে জীবনের সর্বপ্রকার বাধ্য-বাধকতা থেকে তাঁরা মুক্ত। ঘটনাটি শুনে পরে একসময় নেহ্রু মন্তব্য করেছিলেন, এই ধরনের ব্যক্তিরা হলেন আমাদের দেশের বর্তমান দুরবস্থারই প্রতিচ্ছবি। এঁদের কোথাও আমরা নির্বাসিতও করতে পারি না; এবং অন্য কাউকে এঁদের পরিবর্তে আমদানীও করতে পারি না। তাই সাধ্যানুসারে এঁদের মানিয়ে নিয়েই আমাদের চলতে হবে।

১৯৫৩ সালে আমাদের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক ভারতে আসছিলেন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমহম্মদ আলী। ব্যাপারটা নেহ্রু পূর্বাহ্নেই সর্বসাধারণ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। তাই অনুমান করা হ'ল যে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে বিমান বন্দরে বিশাল জনতার সমাবেশ হবে। এই ধরনের উপলক্ষ্যে দর্শক সাধারণের বিশৃঙ্খলার দরুন সাধারণতঃ সব কিছু ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এবার তাই জনতাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ রাখার একটা আদর্শ স্থাপন করতে অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন নেহ্রু। কোন রকম গণ্ডগোল যাতে না হয় তার জন্যে আমায় বললেন পালাম বিমান বন্দরে উপযুক্ত একটা সংগঠন গড়ে তুলতে। এই সব উপলক্ষ্যে সাধারণতঃ শেষ মুহূর্তে ভীড়ের চাপে যত সব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই প্রস্তাব করলাম মহম্মদ আলীর বিমান পৌছুবার নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট পূর্বে যেন সকলে, এমন কি অতি সম্মানিত ব্যক্তিরাও (V. I. P.) পালামে উপস্থিত হন। নেহ্রু আমার সঙ্গে একমত হলেন, এবং নির্বিচারে এই নিয়মটি প্রয়োগ করতেও অনুমতি দিলেন। মন্ত্রীসভার দুই জন প্রবীণ সদস্য এ ধরনের উপলক্ষ্যে সাধারণতঃ বিলম্বে উপস্থিত হতেন। বর্তমান উপলক্ষ্যেও যদি তাঁরা বিলম্বে উপস্থিত হন এবং তাঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় তবে আরো অনেকেই সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, এবং এইভাবে সম্পূর্ণ চলাচল ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়বে। তাই কর্মরত আমার স৺ ঙ লোক-জনদের আদেশ দিলাম, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর বিমান পৌছুবার নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট পূর্বে তারা যেন একটি বেষ্টনী রচনা করে কাউকে বিমান বন্দরে প্রবেশ করতে না দেয় এবং এ ব্যাপারে বিলম্বে আগত কোন ব্যক্তি সম্বন্ধেই যেন কোন রকম ব্যতিক্রম প্রদর্শন না করে। আশঙ্কা আমার যথার্থ হল। নির্ধারিত সময়ের

দশ মিনিট পূর্বে না এসে যখন তাঁরা এলেন, বিমানটি তখন সবে ভূমি স্পর্শ করছে। আদেশ অনুযায়ী প্রবেশ পথে তাঁদের বাধা দেওয়া হ'ল। সম্মানিত এই ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি কিছুমাত্র অসৌজন্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। নেহ্‌রুর সম্মতিক্রমে বিশাল এই জন-সমুদ্রকে সংযত করতে চেষ্টা করছিলাম শুধু। জানতাম, একবার যদি এই মনুষ্য-বেষ্টনীর কোন স্থানে ভাঙন দেখা দেয় তা'হলে পশ্চাতের জন-সমুদ্রের চাপে সম্পূর্ণ বেষ্টনীই একেবারে ভেঙে পড়বে; এবং বহুলোক ঢুকে পড়বে সেই পথ দিয়ে। হ'লও তাই। ঘটনাটি কানে যেতেই তৎক্ষণাৎ তাঁদের পথ ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন নেহ্‌রু। যে মুহূর্তে তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হ'ল, সেই মুহূর্তে অপেক্ষমান হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে এল বিশাল এক তরঙ্গের মত। কেউ বাধা দিতে পারল না তাদের। চারদিকে দেখা দিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা।

ভারতবর্ষের জনতা কেবলমাত্র ভীড় করতেই ভালবাসে। কার জন্য যে ভীড় করছে সেইটাই তারা অনেক সময় জানে না। মহম্মদ আলী যেমন বিমান থেকে বেরিয়ে এলেন সেই মুহূর্তে বিরাট একটা ধাক্কা-ধাক্কি পড়ে গেল অপেক্ষমান জনতার মধ্যে। জয়ধ্বনি করে উঠল সেই বিশাল জন-সমুদ্র। কিছু সংখ্যক লোক যেমন জয়ধ্বনি দিল 'মহম্মদ আলী জিন্দাবাদ' বলে, তেমনি কিছু সংখ্যক আবার তাঁর নাম না জানার দরুন চীৎকার করে উঠল, লিয়াকৎ আলী জিন্দাবাদ।' কেমন বিদ্রূপাত্মক হয়ে পড়ল ব্যাপারটা! কারণ মহম্মদ আলীর পূর্বতন পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী কিছুদিন পূর্বেই আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন; এবং এই জনতার একাংশ ভুল লোকের জয়ধ্বনি করে উঠল।

[অপরাপর সম্মানিত অতিথিদের মত ১৯৬০ সালে ক্রুশ্চভকেও দিল্লীতে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়েছিল। বস্তুতঃ যখনই কোন দেশের রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে এসেছেন তখনই তাঁকে দিল্লীতে পালাম থেকে কনটপ্লেস অবধি সারাটা পথ হাজারে হাজারে সারবন্দী ভাবে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা জানিয়েছি আমরা।[৩৬] সম্মানিত অতিথি এদেশে তাঁর তথাকথিত জনপ্রিয়তা দেখে স্বাভাবিকভাবেই গর্ববোধ করেছেন। কারণ, এখানে যে লোকে ভীড় জমায় যে-কোন উপলক্ষ্যে, সে তথ্যটি তাঁর জানবার কথা নয়। ১৯৬১ সালে শ্রীমতী জ্যাকুইলীন কেনেডি যখন এখানে আসেন

৩৬। অনুরূপ অভিনন্দন জানান হয়েছে বোম্বাই, কলকাতা অথবা মাদ্রাজে।

তখন পালামে উপস্থিত বিশাল জনতার মধ্যে একজন গ্রামবাসীর কাছে আমি জানতে চাই কাকে দর্শনের জন্য সে উপস্থিত হয়েছে। লোকটি অতি-সরলভাবে স্বীকার করেছিল যে, সেটা তার সঠিক জানা নেই; তবে গুজব শুনেছে যে একজন সুন্দরী বিদেশিনী রাণী ভারতবর্ষে এসেছেন। অনুরূপ-ভাবে বহু লোক ভীড় করেছিল চৌ-এন-লাই, আইসেনহাওয়ার এবং রাণী এলিজাবেথকে অভ্যর্থনা জানাতে। ক্রুশ্চেভের আগমনে জনতার ভীড় তাই কোন ব্যতিক্রম ছিল না। আমাদের দেশে গ্রামবাসীদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে এ ধরনের উপলক্ষ্যগুলি অন্য যে কোন উপলক্ষ্যের মতই বিরাট একটা 'তামাশা'র ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়।]

একবার সৈন্য সংগ্রহের উপলক্ষ্যে এক জনসভায় (Recruiting Rally) আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়। জনৈক রাজনৈতিক নেতাকে সেই সভায় অভিনন্দন জানাতে এবং তাঁর বক্তব্য শুনতে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হাজার হাজার গ্রামবাসী জড়ো হয়েছিল। তাদের আশা ছিল, নতুন জাতীয় সরকারের তরফ থেকে নেতাটি এমন কিছু বলবেন যার মধ্যে তাদের দুঃখ-দুর্দশা অবসানের কিছুটা আশ্বাস পাওয়া যাবে। কিন্তু বক্তৃতাটিতে নতুন কিছুই ছিল না। সেই দিনই নেতাটির অন্যত্র এক বক্তৃতায় একই কথাগুলি আগেই শুনেছিল তারা। বক্তৃতার সারমর্ম ছিল ভারতকে শক্তিশালী করে তুলতে প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হ'ল তার সরকারের পিছনে এসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান। বক্তৃতা শেষ হবার পর যথারীতি হর্ষধ্বনির রেশ মিলিয়ে যেতেই পক্ককেশ এক বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল নেতাটিকে। কথাগুলি আমার সঠিক মনে নেই। তবে বক্তব্যটি ছিল মোটামুটি এই ধরনের: নতুন ভারত সরকারকে সে তার সর্বস্ব দান করতে প্রস্তুত আছে। ভগবান করুন, হাত তার একদিন নষ্ট হয়ে গেলেও, হস্তধৃত তরবারিটি যেন সর্বদা দেশ সেবার জন্য অক্ষত থাকে। প্রজাদের কাছে নতুন সরকার যা আশা করেন তা শুনে সে আনন্দিত। কিন্তু সরকারের কাছেও কিছু কিছু ন্যায্য দাবী পূরণের আশা প্রজারা রাখে। প্রজাদের প্রতি সরকারের কি কোন দায়-দায়িত্বই নেই? খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্রের মত অতি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি তাদের জোগান সরকারের কর্তব্য নয়? তাদের কোন বিদ্যালয় নেই, হাসপাতাল নেই, পথ-ঘাট নেই। এগুলি তাদের প্রাথমিক চাহিদা। বহু বৎসর ধরে এগুলি থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছে। নেতাটি ফিরে যেয়ে

সরকারকে যেন বলেন, এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যগুলি তাদের না দেওয়া হলে কেউ তাঁদের পিছনে দাঁড়াবে না। কথাগুলি বলেই ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধ।

অধীনস্থ কর্মচারীরা দুঃখ-দুর্দশায় পড়লে সাধ্যমত সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটা প্রথা করে নিয়েছিলাম আমি। এই ধরনের এক সাক্ষাৎকারে একদিন জনৈক করণিক তার দুর্দশার কথা জানাল। লোকটি বেতন পেত যৎসামান্য; এবং তাই দিয়ে বাড়ী ভাড়া, দু'বেলা খাবার সংস্থান, জামা-কাপড়, সন্তানদের শিক্ষা এবং ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে সংসার চালান তার পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়েছিল। বিগত কয়েকমাস ধরে তার অসুস্থ স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অর্থের অভাবে ঔষধ-পত্র অথবা চিকিৎসক, কোন কিছুরই ব্যবস্থা সে করতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার ব্যাপারটা তার পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা বিলাসিতা। জীবনধারণের সমস্যাগুলিতে বিব্রত হয়ে শেষ অবধি তার সুন্দরী, সাবালিকা কন্যা দু'টিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ শিক্ষার খরচ জোগানর সাধ্য তার নেই। মর্মস্পর্শী কাহিনীটি আমায় বিচলিত করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত জনৈক উচ্চপদস্থ সামরিক চিকিৎসককে লোকটির বাসায় যেয়ে তার অসুস্থ স্ত্রীকে পরীক্ষা করতে অনুরোধ করলাম। চিকিৎসকটি ছিলেন যথার্থই একজন সৎব্যক্তি। আমার অনুরোধ রক্ষা করলেন। শুধু তাই নয়, হাসপাতাল থেকে ঔষধপত্রের ব্যবস্থাও করে দিলেন। বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসকের মনোযোগ এবং উপযুক্ত ঔষধপত্র বাড়ীতেই পেয়ে স্ত্রীলোকটি দ্রুত আরোগ্য লাভ করল। মেয়ে দু'টির শিক্ষার বন্দোবস্তও করে দিলাম 'জেসটেট্নার' কোম্পানীতে। শিক্ষাশেষে ভালো কাজও জোগাড় করে দিলাম তাদের। পরিবারটি আবার মানুষের মত দাঁড়িয়ে উঠল। চিকিৎসার জন্য দু'একটি নিয়ম-কানুন অবশ্য ভঙ্গ করেছিলাম। কিন্তু জানতাম, অন্যায় কিছু করিনি।

১৯৫৩ সালের শেষের দিক থেকে শেখ আবদুল্লা এমন কতকগুলি ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করতে শুরু করলেন যার অন্তর্নিহিত অর্থ হল ভারত, পাকিস্তান এবং কাশ্মীরের সন্তোষজনক সম্মতির ভিত্তিতেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। পাকিস্তানের সম্মতির প্রয়োজনীয়তাটি এই প্রথম তিনি

আমদানী করলেন কাশ্মীর সমস্যায়। বস্তুত কাশ্মীরকে যে তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে চান সেকথা পরিষ্কার ফুটে উঠল বক্তৃতাগুলিতে। ভারতের বিরুদ্ধে কাল্পনিক সমস্ত অভিযোগও করতে শুরু করলেন। প্রকৃতপক্ষে একটা 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব গ্রহণ করলেন শেখ আবদুল্লা। স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে উঠলেন নেহ্‌রু। চিঠি লিখলেন। কিন্তু পূর্ব-বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করলেন আবদুল্লা। নেহ্‌রু শেষ পর্যন্ত ঈদের দিন মৌলানা আজাদকে শ্রীনগরে পাঠালেন। আশা করেছিলেন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনোভাব গ্রহণে আবদুল্লাকে সম্মত করাতে পারবেন তিনি। কিন্তু সেই দিনই ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে শ্রীনগরে চরম উত্তেজনাপূর্ণ এক বক্তৃতা দিলেন আবদুল্লা। অতএব তিনি যে কোনরকম যুক্তি-পরামর্শকেই আমল দেবেন না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে আজাদ ফিরে এলেন দিল্লীতে।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি ডি. পি. ধর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীরের তৎকালীন বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানালেন। সব শুনে, মন্ত্রীসভার 'শক্ত মানুষ' রফি আহ্‌মেদ কিদোয়াইকে টেলিফোন করলেন নেহ্‌রু, এবং অবিলম্বে ডি. পি. ধরের সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করলেন। পরের দিন সকালে কিদোয়াই এবং ডি. পি. ধরের মধ্যে সাক্ষাৎকার হল। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে সংক্ষিপ্ত এই মন্তব্য দু'টি করলেন কিদোয়াই :

(ক) সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হ'ল কাশ্মীর। সেখানকার ঘটনাবলী তাই বিশেষ কোন একটি ব্যক্তি অথবা দলের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ সেখানে যাই ঘটুক না কেন তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সারা ভারতের উপর হতে বাধ্য।

(খ) শেখ আবদুল্লাকে অপসারণ করার সময় এসে গেছে।

তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব করে একখানা চিঠি লিখলে শেখ আবদুল্লার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ডি. পি. ধরের কাছে জানতে চাইলেন কিদোয়াই। আবদুল্লা যে ইদানীং কতখানি স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিলেন সে কথা ধর-এর জানা ছিল। তাই আবদুল্লার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে পরামর্শ দিলেন তাঁকে দিল্লীতে ডেকে না পাঠিয়ে

সাক্ষাৎকারের জন্য কিদোয়াই নিজেই শ্রীনগর যাবার প্রস্তাব করলে ভাল হয়। তদনুসারে আবদুল্লাকে পত্র লিখলেন কিদোয়াই। উত্তরে আবদুল্লা জানালেন, সাক্ষাৎকারে কোন লাভ ত হবেই না বরং আপোষ মীমাংসার কোন প্রচেষ্টা কিদোয়াই-এর তরফ থেকে হলে তাঁর নিজেরই সুনাম বিনষ্ট হবার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরটা পেয়েই আবদুল্লাকে টেলিফোন করলেন কিদোয়াই। বললেন, তাঁর সুনাম সম্বন্ধে আবদুল্লা যেন অনর্থক চিন্তিত না হন; এবং আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটার একটা সমাধান করবার সুযোগ দু'জনেরই নেওয়া উচিত। এর পরও কিন্তু টললেন না আবদুল্লা। সাক্ষাৎ করতেও রাজী হলেন না। কিদোয়াই বিরক্ত হলেন। জুলাই মাসের ২৫ তারিখ নাগাদ ডি. পি. ধরের সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎ করলেন। কাশ্মীরের বিভিন্ন নেতৃবর্গের মধ্যে ধূমায়িত প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং সর্বস্তরের অসন্তোষজনক অবস্থার কথা কিদোয়াইকে আবার জানালেন ডি. পি. ধর। ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিল হয়ে দাঁড়াল। ডি. পি. ধর এর পর পণ্ডিত নেহ্‌রু এবং কিদোয়াইয়ের সঙ্গে একত্রে সাক্ষাৎ করলেন। সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে দু'জনেরই মতামত জানতে চাইলেন নেহ্‌রু। কিদোয়াই রইলেন নিরুত্তর, কিন্তু ডি. পি. ধর নিজের মত প্রকাশ করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সমস্যা মোকাবিলা করবার একমাত্র উপায় হ'ল কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নেহ্‌রু নিঃশব্দে শুনলেন; তারপর আবদুল্লার সর্বশেষ পত্রখানা বার করে এগিয়ে দিলেন ডি. পি. ধরের কাছে। অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে আবদুল্লা লিখেছিলেন:

(ক) কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদাকে ভারত নষ্ট করছে। ফলে কাশ্মীরীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক অসন্তোষ।

(খ) তিনি এত ব্যস্ত রয়েছেন যে নেহ্‌রুর সঙ্গে কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষে দিল্লী আসা সম্ভব নয়। (প্রস্তাবটা নেহ্‌রুই করেছিলেন।)

(গ) ব্যক্তিগতভাবে নেহ্‌রুকে তিনি শ্রদ্ধা করলেও দৈনন্দিন জীবনে কখনো কখনো দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরে স্থান দিতে হয়।

চিঠিখানা পড়ে কোন মন্তব্য করলেন না ডি. পি. ধর। নেহ্‌রু তখন

সেটাকে কিদোয়াই-এর হাতে তুলে দিলেন এবং তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। নিঃশব্দে চিঠিখানা পড়লেন কিদোয়াই। তারপর আবদুল্লার মতানুসারেই ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন নেহ্রুকে। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের চাইতে জাতীয় স্বার্থের গুরুত্ব অনেক বেশী। (আসলে তিনি আবদুল্লার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ ই নেহ্রুকে দিলেন।)

নেহ্রুর আবাসস্থল থেকে বেরিয়ে এসে আবার নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন তাঁরা। দু'জনেই একমত হলেন যে প্রয়োজন পড়লে কাশ্মীরে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার দায়িত্বও নিলেন কিদোয়াই। কারণ ধর-এর সন্দেহ ছিল, এই ধরনের ব্যাপারে নেহ্রু মধ্যপন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী; এবং কোন প্রকার চরম পন্থা গ্রহণে তিনি সম্মতি দেবেন না।

ডি. পি. ধর প্রথমে কিদোয়াই এবং পরে নেহ্রুকে অনুরোধ করেছিলেন যেন এই ব্যাপারে তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যের জন্য আমাকে কাশ্মীরে পাঠান হয়। কিদোয়াই ও ধরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নেহ্রুর আগে থেকেই সন্দেহ ছিল। এর সঙ্গে যখন আমার নাম যুক্ত হলো তখন আশঙ্কাটা যেন সামনে এসে দাঁড়াল তাঁর। সন্দেহ করলেন, এই ত্রয়ী সম্মেলন হয়ত এমন কোন স্বেচ্ছাচারপূর্ণ এক তরফা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেটা তিনি মেনে নিতে পারবেন না। তাই প্রথমটা তিনি ইতস্ততঃ করলেন। কিন্তু প্রবল অনুরোধ শেষ অবধি এড়াতে পারলেন না। বেসরকারীভাবে আমাকে কাশ্মীরে পাঠাতে সম্মত হলেন। এদিককার ব্যবস্থা ঠিক করে ডি. পি. ধর ফিরে গেলেন শ্রীনগরে। সেখান থেকেই নিয়মিতভাবে অবস্থা সম্পর্কে কিদোয়াইকে ওয়াকিবহাল রাখতে থাকেন।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাস শেষ হয়ে এল। সারাদিন অফিসে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাই একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে মনস্থ করলাম। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় টেলিফোনে সংবাদ এল প্রধানমন্ত্রী নেহ্রু অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বাড়ি আর ফেরা হ'ল না। ছুটলাম বৈদেশিক দপ্তরে। কামরার মধ্যে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই নেহ্রু পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রাখলেন, বেসরকারীভাবে আমাকে ডেকেছেন তিনি এবং আমাদের কথোপকথন যথারীতি নথিভুক্ত করা হবে না। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন কাশ্মীরে প্রকৃতই কী ঘটছে আমি

জানি কি না। সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হচ্ছিল, তার অধিক কিছুই জানতাম না। এবং সেগুলি পাঠ করে আমার ধারণা হয়েছিল, কাশ্মীরে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেই কথাই বললাম তাঁকে। নেহ্রুও স্বীকার করলেন। বললেন আভ্যন্তরীণ দিক থেকে কাশ্মীরকে[৩৭] শক্তিশালী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করাটাই হলো আসল সমস্যা। সেটা যদি একবার করা সম্ভব হয়, তবে বাইরে থেকে যত চাপই আসুক না কেন সেখানে ভারতের অবস্থাকে কেউ দুর্বল করতে পারবে না।

ভারতের প্রতি শেখ আবদুল্লার মনোভাব অকস্মাৎ কঠোর হয়ে উঠেছিল। নেহ্রুর কাছে প্রতিদিন বহু উদ্বেগজনক সংবাদ আসছিল কাশ্মীর থেকে। এ ধরনের ঔদ্ধত্য অতীতে কোন দিন শেখ আবদুল্লা দেখান নি। অনেক নতুন নতুন বিতর্কিত বিষয়েরও ইদানীং উল্লেখ করতে আরম্ভ করেছিলেন। ফলে, কাশ্মীরে নেমে এসেছিল চরম বিশৃঙ্খলা। যুবরাজ করণ সিং, শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর সহকারী বকশী গুলাম মহম্মদ এই তিন জনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তীব্র বিভেদ। সে সমস্ত উল্লেখ করে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আমায় কাশ্মীর যেতে অনুরোধ করলেন নেহ্রু। বললেন, যদিও নিয়মিত বেসামরিক কর্তৃপক্ষের (Normal Civil Agency) প্রতি ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত রাখতে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে, তবু তাঁর ইচ্ছা এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁর তরফ থেকে ঘটনা প্রবাহের প্রতি যেন আমি লক্ষ্য রাখি ও তাঁকে জানাতে থাকি।

প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে দশ দিনের ছুটি নিয়ে বেসরকারীভাবে শ্রীনগরে অবতরণ করলাম। আমি যে কাশ্মীরে যাচ্ছি সে কথাটা নেহ্রু পূর্বাহ্ণেই সংশ্লিষ্ট সবাইকে টেলিফোনযোগে জানিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীনগরে আতিথ্য গ্রহণ করলাম মেজর জেনারেল হীরালাল অটলের এবং পৌঁছুবার

৩৭। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই নেহ্রু বলেছিলেন, 'কাশ্মীর সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এবং তা' থেকে আমরা নড়ব না......সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের কাছেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে আর কোন তর্জন-গর্জন অথবা শাসানীর কাছেই নতি স্বীকার করব না আমরা।'

এবং এর কয়েকদিন পর কৃষ্ণমেনন বলেছিলেন, 'কাশ্মীর সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব যদি দুর্বোধ্য মনে হয়, তবে আমাদের তরফের ভুল ধরে লাভ নেই; গণ্ডগোলটা রয়েছে শ্রোতাদের তরফেই।'

পরই ভদ্রতার খাতিরে সাক্ষাৎ করলাম শেখ আবদুল্লার সাথে। কথা প্রসঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ করলেন শেখ। বললেন, কাশ্মীরের জনসাধারণই নিজের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এমনও হতে পারে যে ভারত কিংবা পাকিস্তান কারও সঙ্গে যোগ না দিয়েই স্বাধীনভাবে থাকবারই মতামত প্রকাশ করবে তারা। যখন জিজ্ঞেস করলাম, কাশ্মীর স্বাধীন হলে ভারতের চার কোটি মুসলমানের ভাগ্যে কি হবে, তার উত্তরে আবদুল্লা স্পষ্ট বললেন, সেটা তাঁর দেখবার নয়। এবং ভারত যদি কাশ্মীরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বন্ধ না করে তবে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হবেন। পরিশেষে স্মরণ করিয়ে দিলেন, জনগণ যে তাঁকে বৃথাই শের-এ-কাশ্মীর (কাশ্মীর সিংহ) আখ্যা দেয় নি সে কথাটি ভারত যেন মনে রাখে।

আমি যে বিদ্রোহী আবদুল্লার সঙ্গে বার্তালাপ করছিলাম সে বিষয়ে আমার মনে আর কোন সন্দেহই ছিল না। এমন একদিন ছিল যেদিন জনতার চোখে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় একজন নেতা। কিন্তু অমিতাচারী প্রশাসন, মাত্রাহীন অবিচার এবং স্বজন-পোষণের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর অন্য এক রূপ আজ জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। অন্যায়ভাবে বহু আনুকূল্য তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন, এবং প্রদান করেছিলেন আশ্রিতবর্গকেও। ব্যক্তিগত ব্যবহারেও হয়ে পড়েছিলেন অশালীন, নির্মম এবং উদ্ধত। ক্রমশঃ বিশ্বাস হারিয়েছিলেন জনগণের। এই সমস্ত কারণে বহু অভিযোগ এসেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, যে লোক নিরীহ কাশ্মীরবাসীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছেন তাঁরই প্রতি নেহরুর ক্রমাগত সমর্থনের জন্যও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সবাই।

কাশ্মীরবাসীদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য এবং দুরবস্থার প্রতিকার করবার সঙ্কল্প অথবা উদ্দেশ্য কোনটাই প্রদর্শন করেন নি আবদুল্লা। বরং জনগণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করবার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভাবন করেছিলেন। ভারতভুক্তির যে পরিকল্পনাকে একদিন তিনি নিজেই জন্ম দিয়েছিলেন, সেই ভারতভুক্তিকে ইদানীং শুরু করেছিলেন 'মারাত্মক' বলে প্রচার করতে। জনগণের শক্তিই একদিন কাশ্মীরকে প্রদান করেছিল স্বায়ত্বশাসনের অধিকার। এই গণশক্তিই ১৯৪৭ সালে প্রতিহত করেছিল সীমান্তে অপর পার থেকে অকারণ আক্রমণ। আবার এই গণশক্তিই আবদুল্লাকে শীর্ষস্থানে বসিয়ে সরকার গঠনের সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। আবদুল্লার মাধ্যমেই তারা আশা

করেছিল আভ্যন্তরীণ সংস্কার তথা উন্নতি সাধনের সঙ্গে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে পালন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এ সবকিছুর দায়িত্ব ছিল তাঁর। কারণ, সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হবার দরুন তাঁর হাতে ছিল ব্যাপক ক্ষমতা। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ সম্পূর্ণ বিপরীত এক চিত্র উদ্ঘাটন করল। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আবদুল্লা ব্যর্থ হলেন। অর্থনৈতিক উন্নতির পরিবর্তে জনগণকে করে তুললেন আরও দুর্দশাগ্রস্ত। উৎকোচ এবং অন্যান্য দুর্নীতিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে ব্যর্থ তো হলেনই, বরং তাঁর নিশ্চিত আশ্রয়ে সেগুলি আরও উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ভূমি-সংস্কার অথবা কৃষকদের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যের দিকেও কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারলেন না তিনি। জনগণের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে করলেন না সামান্যতম প্রচেষ্টাও। কাশ্মীরীরা আগের মতই রয়ে গেল অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে। এখানে যে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন কোন চিহ্নই দেখা গেল না কোথাও। এই সমস্ত দুঃখজনক এবং অপযশমূলক ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও একাধিকবার প্রকাশ্যে ঘোষিত স্বীয় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলিকেও[৩৮] অমান্য করবার নিশ্চিত লক্ষণ প্রকাশ করতে শুরু করলেন আবদুল্লা।

এই ধরনের বিশৃঙ্খলা অধিক দিন ধরে চলতে দেওয়া যায় না। এমত অবস্থায়, অতএব, তাঁর মত একজন নেতার যে পতন হবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে এ ধরনের ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। আকাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শ লাভে যখন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যর্থ হয় তখন সেই আদর্শের পরিপন্থী যা কিছু বিকৃত, অসৎ এবং ক্ষতিকারক, সেগুলিকে ছেঁটে-ফেলা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কাশ্মীরেও হয়েছিল ঠিক তাই। জনগণের জীবনযাত্রার সন্তোষজনক উন্নতিবিধানে ব্যর্থতা, শ্বাসরোধকারী সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদে অক্ষমতা এবং অশিক্ষা তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে অসামর্থ্যের দরুন আবদুল্লাকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। সব চাইতে মারাত্মক যেটা হয়েছিল তা' হল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চূড়ান্ত অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। অথচ এই অভীষ্টের প্রতিই মনঃসংযোগ করা উচিত ছিল সর্বাগ্রে।

৩৮। সর্বোপরি, তাঁর আমলে আইন-শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙে পড়ে এবং সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরে দেখা দেয় চরম অরাজকতা।

অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল ভারতবর্ষেও। আবদুল্লার দাবী অনুসারে কাশ্মীরকে এমন কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, যেগুলি অন্য কোন অঙ্গরাজ্য পায় নি। জনমতকে পদদলিত করেছিলেন আবদুল্লা; প্রশ্রয় দিয়েছিলেন জাজ্বল্যমান কুশাসনের; এবং সর্বোপরি ভারতের উদ্দেশ্যে শুরু করেছিলেন তীব্র অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধীতা। তাই অসন্তোষের প্রশ্ন উঠেছিল চারদিকে,—এ সমস্ত সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কেন আবদুল্লাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছেন?

বকশী, ডি. পি. ধর এবং যুবরাজ করণ সিং-এর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হ'ল। কাশ্মীরের শাসক যুবরাজ করণ সিং ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত একজন যুবক। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে মানিয়ে চলা ইদানীং যে কতখানি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে সে কথা তাঁরা দু'জনেই বললেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমাদের সন্দেহ হ'ল গোপন কোন অভিসন্ধি রয়েছে শেখ আবদুল্লার। পরবর্তী তিনদিন ধরে তাঁর চলাফেরা কেমন রহস্যাবৃত হয়ে রইল। আমাদের প্রহরা কিন্তু অব্যাহত রাখলাম। ইতিমধ্যে একদিন আবদুল্লার গোপন অভিসন্ধির সংবাদ আনলেন ডি. পি. ধর এবং বকশী। তারা খবর পেয়েছিলেন কয়েকদিনের মধ্যেই গুলমার্গ যাবেন শেখ। শ্রীনগর থেকে মোটরে গুলমার্গ ঘণ্টাখানেকের পথ। সেখান থেকে সীমান্ত হ'ল মাত্র সাত মাইল। সীমান্তের ওপার থেকে শেখের কয়েকজন বন্ধু গুলমার্গে আসবেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেবার পরই বকশী, ধর এবং আরও কয়েকজনকে মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হবে। তারপর তাঁদের স্থানে নিজের দৃঢ় সমর্থক কয়েকজনকে নিয়ে মন্ত্রীসভায় স্বীয় আসন সুরক্ষিত করবেন আবদুল্লা। এবং সর্বশেষে, একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান পূর্বক সেখানে কাশ্মীরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভারতকে (পাকিস্তানকে কিন্তু নয়) বলবেন কাশ্মীর হতে তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নিতে। কাশ্মীর সমস্যার নিজের মনোমত 'সমাধান' এই ভাবেই করবার মতলব করেছেন শেখ।

সারারাত ধরে এই গুরুতর তথা বিস্ফোরক পরিস্থিতিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার-বিশ্লেষণ করলাম যুবরাজ, বকশী, ডি. পি. ধর এবং আমি। সবাই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলাম যে আবদুল্লার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সময় এসে গেছে। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে ভারতভুক্ত হয়েছিল

কাশ্মীর। এই অবস্থায় তাকে যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করতে দেওয়া হয়, তা'হলে সীমান্তের অপর পার থেকে যে অন্য কোন শক্তি তথাকথিত ন্যায়সঙ্গত অছিলায় সেই শূন্যস্থানে এসে হাজির হবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ১৯৪৭ সালেও[৩৯] ঠিক তাই হয়েছিল। কাশ্মীর আক্রমণ করে সেই আক্রমণের উপযুক্ত কারণও দর্শান হয়েছিল; যেন বিদেশী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণকেও সমর্থন করা যায়।

অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করলাম আমরা। তবু মনে হল, আর অগ্রসর হবার আগে, কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা নেহ্রুকে জানন দরকার। এই রকম একটা জটিল ব্যাপার টেলিফোনে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই ঠিক হল, অবিলম্বে আমি দিল্লী যাব।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল চারদিক ঘিরে। বানিহাল গিরিপথের উপর ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিচ্ছিল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। সময় কিংবা আবহাওয়া কোনটাই বিমান চলাচলের উপযুক্ত নয়। বিমানচালক ফ্লাইট লেফ্টনাণ্ট্ গামা এই অস্থির দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই সাবধান করে দিলেন। কিন্তু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে সেই সন্ধ্যাতেই দিল্লী রওনা হতে সম্মত হলেন। ১৯৫৩ সালের ২রা আগস্ট তারিখে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আমরা আকাশে উঠলাম। বানিহাল গিরিপথের উপরে পৌঁছুতেই বিক্ষুব্ধ মেঘমালার মুখে পড়ে গেল আমাদের বিমান। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম[৪০] করে অবশেষে শেষরাতে দিল্লী নামলাম। গামার দৃঢ়তা এবং বিমানচালনায় দক্ষতার জন্যই এটা সম্ভব হ'ল।

বিমান বন্দর থেকে সোজা চলে গেলাম নেহ্রুর আবাসে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, তৎকালীন অবস্থার কথা তাঁকে সব খুলে বললাম। এও জানালাম, আবদুল্লা এমন একটা ফন্দী বার করতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন যার দ্বারা ভারতের সঙ্গে (এবং পাকিস্তানের সঙ্গেও?) দর কষাকষি করা যেতে

৩৯। একই ঘটনা ঘটে।

৪০। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন বিমানের প্রধান প্রধান নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রগুলি সাময়িকভাবে বিকল হয়ে যায়। এই অবস্থায় গামা বিমান চালনায় স্বীয় অভিজ্ঞতা, উত্তম এবং সাহসের উপর নির্ভর করেই বিমানটি চালিয়ে যান। ব্যাপারটা অবশ্য খুবই বিপজ্জনক ছিল। তাঁকে একটি সামরিক সম্মান দেবার জন্য সুপারিশ করি আমি। কিন্তু তা রক্ষা করা হয় নি।

পারে। শুধু তাই নয়, ভারসাম্যটুকু নিজের হাতেই রয়েছে মনে করে ইচ্ছামত সর্ত্তাবলী আরোপ করবার ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করতে শুরু করেছেন। সব শুনলেন নেহ্‌রু। তারপর বললেন, যুবরাজ, বকশী এবং ডি. পি. ধর যাই সঙ্কল্প করে থাকুন না কেন, আবদুল্লাকে যেন কোন অবস্থাতেই বন্দী করা না হয়; কারণ এই ধরনের কাজের কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ কখনই আমরা বিশ্বের কাছে দিতে পারব না। এ কথার পরও বললাম, আবদুল্লাকে কাশ্মীরে যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা দিলে তিনি যদি বকশী, ডি. পি. ধর এবং অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রীকে ভিত্তিহীন অভিযোগে বন্দী করতে সফল হন, তা'হলে ভারতের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। তথাপি নিজের মতে অটল হয়ে রইলেন নেহ্‌রু! আর কিছুই করবার ছিল না আমার। কাশ্মীরের সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁর বক্তব্য জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম।

পরের দিনই শ্রীনগর ফিরে এলাম। নেহ্‌রুর মতামত শুনে যুবরাজ, বকশী এবং ধরের প্রতিক্রিয়া হ'ল বিভিন্ন ধরনের। বিভ্রান্তিকর, মারাত্মক একটা অবস্থার ভিতরে পড়ে গেলাম আমরা। জানতাম, আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করার কথা পূর্বাহ্ণে জানালে নেহ্‌রু নিশ্চয়ই বাধা দেবেন। পক্ষান্তরে স্বাধীন আবদুল্লা কাশ্মীরের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক তথা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিলেন। অতএব অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায়, নেহ্‌রুর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে বন্দী করা একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ উত্তপ্ত আলোচনার পর সকলেই একমত হলাম যে আবদুল্লাকে অপসারণ করবার সময় এসে গেছে; এবং তিনি যদি নিজের পরিকল্পনা মত চলতেই থাকেন, তা'হলে প্রয়োজনবোধে নেহ্‌রুর অজ্ঞাতসারেই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হবে। (যুবরাজ অবশ্য এই ধরনের কিছু করবার আগে নেহ্‌রুকে জানাবার কথা বারংবার বলেছিলেন।)

গুলমার্গ রওনা হবার অব্যবহি· পূর্বে শেখ আবদুল্লা অনেকদিন পর যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। এই সুযোগে শেখের কুশাসনের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে তাঁকে সংযত হতে উপদেশ দিলেন যুবরাজ। অভিযোগগুলি শুনে আহত হবার ভান করলেন আবদুল্লা; অভিযোগগুলিকে অস্বীকার করলেন। যুবরাজ কিন্তু পুনরুক্তি করলেন নিজ বক্তব্যের। এরপর শেখ চলে গেলেন গুলমার্গে। রাজ্যের অভ্যন্তরে অব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য শেখকে

দায়ী করে সংবিধান সভার বহু সদস্য লিখিত প্রতিবাদপত্র আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আবদুল্লার কাছে।

সেই অপরাহ্নেই নিশ্চিত সংবাদ মিললো, শেখ আবদুল্লা দুই দিন পরে নিজ পরিকল্পনাটিকে কার্যে রূপায়িত করতে মনস্থ করেছেন। পরিকল্পনার কথাটা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার ভিতরে বকশী এবং আমি ডি. পি. ধরের বাসভবনে মিলিত হলাম। সেখান থেকে তিনজনে গেলাম যুবরাজের কাছে। অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হ'ল আবার। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল, যে-হেতু আবদুল্লা দেশের আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছেন, তাই ৮ই আগস্ট রাত্রেই তাঁকে বন্দী করা হবে। কাশ্মীরের অবস্থা যে কতখানি গুরুতর হয়ে পড়েছিল, সেকথা সত্যিই দিল্লীর জানা ছিল না!

সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় পূর্বাহ্ণেই অনেকগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ল। মহুরার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র এবং শ্রীনগরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এই দু'টিই ছিল অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের পক্ষে সব চাইতে অনুকূল স্থান। তাই সুরক্ষিত করা হ'ল সে দু'টিকে।

শেখ আবদুল্লাকে কয়েদ করবার জন্য গুলমার্গে পাঠান হ'ল পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট্ এল. ডি. ঠাকুর এবং ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট্ গুলাম কাদিরকে। তার আগেই জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট ফোর্সের লেফ্‌টনাণ্ট্ কর্ণেল বলদেব সিং শেখের হাতে তাঁর বরখাস্তের হুকুমনামা দিয়ে এসেছিলেন। কারও যে এতদূর দুঃসাহস হতে পারে সেটা আবদুল্লা কল্পনাও করেন নি। তাই 'হুকুমনামা' হাতে পেয়েই ক্রোধে চীৎকার করে উঠেছিলেন প্রথমটা। কিন্তু পরে নীরবে এটিকে মেনে নেন। উধমপুরে তাঁকে আটক রাখা সাব্যস্ত হয়েছিল। প্রার্থনা সাঙ্গ করে এবং আকাশবাণীর সংবাদ শুনে তারপর উধমপুর যাত্রা করলেন শেখ। এ ঘটনা ঘটল ৯ই আগস্ট প্রত্যূষে।

গোপনীয়তার অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে সম্মানিত বন্দীসহ ভ্যানগাড়ী গন্তব্য-স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। আমি সে সময় শ্রীনগরের পাঁচ মাইল দূরে গুলমার্গের দিকে পথপার্শ্বে অপেক্ষা করছি। এমন সময় গাড়ীটি দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। এত সতর্কতা সত্ত্বেও শেখের গ্রেপ্তারের সংবাদ কী জানি কী ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

জম্মু ও কাশ্মীরের নতুন প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করলেন বকশী গুলাম মহম্মদ। সেই অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করবার পর-পরই কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। শ্রীনগর শহরের মধ্যে নিজেদের শ্বেতবর্ণের জীপগাড়ীতে ছুটোছুটি করতে দেখা যায় রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষকদের। অথচ তাঁদের সে সময় থাকবার কথা ছিল সীমান্তবর্তী এলাকায়। যাই হোক, বকশী এবং ধর উভয়েই এই ব্যাপার-গুলোকে দৃঢ় হস্তে দমন করেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সেই সময় আমি ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলাম, এবং শ্রীনগর তথা কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য আমাকে যা কিছু করতে বলা হয়েছিল, তাও করেছিলাম।

৯ই আগস্ট তারিখেই যুবরাজ করণ সিংকে টেলিফোনে ডেকে আবদুল্লাকে গ্রেপ্তারের অনুমতি দেবার জন্য তিরস্কার করতে শুরু করেন নেহ্রু। বিস্ফোরণের আংশিকমাত্র শুনেই বিচলিত যুবরাজ টেলিফোনটি দিয়ে দেন এ. পি. জৈনের হাতে। জৈন ততক্ষণে শ্রীনগর পৌছে গিয়েছিলেন। সেই প্রচণ্ড তিরস্কারের সবটুকু নিজে গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে, জৈন আবার টেলিফোনটি এগিয়ে দেন ডি. পি. ধরের দিকে। কিন্তু কেবল মাত্র চীৎকার ছাড়া আর সব কিছুই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল!

দু'দিন পর দিল্লীতে নেহ্রুর সঙ্গে আমার দেখা হতেই তাঁর আদেশ অমান্যপূর্বক আবদুল্লাকে কারারুদ্ধ করায় প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু যেমন দিন অতিবাহিত হতে থাকে, এবং কাশ্মীরে চরম উত্তেজক মুহূর্তে 'তাঁর' কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণের সমর্থনে জনসাধারণের অনুমোদন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমন তেমন বিগত ঘটনার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে নেন তিনি, এবং এই বিদ্রূপাত্মক প্রশংসাও স্বীকার করে নেন।

কোরিয়ার ভাষায় কোরিয়া শব্দটি 'কোজেন' (Chosen) বলে পরিচিত, যার অর্থ হল প্রশান্ত প্রভাতের দেশ। প্রধান উপদ্বীপটি ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে প্রায় তিন হাজারের মত দ্বীপ। প্রধান উপদ্বীপটির (দ্বীপগুলি বাদ দিয়ে) দৈর্ঘ্য ৬০০ মাইল, প্রস্থ ১৩৫ মাইল এবং মোট আয়তন হল ৮৫,০০০ বর্গমাইল। এর তিন-চতুর্থাংশ পর্বতময়। সর্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা ৯,০০০ ফিট। প্রাচীন এক সভ্যতার ধারক এখানকার অধিবাসীরা দৈহিক দিক থেকে বলিষ্ঠ, এবং প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। ১৯০৫ সালে রাশিয়া-জাপান যুদ্ধের পর কোরিয়া চলে যায় জাপানের অধিকারে।

১৯৪৩ সালে মিত্রশক্তির শীর্ষবৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কায়রোয়। সেই বৈঠকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কোরিয়াকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে আমেরিকা, চীন এবং ইংলণ্ড। রাশিয়ার সম্মতিসহ এই প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ঘোষিত করা হয় ১৯৪৫ সালে, পট্‌স্‌ডামে। এও স্থির হয় যে, ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার উত্তর এবং দক্ষিণে অবস্থিত জাপানী সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করবে যথাক্রমে রাশিয়া এবং আমেরিকার কাছে। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া, ইংলণ্ড, এবং আমেরিকা, কোরিয়ার জন্য একটি অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাঁচ বছরের জন্য কোরিয়ায় একটি চতুঃশক্তি অছি পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও এর মধ্যে ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটি শেষ অবধি পাঠান হয় রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে। কারণ, কোরিয়ার শাসন পরিচালনার জন্য, নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠনের দায়িত্ব দেবার কথা ছিল একটি যুক্ত কমিশনের উপর ; এবং এই কমিশন স্থাপনের ব্যাপারেই মতানৈক্য হয়ে গেল আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে। রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ ১৯৪৭ সালে সুপারিশ করে যে, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কোরিয়ায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে। এবং সম্ভব হলে, সরকার প্রতিষ্ঠার নব্বই দিনের মধ্যেই আমেরিকা এবং রাশিয়ার দখলকারী সৈন্যদের সরিয়ে নিতে হবে কোরিয়া থেকে। তা' ছাড়া, কোরিয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সমগ্র দেশের জন্য একটিমাত্র জাতীয় সরকার গঠনের সুপারিশ করতে একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাবও করে সাধারণ পরিষদ। রাশিয়ার প্রতিনিধি কিন্তু এই প্রস্তাবে ভোট দিতে অসম্মত হন ; এবং কমিশনকে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করতে দিতেও সম্মত হন না। অতএব, কমিশনের কাজ দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যেই সীমিত হয়ে রইল। ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দক্ষিণে আমেরিকার অঞ্চলে রিপাবলিক অফ্‌ কোরিয়া (Rok) গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং এই 'রক'-এর নতুন রাষ্ট্রপতিরূপে মনোনীত করল ডঃ সীগম্যান রী-কে। এদিকে আবার রাশিয়াও ১৯৪৮ সালের অগাস্ট মাসে উত্তর কোরিয়ায় নিজেদের অঞ্চলে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে রিপাবলিক অফ্‌ কোরিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্বক সমগ্র উপদ্বীপের উপর অধিকার দাবী করে বসল। এইভাবে ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দুই দিকে দু'টি ভিন্ন আদর্শবাদী সরকারের অধীনে কোরিয়া হয়ে গেল দ্বিধাবিভক্ত। রাশিয়ার সৈন্য বাহিনীকে ১৯৪৮ সালের

ডিসেম্বর মাসে এবং আমেরিকার সৈন্যবাহিনীকে ১৯৪৯ সালের জুন মাসে সরিয়ে নেওয়া হ'ল কোরিয়া থেকে।

সীগম্যান রী উত্তর কোরিয়া আক্রমণের হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই হুমকিকে কার্যে পরিণত করবার পূর্বেই ১৯৫০ সালের ২৮শে জুন তারিখে উত্তর কোরিয়ার সৈন্য বাহিনী ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দেশের দুই অংশের মধ্যে বেধে গেল যুদ্ধ। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যার্থে প্রেরণ করল নিজেদের সৈন্যবাহিনী। ১৯৫০ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআর্থার কোরিয়ার রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যের উপস্থিতির কথা জানালেন। একদিকে উত্তর কোরিয়া ও চীনের কম্যুনিস্ট বাহিনী, এবং অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ও ইংলণ্ড এবং আমেরিকাসহ অপর ষোলটি[৪১] মিত্র শক্তির সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল তুমুল সংগ্রাম। চারটি দেশ পাঠাল শুধু চিকিৎসকদল (Medical Unit)[৪২]।

শান্তির জন্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে। আলোচ্য বিষয় সূচীর মধ্যে পাঁচটি ছিল প্রধান ঃ

(ক) বিষয়সূচী গ্রহণ এবং সেগুলিকে আলোচনা করায় সম্মতি দান।
(খ) যুদ্ধবিরতি সীমারেখা নির্ধারণ।
(গ) যুদ্ধবিরতির তত্ত্বাবধান।
(ঘ) যুদ্ধবন্দী বিনিময়।
(ঙ) সুপারিশ ইত্যাদি।

আটক বন্দীর সংখ্যা নিয়ে দুই পক্ষে মতৈক্য হলো না। ১৯৫২ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে উভয় পক্ষই যুদ্ধ বিরতির সর্তগুলিকে প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে গঠিত 'নিরপেক্ষ দেশের তত্ত্বাবধায়ক কমিশন' (Nutral Nations Supervisory Commission) মেনে নিতে সম্মত হলো।

৪১। অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, কলম্বিয়া, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, লুকসেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপিন, থাইল্যাণ্ড, তুর্কি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা।

৪২। ভারত, ইটালী, নরওয়ে এবং সুইডেন।

দু'টি কম্যুনিস্ট এবং দু'টি অ-কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি চতুঃশক্তি কমিশনের পরিচালনায় যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে পুনর্বাসনের একটি পরিকল্পনা ১৯৫২ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে ভারত উপস্থাপন করল বিবেচনার জন্য। অচল অবস্থার সৃষ্টি হ'লে রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন রাষ্ট্রকে সালিশ মানবার ব্যবস্থাও ছিল পরিকল্পনাটির মধ্যে। কিন্তু প্রস্তাবটিকে প্রত্যাখ্যান করল রাশিয়া, চীন এবং উত্তর কোরিয়া। কঠিন পীড়িত এবং আহত যুদ্ধবন্দীদের জেনেভা চুক্তি অনুসারে অবিলম্বে বিনিময় করার একটা প্রস্তাব ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে আনলেন জেনারেল ক্লার্ক। কম্যুনিস্ট পক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী হলো। ১৯৫৩ সালের ৮ই জুন তারিখে উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে স্থির হ'ল :

(ক) যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে পুনর্বাসনের তত্ত্বাবধান করার জন্য ভারত, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া—এই পাচটি রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি 'নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কমিশন' গঠন করা হবে। যে সমস্ত যুদ্ধবন্দী স্বদেশে পুনর্বাসিত হতে অনিচ্ছুক, তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এই কমিশন। ভারতের মনোনীত ব্যক্তি এই কমিশনের সভাপতি হবেন।
(খ) এই সমস্ত বন্দীদের দেখাশুনার জন্য কেবলমাত্র ভারতই সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করতে পাববে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে। কোরিয়ার যুদ্ধ থামল। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির সীমারেখা ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখায় না হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের মতে ভুল করে তা হলো আট মাইল ভিতরে। তিন বৎসরাধিককাল ধরে দোলকের মত দোদুল্যমান এই যুদ্ধে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। এবং এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ করতে ভারতের ভূমিকা ছিল বিরাট।

প্রায় ৫৮,০০০ চীনা এবং উত্তর কোরীয় যুদ্ধবন্দী রাষ্ট্রপুঞ্জ কমাণ্ডের হাতে ছিল। পক্ষান্তরে সেই তুলনায় কম্যুনিস্টদের হাতে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বন্দীর সংখ্যা ছিল অনেক কম। পাশ্চাত্য দেশগুলির মতে যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশ-পুনর্বাসনে অসম্মতির মূল কারণ ছিল কম্যুনিস্ট শাসনে সেখানকার অসহনীয় দুরবস্থা। বিপরীত মত ছিল, সামন্য কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ

বন্দীই দীর্ঘ দিন যাবৎ নিজ নিজ প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন তথা কঠোর সংগ্রামে রত থাকার দরুন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কমিশনে'র দায়িত্ব হয়ে পড়েছিল আরও অধিক। প্রতিটি বন্দীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবেই নির্ধারণ করতে হতো তারা স্বদেশে ফিরবে অথবা অন্য কোথাও যাবে। কোরিয়ায় এই কমিশন গঠিত হবার পূর্বেই অবশ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে অবস্থিত ৫৮,০০০ যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ৩৫,০০০ পলায়ন করে। অতএব ব্যবস্থা যা কিছু করবার তা ছিল বাকী ২৩,০০০ বন্দীর। সশস্ত্র রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে এই বিরাট সংখ্যক বন্দী যে কী ভাবে পলায়ন করল তা' দুর্বোধ্য। অনেকের সন্দেহ ছিল, সীগম্যান রী নিজেই তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পুনর্বাসন কমিশনের (Neutral Nations Repatriation Commission—N. N. R. C.) সভাপতিরূপে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য মনোনীত হন লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল কে. এস. থিমায়া। বিকল্প সভাপতি হিসাবে চক্রবর্তী, এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টারূপে পি. এন. হাকসর এবং বাহাদুর সিং মনোনীত হন। লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল এস. এস. পি. থোরাটের যাবার কথা ছিল ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীর অধিনায়করূপে। এবং থিমায়া আমাকে মনোনীত করেন স্বীয় 'চীফ অফ্‌ স্টাফ্‌' হিসাবে।

কোরিয়া যাত্রার প্রাক্কালে নেহ্‌রু আমাকে ডেকে পাঠালেন, এবং যুদ্ধবন্দী সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন যে সব জটিলতার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে তার উল্লেখ করলেন। বললেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়েই নিজ নিজ চিন্তাধারার যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে উৎসুক হয়ে রয়েছে, এবং আমাদের উপর তারা চাপ সৃষ্টি করবেই। এমত অবস্থায় কেবলমাত্র কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চললেই হবে না আমাদের। সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা ছাপও রাখতে হবে সকলের মনে। কমিশনের সভাপতি হিসাবে বিশিষ্ট একটি আস্থার স্থান অধিকার করতে চলেছে ভারত। এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাই নিজেদের চারদিকে নিরপেক্ষতার এমন একটা সুদৃঢ় বুনিয়াদ তৈরী করতে হবে আমাদের, যাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাজিত চাপা উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নেহ্‌রু পরামর্শ দিলেন: প্রথমেই আমাদের শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ সমস্ত যুদ্ধবন্দীদের উদ্দেশ্যে একটি বাণী পাঠান যেতে পারে। কোরিয়ার ভাষাও শিখতে হবে আমাদের। এতে

সমস্যাটি সম্বন্ধে আমরা যে যথার্থই আগ্রহী এ বিশ্বাস তাদের মনে দৃঢ় হবে। আরও বললেন, কিছু কিছু এমন বন্দীও থাকতে পারে যারা পুনর্বাসনে সম্মত নয়। অতএব প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে তাদেরই নিয়ে যারা এ বিষয়ে আগ্রহী। অধিকাংশ বন্দীই হয়ত সাধারণ কৃষক ; রাজনীতি থেকে মুক্ত। স্বভাবতঃই তারা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। এই ধরনের বন্দীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে আমাদের। সমস্যাটি সাধারণ নয়। সমাধানের পথ হিসাবে তাই নেহ্‌রু আরও পরামর্শ দিলেন, যে সমস্ত বন্দীরা আপত্তিজনক কার্যকলাপে লিপ্ত তাদের পৃথক করে দলপতিদের খুঁজে বার করতে হবে। এই ধরনের বন্দীরা হয়ত জেরাকারীর কাছে কিছুই প্রকাশ করতে চাইবে না। সে ক্ষেত্রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সম্মত করাতে হবে তাদের। যদি কখনো অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটাকেও চেষ্টা করে সমাধান করতে হবে। চীন প্রসঙ্গে নেহ্‌রু বললেন, চীনও আমাদের বন্ধু, এবং চীনের সঙ্গে আমাদের সুদীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। অতএব, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীকে বিনা কারণে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তোলা আমাদের পক্ষে বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে না। যে কোন ব্যাপারেই হোক, নিরপেক্ষতার যে জাতীয়-নীতি আমরা গ্রহণ করেছি সেটাকে সর্বদা মনে রেখেই অগ্রসর হতে হবে।

নেহ্‌রুর উপদেশ স্মরণে রেখে থিমায়া এবং প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সকলের সঙ্গে দিল্লী থেকে যাত্রা করে ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান পৌঁছুলাম। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মার্ক ক্লার্কের সদর দফতর ছিল টোকিওতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর অভীষ্ট স্থান পান-মুন-জং অভিমুখে আবার যাত্রা শুরু হ'ল। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি সীগম্যান রী'র ভারত-প্রীতি সত্যিই খুব বেশী ছিল! তাই পান-মুন-জং যাবার পথে আমাদের বিমানটিকে দক্ষিণ কোরিয়ার ভূমি স্পর্শ করতেও নিষিদ্ধ করে দিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ অবশ্য ব্যাপারটাকে সামলে নেয়, এবং নিজেদের এলাকায় অবতরণ করতে দেয়। ক্ষণিক বিরতির পর আবার যাত্রা শুরু হ'ল আমাদের।

কোরিয়ায় উপস্থিত হয়ে প্রথমেই যে জিনিসটি লক্ষ্যে পড়ল, তা'হল আমেরিকান এবং চীনারা উভয়েই সেখানে হাজির হয়েছে অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতে।

ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীর (Custodian Force of India)

সৈনিকদের কর্তৃত্বে রাষ্ট্রপুঞ্জ কমাণ্ডের হাত থেকে কমিশন (N. N. R. C.)[৪৩] কোরিয়ান এবং চীনা বন্দীদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করল। উচ্ছৃঙ্খলতায় চূড়ান্ত ছিল এই সমস্ত বন্দীরা। তথাপি আমাদের সৈনিকেরা অসীম ধৈর্য-সহকারে প্রশংসনীয়ভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেছে। এতটুকু বিরাগ অথবা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নি। লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল থোরাটের আদেশ ছিল, প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তি বাদ দিয়ে এই সমস্ত বন্দীদের নিরস্ত্র করতে হবে।

কমিশনে দু'টি দল হয়ে গিয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ড এবং সুইডেন ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের নীতিগুলির দৃঢ় সমর্থক। পক্ষান্তরে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোলাণ্ড ছিল উত্তর কোরিয়ান কমাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক। অতএব, ভারতের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়েছিল আরও অধিক। ভারতের সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং ভূমিকার উপরেই নির্ভর করছিল কমিশনের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা। বস্তুত যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময় উভয় পক্ষের অন্তরে যে তিক্ততা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে ছিল, সেইগুলিই এসে পড়েছিল একমাত্র নিরপেক্ষ শক্তি ভারতের উপর।

সুবিধা মত একটা স্থান নির্বাচন করে সেখানে কতগুলি তাঁবু খাটাতে মনস্থ করেছিলাম আমরা। উদ্দেশ্য ছিল, ইচ্ছামত সেই সমস্ত তাঁবুতে বসে উত্তর কোরীয় কমাণ্ডের প্রতিনিধিগণ বন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সম্মত করাবার চেষ্টা চালাতে পারবেন। কিন্তু তাঁবুগুলি কোথায় খাটান হবে তাই নিয়ে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে তুমুল বাগ-বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। রাষ্ট্রপুঞ্জ কমাণ্ডের মতে, নির্বাচিত স্থানে তখন পর্যন্ত বহু মাইন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং সেখানে তাঁবু খাটান বিপজ্জনক। পক্ষান্তরে, উত্তর কোরীয় কমাণ্ডের বক্তব্য ছিল জায়গাটিতে কোন মাইন নেই। আমার ধারণা, সামরিক যুদ্ধবিরতি কমিশনের (Military Armistice Commission) সম্মুখে রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে ১৯৫৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে জেনারেল ব্রায়েন মোটামুটি এই মর্মে যে ঘোষণাটি করেছিলেন, সেইটিই ছিল উত্তর কোরীয় কমাণ্ডের বক্তব্যের মূল কারণ। বাগবিতণ্ডা চলল বেশ কিছুদিন ধরে। আমি এবং আরও অনেকেই এই অনর্থক

৪৩। 'এন. এন. আর. সি'-এর হাতে ছিল পরিচালনার ভার এবং এদের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব ছিল 'সি. এফ. আই'-এর উপর।

তর্কাতর্কির জন্য বিরক্ত হয়ে উঠলাম। শেষ অবধি বিতর্কের ইতি করবার উদ্দেশ্যে স্থির করলাম, উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের চোখের সামনে দিয়ে উল্লিখিত স্থানটি পদব্রজে পার হব। ব্যাপারটি ছিল খুবই সরল। এত সরল যে, অক্ষত অবস্থায় পার হতে পারলে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে ওখানে কোন মাইন পাতা নেই। আর, মাইন পাতা থাকলে, সে কথা বলবার জন্যে অবশ্য আমি বেঁচে থাকবো না। নির্ভীক এবং আস্থা ভাজন স্যাপার (Sapper—মাইন অনুসন্ধানকারী বিশেষজ্ঞ) মেজর মার্ক ভ্যালাডারেস এবং অন্যান্য কয়েকজন ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে দুরুদুরু বক্ষে উক্ত স্থানটি অভিমুখে রওনা হলাম। প্রতিটি পদক্ষেপেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি মাইনের উপর পা পড়ে এবং বিস্ফোরণে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাই আমরা। কয়েকটি মাত্র মিনিট বোধ হয় লাগল স্থানটি অতিক্রম করতে। কিন্তু সেই সময়টুকুই মনে হল যেন অনন্ত। শেষপর্যন্ত নিরাপদে অপর প্রান্তে পৌছুলাম। ফেরত পথেও কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। এর পরেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিতর্কের অবসান হলো। নির্দিষ্ট স্থানে তাঁবুগুলিও খাটালাম আমরা। কেউ কোন উচ্চ-বাচ্য করল না আর।

ইতিমধ্যে পিকিং পরিদর্শনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ এল আমার কাছে। নেহ্‌রু এবং থিমায়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। উভয়েই অনুমতি দিলেন। আমন্ত্রক পক্ষই পান-মুন-জংয়ের নিকটস্থ কায়েসং থেকে বিশেষ ট্রেন যোগে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন আমাদের। পথে পড়ল উত্তর কোরিয়ার সারেওন এবং পাইঅঙইয়ং। সেখান থেকে মাঞ্চুরিয়ার মুকদেন-এর (শেন-য়াঙ) ভিতর দিয়ে আন-তুংএর কাছে সীমান্ত অতিক্রম করলাম।

আমাদের দলের মধ্যে ছিলেন বৈদেশিক দপ্তরের বাহাদুর সিং, আমার স্টাফ অফিসর মেজর এইচ. এস্. সাঁধু এবং তিনজন ভারতীয় সাংবাদিক, জি. কে. রেড্ডী, পি. আব্রাহাম এবং মালকানি। বাহাদুর ছিলেন চীনা ভাষায় দক্ষ। আগাগোড়া এই সফরে তাঁর কাছ থেকে বহু মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। নিরহঙ্কারী এবং সুযোগ্য কূটনীতিবিদ্ বাহাদুর সিং চীনা নেতৃবৃন্দের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে জানতেন।

যাত্রাপথে আমাদের সঙ্গে একজন চীনা রাজনীতিক প্রতিনিধি ছিলেন। দো-ভাষীর মাধ্যমে ছাড়া কখনই তিনি আমাদের সঙ্গে বার্তালাপ করতেন না। তাঁর উপস্থিতিতেই যখন আমরা নিজেদের মধ্যে হিন্দীতে নানা বিষয়ে

কথাবার্তা বলেছি, ভদ্রলোক তখন থেকেছেন নির্বিকার মুখ করে। অথচ আমাদের প্রতিটি শব্দই যে তিনি বুঝতে পারছিলেন, সে কথা তখন আমরা কল্পনাও করি নি। পরে বুঝেছিলাম ভদ্রলোক খুব ভাল হিন্দী জানেন।

১৯৫৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে পিকিং[৪৪] পৌছুলাম। অভ্যর্থনা করলেন চীনা 'চীফ অফ্ প্রোটোকল'-এর অস্থায়ী বদলী হিসাবে কর্মরত (officiating) একজন অফিসর, অন্যান্য চীনাকর্মচারীবৃন্দ এবং আমাদের দূতাবাসের কর্মীগণ।

পিকিংয়ে জনসাধারণের নিয়ম-শৃঙ্খলা তথা সময়ানুবর্তীতা এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্পোদ্যম, কৃষি ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানকল্পে তাদের অভূতপূর্ব উদ্যম এবং কর্মচাঞ্চল্য আমায় গভীরভাবে প্রভাবিত করল। অপরদিকে এও লক্ষ্য করলাম, বাক্ এবং কর্ম-স্বাধীনতা তথা ব্যক্তিগত উদ্যমের সুযোগ তাদের নেই বললেই চলে। প্রতিটি ব্যাপারেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মুখ চেয়ে রয়েছে সবাই ; এবং জীবনযাত্রার যে ব্যাপারগুলি তাদের নিজেদেরই মনোমত নয়, সেগুলি আমাদের দেখাতে সঙ্কোচবোধ করেছে।

পিকিংয়ে কার কার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক জানতে চেয়েছিলেন চীনা চীফ অফ্ প্রোটোকল। বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি আমার পক্ষপাত ছিল না। সে কথা তাঁকে জানিয়েছিলাম। তাই তিনি আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন উপ-বৈদেশিক মন্ত্রী জেনারেল লী কা নঙ্ এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এর সঙ্গে।

চীনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অনুরূপ একটি সাক্ষাৎকার হয় ১৯৫৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে। আমাদের পিকিংস্থ রাষ্ট্রদূত রাঘবন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে নেহ্রুকে জানাই সেজন্য বিশেষ জোর দেন চৌ এন-লাই :

৪৪। উত্তর কোরিয়া থেকে পিকিং পর্যন্ত পথে আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভূপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে গমন করি। গ্রামাঞ্চলে পরিচ্ছন্ন আদিম পল্লী, নূতন এবং পুরাতন শহর এলাকা, বিশাল বিশাল কারখানা সম্বলিত শিল্পাঞ্চল এবং এমন দুই তিনটি আধুনিকতম নগরী যা সেখানে দেখবার আশা করি নি আমি।

(ক) আমেরিকা যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উত্তেজনা জীইয়ে রাখতে চায় তার কারণ হ'ল :

(১) যাতে জাপানকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করার কাজ চালিয়ে যেতে পারে এবং নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে বিরাট সংখ্যায় সেই এলাকায় মোতায়েন রাখতে পারে ;

(২) পূর্ব গোলার্ধে কম্যুনিস্ট ভীতির অছিলায় যাতে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিয়ে যেতে পারে ; এবং

(খ) আমেরিকা দু'টি দাবী করেছে যথা, রাশিয়াকে রাজনীতিক অধিবেশনে যোগদান করতে হবে ; এবং, এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিতে হবে। দাবী দু'টির উদ্দেশ্য হ'ল রাশিয়াকে যুধ্যমান পক্ষরূপে প্রতিপন্ন করা এবং শান্তিস্থাপনে প্রজাতন্ত্রী চীনের অক্ষমতা প্রচার করা। রাজনীতিক অধিবেশনকে আমেরিকা যে আসলে ভণ্ডুল করতে চায়, এগুলি হ'ল তারই ইঙ্গিত।

(গ) আমেরিকা যদি চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার মত ভুল করে, তবে চীন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে, এবং যথাসময়ে আমেরিকাকে উপযুক্ত জবাবও দেবে।

কোরিয়ায় নিরপেক্ষ-রাষ্ট্র পুনর্বাসন কমিশনের (N. N. R. C.) কর্মপদ্ধতি এবং প্রকৃত তথ্য নিরূপণে ব্যর্থতার জন্যও অসন্তোষ প্রকাশ করেন চৌ এন-লাই।

সাক্ষাৎকারের পর আমাদের রাষ্ট্রদূত রাঘবনকে অনুরোধ করি চৌ এন-লাইএর বক্তব্যের সারমর্ম যেন তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহ্‌রুকে জানান। রাঘবন সম্মত হন।

অন্য এক উপলক্ষ্যে চৌ এন-লাই আমায় স্মরণ করিয়ে দেন যে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ২৪০[৪৫] কোটির মধ্যে চীনে রয়েছে ৬০ কোটি। অতএব তৃতায় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তাঁরা মোটেই ভীত নন। কারণ, শেষ অবধি বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক শক্তিরই জয় হবে। উদাহরণস্বরূপ বলেন, গুটিকয়েক পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে যেক্ষেত্রে সমগ্র ইংলণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে, চীনের সেখানে

৪৫। একশত বৎসর পর পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটি হবে বলে অনুমান করা হয়।

ধ্বংস হবে মাত্র একাংশ। অনেকগুলি ইংলণ্ডের চাইতেও বড় অবশিষ্ট অংশ অক্ষত অবস্থাতেই থেকে যাবে। চীনের বিপ্লবে রাশিয়ার কোন অনুপ্রেরণা ছিল কিনা জানবার কৌতূহল ছিল আমার। জিজ্ঞাসা করতেই যেন জ্বলে উঠলেন চৌ এন-লাই। বললেন, প্রকৃত বিপ্লব কখনো আমদানী করা হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার প্রকাশ হয়। চীনের বিপ্লবও তেমনি অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত; লোকের ধারণা অনুযায়ী রাশিয়া থেকে আমদানী করা নয়। ৬০ কোটি চীনবাসী ২০ কোটি রাশিয়ানদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে না।

চৌ এন-লাই আরও বলেন চীন সম্বন্ধে বিদেশী পরিদর্শকদের সমালোচনা তিনি পছন্দ করেন। এই প্রসঙ্গে চীন পরিদর্শন করে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে কিনা তাও জানতে চান। বক্তব্য আমার অনেক কিছুই ছিল। এখানকার অনেক কিছু যেমন আমায় মুগ্ধ করেছিল, তেমনি কতগুলি ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবারও প্রয়োজন বোধ করলাম। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকজন চীনা অফিসরকে আমি ডিনারে নিমন্ত্রণ করি। কিন্তু সে নিমন্ত্রণ তাঁরা গ্রহণ করলেন কিনা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমায় জানান নি। পিকিং বেতার কেন্দ্র পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু আমার অনুরোধ রক্ষা করা হবে কি না তা অনেকক্ষণ ধরে সঙ্গী চীনা অফিসর আমায় জানতেই দেন নি। পিকিং-এর বস্তী এলাকা দেখতে চাইলেও প্রথমে তাঁরা দেখাতে রাজী হয়েছিলেন; কিন্তু কার্যতঃ সে প্রতিশ্রুতি রাখা হ'ল না। ঘটনাগুলি চৌ এন-লাইকে বললাম। জানতে চাইলাম, এই ধরনের প্রতিটি ব্যাপারেই তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয় কি না। বিশেষ কোন দৃশ্য অথবা স্থান দেখাতে আপত্তি থাকলে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে না রেখে সঙ্গত কোন অজুহাতে এড়িয়ে গেলেই তো ভাল হয়।

ঘটনাগুলির কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন চৌ এন-লাই। এবং, চীন যে সবে একটি তরুণ জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এখনও বালকের মত অপরিণত অবস্থাতেই রয়েছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, এমত অবস্থায় কিছু কিছু বাধানিষেধ তাদের উপর আরোপ করা প্রয়োজনীয়। অপরিণত অবস্থায় তারা যাতে অবিজ্ঞজনোচিত কোন কথা না বলে কিংবা কোন কাজ না করে সেদিকে তত্ত্বাবধায়কদের লক্ষ্য রাখতেই হবে। বাধা-নিষেধগুলি অবশ্য যথাসময়েই অপসারণ করা হবে। (জবাবগুলি আমার

কাছে সন্তোষজনক মনে হয় নি। তবু এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়ালাম না, চীনা ভাষায় যাকে বলে 'কিরচি' অর্থাৎ ভদ্রতার খাতিরে।)

চৌ এন-লাই একদিন আমায় এবং বাহাদুর সিং-কে তাঁর আবাসে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। কথাবার্তা যা কিছু বলছিলেন সবই দোভাষীর মাধ্যমে। তবু মাঝে মাঝে অদ্ভুত সমস্ত ইংরেজী শব্দ বলছিলেন। প্রথমেই শুরু হ'ল মাও সে তুঙ্, নেহ্রু, চীন্, ভারতবর্ষ প্রভৃতির মঙ্গলকামনা করে মদ্যপানের পালা। চৌ এন-লাই এই সমস্ত 'গাও তাই'-এর (ধেনো মদ) 'গ্যাম্বেস'-এ (বোতল খালি করা) আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে অনুরোধ করলেন। সবিনয়ে জানালাম এই ব্যাপারে বাহাদুর সিং-ই আমার উপযুক্ত 'দাই-বিয়াও'-এর (প্রতিনিধির) কাজ করবেন। পরপর প্রায় গোটা পনের 'গ্যাম্বেস'-এর পর চৌ এন-লাই এর পা টলমল করতে লাগল, কিন্তু বাহাদুর সিং রইলেন পাথরের মত অটল। ব্যাপারটি দেখে মদ্যপানের ক্ষেত্রে স্বীয় আত্মবিশ্বাস বোধহয় খানিকটা টলে উঠল চৌ এন-লাই এর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাহাদুর সিং-এর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন: মদ্যপান আপনি কোথায় শিখেছেন মিঃ বাহাদুর সিং ?

চোখ দুটো চক্চক্ করে উঠল বাহাদুর সিং-এর। অকম্পিত চরণে উঠে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন: ইওর একসেলেন্সি, আমরা রাজপুত, এবং সাত পুরুষ ধরে আকণ্ঠ মদ্যপান করে আসছি। জিনিসটা তাই আমার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে।

এরপর মদ্যপানের পালায় ক্ষান্ত দিলেন চৌ এন-লাই, এবং আর বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই খাবার পালা শুরু হ'ল। আকর্ষণীয় এই চীন ভ্রমণ শেষ করে অতঃপর ভারতীয় সঙ্গীদের নিয়ে পান-মুন-জং এ প্রত্যাবর্তন করলাম।

কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল চীন। বৈঠক কিংবা পত্রালাপে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হলেই প্রতিবারই রাষ্ট্রপুঞ্জকে 'গুরুতর পরিণতি'র ভীতি প্রদর্শন করে অন্তহীন হুমকি দিত। প্রতিটি উপলক্ষ্যেই আবার বলে দেওয়া হ'ত যে সেটা হ'ল ১৭৬, ২৩৯ কিংবা ৪৫৬ বারের হুমকি ইত্যাদি। আমার মনে হয় এগুলি তাদের ছিল মানসিক চাপ সৃষ্টি করার একটা কৌশল। কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ কমাণ্ডের অতি প্রিয় যুক্তি ছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে অবস্থিত বন্দীরা কম্যুনিজমকে ঘৃণা করে, এবং সেই কারণেই কেউ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে রাজী নয়।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা কতগুলি নিরপেক্ষ নিয়ম-প্রণালীর খসড়া প্রস্তুত করেছিলাম। দুঃখের বিষয় এগুলিকে কার্যকরী করা হয় নি। রাষ্ট্রপুঞ্জের হেফাজতে অবস্থিত বন্দীদের উপর নিজেদের ইচ্ছা জোর করে আমরা চাপাতে চাই নি। চেয়েছিলাম, উচ্ছৃঙ্খল সেই দলকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবেই কাজ চালাতে। আমাদের তারা গালিগালাজ করেছে, মিথ্যা অভিযোগ এনেছে, পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ীগুলির উপর পাথর ছুঁড়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বহু হিংসাত্মক কার্যকলাপ তো ছিলই। আমরা কিন্তু তাদের মধ্যে দলবদ্ধ বিক্ষোভের আশঙ্কায় কোন রকম কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি; বরং যথাসাধ্য ভদ্র ব্যবহারই করেছি। বন্দীদের অনেককে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁবুতে নিয়ে যেতেও বেগ পেতে হ'ত। চীৎকার, চেঁচামেচি এমন কি আমাদের প্রহরীদের উপর আক্রমণ করতেও ছাড়ত না। অনেকে আবার তাঁবুতে যেতই না। এত সব ঝামেলা করেও জিজ্ঞাসাবাদের পর অতি অল্প সংখ্যক বন্দীই গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে রাজী হ'ত। বেশ বুঝতে পারতাম পাণ্ডা গোছের কিছু লোককে বন্দীদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তারাই এই সমস্ত গোলযোগের মূল কারণ। নানা রকম ভীতি প্রদর্শন, এমন কি খুন[৪৬] করবার শাসানি দিয়েও তারা বন্দীদের স্বদেশ-

৪৬। একবার বন্দীরা একজনকে হত্যা করে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সনাক্তকরণবত আমাদের সৈনিকদের বাধা দেয়। অতএব নিজেই এগিয়ে গেলাম আমি। থিমায়াকে বললাম, শয়তানি করে বন্দীরা দলবদ্ধভাবে গোলযোগ বাধাবার চেষ্টা করলে তা বন্ধ করে দেবারও ব্যবস্থা করব। থিমায়া সম্মত হলেন। সেই বিশেষ বন্দী-শিবিরটিতে উপস্থিত মাইক্রোফোনযোগে আদেশ করলাম, শান্তিপূর্ণভাবে সনাক্তকরণের জন্য সমস্ত বন্দীরা যেন আমার সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যায়। আদেশ প্রতিপালিত না হলে শক্তিপ্রয়োগ করা হবে সে কথাটাও জানিয়ে দিলাম। আদেশটিকে মিথ্যা ভীতি প্রদর্শন মনে করল কাপুরুষগুলো। তাই প্রথমে আমার কথায় কোন আমলই দিল না। বরং আদেশ অমান্যপূর্বক চীৎকার করে বিক্ষোভ তথা বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত করে ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সৈনিকদের গুলি চালাতে আদেশ দিলাম। একটি কী দু'টি বন্দী মারা পড়ল। কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল সবাই। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল তাদের সমস্ত বিশৃঙ্খলা এবং বিক্ষোভ। এই ঘটনাই প্রমাণ করল, 'গণ-হত্যা'-র প্রশ্রয় না দিয়ে প্রতীক হিসাবে আমাদের সামান্যতম শক্তি প্রদর্শন করলে আদেশ অমান্য করার সাহস হ'ত না তাদের। কারণ তারা বুঝত বাজে কথা আমরা বলি না। কিন্তু তা' না করে লোকগুলিকে এমন প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল যে বন্দীদেরই বন্দী হয়ে পড়েছিলাম আমরা। ফলে, আসল কাজ বিশেষ কিছুই হয়নি।

প্রত্যাবর্তনে বাধা দিত। অথচ এইসব অপরাধীদের শাস্তি দেবার পরিবর্তে আমাদের সঙ্গে সমপর্যায়ে বসে আলোচনা করবার সুযোগ এবং অন্যান্য বহু সুবিধা দেওয়া হ'ত। অনেক চেষ্টা করেও পাণ্ডাদের আমরা খুঁজে বার করতে পারিনি। চোখের সামনেই তারা ইশারা-ইঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে অবৈধ সংবাদ আদান-প্রদান করেছে; এসব বন্ধ তো করতে পারিই নি, এমনকি সন্দেহজনক ব্যক্তিদেরও খুঁজে বার করতে বিফল হয়েছি। রাষ্ট্রপুঞ্জের হাসপাতালের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ অথবা তাদের মধ্যে গোপন কোন সংগঠন, কিছুই আমরা সংযত কিংবা বন্ধ করতে পারিনি। নামহীন বহু বন্দী আমাদের কাছে এসেছে; কিন্তু এদের কোন বিস্তারিত তালিকাও তৈরী করতে পারিনি আমরা। ফলে অনেক বন্দী বেআইনীভাবে অন্যদলে ঢুকে পড়েছে এবং দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নিয়েছে। ভীতি প্রদর্শন অথবা আক্রমণের সম্ভাবনা সত্ত্বেও বন্দীদের ছুরি এবং অন্যান্য তীক্ষ্ণ যন্ত্রাদি সঙ্গে রাখতে দেওয়া হ'ত। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসবার সময় অনেকে আবার মুখোশ পরে আসবার দাবী তুলত। দেখতে সারকাসের ভাঁড়ের মত লাগলেও, সে দাবী আমরা মেনে নিয়েছি। কয়েকজন ভারতীয় অফিসরকে একদিন তারা বলপূর্বক আটক করেও রাখে। অনেকে আবার শৃঙ্খলাভঙ্গের মত গুরুতর অপরাধ অথবা আমাদের কর্তৃত্বকেই অবজ্ঞা করেছে। কিন্তু এগুলির কোনটাতেই না আমরা যথোচিত তদন্ত করতে পেরেছি, না কাউকে পেরেছি কয়েদ করতে। দৃষ্টান্তকারী শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা!

এই জটিল ব্যাপারটি সম্বন্ধে দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। অনেকের ধারণায় বন্দীদের এই সমস্যা ছিল সমাধানের অসাধ্য (কারণ দু'টি শক্তি-গোষ্ঠীর দাবার বড়ে হয়ে পড়েছিল তারা; এবং গোষ্ঠীদ্বয়ের পরস্পরের মতপার্থক্যের সমন্বয় সাধন করাই ছিল দুরূহ); এবং কারুর পক্ষেই সন্তোষজনকভাবে এর মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। যা কিছু সিদ্ধান্তই আমরা নিতাম না কেন, কোন না কোন পক্ষ সেগুলিকে দূষণীয় বলে মনে করতই। এই ধরনের রাজনীতি-সংক্রামিত বন্দীদের জটিল সমস্যার মোকাবিলা করার মত অভিজ্ঞতাও কোন ক্ষেত্রেই ছিল না আমাদের, এবং সমাধানের জন্য শক্তি প্রয়োগ করলেও, তা' হ'ত আমাদের জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী। অতএব প্রথমোক্ত দলের মতে, এই সমস্ত বিচার-বিবেচনা করে, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যথাসাধ্য প্রশংসনীয় কাজই আমরা করেছিলাম; এবং এই কৃতিত্বের

সম্পূর্ণ সম্মান প্রাপ্য ছিল লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল কে. এস. থিমায়া এবং মেজর জেনারেল এস্‌. পি. পি. থোরাটের। কারণ অতীব কৌশল এবং অধ্যবসায় সহকারে জটিল সমস্যাটির তাঁরা মোকাবিলা করেছিলেন।

পক্ষান্তরে, পি. এন. হাকসার, বাহাদুর সিং এবং আমার অভিমত ছিল, জেনারেল থিমায়া এবং থোরাটের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কোরিয়ায় আমরা এসেছিলাম, তা' সফল হয়নি। বন্দীদের স্বদেশে পুনর্বাসনের সমস্যাটিকে নেহ্‌রু মনে করতেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার্য একটি বিষয়। আমারও ধারণা ছিল তাই। এই সমস্ত বন্দীরা বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধের কঠোরতার মধ্যে অবস্থান করেছে; এবং চিরকালের জন্য এই নির্বাসন ভোগের পরিবর্তে মুক্তিলাভ করে পুনরায় আত্মীয়স্বজনের সাহচর্যে ফিরে যেতে নিশ্চয়ই তারা উদগ্রীব। কিন্তু কয়েক ব্যক্তি তা' মনে করতেন না। তাঁদের মতে, এটা ছিল একটা রাজনৈতিক সমস্যা।

ঘোষিত নিজস্ব নীতি অনুযায়ী ভারত যা চেয়েছিল তার কোনটাই সে কমিশনের (N. N. R. C.) সভাপতি হিসাবে করতে পারে নি। নেহ্‌রু নিজেও দ্বিধাগ্রস্তভাবে কমিশনের অধিকাংশ সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন, এবং কমিশনের সার্বিক কর্মধারার প্রতি মৌন সম্মতি জানান।

[কোরিয়ায় ছ' মাস ছিলাম আমি। সেই সময় বিভিন্ন বাহিনীর সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৯৫০-৫৩ সালে কীভাবে তাঁরা সেখানকার কয়েকটি আকর্ষণীয় যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। জানতে পারি, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, উন্নত ধরনের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা; সার্থক অগ্নিনিরোধক পরিকল্পনা; জরুরী অবস্থায়, বিশেষ করে জলের বাধা অতিক্রমণের ব্যাপারে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; সার্থক আত্মগোপন তথা শত্রুকে প্রতারিত করার কৌশল; প্রশাসনিক দৃঢ়তা এবং সাহসিক নেতৃত্ব;—এইগুলি তাঁদের উল্লিখিত যুদ্ধে প্রচুর সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।]

নেহ্‌রু বলতেন, গণতান্ত্রিক ভারত না একনায়কতন্ত্রী চীন, কোন্‌ দেশ দ্রুততর এবং সুষ্ঠুতরভাবে উন্নতি লাভ করে তারই উপর গণতন্ত্রের ভবিষ্যত অন্ততঃ এশিয়াতে নির্ভর করছে। তাই কোরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নয়া দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই জিজ্ঞাসা করেন চীনের বহু ব্যাপারেই আমি যে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি সে কথা তিনি শুনেছেন; এবং যদি

তা' সত্যি হয়, তবে চীনের কোন্ ব্যাপারটি আমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। সামান্য যেটুকু দেখেছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছিল শক্তিশালী একটি সরকারের অধীনে অসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে চীন। সে কথা নেহ্‌রুকে জানাই। ভারতের একাধিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও এই বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের অধিকাংশই[৪৭] আমারই মত চীনের মতাদর্শের সঙ্গে সহমত না হয়েও, কতিপয় ক্ষেত্রে তাদের দ্রুত অগ্রগতি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চীনের এই অগ্রগতিকে অবিশ্বাস করবার মত লোকেরও অভাব ছিল না। আমার অবশ্য মত ছিল, কোন দেশের শক্তি সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করাও যেমন ঠিক নয়, তেমনি আবার ইচ্ছাকৃতভাবে তার শক্তির গুরুত্বকে অবহেলা করাও আমাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।

কোরিয়ায় প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং কষ্ট করতে হয়েছিল আমায়। বিশ্রামের জন্য তাই লম্বা একটা ছুটির দরখাস্ত করলাম। দরখাস্তখানা মঞ্জুর তো হলই না, বরং বিশেষ দায়িত্বভার দিয়ে আমাকে কয়েক মাসের জন্য বৈদেশিক মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হ'ল। এই সময়েই একদিন নেহ্‌রু জিজ্ঞাসা করেন, পিকিংয়ে চৌ এন-লাই এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কি না। চৌ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারগুলির মধ্যে একটির বিবরণ নেহ্‌রুকে পাঠাবার কথা ছিল আমাদের পিকিংস্থ রাষ্ট্রদূতের। জিজ্ঞাসা করে জানলাম নেহ্‌রু এ ধরনের কোন বিবরণ দেখেন নি। অতএব, আমাদের রাষ্ট্রদূত এবং বহাদুর সিং-এর উপস্থিতিতে চীনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎকারটি হয়েছিল তার স্মারকলিপির একটি নকল নেহ্‌রুকে দিই।

কিছুদিন পূর্বেই ভারতীয় বাহিনীর একটি দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অত্যদ্ভুত একটি ঘটনার কথা শুনে ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নিযুক্তক স্থান (North East Frontier Agency—NEFA) সম্বন্ধে প্রথম আমার মনে কৌতুহল জেগে ওঠে। নিফা হ'ল একাধিক

৪৭। যথা, জেনারেল জে. এন. চৌধুরী চীন পরিদর্শন করে এসে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে আমাকে লেখেন, '...এখন আপনাকে বলতে পারি, সেই মহান দেশের বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন চাক্ষুষ দেখে অত্যন্ত বেশী প্রভাবিত হয়েছি আমি...।'

উপজাতি অধ্যুষিত একটি অঞ্চল; এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সমস্ত উপজাতিরা সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নি। স্বাধীনতা লাভের পর, সেই অঞ্চলে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ চালু করবার তথা এই সমস্ত উপজাতিদের মধ্যে সভ্যতার আলোক বিকশিত করে তাদের উন্নতির জন্য আমাদের তরফ থেকে চেষ্টা চলতে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই আসাম রাইফেলের একটি পর্যবেক্ষক দল সুবর্ণশিরি নদীর পূর্বতীর ধরে দাপোরিজো ছাড়িয়ে অনাবিষ্কৃত অঞ্চলটিতে একটি অসামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে যায়। বেশ কয়েক মাইল বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আশিমোরির কাছাকাছি একটি স্থানে পৌঁছে তারা স্থির করল রাতটা সেখানেই কাটাবে। এদিকে তুমসা ডুসক নামে স্থানীয় থাগিন উপজাতীয় সর্দার দূরের একটি পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি থেকে অগ্রগামী এই দলটিকে দেখতে পেয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল। লোকগুলির পরিচয় সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারল না সর্দার। তার 'রাজ্যে' এই ধরনের অনধিকার প্রবেশের ঘটনা আগে কখনও ঘটে নি। বিচলিত সর্দার তাড়াতাড়ি উপদেষ্টাদের ডেকে মতামত জানতে চাইল। কিন্তু উপদেষ্টারাও আসন্ন এই 'বিপদ' অথবা তার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করতে পারল না; তবে তাদের এই শান্তিপূর্ণ 'রাজ্য' দখল করবার 'বদ' মতলব নিয়েই যে লোকগুলির আবির্ভাব হয়েছে এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ হ'ল। আগন্তুকরা দলেও ভারী। তাই অনেক বিচার-বিবেচনার পর স্থির হ'ল যুদ্ধের হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে কৌশলে সহজতম পন্থায় এই 'অনধিকার প্রবেশকারী'দের যথোচিত ব্যবস্থা করে ফেলা হবে। শ্রান্ত-ক্লান্ত দলটি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এ সমস্ত কিছু সন্দেহ করে নি। নিশ্চিন্ত মনে থাগিনদের 'রাজত্বে'র সীমানায় উপস্থিত হতেই উপজাতিসুলভ ভদ্রতায় অভ্যর্থনা করে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল রাত্রিবাসের জন্য পূর্বনির্ধারিত স্থানটিতে। আগে থাকতেই জায়গাটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল। আন্তরিক অভ্যর্থনার বহর দেখে খুশী হয়ে উঠল আমাদের সৈনিকেরা। অনুধ্যুষিত যে অঞ্চলে আজ অবধি 'বাইরের' কোন মানুষ পদার্পণ করতে পারে নি সেখানে তারা আশাতীত অনুকূল ধারণার সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে নিজেদের অভিনন্দন জানাল; এবং অস্থায়ী বিশ্রামস্থলের প্রবেশপথে একটিমাত্র প্রহরী মোতায়েন করে পরিশ্রান্ত দিনের শেষে অচিরেই ঢলে পড়ল গভীর নিদ্রায়। সেই রাতেই ছলনা-দক্ষ থাগিনরা সর্দারের

পরিচালনায় আমাদের তাঁবুতে এল খানিকটা লবণ চাইবার ভাণ করে। তারপর নিদ্রামগ্ন ভারতীয়দের আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে সামরিক-অসামরিক সব সুদ্ধ প্রায় ৭৫ জন মানুষের মধ্যে ৭৩ জনকে স্থির মস্তিষ্কে হত্যা করল। দলের অধিনায়ক মেজর রিপুদমন সিং এবং বাকী লোকগুলি দিন দুয়েক ধরে কোণঠাসা অবস্থায় আত্মগোপন করে রইলেন। তাঁদেরও খুঁজে বার করে নৃশংসভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়।

উপরিউক্ত বীভৎস ঘটনাটির কথা একমাত্র জীবিত লোকটির মারফত প্রথমে শিলং তারপর দিল্লীতে পৌছায়। এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কি করা যায় তাই নিয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। আন্তরিক শুভেচ্ছার বশবর্তী হয়ে অনগ্রসর এলাকাটির সামনে সভ্য জগতের দুয়ার আমরা উন্মুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছিলাম। অথচ থাগিনরা একটিমাত্র আঘাতে আমাদের অতগুলি মানুষকে হত্যা করল। অনেকে অপরাধীদের দৃষ্টান্তকারী কঠিন শাস্তি দিতে বললেন। মহাবীর ত্যাগী এবং অনেকে কিন্তু আবার মত দিলেন থাগিনদের প্রশ্রয় দেবার সপক্ষে। কারণ যে উপজাতীয়দের আমরা নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করছিলাম তারা এখনও রয়েছে আদিম অবস্থায়; এবং ভাল-মন্দ কিছুই বোঝে না। তাই চরম কোন পন্থা গ্রহণ করলে 'নিফা'র উন্নতির উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবেই। নেহ্‌রু পরামর্শ দিলেন, প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি বাদ দিয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে 'নিফা'য় আমাদের মূল লক্ষ্য ব্যাহত না হয়। অবশেষে স্থির হ'ল, দাপোরিজো, আলং এবং মাচুকা থেকে হাজার খানেক সৈন্যের তিনটি দল সুবণশিরি নদী ধরে এগিয়ে গিয়ে আশিমোরিতে মিলিত হয়ে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবে। দ্বিতীয়বার এই বিরাটাকার বাহিনীকে নিজের 'রাজত্বে'র দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থাগিন সর্দার এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। ভেবেই পেল না, এই সেদিন অনধিকার প্রবেশকারীদের শেষ মানুষটিকেও কেটে ফেলে ভীতিপ্রদ উদাহরণ স্থাপন করা সত্ত্বেও, কোন্ শক্তি দ্বিতীয় একটি দল আবার পাঠাতে পারে। আতঙ্কিত সর্দার নিজের সহকারীদের জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পেল না। অনতিবিলম্বেই সব-সুদ্ধ বন্দী হ'ল তারা। বিনয়াবনত বন্দী-সর্দার মার্জনা ভিক্ষা করে স্বীকার করল, প্রথম দলটিকে হত্যা করে তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে সম্পূর্ণ বাহিনীটিকেই সে শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু

আপন দেশেরই 'শক্তিশালী' সরকারের সঙ্গে সে যে কলহ-লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এ ধারণা তার একেবারেই ছিল না। সর্দারের অনুতপ্ত ব্যবহার মহাভারতের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: '…বাঞ্ছিত ব্যক্তির বন্ধুত্ব অর্জনে অসমর্থ …এবং শক্তিশালীর বিরুদ্ধে নিজের অন্তরে হিংসার ভাবপোষণরত মানুষ যথার্থই অনুকম্পার যোগ্য।' অতঃপর আমাদের বিচক্ষণ সরকার তাকে অব্যাহতি দেন; এবং থাগিন সর্দারও সুবণশিরি জেলায় আমাদের অন্যতম দৃঢ় সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

এই সময়েই সীমান্তের, বিশেষ করে নিফা এবং নাগাভূমির উপজাতীয়দের সমস্যা নিয়ে নেহ্রুর সঙ্গে একবার আমার আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে তাঁর উপদেশগুলি অনেক কাজে এসেছিল আমার। নেহ্রুর অভিমত ছিল এই সমস্ত উপজাতীয়দের সঙ্গে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব নিয়ে আচরণ করা কখনই উচিত হবে না আমাদের, তেমনি এই সরল অথচ ভাবপ্রবণ জাতিকে আমাদের এক নিম্নতর অনুকৃতিরূপে গড়ে তোলাও অনুচিত হবে। জীবন-দর্শন সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দেবার মত আমাদের কিছু রয়েছে কিনা সন্দেহ; তবে একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারেই প্রগতির দিকে তাদের এগিয়ে যেতে দিতে হবে। আমাদের শুধু কর্তব্য হবে তাদের নিজেদের ভিতর থেকেই কিছু সংখ্যক লোককে দক্ষ প্রশাসক এবং কারিগর রূপে শিক্ষিত করে তোলা। মোট কথা যেদিক দিয়েই সাহায্য করা হোক না কেন, সে প্রচেষ্টায় যাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। জোর জবরদস্তি করে কোন কিছু করতে যাওয়া অথবা কোন বিশ্বাস চাপাবার চেষ্টা করার অর্থই হবে উপজাতীয়দের আমাদের কাছ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া।

নেহ্রু এবং আমি উভয়েই ছিলাম আঞ্চলিক বাহিনী পরামর্শদাতা কমিটির (Territorial Army Advisory Committee) যথাক্রমে সভাপতি এবং পদাধিকারজনিত (ex officio) সেক্রেটারী। দেশের মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় অসামরিক ব্যক্তিকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবার অন্যতম একটি সিদ্ধান্ত কমিটি গ্রহণ করে। জনসাধারণকে নিয়মানুবর্তীতা এবং আত্মনির্ভরতায় উদ্বুদ্ধ করে জাতির বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে তাদের সার্থকভাবে নিয়োজিত করাই সিদ্ধান্তটির প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে রোটাং গিরিপথ পার হয়ে ১১,০০০ ফুট উঁচুতে কেয়লং-এ একটি

প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করবার জন্য সামরিক শিক্ষকদের একটি দলকে পঞ্জাব থেকে লাহাওলে পাঠাতে মনস্থ করলাম; এবং দলটির অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করলাম অস্থায়ী কমিশনে নির্বাচিত ক্যাপ্‌টেন ত্রিলোচন লাভ সিং-কে। অভিযান সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ দেবার পর তাঁর সাফল্য কামনা করে বললাম, স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনের এই হ'ল তাঁর সুযোগ; কারণ বিপদসঙ্কুল পথ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং কঠিন জীবন-যাত্রার মোকাবিলা এই অভিযানে করতে হবে। সেই সঙ্গে আশ্বস্ত করে বললাম, এমন কোন অবস্থা যদি কখনও দেখা দেয় যার মোকাবিলা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, তবে যত অসুবিধাই থাকুক না কেন আমি নিজে তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে যাব। উৎসাহী মানুষ বলেই মনে হ'ল ক্যাপ্‌টেনকে। যথাসাধ্য চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর কঠিন সঙ্কল্প হৃদয়ে নিয়ে সদলবলে যাত্রা করে নিরাপদে অতিক্রম করলেন বিপদসঙ্কুল রোটাং গিরিপথ। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়ে কঠিন পরিশ্রম করে লাহাউলিদের মনে গভীর রেখাপাত করলেন তাঁরা। পরিকল্পনা মতই প্রশিক্ষণের কাজ এগিয়ে চলেছিল। সব কিছুই মনে হচ্ছিল আশাপ্রদ। বৎসরেব শেষ দিক এবং এতখানি উচ্চতা সত্ত্বেও আবহাওয়াও মোটের উপর ভালোই যাচ্ছিল এতদিন।

এক রাত্রিতে শুতে যাবার সময় অস্বাভাবিক গরমের জন্য সকলেই একটু অবাক হল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়েই সবিস্ময়ে দেখল পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারপাত হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁটু পরিমাণ গভীর তুষারে ঢেকে গেল চারদিক। অনেক কষ্টে হাতিয়ার, রেশন, পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন কি নিজেদেরও মুক্ত করে কেয়লং-এর ছয় মাইল দূরে তান্দি নামে একটি গ্রামে গিয়ে তাড়াতাড়ি কোন রকমে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর তুলে তার মধ্যে আশ্রয় নিল সবাই। দলটির সঙ্গে ভারতের একমাত্র যোগসূত্র ছিল চন্দ্র এবং ভাগা নদীর উপর অবস্থিত কেয়লং-রোটাং সেতু। সেটাও একদিন ধ্বসে পড়ল। দলটির রেশন কমে আসতে লাগল ক্রমশঃ। পোষাক-পরিচ্ছদও যথেষ্ট ছিল না। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ল অনেকে। আর একটি প্রবল তুষারপাত হলেই রোটাং গিরিপথ ছয় মাসের মত বন্ধ হয়ে যাবে। দলটিও অসহায় অবস্থায় আটকা পড়ে থাকবে সারা শীতকাল ধরে।

এই রকম যখন অবস্থা সেই সময় ক্যাপ্‌টেন ত্রিলোচন লাভ সিং নিজেদের

দুরবস্থার বিবরণ দিয়ে একখানা জরুরী বার্তা পাঠালেন আমার কাছে। মানুষগুলির জীবন যে বিপন্ন হয়েছে সেটা অনুধাবন করতে বিলম্ব হ'ল না। সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া ছিল আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। সেই রকম আশ্বাসই তাদের দিয়েছিলাম। অতএব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ ছিল না। যথোচিত বিভাগের মাধ্যমে কাজটি গ্রহণ করবার অনুমতি নিলাম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল বি. এস্‌. চাঁদ কিছুদিন আগেও আমার অধীনে ছিলেন। তাঁকেও এই অভিযানে আমার সঙ্গে যোগদান করতে অনুরোধ জানালাম। সাগ্রহে সম্মত হলেন চাঁদ।

সাম্প্রতিক বন্যা এবং বৃষ্টিতে কুলু-মনইলি পথ অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল। তার উপর, বেশ কয়েক ফুট বরফ জমে রোটাং গিরিপথও হয়ে পড়েছিল অনতিক্রমণীয়। তাই অনেকেই আমাকে হঠকারীর মত এই অভিযান চালাতে বারণ করলেন। কিন্তু যত বাধা বিপত্তিই থাক না কেন, অভিযানটি আমার কাছে একটা ইজ্জতের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে বিপদগ্রস্ত দলটিকে খবর পাঠিয়ে দিলাম, যেখানেই তারা থাক না কেন, আমি নিজে আসছি তাদের উদ্ধার করতে। তারপর আমি এবং চাঁদ রওনা হলাম দিল্লী থেকে। আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করলেও, দৃঢ় সংকল্প নিলাম যে-করেই হোক লোকগুলির কাছে আমাদের পৌছুতেই হবে।

পথে প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় এবং ঔষধপত্র সংগ্রহ করে প্রথম রাত্রিতেই আমরা পৌছে গেলাম পালামপুর। সেখান থেকে বাছা বাছা কয়েকজন লোকের একটি দলকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত করে আগে-ভাগেই পাঠিয়ে দিলাম রাস্তার ছোটখাট বাধাগুলিকে অপসারণ করবার জন্য। তারপর রওনা হলাম আমরা।

কুলু ছাড়াতেই দেখলাম পথের অবস্থা শোচনীয়। বহু স্থান ভেঙ্গে গেছে। বহু স্থান দিয়ে বয়ে চলেছে তীব্র জলস্রোত। স্রোতের তোড়ে পাছে ভেসে যাই তাই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি বেঁধে সেগুলি পার হলাম। অনেক জায়গায় পথের কোন চিহ্নই ছিল না। হাঁটু খানেক কাদা আর জলার ভিতর দিয়ে লড়াই করতে করতে পথহীন সেই বন্ধুর ভূ-ভাগের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। অবশেষে পঁচিশ ঘণ্টায় বত্রিশ মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে মনইলি হয়ে রোটাং গিরিপথের পাদদেশে অবস্থিত কোটিতে উপস্থিত হলাম।

পরদিন প্রভাতে যাত্রারম্ভের আগে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘন

বরফের চাদরে আবৃত রোটাং গিরিপথকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে মেঘের সমুদ্র। মালবাহকেরা সতর্ক করে দিল এই অবস্থায় উপরে উঠলে কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

তবু রওনা হলাম আমরা। ১০,০০০ ফুটের মত উপরে উঠতেই প্রথম বাধা এলো। পিচ্ছিল জমাট বরফে পরিণত তুষারাবৃত খাড়া পাহাড় পথ অবরোধ করে দাঁড়াল আমাদের। ধীরে ধীরে ১১,৫০০ ফুট পর্যন্ত উঠলাম। এখান থেকেই শুরু হয়েছে গিরিপথের আঁকা-বাঁকা শেষ চড়াই। ১৩,৫০০ ফুট উঁচুতে রোটাং মনে হ'ল বহু দূরে রয়েছে এখনো।

এতক্ষণ ছিল প্রবল বাতাস। অকস্মাৎ সেটা উন্মত্ত তুষার ঝঞ্ঝার রূপ পরিগ্রহ করল। গতিবেগ তার ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশী ছাড়া কম হবে না। বস্তুতঃ সেই প্রচণ্ড গতিবেগ বাহকদের পিঠ থেকে আমাদের যৎসামান্য মালপত্রের বেশ কিছুটা উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল নীচের খাদে। পর্বতারোহণের ছড়ি ছিল আমাদের হাতে। ক্রুদ্ধ বাতাসের উন্মত্ত আঘাতে সেগুলি পর্যন্ত আমাদের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। এক-পা এক-পা করে শ্রান্ত, ক্লান্ত আমরা এগিয়ে চললাম। হঠাৎ সম্মুখে পড়ল সমান্তরাল একটা বরফের প্রাচীর। জীবন হাতে নিয়ে শম্বুক গতিতে সেটাকেও পরিক্রম করলাম। এবং, এই বাধা অতিক্রম করতে গিয়েই বিশাল একটি তুষার খণ্ডের নীচে শায়িত এক হতভাগ্যের দেহের সঙ্গে হোঁচট খেলাম। লোকটি নিশ্চয়ই সেখানে বিশ্রামের উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে চিরবিশ্রাম লাভ করেছে।

আশে-পাশে চারধার থেকে যেন মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পাচ্ছিলাম। একটি মাত্র ভ্রান্ত পদক্ষেপের অর্থই ছিল বিপদসঙ্কুল ঢালুর নীচে সর্বনাশা পতন। ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠল ঠাণ্ডা। কোথাও কোন আশ্রয় নেই। নির্জীব সারা দেহ ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এলো। ক্ষণপূর্বে যার মৃতদেহ দেখে এসেছি, ভয় হ'ল তার মতই ঠাণ্ডায় জমে আমাদেরও মৃত্যু বরণ করতে হবে।

গিরিপথের নিকটে জমতে শুরু করল ঘন কুয়াশা। দৃষ্টিসীমা সঙ্কুচিত হয়ে এলো বিপজ্জনক ভাবে। গিরিপথ থেকে যখন প্রায় ৫০০ ফুট নীচে রয়েছি তখন ঘন বরফের মধ্যে তুষার ঝঞ্ঝার সঙ্গে সংগ্রামের ফল অনুভব করতে আরম্ভ করলাম। চরম দুর্বলতা পঙ্গু-প্রায় করে ফেলল আমাদের। সমস্ত জীবনীশক্তি মনে হ'ল বেরিয়ে গেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে। বস্তুতঃ তখন

পর্যন্ত কোন রকমে আমরা নিজেদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চলৎ শক্তি রহিত হয়ে পড়ল।

এই ধরনের মুহূর্তগুলিতে নানা চিন্তার উদয় হয় মানুষের মনে। আমারও হ'ল। গৃহের কথা, স্ত্রীর কথা, সন্তানদের কথা; এমন কি সারা জীবন ধরে নানা ব্যাপারে যাদের বিরাগ অর্জন করেছি, তাদের কথাও। চাঁদ এবং আমি উভয়েই সহনশীলতার শেষ সীমায় পৌছে সমস্ত ইচ্ছাশক্তি কেন্দ্রীভূত করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম কেবলমাত্র সঙ্গীদের এবং নিজেদের জীবন রক্ষার তাগিদে। পরিশ্রান্তি এবং দুর্বলতার আধিক্যে কিছুক্ষণ পর পরই বসে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন হচ্ছিল আমাদের সমস্ত শক্তি এবং সাহসের। তারপর এক সময়, বোধ হয় প্রায় এক যুগ পর হঠাৎ নিজেদের আবিষ্কাব করলাম গিরিপথের উপরে। বিভীষিকাময় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কী ভাবে যে এখানে পৌছুলাম জানিনা। তবে, শেষ অবধি যে এই ভয়াতুর চড়াইয়ের কঠিনতম পরিশ্রম পিছনে ফেলে এসেছি তার জন্যে গভীর স্বস্তি অনুভব করলাম। চতুর্দিকে পরিবেষ্টন রচনাকারী পর্বতগুলি ২০,০০০ ফুটেরও বেশী উঁচু। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে। গিরিপথটি বিশেষ করে রাত্রিবেলা ভীতিপ্রদ হলেও মহিমান্বিত এক দৃশ্যের অবতারণা করল। সুদূর-পরাহত বাঁচবার আশা নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে প্রাণহীনের মতো আমরা ঘন তুষারের মধ্যেই বসে পড়লাম।

রোমাঞ্চকর এক অনুভূতি চারধার থেকে আঁকড়ে ধরল আমাদের। সারাটা রাত ধরে গর্জন করে চলল উন্মত্ত বাতাস। উদ্বিগ্ন চিন্তার রাশি হাতড়ে বেড়াতে লাগল নিকষকালো অন্ধকারের ভিতর। জানতাম, নিকটবর্তী কোন স্থান থেকেই মহর্ষি ব্যাসদেবের স্মৃতিবহনকারী বিয়াস নদীর উৎপত্তি হয়েছে। প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্বে এই স্থানেই তপস্যারত মহর্ষি ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন মহাভারত। মনে হ'ল যেন মহর্ষির পুণ্য দর্শনও আমরা পেলাম।

কিছু গরম পানীয় এবং গরম কাপড়ের আশু প্রয়োজন ছিল আমাদের। কিছুক্ষণ পূর্বেই ভারবাহকেরা কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। তাদের খোঁজ করছি এমন সময় দেখলাম ঘন নীহের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে তাদের কয়েকজন। সঙ্গে নিয়ে এলো চা, চিনি এবং কয়েকটি কম্বল। সঙ্গে সঙ্গে চা তৈরী করবার জন্য খানিকটা বরফ গলিয়ে নিলাম। এই একটিমাত্র পদার্থই এখন আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারে। অত উচ্চতায় এবং মেরুসুলভ

তাপমাত্রায় জল ফুটতে অনেক সময় নেয়। তাই ভগবৎদত্ত এই সঞ্জীবনী সুধা প্রস্তুত করতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হ'ল আমাদের। দু'টি খালি টিন জোগাড় করে তাতেই চায়ের পাতা ভিজানো হ'ল। তৈরী হয়ে যাবার পর মনে হ'ল যেন দেবভোগ্য অমৃত প্রস্তুত করেছি। এবার সমস্যা দেখা দিল কে আগে পান করবে তাই নিয়ে। টিন মাত্র দু'টি। অথচ লোক রয়েছি চারজন। ভারবাহকেরাও আমাদেরই মত শ্রান্ত এবং নিঃশেষিত শক্তি। তাদের আগে দেওয়া হবে, না আগে নেব চাঁদ ও আমি। খানিকটা গরম পানীয়ের অভাবে চারজনেই আমরা মরতে বসেছি। মনে মনে আলোচনা করে দেখলাম, এই সঙ্কটের সময় ভারবাহকদের আগে দিলে, চিরদিনের জন্য তারা আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে। অতএব ওদেরই প্রথমে দিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম আমরা দু'জন। পরবর্তী দু'টিন চা প্রস্তুত হতে মনে হ'ল যেন কত যুগ পার হয়ে গেছে।

তাড়াহুড়া করে দিল্লী থেকে রওনা হয়েছিলাম বলে যথেষ্ট শীতবস্ত্র কিংবা তুষার-ক্ষতের ওষুধ কিছুই সঙ্গে আনতে পারি নি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ফলে তাই আমাদের মুখের চামড়া ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করল। পা'গুলোও ফুলে উঠেছিল। এততেও বুঝি যথেষ্ট হ'ল না। সেই রাতেই এক তুষার ভল্লুকের সামনে পড়ে গেলাম। ভল্লুকটি বোধ হয় নিজের গোপন আবাসে অপরিচিত কতকগুলি মানুষকে অনধিকার প্রবেশ করতে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেল বড় বড় পা ফেলে।

যন্ত্রণাদায়ক সময় যেন আর কাটতে চাইছিল না। তবু এক সময় শেষ হ'ল সেই বিভীষিকাময় রাতের। দুর্যোগের অন্ত ঘোষণা করে আকাশে দেখা দিল উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। ভয়ঙ্করতম পরিস্থিতিতেও যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, আমাদেরও মনে তেমনি জেগে উঠল আশার একটি আলোক-রশ্মি। যাত্রা পথের শেষ অংশটুকু পাড়ি দেবার জন্য যখন নবোদ্যমে প্রস্তুত হচ্ছি, সেই মুহূর্তে দেখলাম গিরিপথের অপর দিক থেকে একটি মানুষ উঠে আসছে। পরক্ষণেই তার পিছু পিছু দেখা গেল অনেকগুলি মানুষ। এদেরই উদ্ধার করতে এসেছিলাম আমরা।

চন্দ্র এবং ভাগা নদীর জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে সেই বরফের উপর দিয়ে নদী পার হয়ে লোকগুলি এতদূর অবধি চলে এসেছে। অর্ধাশনে কাতর এই মানুষগুলির পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে প্রায় কিছুই ছিল

না। দৈহিক দিক থেকেও ভেঙে পড়েছিল সবাই। তুষার-অন্ধত্ব এবং পায়ে তুষার-ক্ষত দেখা দিয়েছিল অনেকের। পায়ের ফোসকা ফেটে রক্ত ঝরছিল। তাদের উদ্ধারের জন্যই এই দুর্গম পথে এত দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে আমরা এসেছি দেখে দৃশ্যতই অভিভূত হয়ে পড়ল সবাই। মর্মস্পর্শী কতগুলি দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। পরস্পরের অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম আমরা।

লোকগুলি একত্রিত হতেই কতগুলি দলে ভাগ করে দিলাম তাদের। মোট চল্লিশজনের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন পীড়ায় অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। রোটাং-এর উতরাইতে যাতে নামবার সময় অসুবিধা না হয় তাই পীড়িত লোকগুলিকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেকটি দলের ভার দিলাম এক একজন সমর্থ মানুষের উপর।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে গোধূলির সময় মুমূর্ষু অবস্থায় রোটাং গিরিপথের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে আবিষ্কার করলাম আমাদের মধ্যে দু'জন নেই। কেউ তাদের সন্ধান দিতে পাবল না। চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে স্থির করলাম লোক দু'টিকে না পাওয়া অবধি আমরা ফিরে যেতে পারি না; এবং তাদের খোঁজবার জন্য কয়েকজনকে আবার রোটাং গিরিপথের উপর উঠতেই হবে। ব্যাপারটি চিন্তা করতেও সারা শরীর যেন অবশ হয়ে এলো। কারণ, সঙ্কল্প থাকলেও এক ইঞ্চি নড়বার মতো ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট ছিল না আমাদের। তবু, আমার পক্ষে নিখোঁজ লোক দু'টিকে প্রতিক্ষায় ফেলে বাখা সম্ভবও ছিল না। সেই রাতেই আবার একটি দল গঠন করে নিয়ে তাদের অনুসন্ধানে যাবো মনস্থ করলাম। কিন্তু ভগবানের অশেষ করুণা, স্খলিত চরণে লোক দু'টি তাঁবুতে এসে উপস্থিত হ'ল। মরার মতো সে রাতে ঘুমোলাম সবাই। মনইলি হয়ে দিল্লী ফিরতে এরপর আর কোন কষ্ট হয় নি।

বিপর্যস্ত অবস্থায় দিল্লী পৌছুতেই এই ভয়াবহ অভিযান থেকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য বন্ধু-বান্ধব প্রচুর অভিনন্দন জানালেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিখিতভাবে পাঠালেন একটি প্রশংসাপত্র। নেহ্‌রু তাঁর সঙ্গে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন একদিন। ভারতের সংবাদপত্রগুলি বড় বড় শিরোনামা দিয়ে অভিযানের বিবরণ ছাপলো। বিদেশী সংবাদপত্রগুলি বিশেষ প্রবন্ধের জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলো আমায়। সামরিক বিভাগ এবং অন্যত্র ঈর্ষাও জাগরিত হয়ে উঠল সেই সঙ্গে।

১৯৫৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে আমাকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে কয়েক মাসের জন্য উত্তর প্রদেশের আঞ্চলিক অধিনায়কত্বের (Area Commander) দায়িত্বভার দেওয়া হ'ল (এর পরেই ৪নং ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ডিভিশনের অধিনায়কপদে আমাকে নিযুক্ত করা হয়)। ব্রিগেডিয়ার পি. পি. কুমারমঙ্গলমের (বর্তমান প্রধান সেনাপতি) অধিনায়কত্বে একটি ছত্রী ব্রিগেড (Para Brigade) সহ অনেকগুলি শিক্ষণকেন্দ্র আমার অধীনে ছিল।

বেরিলির ডিষ্ট্রিক্ট জেল পরিদর্শনের জন্য আমাকে একবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরিদর্শনকালে একজন যুবক দর্শনার্থীকে অশ্রুপূর্ণনেত্রে জনৈক বয়োবৃদ্ধ বন্দীর কাছে বিদায় নিতে দেখলাম। বন্দীটির পরের দিন ফাঁসী হবার কথা ছিল। কৌতূহলী হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্যাপারটি সম্বন্ধে জেল সুপারকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, একটি হত্যার মামলায় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটি নিজে খুন করেছে বলে কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে; এবং সেই কারণেই ফাঁসীর আদেশ হয়েছে তার। অথচ খুনটা প্রকৃতপক্ষে করেছে তার পুত্র; দর্শনার্থী ওই যুবকটি। পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে দুর্ভাগা পিতা মৃত্যু বরণ করবে কয়েকঘণ্টার মধ্যে। অবিচারের কারণে জীবন হারাবে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি! বিষয়টা কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না। সেই সময় লখ্‌নউতে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন আমার জ্ঞাতিভ্রাতা এম. জি. কল, আই. সি. এস.। অবিলম্বে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম তাঁর সঙ্গে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম লোকটির যাতে পরের দিন ফাঁসী না হয় সেই উদ্দেশ্যে একটি মুলতুবী আদেশ জারী করতে। বিনা ওজর আপত্তিতে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করলেন কল। ফাঁসীর কবল থেকে আপাততঃ রেহাই পেল লোকটি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থের কাছে শেষ মুহূর্তে তার প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করবারও একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হতভাগ্য লোকটি কিছুতেই নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলো না। অতএব ফাঁসীর আদেশ কার্যকরী করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না কর্তৃপক্ষের। আমাকে হতাশ করে দিয়ে কয়েক সপ্তাহ পর লোকটির ফাঁসী হয়ে যায়।

লেঃ জেনারেল সন্ত সিং ছিলেন আমার সামরিক অধিনায়ক। ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কথা তিনি আমায় বলেন। বিশিষ্ট নাগা নাগরিক এবং আমাদের সরকারের অনুগত

সমর্থক পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক ডাক্তার হারালু দুর্ঘটনাক্রমে কোহিমার কাছে আমাদের ২নং শিখ বাহিনীর সৈনিকদের হাতে নিহত হন। ঘটনার কয়েকদিন আগেই নাগারা কোহিমা আক্রমণ করেছিল। তাদের এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমাদের সৈনিকেরা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পূর্বের চাইতে অনেক বেশী সতর্ক হয়ে পড়ে। ঘটনার দিন ডাক্তার হারালু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পরনে তাঁর ছিল নাগাদের জাতীয় পোষাক। স্খলিত-চরণে বৃদ্ধ আসছিলেন কোহিমার দিকে। ২নং শিখ বাহিনীর একটি পর্যবেক্ষক দল দূর থেকে তাঁর আবছা মূর্তি দেখে বিদ্রোহী নাগা ভ্রমে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলে। নিহত লোকটি যে ডাক্তার হারালু এটা প্রচাব হতেই বিরাট একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বর্বরতার এবং ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়। ডাক্তার হারালুব কন্যা দিল্লীর বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নেহ্‌রুর অধীনে কাজ করতেন। তাঁর এবং নেহ্‌রুর কাছে সংবাদটি পৌঁছয় প্রায় একই সময়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি তদন্তের আদেশ দেওয়া হ'ল। তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করে ২নং শিখ বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল গুরবকস্‌ সিং সহ সমস্ত সামরিক অধিনায়কগণ ভ্রমক্রমে এই হত্যার জন্য দায়ী নিজেদের লোকগুলিকে রক্ষা করতে ব্যগ্র হয়ে পডলেন। প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্ত সকলেই রেহাই পেয়ে গেল। কিন্তু তদন্তটির বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠতেই আর একটি তদন্তের আদেশ দেওয়া হ'ল। এই দ্বিতীয় তদন্তটি করলেন জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার ডি. এম. সেন। এবাব দোষী সাব্যস্ত হ'ল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। কঠিন শাস্তি হ'ল তাদের। কয়েকজন অধিনায়কের বিরুদ্ধে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ভিত্তিহীন দোষারোপও করেছিলেন। ফলে, বিশ্বস্তভাবে এবং বিবেকের সঙ্গে সেনা-বিভাগে কাজ করা সত্ত্বেও লেঃ জেনারেল সন্ত সিংকে পাঁচমাস আগেই অবসর দেওয়া হ'ল, তাঁর স্থলাভিষিক্ত ক'রে পাঠানো হল থিমায়াকে[৪৮]। উক্ত ব্রিগেডে এবং ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কদেরও বদলী করে দেওয়া হয়। অবস্থার বলি হয়ে নেপথ্যে চলে গেলেন তাঁরা।

৪৮। কথিত আছে বৈরী নাগাসর্দার কাইতোর সঙ্গে থিমায়া সাক্ষাৎ করবার চেষ্টা করলে, আদব-কায়দা অনুসারে থিমায়ার মতো সামান্য একজন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কাইতো অসম্মত হন (কারণ, নাগাসর্দারের সঙ্গে দেখা করবার মতো পদমর্যাদা থিমায়ার ছিল না)।

৪

প্রস্তুতির পথে

দেশকে আমি সেবা করেছি,
তারা ত তা' জানে।
সেকস্‌পীয়র



১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে পঞ্জাবে অবস্থিত ৪নং (লাল ঈগল) ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ডিভিশনের অধিনায়করূপে নিযুক্ত করা হ'ল আমায়। গত মহাযুদ্ধে এই বাহিনী বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। পূর্বতন অধিনায়ক মেজর জেনারেল বাহাদুর সিং আদর্শস্থানীয় একটি সংগঠন আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই সংগঠনের মধ্যে নিয়ম মাফিক সহায়ক সংস্থাগুলি ছাড়াও ছিল ৫নং, ৭নং এবং ১১নং এই তিনটি ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ব্রিগেড। ব্রিগেডগুলির মধ্যে কিছুসংখ্যক সৈনিক সবদিক থেকে ছিল উৎকৃষ্ট ধরনের।

ডাক্তার হারালুর ঘটনায় অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ২নং শিখ বাহিনীর দুর্নাম হয়ে যায়, এবং নাগাভূমি থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বাহিনীটিকে আমার অধীনে দিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি; এবং সে অনুরোধ রক্ষাও করা হয়। ব্যাটেলিয়নটি আমার অধীনে আসবার পর তাদের নিয়ে বহু সাফল্যজনক কাজ আমরা করি এবং প্রশংসাও অর্জন করি। এইভাবে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে; এবং খেলাধুলা, ড্রিল, লক্ষ্যভেদ অথবা শিক্ষণ কোন ব্যাপারেই যে তারা কারও চাইতে হীন নয় এ কথাটা তারা অতি শীঘ্রই প্রমাণিত করে।

আমার কোর কমাণ্ডার (Corps Commander) প্রথমে ছিলেন লেঃ জেনারেল থোরাট এবং পরে লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরী। প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করে আনন্দলাভ করেছি; কিন্তু দ্বিতীয় জন ছিলেন দাম্ভিক, বাক্‌-সর্বস্ব এবং কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনে সদা-সচেষ্ট।

৪নং ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ডিভিশনের প্রাক্তন অধিনায়ক মেজর জেনারেল টি. ডবলু. রীসের অন্ধ অনুরাগী ছিলাম আমি। তাই এই বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে প্রথমেই তাঁকে একখানা চিঠি লিখলাম। সেই সময় তিনি ব্রিটেনে অবসর জীবন যাপন করছিলেন, এবং উদ্বৃত্ত সময়ে কোমব্রান (Cwmbran)

নামে একটি ছোট্ট শহর গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [স্থানটি ছিল নিউপোর্টের (ওয়েলসের মনমাউথশায়ারে) পাঁচ মাইল উত্তরে এবং গ্লামরগানের কারডিফের প্রায় বারো মাইল নিকটে।] যে সংগঠনের পুরোভাগে একদিন রীসের মতন একজন মানুষ ছিলেন, সেই সুবিখ্যাত ৪নং ডিভিশনের অধিনায়করূপে নির্বাচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; এবং সে বিষয়ে সচেতন থেকেই যথোচিত বিনয় এবং গর্বের সঙ্গে নিযুক্তিটাকে গ্রহণ করেছিলাম। চিঠিতে আমার এই মনোভাব প্রকাশ করে প্রার্থনা জানালাম যেন পূর্বেকার মতো এখনো তিনি আমাকে তাঁর অমূল্য উপদেশ দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আন্তরিকতাপূর্ণ জবাব এল রীসের কাছ থেকে। লিখলেন, আমার চিঠিখানা তাঁকে অভিভূত করেছে, এবং এই ডিভিশন তথা আমার কার্যাবলীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারলে তিনি আন্তরিকভাবে খুশী হবেন। (যতদিন রীস বেঁচে ছিলেন, নিয়মিতভাবে ডিভিশনের খবরাখবর তাঁকে দিয়েছি। তিনিও সেগুলি পেয়ে সত্যিই আনন্দিত হয়েছেন। কয়েক বৎসর পরেই তিনি মারা যান। রীসের মৃত্যুতে কেবল যে একজন মহামূল্য বন্ধুকেই হারালাম তা' নয়, হারালাম একজন মহৎ-হৃদয় উপরওয়ালাকেও।)

নতুন দায়িত্বভার নিয়ে চারটি বিষয়ে মনোনিবেশ করলাম: সর্বাধিক সংখ্যক মহড়ার দ্বারা বিভিন্ন সমরকৌশল আয়ত্ত করে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় ডিভিশনটিকে কুশলী করে তোলা; সমস্ত পর্যায়ে সমরাস্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন করানো; খেলা-ধূলায় শ্রেষ্ঠত্ব, এবং জওয়ান তথা তাদের পরিজনবর্গের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ প্রশাসনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। অফিসর এবং জওয়ানদের আত্মবিশ্বাসের নৈতিক শক্তি উন্নত করে রণকৌশলে উচ্চাঙ্গের দক্ষতা অর্জন করতে হলে এগুলির প্রত্যেকটি হ'ল অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রায় বিশ হাজার লোকের একটি ডিভিশনের প্রশাসন অথবা তার জন্য বিরাট একটি দলকে পরিচালনা করা জটিল ব্যাপার। এতগুলি মানুষ এবং তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য, প্রথমে মানুষগুলি এবং তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিয়ে তারপর সুকৌশলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র মেজর জেনারেলের পদ এবং কর্তৃত্বই যথেষ্ট নয়। কারণ, প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা, তোষামোদ, ভীরুতা, নীচতা, মিথ্যাকথন এবং মানব চরিত্রের অন্যান্য দুর্বলতার[১] সম্মুখীন হতেই হবে,

১। মানুষের জীবনে এই ধরনের পরিস্থিতি হ'ল অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা।

এবং তাদের মোকাবিলাও করতে হবে। একমাত্র সান্ত্বনা হ'ল যেমন এই ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি ত্যাগ, শৌর্য এবং সহমর্মীতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তেরও দেখা মেলে। অতএব, ভালো-মন্দ মিশ্রিত এই ব্যাপারগুলির মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

সামরিক দিক থেকে ডিভিশনটিকে সুদক্ষ করে তোলবার কাজে হাত দেবার আগে, সৈনিক ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্ব সম্বন্ধে এর পূর্বে যা কিছু পড়েছি অথবা শিখেছি, সে সমস্ত মনে মনে চিন্তা করে নিলাম। ডিভিশনের দৃষ্টিকোণ থেকে সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অংশ এবং দলগুলিকে যুদ্ধে নিয়োগ করার কৌশলও বিশ্লেষণ করলাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তারপর ভূমির উপর বিভিন্ন আক্রমণাত্মক যুদ্ধকৌশল প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে একাধিক মহড়ার ব্যবস্থা করলাম।

এইগুলির মধ্যে 'মালব' এবং 'দোয়াব' নামে পশ্চিম কমাণ্ড কর্তৃক আয়োজিত সর্ববৃহৎ দু'টি মহড়ায় আমার ডিভিশন সহ নিজে অংশ গ্রহণ করি। পদাতিক, সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনীয়ার এবং সিগনাল দলের ব্যাপক ব্যবহার করা হয় মহড়া দু'টিতে। ব্যূহ-রচনা সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং সেগুলির মোকাবিলাও করি আমরা। একটি মহড়ায় শতদ্রু নদী অতিক্রম করতে হয় আমাকে। আক্রমণাত্মক সরঞ্জামাদির স্বল্পতার দরুন স্থির করেছিলাম একটিমাত্র ব্রিগেড নিয়েই নদীটি পার হব। যে সমস্ত গোলন্দাজ এবং ইঞ্জিনীয়ার দল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তাদের সহায়তায় মহড়াটি করবার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের ছত্রিশ ঘণ্টা আগে আমার 'ও' গ্রুপের[২] সঙ্গে বসে সমস্ত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করে দেখছি, এমন সময় লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরী একটি জীপে করে এসে উপস্থিত হলেন; এবং আমার ব্রিগেড অধিনায়ক ও অন্যান্যদের শ্রুতিগোচর স্বরে বললেন, প্রধান সেনাপতি জেনারেল কে. এস. থিমায়ার ইচ্ছা আক্রমণাত্মক অতিক্রমণটি যেন দু'টি ব্রিগেড নিয়ে করা হয়। পরিকল্পনাটিকেও সেইমত পরিবর্তন করতে বললেন চৌধুরী। আক্রমণাত্মক সাজ-সরঞ্জামের ঘাটতি থাকার কারণে প্রধান সেনাপতির অভিপ্রায় সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে আমার আদেশ পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। তা' ছাড়া অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থাগুলিকে পরিবর্তিত করে

২। আক্রমণাত্মক অভিযানটিকে কার্যকরী করবার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল।

তারপর মহড়া করে নেবার মত যথেষ্ট সময়ও হাতে ছিল না। সে কথা চৌধুরীকে খুলে বললাম। কিন্তু মহড়ার এই ব্যাপারটি নিয়ে প্রধান সেনাপতির বিরাগভাজন হতে রাজী ছিলেন না চৌধুরী; এবং সেই ওজর দেখিয়ে বিচলিতভাবে বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন। অগত্যা জিজ্ঞাসা করলাম শিক্ষণের ব্যবস্থাটা করা হয়েছে যুদ্ধের জন্য, না উপরওয়ালাকে খুশী করার জন্য। এবার বেশ অসন্তুষ্ট হলেন চৌধুরী। বললেন, আমার যা খুশী তাই বলতে পারি, কিন্তু (ভগবানের দোহাই) অভিযানটিতে যেন দু'টি ব্রিগেডকেই নিযুক্ত করা হয়। এই কথাটাও আমার 'ও' গ্রুপের অধিকাংশ ব্যক্তিরই কর্ণগোচর হ'ল।

আলোচ্য মহড়ার পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত একটি সেতুকে 'বিধ্বস্ত' বলে ধরে নিয়ে নৌকার সাহায্য ব্যতিরেকে নদীটি পার হবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটি ব্রিগেডের উপর। চৌধুরী যখন দেখলাম কোন যুক্তি-তর্কই শুনবেন না, তখন অনিচ্ছাভরে আদেশ দিলাম ট্রাকে করেই সেতুটিকে পার হতে হবে, কিন্তু মনে করে নিতে হবে যে সেতুটি 'বিধ্বস্ত' এবং ট্রাকগুলি হল নৌকা (!)। পরিবর্তীত আদেশ অনুযায়ী মহড়া শুরু হতেই, ১১নং ব্রিগেড নিয়ে ব্রিগেডিয়ার ভগবতী সিংকে লরীযোগে সেতুটি পার হতে দেখে জেনারেল থিমায়া তাঁর কৈফিয়ৎ তলব করেন; এবং বাস্তব অসুবিধার কথা চিন্তা না করেই চৌধুরী এই অতিক্রমণের প্রহসনটি আমাদের করতে বলেছিলেন শুনে অবাক্ হন।

নিজের উপরওয়ালাদের খুশী করতে চৌধুরী যে কীভাবে চেষ্টা করতেন উল্লিখিত ঘটনাটি হ'ল তারই এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আপন সরাসরি উপরওয়ালা লেঃ জেনারেল কলবন্ত সিং-এর সামনে তাঁর অবস্থা হ'ত দেখবার মতন। আত্মপ্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ; বিশেষ করে অধীনস্থ ব্যক্তিদের সামনে। আমার মনে হয়, নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করার অদ্ভুত উৎসাহ ছিল তাঁর। এই উদ্দেশ্যে সময় সময় অধীনস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিসাধন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। আমার ধারণার সঙ্গে অনেকেই ছিলেন একমত। নিজের অথবা নিজের কার্যাবলী সম্বন্ধে অপরে কি ভাবত সেটা জানবার আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল চৌধুরীর মনে। অনেককেই এই বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। বলা বাহুল্য, আশা করতেন অতি-প্রশংসাসূচক জবাবের!

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্শাল ইয়েহ্ চিয়াং-ইংএর নেতৃত্বে

আগত একটি চীনা সামরিক প্রতিনিধি দলকে আমার ডিভিশন পরিদর্শন করতে পাঠালেন জেনারেল থিমায়া। এই উপলক্ষ্যে সক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে হাতে-কলমে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে বলা হ'ল আমাকে। মাতৃভূমি তথা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্রের যথাসম্ভব উন্নত নিদর্শন উক্ত প্রতিনিধিদলের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে স্বভাবতই আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। অনেক চেষ্টার পর 'ধনুষ' নাম দিয়ে পদাতিক এবং বিমান বাহিনীর যুক্ত একটি মহড়ার আয়োজন করলাম। মহড়াটি ছিল, যেন একটি ব্রিগেড আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছে, এবং সেই অভিযানের অংশ হিসাবে ট্যাঙ্ক, কামান, মাঝারি মেশিনগান, মর্টার এবং বিমানের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়েছে একটি ইন্‌ফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন। আমার দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণের পূর্বে কীভাবে শত্রু ঘাঁটিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া যায়; আকাশ এবং ভূমির অস্ত্র-শস্ত্রগুলির সমন্বয় সাধন কতখানি জরুরী; এবং উন্মুক্ত ভূমিতে দিবালোকে আক্রমণ চালাবার সময় জ্ঞাত যে সমস্ত শত্রুঘাঁটিগুলি থেকে আক্রমণকারী ইন্‌ফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন বাধা পেতে পারে সেই সমস্ত স্থানে প্রাপ্তিসাধ্য সর্বপ্রকারের আগ্নেয়াস্ত্রের সহায়তা কীভাবে নেওয়া যায়। প্রথমে দেখানো হ'ল আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে বিমান এবং কামান থেকে বোমাবর্ষণ। তারপর ইন্‌ফ্যান্ট্রি বাহিনী এলো ব্যূহ রচনা করে; আক্রমণ আরম্ভ করবার নির্দিষ্ট সংকেত-স্থান পার হ'ল এবং কামানের গোলার আড়ালে থেকে লক্ষ্যস্থল অভিমুখে এগিয়ে চলল ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে। সেই সঙ্গে প্রতিরোধকারী সম্ভাব্য শত্রুঘাঁটিগুলির প্রতি আক্রমণ চালাল মর্টার এবং মাঝারি মেশিনগান।

এই প্রদর্শনীতে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন, প্রধান সেনাপতি থিমায়া, বিমান বাহিনীর প্রধান মুখার্জি এবং স্টাফ কলেজের কমান্‌ডান্ট মেঃ জেনালের গ্যায়নী সহ সমস্ত ছাত্রগণ।

ডিনারের নিমন্ত্রণে অতিথিদের অভ্যার্থনা জানিয়ে চীনা ভাষায় নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলাম আমি। শুনে আবাক্ হয়ে গেলেন সবাই। আমাদের সরকারের তৎকালীন নীতির জন্য সেই সময় চীনেব সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সামরিক তৎপরতারও আংশিক দায়িত্ব ছিল

আমার উপর। তাই ওয়াগাহ এবং ডেরা বাবা নানক সেতু বরাবর ফেরোজপুর থেকে পাঠানকোট অবধি অংশে কয়েকটি অভিযানমূলক পরিদর্শন-পরিক্রমা চালাই। অঞ্চলটির আশে-পাশের স্থান, বিশেষ করে যোগাযোগের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অসুবিধাগুলি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

মার্শাল জুকভের ভারত পরিদর্শনে আসবার কথা ছিল। সেই উপলক্ষ্যে আক্রমণাত্মক একটি অভিনয় তাঁর সম্মুখে প্রদর্শনের জন্য থিমায়া আমার ডিভিশনটিকে মনোনীত করেন। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতও হই ; কিন্তু শেষ মুহূর্তে জুকভের সফর বাতিল হয়ে যায়। পরে, পশ্চিম কমাণ্ডের সদর দফতর সিমলায় বালুকাময় ভূমির প্রতিরূপ নিয়ে একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়; এবং আমাকেও যোগদান করতে হয় তাতে। চৌধুরীও অংশ গ্রহণ করেন। মহড়াটিতে বহুবিধ বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। লেঃ জেনারেল কলবন্ত সিং এই ধরনের একটি সমস্যার মোকাবিলা করতে চৌধুরীকে আহ্বান জানালে একাধিক উচ্চপদস্থ অফিসরদের সামনে চৌধুরী যে চিন্তাধারার পরিচয় দেন তা' তাঁর তথাকথিত যশ এবং অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না।

১৯৫৮ সালে চৌধুরী এবং আমি একই সঙ্গে জলন্ধরে ছিলাম। জলন্ধর থেকে হোসিয়ারপুর মোটরে হ'ল ঘণ্টাখানেকের পথ। একদিন চৌধুরীর ইচ্ছা হ'ল হোসিয়ারপুরের জনৈক বিখ্যাত ভৃগুর (জ্যোতিষী) কাছে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করাবেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন। আরেকজন অফিসরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই গেলাম সেই জ্যোতিষীর কাছে। ভাগ্য-বিচারও করান হ'ল। চৌধুরী সম্বন্ধে পণ্ডিত ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন, একদিন তিনি প্রধান সেনাপতি হবেন। ভয়ানক খুশী হলেন চৌধুরী। আমার জীবনের কয়েকটি ঘটনাও সঠিক বলেছিলেন পণ্ডিত।

আম্বালার ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা ট্রিবিউনের সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রেম ভাটিয়া। কলেজে সহপাঠী ছিলাম আমরা। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এলস্‌ওয়ার্থ বাংকারের সম্মানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ভাটিয়া আমায় নিমন্ত্রণ করেন। অনুষ্ঠানটি ভালো লাগছিল না। তাই অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ ভাটিয়া ঘোষণা করলেন বিশিষ্ট অতিথির সম্মানে আমি কিছু বলব। অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম আমি। তবু বন্ধুত্বের আবেগপূর্ণ কয়েকটি কথা কোনরকমে বলে ফেললাম। পরে অবশ্য

আলাপ হ'ল বাংকারের সাথে। যাইহোক, দিল্লীতে ফিরে গিয়ে নিম্নলিখিত চিঠিখানা আমায় লিখলেন বাংকার ঃ

নয়া দিল্লী

২১শে এপ্রিল ১৯৫৯

প্রিয় জেনারেল কল,

…সেদিনকার অনুষ্ঠানে এবং আপনার সঙ্গে বার্তালাপে যতখানি আনন্দ পেয়েছি, এমন আর কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। প্রথম আলাপেই আমাদের মধ্যে যে ধরনের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব এবং চিন্তাধারার সাযুজ্য পরিলক্ষিত হ'ল, প্রথম পরিচয়েই সাধারণতঃ সে রকম হয় না…।

আপনার একান্ত অনুগত

এলস্‌ওয়ার্থ বাংকার

(অথচ ভাগ্যের পরিহাস, কুৎসা-রটনাকারীরা এই সময়েই আমাকে আমেরিকা-বিরোধী বলে প্রচার চালাতে থাকে।)

মেজর রঙ্গভাশ্যাম নামে জনৈক সুযোগ্য অফিসর আমার অধীনে কাজ করতেন। পেশাগত বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয় নিয়ে প্রায়ই আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একদিন আমার মতামত জানতে চান তিনি। দক্ষিণ ভারতীয় এবং বঙ্গবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী আমার ভালো লাগে সে কথা স্বীকার করলাম। কারণ তাঁদের মধ্যে কোন ভেজাল নেই। অনেক ভারতবাসী ভারতীয় হওয়াটাকেই মনে করেন লজ্জার ব্যাপার। এঁরা কিন্তু নিজেদের কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে মোটেই সঙ্কোচবোধ করেন না। ইট্‌লী, দোসা অথবা মাছ খাওয়া; নিজেদের ঐতিহ্যগত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা (অন্ততঃ বাড়ীতেও) এবং আপন মাতৃভাষা তামিল, তেলেগু অথবা বাংলায় কথা বলা,—কোনটাতেই এঁরা লজ্জা বোধ করেন না এতটুকু। নিজস্ব সঙ্গীতধারা এবং পাল-পার্বণাদি রয়েছে তাঁদের; এবং রয়েছে আপন ঐতিহ্য ও স্বকীয়তার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা।

এই সময়েই আম্বালার দক্ষিণ-ভারতীয়গণ শ্রীত্যাগরাজের 'আরাধনা' নামক সঙ্গীতোৎসব পালনের মনস্থ করেন। আমাকে অনুরোধ করা হ'ল সেই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করতে। এই সঙ্গীতজ্ঞ ঋষি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমার জানা ছিল না। তাই বিব্রত অবস্থা এড়াবার উদ্দেশ্যে তাঁর জীবন ইতিহাস বিস্তারিতভাবে পড়ে নিলাম। কবিতার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তিকে প্রাণবন্ত

করে তুলতে সুদক্ষ ছিলেন শ্রীত্যাগরাজ। সুনির্বাচিত শব্দাবলী দিয়ে 'সঙ্গতি'র বিস্তার করতেন অপূর্ব কুশলতায়। আবেগ, অনুভূতি এবং দরদই ছিল তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য; এবং পুনরুক্তি দোষ তাঁর কবিতায় নেই বললেই চলে। শ্রীত্যাগরাজ ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট কবি এবং সঙ্গীত সাধক।

মিসেস জয়েস ন্যাগ্‌ল্[৩] নাম্নী বছর কুড়ি বয়সের জনৈক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একদিন নিম্নলিখিত চিঠিখানা পাই (চিঠিখানা এখনো আমার কাছে রয়েছে):

প্রিয় জেনারেল,

আমার জীবন-মরণ সমস্যা স্বরূপ একটি বিশেষ জরুরী ব্যাপারে যথাসত্বর মিনিট দশেকের জন্য অনুগ্রহ করে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করি।

ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

আপনার অনুগত
জয়েস ন্যাগ্‌ল্

চিঠিখানা পেয়েই হাসপাতালে ছুটলাম। মহিলাটির তখন প্রায় শেষ অবস্থা। ঘর থেকে অন্যান্য লোকজন সরে যেতেই আমাকে কাছে বসতে বললেন। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললেন, আমার সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে তিনি অনেক কুৎসা শুনেছেন, কিন্তু কোনটাই বিশ্বাস করেন নি। বলতে বলতে ছোট্ট হাতখানা আমার হাতের উপর রেখে কেঁদে ফেললেন মিসেস ন্যাগ্‌ল্। একটু পরেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

এই কথাটুকু বলবার জন্যই আমায় ডেকেছিলেন মিসেস ন্যাগ্‌ল্; এবং এই কারণেই বুঝি মুমূর্ষু অবস্থাতেও এতক্ষণ মৃত্যুকে বরণ করতে পারেন নি। ব্যাপারটি আমায় ভয়ানকভাবে বিচলিত করে তোলে।

১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ মেনন এলেন আমার ডিভিশন পরিদর্শন করতে। বছর দশেক আগে নেহ্‌রুর বাসায় একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। কিন্তু বলতে গেলে এই প্রথম আমার নিজস্ব এলাকায় তাঁর সঙ্গে মোলাকাত হ'ল।

কথাবার্তায় মেননকে মনে হ'ল অত্যন্ত রূঢ় এবং সর্বদাই যেন ভয়ানক ব্যস্ত।

৩। আমার অধীনস্থ ৬।৮ নং গোর্খা রাইফেল্‌স্-এর ক্যাপটেন ন্যাগ্‌ল্-এর স্ত্রী।

আমাদের আক্রমণাত্মক ভূমিকা তথা বিগত বছর দুয়েক ধরে কীভাবে সেই ব্যাপারে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছি তাই নিয়ে প্রথমে আলোচনা হ'ল। তারপর প্রশাসনিক কতগুলি অসুবিধার কথাপ্রসঙ্গে আমাদের সৈনিকদের পারিবারিক আবাসস্থানের স্বল্পতার কথা বললাম। কয়েক বৎসর পূর্বে দেশ বিভাগের ফলে প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানে চলে গেছে। দুই-তৃতীয়াংশই রয়ে গেছে আমাদের দিকে। অথচ এদের জন্য যত সংখ্যক পারিবারিক আবাস আমাদের থাকা উচিত তার তুলনায় রয়েছে অনেক কম। এই সমস্যাটিই যে বর্তমানে সব চাইতে বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করেছে সে কথা জানালাম প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে। আমার পূর্বতন অধিনায়ক এ ব্যাপার নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক লেখালেখি করেছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি। পারিবারিক আবাসের ব্যাপারে সরকার বোধ হয় মন স্থির করতে পারছিলেন না। কারণ অন্যান্য সমস্যা ছাড়াও, প্রতিরক্ষা বাহিনীর মূল ঘাঁটিগুলি কোথায় স্থাপন করা হবে সেইটাই চূড়ান্তভাবে স্থির হয় নি। মাঝ থেকে উপযুক্ত সংখ্যক পারিবারিক আবাসের অভাবে সৈনিকদের মনোবলের ক্ষতি হচ্ছিল।

সব কিছু শুনে মেনন বললেন, বর্তমান অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিভাগীয় বাধা অতিক্রম করে সমস্যাটির সমাধান করতে অন্ততপক্ষে তিরিশ বছর সময় লাগবে (নিয়ম মাফিক বাস্তু বিভাগের মাধ্যমে করতে গেলে) ; এবং ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা অসম্ভব। অতএব, যদি প্রয়োজন মত অর্থের সংস্থান করা যায় তাহ'লে সৈনিকেরা নিজেদের পারিবারিক আবাস নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারবে কি না সে কথাও জানতে চাইলেন।

কথাটাতে প্রথমে অতটা গুরুত্ব দিই নি ; কারণ, পূর্বতন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও এ ধরনের বহু নিষ্ফল আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। মেনন কিন্তু সত্যিই গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন কথাটা। অতএব প্রস্তাবটি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে কিছুই করবার ছিল না আমার পক্ষে। তাই বললাম, সমাধানের অন্য কোন পন্থা যদি না থাকে এবং আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ[৪] অসম্মত না হন, তাঁ'হলে আমি রাজী আছি। সেই সঙ্গে এও বললাম, নিজের এবং আপন পরিজনবর্গের জন্য নিজ পরিশ্রমে গৃহ নির্মাণ

৪। লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরী, লেঃ জেনারেল কলবন্ত সিং এবং জেনারেল কে. এস. থিমায়া আমার তিনজন উপরওয়ালাই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করতে অনুমতি দেন আমায়।

করার মধ্যে সৈনিকদের পক্ষে অসম্মানজনক কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। অস্থায়ীভাবে মাত্র কয়েক মাসের জন্য এই ধরনের একটি পরিকল্পনায় কাজ করলে আমার সৈনিকগণ কুশলতা হারাবে কিংবা আজীবনের বৃত্তি ভুলে যাবে, অথবা কিছু কালের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যাহত হলে সৈনিকবৃত্তি অপূরণীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা' আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, যেটুকু ক্ষতি হবে তা' সামান্য সময়ের মধ্যেই পূরণ করে নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

আমার বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন মেনন। তারপর জানতে চাইলেন পরিকল্পনাটির জন্য কত টাকা দরকার এবং সম্পূর্ণ করতে কত দিন লাগতে পারে। প্রশ্ন দু'টির জবাব নির্ভর করছিল অনেকগুলি ব্যাপারের উপর। যেমন, ঠিকাদারদের বিলম্ব, বাড়তি খরচের বিবিধ কারণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কড়া সামরিক নিয়ন্ত্রণে কাজের দ্রুত অগ্রগতি ইত্যাদি। বিষয়গুলি মনে মনে চিন্তা করে নিয়ে একটি সহজ সূত্র অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে হিসাব কষে ফেললাম। তারপর বললাম, আনুমানিক এক কোটি টাকা ব্যয়ে ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারব। অসামরিক ঠিকাদারেরা সাধারণতঃ যে সময়ে এবং খরচে কাজটা করতে রাজী হ'ত, আমার হিসাব ছিল তার চাইতে অনেক কম। এত কমে বলতে পেরেছিলাম কারণ আমার অধীনস্থ সর্বস্তরের সৈনিকদের বহুমুখী কর্মশক্তির উপর আমার সুদৃঢ় আস্থা ছিল। সাহস, কঠিন পরিশ্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ইত্যাদি বিশেষ গুণগুলির সমন্বয় হয়েছিল তাদের মধ্যে। ফলে, যে কোন কাজই তারা সুষ্ঠুভাবে করবার শক্তি অর্জন করেছিল। তা' ছাড়া, তাদের নিয়ে যে কোন শ্রমসাধ্য কাজই যে অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারব এ বিশ্বাস আমার ছিল।

পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আরও আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল মেননের। তাই, সেই রাত্রেই তাঁর সঙ্গে আমায় দিল্লী যেতে বললেন। কিন্তু উপরওয়ালার অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারি না আমি। কথাটা মেননকে জানাতেই তিনি সেটাকে একটা বাজে অজুহাত বলে ধরে নিলেন; এবং রাগত ভাবে চলে গেলেন। পরের দিন সকালে জেনারেল থিমায়া এবং আমার অপর উপরওয়ালার কাছ থেকে আদেশ পেয়ে অবিলম্বে মেননের সঙ্গে দেখা করবার জন্য দিল্লী রওনা হলাম।

আগের দিন আম্বালায় যে আলোচনা হয়েছিল সেগুলিকে মেনন অনুমোদন করলেন। শুধু তাই নয়, পরিকল্পনার কাজে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য

বিভাগীয় নিয়মকানুন প্রয়োজন অনুসারে ডিঙ্গিয়ে যাবার বিশেষ অধিকারও আমায় দেওয়া হবে বলে জানালেন।

ব্যাপারটি নিয়ে থিমায়ার সঙ্গেও আলোচনা হ'ল। প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্যক্তি। দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করলেন, প্রথম দিকে পরিকল্পনাটির প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলেন পারিবারিক আবাসের স্বল্পতার দরুন সত্যিই সৈনিকদের মনোবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই মত না দিয়ে পারেন নি।

মাস সাতেকের ভিতরে ন্যূনাধিক এক কোটি টাকার মধ্যে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা এবং আসবাবপত্রসহ সর্বস্তরের সৈনিকদের জন্য ১৪৫০টি পারিবারিক আবাস নির্মাণ করা আমার লক্ষ্য ছিল। হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি বাড়ির জন্য সাড়ে তিন ঘণ্টার মত সময় লাগবার কথা। অধীনস্থ সমস্ত সেনানীদের একত্র করে বললাম তাঁদের উপর ভরসা করেই এই বিরাট দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করেছি। আনন্দের কথা, সবাই আমায় পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এই সময়েই 'দোয়াবা' নামে একটি মহড়ায় আমরা অংশ গ্রহণ করি। আগেই এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আমাদের সমর কুশলতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই কর্তৃপক্ষ মহড়াটির ব্যবস্থা করেছিলেন। বলা বাহুল্য আমরাও সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। এর পরই বিশ্রী গরম পড়ে গেল। প্রখর সূর্য এবং দৃষ্টি-অন্ধকারী ধূলি-ঝঞ্ঝার মধ্যে কাজ করা হয়ে পড়ল অতীব কঠিন।

যাই হোক, পরিকল্পনাটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন মেনন, এবং কাজ আরম্ভ হল ১৯৫৮ সালের ১৬ই জুন তারিখে। মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে পেলাম কর্ণেল শামসের জঙ্গ্ নামে একজন বিনয়ী, বিবেকবান, কুশলী এবং হাসিখুশী মেজাজের অফিসরকে। লেঃ কর্ণেল লাম্বা হলেন প্রশাসনিক অধিকর্তা। অতি মূল্যবান সাহায্য তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

১৪৫০টি গৃহনির্মাণ ছাড়াও আরও অনেক কাজ ছিল। যেমন, ছয় লক্ষ গ্যালন অতিরিক্ত জল সরবরাহের জন্য ষোল মাইল লম্বা নলের ব্যবস্থা করা; ভাকরা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৪৫০ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি নিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং আভ্যন্তরীণ আট মাইল লম্বা রাস্তার উন্নতিসাধন করা। পরিকল্পনাটির জন্য প্রয়োজন ছিল ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০ হাজার টন মালপত্রের। এর মধ্যে ছিল চার কোটি ইট, দশ হাজার টন

সিমেণ্ট, আট হাজার টন কয়লা এবং দেড় হাজার টন ইস্পাত। আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুন এদের মধ্যে অনেকগুলিরই সরবরাহ ছিল কম এবং সংগ্রহ করাও ছিল কঠিন। অথচ মালপত্রগুলি সংগ্রহ তথা তাদের গুণাগুণ নির্দিষ্ট করে নিয়ে বিস্তারিত নকশা প্রস্তুত করবার প্রয়োজন ছিল অবিলম্বে। তা' ছাড়া সামরিক এবং অসামরিক মিস্ত্রী একসঙ্গে কাজ করবে। এতে শ্রম-শক্তিই বা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তাও সঠিক অনুমান করতে পারছিলাম না।

আশপাশে চৌদ্দটি ইটের ভাঁটি ছিল, এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বার্ষিক এক কোটি ইট। আমাদের প্রয়োজনের কথা শুনেই ভাঁটির মালিকরা গা' ঢাকা দিল। অনেক চেষ্টার পর তাদের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু ফল হ'ল না কিছুই। সকলেই একবাক্যে জানাল আধপোড়া কিছু ইট ছাড়া দেবার মত আর কিছুই নেই। ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। তাই স্থানীয় কমিশনারের সাহায্যে সমস্ত ভাঁটিগুলিকে নিয়ে নিলাম। ইট যা' কিছু পাওয়া গেল সমস্ত কিনে নিলাম নগদ দাম দিয়ে। নিজের স্বার্থের জন্য এগুলি করি নি। তাই বিবেক-দংশনের প্রশ্নও ছিল না। এইভাবে জোগাড় হ'ল এক কোটি ইট। বাকী তিন কোটি সংগ্রহ হ'ল অন্যান্য স্থান থেকে। নিকটবর্তী ঘগ্‌গর নদীতে প্রচুর বালি পাওয়া যেত; প্রয়োজন মত সেখান থেকে আনিয়ে নিলাম। আমার ধারণা ছিল নদীতীরবর্তী বালির জন্য কোন দাম লাগে না। কিন্তু অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম ওগুলি হ'ল সরকারী সম্পত্তি। অতএব দামও দিতে হ'ল। বর্ষাকালে সেগুলি যখন আবার ধুয়ে গেল, তখন দেখা দিল কঠিন সমস্যা। আশ-পাশের অঞ্চল থেকে কিছু কিছু কাঠ এবং অন্যান্য মালপত্র জোগাড় করা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তাই বাকীটা সংগ্রহ করতে হ'ল অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে।

মাল পরিবহনের জন্য সর্বাধিক সাহায্য নেওয়া হ'ল ভাড়া করা অসামরিক গাড়ীগুলির। সামরিক প্রয়োজনের জন্য আমাদের গাড়ীগুলিতে হাত দিলাম না। বিভিন্ন ধরনের কারখানা এবং অন্যান্য কাজের জন্য আচ্ছাদনযুক্ত স্থানের প্রয়োজন ছিল। অতএব সেদিকটিতে আমাদের দ্বিগুণ শক্তি নিয়োজিত করলাম।

ইতিমধ্যে এসে পড়ল বর্ষাকাল। বৃষ্টির জন্য ভিত্তি স্থাপনের কাজে বেশ কিছুটা বাধার সৃষ্টি হ'ল। ইটের ভাঁটিগুলির কাজও হয়ে গেল বন্ধ। বহু

ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির জালেও জড়িয়ে পড়লাম। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর প্রদেশ থেকে পঞ্জাবে ইট আমদানীর ব্যাপারে বাধা-নিষেধ ছিল। উত্তর প্রদেশ সরকার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করে সেই বাধানিষেধ অপসারণ করলাম। এরপর দেখা দিল পরিবহনের জটিলতা। অবশেষে রেলওয়ে বোর্ড প্রয়োজন মত মালগাড়ী দিয়ে সে সমস্যারও সমাধান করলেন। শিব কিশোর নামে জনৈক উৎসাহী কর্মচারীর সুদক্ষ পরিচালনায় বিশেষ মালগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা হ'ল। গাড়ীগুলি যাতে আরও দ্রুত চলাচল করতে পারে তার জন্য তাঁকে আমি অনুরোধ করি। অভূতপূর্ব সহযোগিতা করেন শিব কিশোর। আমাদের মাল পরিবহনকারী গাড়ীগুলি যাতে দ্রুতগামী যাত্রীবাহী গাড়ী, এমন কি মেইল অথবা এক্‌স্‌প্রেসেরও আগে যাতায়াতের সুযোগ পায় তার জন্য সময় সময় তিনি সংশ্লিষ্ট রেলকর্মীদের ইশারা করে দিতেন। ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের চাহিদা মেটানোর জন্য কর্মসংস্থাগুলির সাহায্য প্রার্থনা করলাম। সমস্যা আপাততঃ মিটল।

সৈনিকদের নিজস্ব প্রচেষ্টার একটি গৌরব-কীর্তি ছিল এই পরিকল্পনা। তাই, কাজ অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে, সাফল্যের একটি স্বাস্থ্যকর প্রভাবও পরিলক্ষিত হ'ল তাদের মনোবলের উপর।

বাড়ীগুলির জন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল বিশ হাজার দরজা-জানালা এবং বায়ুরন্ধ্রের (ventilator)। শ্রীনগর এবং দিল্লীতে অবস্থিত জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের কাঠের কারখানা থেকে সেগুলি ক্রয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করলেন বকশী গুলাম মহম্মদ। কিন্তু সেগুলি এবং জানালার শার্সির কাচ তাড়াতাড়ি আনার ব্যাপারে প্রথমটা বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। পরে অবশ্য সে সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়। আসবাবপত্রের প্রয়োজন ছিল দশ হাজারেরও বেশী।

শেষ পর্যন্ত জটিলতা দেখা দিল ছাদের ব্যাপারটিতে। কয়েক ধরনের ছাদে খরচ পড়ে যাচ্ছিল অনেক বেশী। আবার কতগুলি ছিল অত্যন্ত জটিল। তারপর খবর পেলাম, রুরকির সেণ্ট্রাল বিল্‌ডিং রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট এক নতুন ধরনের ছাদ উদ্ভাবন করেছে। তাতে আর. সি. সি. তক্তার উপর দুই ভাঁজে বাঁকানো আধার বসিয়ে তার উপর বিমসুদ্ধ ঢালাই করা হয়। এই ধরনের ছাদে সিমেণ্ট এবং ইস্পাত লাগে কম; এবং আমাদের প্রয়োজনের পক্ষেও উপযুক্ত। ব্যাপকভাবে জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখা হ'ল। প্রচলিত

প্রথার অন্যথা হলেও, আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেলাম এই ধরনের ছাদেই। আমার ইঞ্জিনীয়ারগণ এই ধরনের তিরিশ হাজার ছাদ ঢালাই করলেন। (আমি নিজে ইঞ্জিনীয়ার না হলেও, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভিন্ন প্রয়োগ কৌশলগুলিকে বোঝবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম।)

শীতকাল এসে গেল। আমাদের প্রচেষ্টাও পৌছে গেল পরিপূর্ণ অবস্থায়। নিজ নিজ কাজ সম্বন্ধে সৈনিকরাও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছিল। কাজের সময় গান এবং বিনামূল্যে শীতল পানীয় ও চায়ের ব্যবস্থা করেছিলাম তাদের জন্য। এছাড়া, সজাগ পর্যবেক্ষণ এবং আমার দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য প্রতিটি কাজের জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে একটি করে দফতর খুলেছিলাম।

পরিকল্পনাটির নামকরণ করা হয়েছিল 'অমর'। তখনও সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছি, এমন সময় মেনন একটি কঠিন কাজের ভার আমার উপর চাপালেন। দিল্লীতে ভারত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি প্রদর্শিত হবার কথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে একটি প্রতিরক্ষা মণ্ডপ নির্মাণ করতে ইঞ্জিনীয়াররা চেয়েছিলেন অনেক বেশী সময়। মেনন আমাকে সেই কাজটি করতে বললেন ছয় সপ্তাহের মধ্যে।[৫] দায়িত্বটি গ্রহণ করলাম।

এতে আমার উপর কাজের চাপ আরও বেড়ে গেল। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করবার উপায় ছিল না। আম্বালা এবং দিল্লী উভয় স্থানের কাজের জায়গাতেই যাতে প্রতিদিন উপস্থিত থাকতে পারি তার জন্য জেট এবং অন্যান্য ধরনের দ্রুতগামী বিমানে প্রতিদিন যাতায়াত করতাম। এক তরফের যাত্রায় জেটের লাগত পনের মিনিট সময়। মণ্ডপটির জন্য পয়ত্রিশ ফিট উচ্চ এবং পনের হাজার বর্গফিট ব্যাসের একটি ভিত তৈরী করবার পরিকল্পনা ছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত এবং মালপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যের দরুন কাজটির ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন পরিকল্পনাটির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন আমার

৫। প্রকৃতপক্ষে সামরিক সদর দফতরের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করেন। পরে আমি সম্মত হওয়ায় আমাকেই কাজটির দায়িত্বভার দেওয়া হয়; এবং যথা সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সর্ব প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থিমায়া আমাকে দেন। ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখের একটি চিঠিতে থিমায়া উপরি-উক্ত তথ্য সামরিক সদর দফতরের প্রধান ইঞ্জিনীয়ারকে জানান।

জনৈক বন্ধু। আমার অনুরোধে একদিন তিনি এসে আমাদের নানা অসুবিধা-গুলি স্বচক্ষে পরিদর্শন করে যান।

এই নতুন পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিজয়'। ১৯৫৮ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখে 'বিজয়ে'র কাজে হাত দিই। কর্ণেল বি. এন. দাশের মত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন আমার প্রধান ইঞ্জিনীয়ার। নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন অভিজ্ঞ বাস্তুকার লালা তীরথ রাম।

বিশেষজ্ঞগণ যে কাজের জন্য প্রায় ছয় মাস সময় চেয়েছিলেন, আমাকে সেই কাজের জন্য দেওয়া হয় ছয় সপ্তাহ মাত্র। অতএব পরিকল্পনা তথা নির্মাণের কাজ চালিয়ে যেতে হয় একই সঙ্গে। কাজ চালাবার মত কোন নকশা ছিল না। ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে সমর বিভাগের স্থপতির এই ব্যাপারে তীব্র মত-পার্থক্য দেখা দেয়। ফলে, স্থপতিকে সরিয়ে সেই জায়গায় আনতে হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ রাণাকে।

এই অঞ্চলে উপ-ভূতলের জলের সমতলত্ব ছিল ভূত্বক থেকে মাত্র চার ফিট নীচে। তা' ছাড়া ভূগর্ভে জালের মত বিছিয়ে ছিল বিদ্যুৎবাহী তার এবং জলের পাইপ। অতএব নতুন নকশা তৈরী করে সেই অনুযায়ী মণ্ডপটির ভিত অন্য স্থানে বিন্যস্ত করতে বাধ্য হই। ফলে আরও দেরী হয়ে যায়। নতুন স্থপতি আমাদের বিন্যাস-কৌশল এবং পরিকল্পনা আগাগোড়া পরিবর্তন করেছিলেন। ইতিমধ্যে নেমে গেল ভরা বর্ষা। উপভূতলস্থ জলের রেখা আরও উপরে উঠে এল। বাংলাদেশের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সিমেণ্ট এবং ইস্পাত দ্রুত এসে পৌছুতে শুরু করল দিল্লীতে। সমানতালে আসতে লাগল ইট, পাথর কুচি এবং বালি। ঘড়ির কাঁটার মত একনাগাড়ে কাজ চালিয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে যে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ভোর-রাত অবধি ঠায় দাঁড়িয়ে কাজকর্ম দেখাশুনা করে পরের দিনই আম্বালা ফিরে 'অমরে'র বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করেছি। অসম্ভব পরিশ্রম হয়েছে এতে। কাজ এগুবার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতগুলি বাড়ী তৈরী করতে বলেন মেনন। ফলে কাজ আবার বেড়ে যায়। প্রতিরক্ষা মণ্ডপটি ছাড়াও একটি আধুনিক অভিনয় মঞ্চ এবং একটি রেস্তোরাঁর জন্যও বাড়ী তৈরী করতে হয়। মোট ভিত এইভাবে এসে দাঁড়ায় প্রায় ২৮,০০০ বর্গ ফিটে; অর্থাৎ মূল পরিকল্পনার প্রায় দ্বিগুণ।

সম্প্রতি একখানা বই-এ পড়েছিলাম, সিমেণ্ট জমে ওঠার জন্য অপেক্ষা না করেই প্রয়োজন হলে কাঁচা অবস্থাতেই তার উপর ভার চাপান চলে।

কাজটা অবশ্য করতে হবে ধীরে ধীরে এবং নিয়মিতভাবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত ছিল ভালভাবে জমবার জন্য সিমেণ্টকে অন্ততপক্ষে তিন সপ্তাহ সময় দিয়ে তারপর ভার চাপান যেতে পারে। সময় সম্বন্ধে এত কড়াকড়ির কোন অর্থ বুঝলাম না। একবারে সব ভার না চাপিয়ে ধীরে ধীরে এবং নিয়মিত-ভাবে চাপালে যে কী ক্ষতি হয় তাও বোধগম্য হ'ল না। যাই হোক, পঁয়ষট্টি ফিট প্রসারের অনেকগুলি বাড়ী এক সপ্তাহের মধ্যেই সমাপ্ত হ'ল। সম্পূর্ণ মণ্ডপটির জন্য রি-ইনফোরস্‌ড্ কংক্রীটের ভিতও নির্মিত হ'ল। লোহার ছড়্গুলিকে অনেক পরিশ্রমে ঢালাই করে তারপর তৈরী করা হ'ল 'এন' জাতীয় কড়া। বর্ষার জন্য অনেকগুলি ট্রান্স্‌ফরমার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই, ঢালাইয়ের কাজে মহা অসুবিধায় পড়তে হয়। তবু, শেষ অবধি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি যথাসময়েই সমাপ্ত হয়, এবং এটি উদ্বোধন করেন নেহ্‌রু।

আবার 'অমরে'র দিকে মনোনিবেশ করলাম। ইস্পাত এবং সিমেণ্ট যথা সময়ে এবং প্রয়োজন মতই সংগৃহীত হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে মালপত্র সংগ্রহের জন্য বাছা বাছা কয়েকজনকে ভারতের নানাস্থানে পাঠিয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে ব্যবসাদারেরা মালপত্রের দাম চড়িয়ে দিল। বহু ঠিকা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করবার সব রকম ব্যবস্থাই করে রেখেছিলাম। এবং এই ব্যাপারে লেঃ কর্ণেল ডি. এস. রাও আমাকে প্রভূত সাহায্য করেন।

শীত পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী. বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহের কাজ আরম্ভ করা হ'ল। নলকূপ বসানো ছিল একটা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তারও সুরাহা হ'ল শেষ পর্যন্ত। ঘণ্টায় দশ হাজার গ্যালন জল পাবার আশা করেছিলাম। সে জায়গায় পাওয়া গেল গড়ে পনের হাজার গ্যালন। ১৯৬১ সাল অবধি অতিরিক্ত কোন বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে পারবেন না বলে পঞ্জাব সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু খানিকটা চেষ্টার পর তাঁদেরও আমাদের প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ সরবরাহে রাজী করালাম। এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তির জন্য প্রয়োজন পড়ল মূল কেন্দ্র তথা বিভাজন ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি এবং আরও সাব-স্টেশনের। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ঘাটতি তো ছিলই; এবং সময়মত পাবারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। সুইচ-গীয়ার ব্যবস্থার কিছু কিছু অংশ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। তার জন্য প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রার। সেটা সংগ্রহ করাও সে সময় ছিল একটা কঠিন সমস্যা। যাই

হোক, ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সব কিছুরই ব্যবস্থা করলাম। আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির দৌরাত্ম্য এবং বিলম্ব, দু'টির কবল থেকেই রক্ষা পাওয়া গেল।

পরিকল্পনাটির জন্য জল-বাহিত শৌচ-ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা ছিল। এতদিন ছিল মলশোধনাশয় এবং শোষক কূপের ব্যবস্থা। দু' এক বৎসরের বেশী সেগুলি টিকত না। কারণ ছয় থেকে ত্রিশ ফুট গভীর মাটিতে ছিল অত্যধিক কাদার অংশ। উপ-ভূতল পাওয়া যেত প্রায় ত্রিশ ফুটের কাছাকাছি। ফলে, পাললিক শিলাস্তরে আবর্জনাগুলির পুরোপুরি বিন্যাস হতে পারত না। ব্যবস্থাটি তাই অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় শেষ অবধি নতুন একটি উপায় ভেবে বার করা হ'ল। একাধিক কূপ নির্মাণ করে সেখান থেকে আবর্জনাগুলি পাম্প করে দূরবর্তী প্রাকৃতিক নালার পার্শ্বস্থিত শোষক-কূপগুলির মধ্যে ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকে সেগুলি নালার স্রোতের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ছিল অভাব। আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুন কোন কিছু পাওয়া যেত না বললেই চলে। দেশের মধ্যে যা প্রস্তুত হ'ত, প্রয়োজনের তুলনায় তাও ছিল অত্যন্ত কম।

বিঘ্ন যে কত রকমের ছিল তা' বলবার নয়। কিছু সংখ্যক বেসামরিক শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম আমরা। কখনই তারা সময় মত কাজে আসত না। শ্রমিক সমিতিগুলিও তাদের উস্কানি দিত। কিন্তু ফল হ'ত না কোন। কারণ অনেক কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম তাদের জন্য।

এই ভাবে এসে পড়ল ডিসেম্বর মাস। আমার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। মালপত্র আসার দেরী তো হচ্ছিলই, উপরন্তু চুক্তি অনুযায়ী অনেকগুলি জিনিস সরবরাহ করতেও ঠিকাদারেরা অক্ষম হ'ল। নগদ মূল্য দিয়ে লোহা ক্রয় করবার জন্য অন্ততঃ ছয় জায়গায় লোক পাঠালাম। জানলার শার্সি কাচ সরবরাহের একটা চুক্তি ছিল। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী মাল দিতে পারল না তারা। ছাদের উপর জলাধার সরবরাহের একটি চুক্তিও শেষ মুহূর্তে আমায় বিপদে ফেলল। যাই হোক, অনেক ঝঞ্ঝাটের পর ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ সব মালপত্র এসে গেল; এবং ১৯৫৯ সালের ১০ই জানুয়ারী নাগাদ সম্পূর্ণ হ'ল আমাদের কাজ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে স্থির হল স্টেডিয়ামটির সামনে ষাট ফুট উঁচু একটি

লোহার তোরণ বসান হবে। বিরাট কাজ ছিল এটা। অবশেষে তাও সম্পন্ন করা হ'ল। আমার সেনানায়কগণ, ইঞ্জিনীয়ার এবং অন্যান্য সৈনিকেরা নিজেদের রক্ত-জল করা পরিশ্রম দিয়ে স্থাপন করলেন উল্লেখযোগ্য একটি কীর্তির ; সাফল্যমণ্ডিত করলেন একটি আদর্শ পরিকল্পনার। অতীব প্রতিকূল সময় এবং আবহাওয়ার মধ্যেও অনভিজ্ঞ এই ব্যক্তিরা কঠিন কাজটিতে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করেছিলেন, তার একটাও প্রথাগত নয়। বস্তুতঃ এটা ছিল প্রতি স্তরে আদর্শ নেতৃত্ব, দলবদ্ধ প্রচেষ্টা, প্রয়োজন তথা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতা, সহকর্মীতার উদ্দীপনা এবং ব্যক্তিগত গুণরাজির সার্থক সমন্বয়ের একটি অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষের জীবনে এ জিনিস দেখা যায় কদাচিৎ।

তারপর এল ১৬ই জানুয়ারীর সেই স্মরণীয় দিন। মেনন, অন্য কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, বকশী গুলাম মহম্মদ, সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ, ভারতীয় বাহিনীর তিন প্রধান এবং অন্যান্য বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে নেহ্‌রু বিমানযোগে এসে পৌছুলেন। সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর বিশ হাজার সৈনিক, তাদের পরিজনবর্গ এবং হাজার দশেক অন্যান্য শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতিতে 'অমরে'র উদ্বোধন করলেন।

ডিভিশনের বিশ হাজার সৈনিকদের উদ্দীপনাপূর্ণ একটি হিন্দী সমবেত-সঙ্গীত[৬] শিক্ষা দিয়েছিলাম। রচনা করেছিলেন জমাদার কাশ্মীরী। সারা ডিভিশনে একটা ঐক্য, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম এবং সহকর্মীতার বন্ধন এনে দিয়েছিল সঙ্গীতটি। শুনে রোমাঞ্চিত হলেন নেহ্‌রু। লিখিতভাবে প্রশংসাও জ্ঞাপন করেছিলেন। থিমিয়া পরে আমাকে সেটা জানান। যাই হোক, 'অমরে'র সাফল্যের জন্য সমস্ত স্তরের সৈনিকদের অভিনন্দন জানিয়ে নেহ্‌রু বললেন :

৬। গানটির বঙ্গানুবাদ হ'ল :

হে ভারতবাসী এবং চতুর্থ ডিভের সাথীরা !
এসো, সমবেতভাবে আমরা দেশের সেবা করি,
আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করি,
ভারতের সন্তান আমরা, গাইব 'ভারতের জয়' ;
দেশকে সেবা এবং রক্ষা—এই হ'ল আমাদের লক্ষ্য,
আত্মত্যাগের জন্য আমাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু উন্মুখ,
সর্বস্ব, এমন কি জীবনও আমরা দান করবো দেশকে,
হে ভারতবাসী··· ।

স্ব-নির্ভরতার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য দেশবাসীর কাছে তাদের প্রশংসা পাওয়া উচিত। সম্মিলিত এই উৎসবটি কোন যুদ্ধ জয়ের জন্য নয়; এ বিজয় হ'ল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি জিনিস।

'অমর' প্রকৃতপক্ষে ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের কর্মশক্তি এবং দেশভক্তির অভূতপূর্ব একটি দৃষ্টান্ত। যেরূপ দ্রুত এবং দক্ষতা সহকারে চতুর্থ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ডিভিশনের সৈনিকগণ এই দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন করেছিল, তা' দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন নেহ্‌রু।

উৎসবের শেষে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বিশ হাজার মানুষের দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। হৃষ্ট চিত্তে সৈনিকদের সঙ্গে নেহ্‌রু যোগ দিলেন সেই ভোজসভায়। খোলাখুলি ভাবে মেলামেশা করলেন তাদের সাথে। পরিবেশন, ভোজন এবং পাত্রগুলি অপসারণ—সমস্ত ব্যাপারটিতে লাগল মাত্র বিশ মিনিট সময়। জিনিসটা নেহ্‌রুকে আরও মুগ্ধ করলো।

নিজেদের ব্যবহারের জন্য গৃহ-নির্মাণ করতে সৈনিকদের নিযুক্ত করা উচিত কি না, তা' নিয়ে জনসাধারণ এবং সৈন্য বিভাগের মধ্যেও অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ আমি এর পক্ষপাতী নই; কারণ সামরিক কর্তব্য খানিকটা ব্যহত হয়-ই। দেশরক্ষা এবং তজ্জন্য যুদ্ধ-প্রশিক্ষণই হ'ল সৈনিকদের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসৈনিকোচিত কাজে সৈনিকদের অংশগ্রহণ করাকে আমি দূষণীয় জ্ঞান করি না। যেমন, স্বীয় পরিজনবর্গের জন্য গৃহাদি নির্মাণ, বন্যা প্রতিরোধ ইত্যাদি। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই বিবিধ অসামরিক কাজে সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করে; বিশেষতঃ, সময় মত সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় যদি না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষতিগ্রস্ত অসামরিক সেতু মেরামত, বন্যা-প্রতিরোধ, রেল দুর্ঘটনা তথা ভূমিকম্পে ত্রাণ কার্য ইত্যাদির জন্য তলব করা হয় সৈন্য বাহিনীকে। কাজগুলির একটিও যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ নয়। সামরিক কর্তব্যও এতে বাধা প্রাপ্ত হয়। আমেরিকা, য়ুরোপ, ইংলণ্ড, এমন কি সোভিয়েত রাশিয়াতেও দুর্বৃত্তদের খুঁজে বার করা থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক কাজেই অসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য সৈন্যবাহিনীকে নিযুক্ত করবার বহু নজির আমার জানা আছে। আমাদের সেনানায়কদের মধ্যে অনেকেই বলেন তাঁরা নাকি অসামরিক কাজ করার পক্ষপাতী নন। কিন্তু সেই কাজই যখন করতে বলা হয়, তখন যে তাঁরা কেন সরে না দাঁড়িয়ে সম্মতি প্রদান করেন, সেইটাই বোধগম্য হয় না।

সৈনিকদের জন্য যেমন ভালো থাওয়া-পরা এবং উন্নত ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে তাদের এবং তাদের পরিজনবর্গের জন্য আবাসস্থানের। তবেই তারা থাকবে পরিতৃপ্ত। কর্মোপলক্ষ্যে অথবা যুদ্ধের সময় পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটার একটা অর্থ হয়। কিন্তু এই বাধ্যতামূলক দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর শান্তিপূর্ণ এলাকায় ফিরে এসেও যদি তাদের এই বিচ্ছেদ সহ্য করতে হয়, তা'হলে সেটার কোন যুক্তিই থাকে না। এতে বরং তাদের মনোবলের উপর পড়ে বিষময় প্রভাব। অথচ সৈনিকদের মনোবল যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেই দিকেই সেনানায়কদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা দরকার; এবং কু-প্রভাবকারী কারণ-গুলিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা প্রয়োজন। সরকার অথবা সৈন্য-বিভাগ যদি এ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম না হয়, তা'হলে সংশ্লিষ্ট সেনানায়ক এবং সৈনিকদের কর্তব্য হ'ল নিজেদেরই এর সমাধানের ব্যবস্থা করা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হলে, উটপাখির মতো বালির মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে 'বাড়ী তৈরী করা সৈনিকদের কাজ নয়,' এই মন্ত্র জপ করার কী অর্থ হয় বুঝি না। যে উপদেশের মূল্য কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ, বাস্তবজীবনে তার সার্থকতাই বা কি? অথচ মনোবল ভেঙ্গে পড়লে শেষ পর্যন্ত সৈনিকদের সমর-কুশলতার উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। সেটা যাতে না হয় সেই জন্য সেনানায়কগণ যদি সৈনিকদের নিজ নিজ আবাস নির্মাণ করে নিতে উৎসাহিত করেন তবে তাঁদের সে কাজ অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। এতে স্ব-নির্ভরতার তৃপ্তি ছাড়াও, অন্ততঃ কিছু-কালের জন্য নিজ নিজ স্ত্রী-সন্তানাদির সঙ্গে একত্রে বসবাস করার আনন্দ পাবে তারা। তবু এ নিয়ে জনসাধারণ তথা সৈন্য-বিভাগের মধ্যে অনেক হৈ-চৈ হয়েছে। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটিকে বিচার করেছেন স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই।

আমার অধীনস্থ সৈনিক তথা তাদের পরিজনবর্গের আবাসস্থানের অভাব ছিল। সরকার যে এটা জানতেন না তা' নয়। কিন্তু ঔদাসীন্য এবং অর্থাভাবের কারণে এতদিন এ বিষয়ে আমাদের কোনরূপ সাহায্যই তাঁরা করতে পারেন নি। তার উপর, সামরিক কেন্দ্রগুলির অবস্থান সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেন নি তাঁরা। জানতাম, এই ব্যর্থতা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছিল আমার সৈনিকদের মনোবলের উপর। সব জেনে শুনেও কী কিছুই

করবার ছিল না আমার? অবশ্যই ছিল; এবং বক্তৃতার পরিবর্তে সেইটাই হাতে-কলমে করে দেখালাম। অনুরূপ সমস্যা আরও অনেক সেনাধ্যক্ষকে বিব্রত করে রেখেছিল। কিন্তু আমি অগ্রণী হয়ে এই পরিকল্পনায় হাত না দেওয়া অবধি কেউ কিছু করেন নি। চতুর্থ ইন্‌ফ্যান্ট্রি ডিভিশনে অধিনায়কত্ব করেছি চৌত্রিশ মাস। তার মধ্যে মাত্র সাত মাস সময় ব্যয় করেছিলাম গৃহনির্মাণের কাজে; তাও কর্তৃপক্ষের যথোচিত অনুমতি নিয়ে। তবু লোকে বলতে শুরু করল অসামরিক এই কাজটিতে নিযুক্ত করায় আমার সৈনিকদের সামরিক শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে এবং তাদের সামরিক দক্ষতাও হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু সৈনিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা তো স্বল্পকালের জন্য হলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে আরও অনেক কারণেই। যেমন, অসামরিক কাজে নিযুক্ত হলে এবং অসুস্থতা অথবা ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে। এবং, এতে যে ক্ষতিটুকু হয় সেটুকুকে মেজে-ঘষে ঠিক করে নিতেও সময় লাগে না। আমিও করেছিলাম তাই।

ব্যাপারটি নিয়ে আমার প্রচুর সমালোচনা করা হ'ল। অথচ, ভারতীয়-বাহিনী এবং মূল্যবান সামরিক সরঞ্জামগুলিকে যখন কুম্ভমেলার মতো সামরিক-মূল্যহীন বহু কাজে বছরের পর বছর ধরে নিযুক্ত করা হয়, তখন কিন্তু কেউ একটি কথাও বলে না। বস্তুতঃ দেশ বিভাগের পর থেকে একের পর এক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হয়েছে বারংবার। জরুরী অবস্থায় অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সানন্দে আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রয়োজনটি যখন বারংবারের, তখন সরকারের অন্য কোন সূত্র থেকে এর একটা পৃথক বন্দোবস্ত করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে অন্ততঃ আমাদের আংশিক বিনষ্ট এবং নিঃশেষিতপ্রায় অতিপ্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামগুলি কিছুটা রক্ষা পাবে। কিন্তু 'জনতার দাবী'কে উপেক্ষা করতে প্রত্যেক প্রতিরক্ষামন্ত্রীই নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। ব্যাপারটি যতবারই পেশ করা হয়েছে প্রধান মন্ত্রীর কাছে, ততবারই পাওয়া গেছে একই উত্তর। শুধু ভাষাটি হয়েছে ভিন্ন।

'অমরে'র মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করেছিলাম। অন্য কেউ এ কাজ করতে সম্মত হন নি। এবং কাজটি করবার সময় লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করে আমরা পরিশ্রম করেছি।

গোয়েব্‌ল্‌স্‌-এর প্রচারনীতি অনুসরণ করে বিরক্তিকর ভাবে লোকে

'স্থপতি' শব্দটি ব্যবহার করেছে আমার সম্বন্ধে। বিশ্বাসও করেছে অনেকে। জীবনে যেন আমি গৃহনির্মাণ ছাড়া আর কিছুই করি নি। (অথচ মোট ছাব্বিশ বছর চাকরীর মধ্যে এবং প্রায় তিন বছর এই ডিভিশনের অধিনায়কত্বে, গৃহনির্মাণের কাজের জন্য ব্যয় করেছি এখানে মাত্র সাত মাস এবং অন্য জায়গায় আরও কয়েকমাস সময়।)

'অমরে'র কাজে যে সময়টুকু নষ্ট হয়েছিল, সেটুকুকে পূরণ করে নেবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত জোর প্রশিক্ষণের কাজ চালালাম। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এবং নানারকম সামরিক মহড়ায় অংশ গ্রহণ করলো সবগুলি ইউনিট। এপ্রিল মাসে ডিভিশনব্যাপী ড্রিলের একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলাম। উন্নত ধরনের ড্রিল প্রদর্শিত হ'ল এই অনুষ্ঠানে। লক্ষ্যভেদের ব্যাপারে 'কোর' এবং 'কমাণ্ড' উভয় প্রতিযোগিতাতেই জয়লাভ করলাম আমরা। বিরাটাকার মহড়া ছাড়াও, ছোটখাটো একাধিক মহড়ায় ট্যাঙ্ক ঘায়েল করা, মাইন পাতা, অবরোধ সৃষ্টি, শত্রুকে প্রতারণা এবং আত্মগোপন ইত্যাদির কৌশল প্রদর্শন করা হ'ল। অচিরেই সামরিক দক্ষতার দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর হয়ে দাঁড়াল আমার ডিভিশন।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। যখনই নেহ্‌রু আমাকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করেছেন, অমনি চারদিকে আমার বিরুদ্ধে সমালোচনার ধুম পড়ে গেছে। 'অমর'কেও যেই নেহ্‌রু প্রশংসা করলেন অমনি চাপা সমালোচনার ব্যাপক প্রচার কার্য শুরু হয়ে গেল চতুর্দিকে। বাড়ীগুলির নানা রকম খুঁত ধরা থেকে শুরু করে, পরিকল্পনাটি যে সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে এবং আমার ডিভিশনটি যে সমর কুশলতার দিক থেকে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে, সেটা প্রমাণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগল সবাই। কিন্তু এ সমস্ত ছিল সত্যের অপলাপ। বাড়ীগুলি হয়েছিল নিখুঁত। স্ব-নির্ভরতার ভিত্তিতে নিজ নিজ পরিজনবর্গের জন্য গৃহ নির্মাণ করে সৈনিকদের হৃদয়ে গর্বের অন্ত ছিল না। সৈনিকোচিত দক্ষতাও তাদের বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নি। দীর্ঘদিনের শিক্ষাকে কয়েকমাসের অনভ্যাসে ভুলে যাওয়া আমার সৈনিকদের পক্ষে ছিল অসম্ভব।

পরিকল্পনার কাজ যখন আরম্ভ করি, অনেকেই সে সময়ে জ্যোতিষীর মতো আমাদের ব্যর্থতার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। এ যেন ছিল বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এবং, সে চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণও করেছিলাম।

প্রচলিত বহু প্রয়োগ-পদ্ধতি ও রীতি ভঙ্গ করে এবং ইঞ্জিনীয়ার তথা কনট্রাক্টরদের সযত্ন-লালিত মতবাদ খণ্ডন করে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

কাজ শেষ হবার আগে দু'বার 'অমর' পরিদর্শন করে যান থিমায়া। এবং, একখানি পত্রে, আমার প্রেরণাদায়ক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নেতৃত্বে এই সাফল্য অর্জনের জন্য সমস্ত অফিসর, এন. সি. ও. এবং জওয়ানদের প্রতি সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কয়েক মাস পরে আর একখানা চিঠি তাঁর কাছ থেকে পাই। ডিভিশনটি যাতে যথোচিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালের মে মাস পর্যন্ত বর্তমান পদে আমাকে বহাল রাখার নিশ্চিত আশ্বাস দেন থিমায়া। বর্তমান সমালোচনা উপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে আরও লেখেন: আমার সাফল্য বাস্তবে রূপায়িত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সমালোচনা এবং ঈর্ষার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

'অমরে'র উদ্বোধনের পরই এক জনসভায় সেই প্রসঙ্গে নেহ্‌রু বলেন: কোন রকম হৈ-হল্লা অথবা বিশৃঙ্খলা ছাড়াই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশ হাজার দর্শককে মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে খাদ্য পরিবেশন করবার অবিস্মরণীয় ঘটনাটি হ'ল ভারতীয় জওয়ানদের বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা এবং নিয়মানুবর্তিতার এক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন; এবং প্রতিটি ভারতবাসীর শিক্ষণীয় বস্তু।

১৯৫৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে কলকাতার প্রখ্যাত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা স্টেটস্‌ম্যান লিখলো: ১৯৫৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে নতুন উপনিবেশটি পরিদর্শন করে চতুর্থ ইন্‌ফ্যান্ট্রি ডিভিশনের কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে নেহ্‌রু যে উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তা' সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। প্রচলিত নিয়মে করতে গেলে পরিকল্পনাটি রূপায়নে লাগত দুই থেকে তিন বৎসর··এবং খরচ হত দ্বিগুণ। শোনা যাচ্ছে পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এই ধরনের আরও পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হবে। সেনা বিভাগই শুধু নয়, আমরাও সেগুলির অগ্রগতি লক্ষ্য করবো কৌতূহলের সঙ্গে। সামরিক বিভাগের হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আবাসস্থলের ব্যবস্থা করতে অন্ততঃপক্ষে লাগত ত্রিশ বৎসর সময়। দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে, তাঁদের প্রতি সেটা হ'ত চরম অবিচার।

লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরী আমাকে একখানা চিঠিতে লেখেন: সৈন্যবাহিনী যে কী করতে পারে আগামী দিনের মানুষের কাছে তারই পরিচয় দেবে 'অমর'। কিন্তু সেইটুকুই সব নয়। এত বড় একটা দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো সাহসী একজন সেনাপতি আমাদের মধ্যে ছিলেন, সেটাই হ'ল প্রকৃত কথা। কয়েক দিন পর আর একখানা চিঠিতে লেখেন: ভারতের দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা সর্বসময়েই আমাদের সম্মুখে রয়েছে; এবং সেই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করবেন আপনার মতো ব্যক্তিরাই।

১৯৫৯ সালের মে মাসে লেঃ জেনারেল পদে পদোন্নতির আদেশ হ'ল আমার, এবং সামরিক সদর দফতরে কোয়ার্টার-মাস্টার জেনারেলরূপে যোগদান করলাম। চতুর্থ ইন্‌ফ্যান্ট্রি ডিভিশনে প্রায় তিন বৎসর এবং একাদশ ইন্‌ফ্যান্ট্রি ব্রিগেডে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ধরে অধিনায়কত্ব করেছি। (এর আগে অনেকগুলি ছোট ছোট ইন্‌ফ্যান্ট্রি ইউনিটের অধিনায়কও ছিলাম।) তবু, অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা আমার নেই বলে অজস্র অভিযোগ উঠেছে আমার নামে।

আমার পদোন্নতিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে এই সময়ে চৌধুরী আর একখানা চিঠি লেখেন আমায়। পদোন্নতির ঘোষণাটিকে যোগ্যতার ন্যায্যতম পুরস্কার রূপে বর্ণনা করে এবং নিজেকে আমার বিশ্বস্ত সমর্থক বলে ঘোষণা করে লেখেন: আমার কর্মশক্তি এবং নেতৃত্বে সামরিক প্রশাসন তথা কুশলতা যে প্রভূত উন্নতি লাভ করবে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

১৯৫৯ সালের জুন মাসে সামরিক সদর দফতরে কোয়ার্টার-মাস্টার জেনারেলের পদে যোগদান করলাম। ৫নং ইয়র্ক রোডের উপর অবস্থিত প্রকাণ্ড বাগান ঘেরা বিরাট একটি বাংলো আমার বাসস্থান রূপে নির্দিষ্ট হ'ল। সিনিয়র অফিসর হিসাবে এই প্রথম আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার এবং সামরিক 'মক্কা'র সম্মুখীন হলাম আমি।

কাজে যোগদান করে প্রথমেই লক্ষ্য করলাম আগাগোড়া ব্যবস্থাটাই নীতি নির্ধারণের উৎস না হয়ে, হয়ে পড়েছে আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির একটা সাগর বিশেষ। বিভিন্ন বিভাগগুলি যেন এক একটি স্বতন্ত্র, জটিল, হৃদয়হীন প্রতিষ্ঠান। কাজে কোন উদ্যম নেই; নেই পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ অথবা সমন্বয়। অধিকাংশ কর্মচারীর মধ্যেই রয়েছে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অভাব। সামান্য কয়েকজন ছাড়া, সবাই যেন কাজ করে যাচ্ছে হৃদয়হীন যন্ত্রের মতো।

যাই হোক, কর্মভার গ্রহণ করলাম লেঃ জেনারেল দৌলত সিং-এর মতো সুদক্ষ স্টাফ্ অফিসরের কাছ থেকে। সেই সঙ্গে পেলাম সুযোগ্য অধস্তন অফিসরদের একটি দল। আর পেলাম মেজর জেনারেল আর. এন. নেহরাকে আমার নির্ভরযোগ্য সহকারীরূপে।

আমার মুখ্য কাজ ছিল 'কিউ' ('Q') পরিকল্পনা, সামরিক গৃহাদি নির্মাণ, সৈন্য চলাচল, সাজসরঞ্জাম ও রসদ এবং যোগান ও চলাচলের ব্যবস্থা করা। যথা সত্বর এবং স্বল্প ব্যয়ে যথেষ্ট পরিমাণে গৃহাদি নির্মাণ এবং সুপরিকল্পিতভাবে ও দ্রুতগতিতে চলাচলের ব্যবস্থার দিকে বিশেষভাবে নজর দেবার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রচলিত রীতি বর্জন করে নতুন নতুন উপায়ে উন্নতি বিধানের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ কবলাম। মেননও এ ব্যাপারে আমাকে অনেক সাহায্য করলেন। অবশ্য বহু কায়েমী স্বার্থান্বেষীর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হ'ল আমায়।

সুষ্ঠু চলাচলের ব্যবস্থাই হ'ল সব রকম সামরিক তৎপরতার মূল কথা। আমার মনে হয়, এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে চাই কিছুটা মৌলিক চিন্তা এবং রেল বিভাগের সঙ্গে অধিকতর সমন্বয় সাধনপূর্বক কাজ করা। কয়েক বৎসর পূর্বেই[৭] এই দিকটাতে আমার নজব পড়ে। প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে প্রয়োজনের সময় আমাদের সাঁজোয়া ডিভিশনকে বর্তমান কেন্দ্র থেকে সরিয়ে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে একত্রিত করতে অনর্থক বেশী সময় লেগে যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একটু চেষ্টা করলেই এই সময়টাকে অনেকখানি কম করা যেতে পারে। 'আর্মার্ড্ কোর' এবং পদাতিক বাহিনীর একাধিক প্রবীণ সেনানায়কই অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। বিলম্বটুকুতে আসলে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভাবখানা ছিল, প্রয়োজন-সংখ্যক মালগাড়ী যখন নেই, তখন তাঁদের করবারও কিছু নেই। বস্তুতঃ সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রকৃত কোন চেষ্টাই কেউ করেন নি। রেল বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিশ্বাসও করা হয়নি এ ব্যাপারে। সময় সংক্ষেপের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাব ব্যাপারটিকে নিজেদের মধ্যে গোপন রাখা হয়েছিল।

আর, ঠিক এই জায়গাটিতেই প্রথমে হাত দিলাম আমি। দেশের

৭। এ ব্যাপারে কিছু করবার অধিকাব সে সময় আমার ছিল না

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দ্রুত সমর-সম্ভার পরিবহনের গুরুত্ব তথা প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা' খুলে বললাম রেলওয়ে বোর্ডের পর পর দুইজন চেয়ারম্যান কে. বি. মাথুর এবং করনৈল সিংকে। উভয় ব্যক্তিই ছিলেন উৎসাহী কর্মী এবং দৃঢ়চেতা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

সাঁজোয়া ডিভিশনের সাজ-সরঞ্জাম পরিবহনের ব্যবস্থা সে সময় সহজ ছিল না। মালগাড়ীতে দিবা-রাত্রের সমস্ত সময়ে বোঝাই করা এবং নামানোর সুবিধাও ছিল না তখন অবধি। তাই একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সেটিকে আশু রূপায়নের দিকে মনোনিবেশ করলাম। পরিকল্পনাটির মধ্যে ছিল নতুন নতুন পাশ্ববর্তী রেললাইন সহ প্রতিরক্ষা এবং রেল বিভাগের যৌথ খরচে অতিসত্বর বিশেষ ধরনের মালগাড়ী নির্মাণ, এবং বর্তমান মালগাড়ীগুলির সদ্ব্যবহার করা। এগুলির প্রতি আগে বোর্ড নজর দেননি। অসামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য যে বিশেষ ধরনের মালগাড়ীগুলি ছিল, সেগুলিকেও সামান্য অদল-বদল করে কাজে লাগানো হ'ল। ফলে, ট্যাঙ্ক পরিবহনের জন্য নতুন গাড়ী তৈরী করতে হ'ল না। বেশ কিছু টাকা বেঁচেও গেল এতে।

এছাড়া ট্যাঙ্কগুলিকে মালগাড়ীতে ওঠানো-নামানোর অতিরিক্ত ব্যবস্থাও করলাম। পথের নানারকম প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে সাঁজোয়া গাড়ীগুলির কর্মক্ষমতাও পরীক্ষা করা হ'ল ভালো ভাবে। সামরিক প্রয়োজনের সময় যাতে দ্রুতগামী মালগাড়ীগুলিকে বহন করতে সক্ষম হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট রেললাইনগুলিকেও বার বার পরীক্ষা করা হ'ল। দ্রুত ইঞ্জিন পরিবর্তন তথা সময় সংক্ষেপের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে গাড়ীগুলির গতিবেগও বর্ধিত করা হ'ল পূর্বের চাইতে দ্বিগুণ।

এতো গেল রেলযোগে পরিবহন ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে যাতে সড়ক দিয়ে দ্রুত চলাচল করতে সাঁজোয়া ডিভিশনের অসুবিধা না হয় তার জন্য জনবহুল শহরগুলিকে পাশ কাটিয়ে নতুন নতুন পথ এবং রেললাইনের উপর দিয়ে ওভারব্রীজ নির্মাণের কাজও তরান্বিত করলাম। অত্যন্ত সাধারণ অথচ অপ্রচলিত এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথোচিত সচেতন করে এতদূর সাফল্য অর্জন করা গেল, যা অনেকেই আশা করেন নি।[৮]

৮। নিরাপত্তার খাতিরে প্রকৃত তথ্য জানানো সম্ভব নয়।

সাঁজোয়া ডিভিশনের কর্তৃপক্ষ কিংবা সামরিক বিভাগে তাঁদের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকদের একজনও আজ অবধি এই বিষয়ে কিছু করেন নি। বস্তুতঃ, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দ্রুততর সমরসম্ভার পরিবহনের গুরুত্ব যে কতখানি, সেটা অনুধাবন করেন নি কেউ-ই।[১] (নতুন ব্যবস্থাটির অসীম কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়।) এখন তাঁদের অতীতের গাফিলতি এইভাবে সর্ব সমক্ষে উদঘাটিত হয়ে পড়াতে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলেন সবাই। বলে বেড়াতে লাগলেন, এই ধরনের 'হৈ-চৈ' করাটা তাঁরা আদৌ চান নি; এবং বর্তমান ব্যবস্থাটি তাঁদের মতে যথেষ্ট। যাই হোক, তাঁদের আত্মতুষ্টিমূলক সমালোচনায় কর্ণপাত না করে নিজের কাজ করে গেলাম। নতুন ব্যবস্থায় সাঁজোয়া ডিভিশন যতদিন পাকাপোক্ত না হয়ে উঠল ততদিন চালিয়ে গেলাম মহড়ার কাজ।

১৯৪৮ সাল থেকেই শুনে আসছিলাম, এগার হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চে অবস্থিত কাশ্মীরের জোজিলা গিরিপথ জুলাই থেকে নভেম্বর, বছরের এই চারটি মাস মাত্র চলাচলের যোগ্য থাকে। বাকী আট মাস বন্ধ থাকে বরফের জন্য। সৈন্য বিভাগের প্রত্যেকেই এটাকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে সামরিক যান-বাহনের বাধা সৃষ্টি করে কোন স্থান যে প্রতিবছর এত দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ থাকতে পারে এটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে নি। তা' ছাড়া আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে যে বরফ সরানো যায় না এটাও মানতে পারি নি। ১৯৫৯ সালে ব্যাপারটি আমার কর্তৃত্বের আওতায় আসতেই ঠিক করলাম এ রহস্যের একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে হবে। অনেক সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন আমার অধীনে। তাঁদের অগ্রণী আবার ছিলেন মেজর জেনারেল কে. এন. দুবের মতো লোক। অতএব সাফল্যের বিশ্বাস আমার ছিল। বিদেশ থেকে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানী করবার অনুমতি আনালাম সরকারের কাছ থেকে। আমার ইঞ্জিনীয়ারেরা সেগুলি কেনবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর নামলাম কাজে। গিরিপথটি যাতে পূর্বের চাইতে অধিক দিন ধরে চলাচলের যোগ্য করা যায়, তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা

১। পরিবর্তিত ব্যবস্থাটি রূপায়িত করতে আমায় রেল-উপদেষ্টা শিব কিশোর আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন।

হ'ল। দৃঢ় সঙ্কল্প এবং অবিরাম পর্যবেক্ষণের ফলে চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালাম আমরা। বছরে চার মাসের পরিবর্তে, গিরিপথটি এখন চলাচলের যোগ্য হ'ল প্রায় আট মাস। গোঁড়া দৈবজ্ঞের অভাব কোন দেশেই থাকে না। আমাদেরও ছিল না। নিজেরা এঁরা কিছুই করেন নি বছরের পর বছর ধরে। অথচ আমি যখন এগিয়ে গেলাম, সবাই সমস্বরে আমার অকৃতকার্যতার ভবিষ্যদ্‌বাণী করে রাখলেন।

বিজু পট্টনায়ক আগে ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর বৈমানিক। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বহু দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে সেখানকার অনেক জনপ্রিয় নেতাকে তিনি বিমানযোগে উদ্ধার করেন। কলিঙ্গ এয়ারওয়েজ ছিল তাঁরই একটি প্রতিষ্ঠান।

আমাদের পরিচয় ছিল দীর্ঘ দিনের। একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার দফতরে এলেন বিজু। তখনও তিনি উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী হন নি। কথা প্রসঙ্গে কলিঙ্গ এয়ারওয়েজ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বললেন। আগেই আমি জানতাম ব্যাপারটা। নিফার দুর্গম অঞ্চলে বহু দূরে দূরে আমাদের আসাম রাইফেলস্-এর কতগুলি সামরিক ঘাঁটি ছিল। যান বাহন চলাচলের যোগ্য পথ-ঘাট না থাকার দরুন ঘাঁটিগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের একমাত্র উপায় ছিল বিমান থেকে নীচে ফেলে দেওয়া। আমাদের বিমান বাহিনীর সীমিত সামর্থ্যের জন্য বহির্বিষয়ক মন্ত্রক কলিঙ্গ এয়ারওয়েজকে এই কাজে নিযুক্ত করে। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে প্রয়োজনীয় বিমান ক্রয় করতে না পারায়, কলিঙ্গ এয়ারওয়েজের পক্ষেও সুষ্ঠুভাবে কাজটা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বলে-কয়ে বিমান ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করে দিতে আমায় অনুরোধ করলেন বিজু। প্রস্তাবটি আমার কাছে খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ল। তাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছে কথাটা তুললাম। কিন্তু জানতাম না, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চলেছি। কৃষ্ণ মেনন স্পষ্ট বলে দিলেন কোন রকম সাহায্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না; কারণ সাহায্য করার অর্থই হ'ল তাঁরই অধিনস্থ বিমান বাহিনীর অক্ষমতা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া। দেশের প্রতিরক্ষার মতো একটা ব্যাপারে ভুয়া মর্যাদাবোধ আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সে কথা বললাম। কিন্তু মেনন অনড় হয়ে রইলেন। ফলে আসাম রাইফেলস্-এর ঘাঁটিগুলির সরবরাহ ব্যবস্থার কিছুই উন্নতি করা

গেল না। সামরিক প্রয়োজনে আরও কতগুলি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অপ্রতুল সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে সে পরিকল্পনাও বাদ দিতে হ'ল।

অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যেই যাতে সর্বাধিক সংখ্যক নির্মাণকার্য করা যায় তার জন্য প্রয়োজন হলে সস্তায় নিম্নমানের গৃহাদি নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন মেনন। বহুবার তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আমার তীব্র মতবিরোধ হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারদের মতামতকেই এ বিষয়ে আমি চূড়ান্ত বলে মনে করি। তাঁদের মত হ'ল, নির্মাণ কার্যাদির ব্যাপারে সময়-স্বল্পতা, উৎকর্ষ এবং খরচ, এই তিনটিরই চলা উচিত সমান তালে। অযৌক্তিকভাবে কোন একটিও কম-বেশী করা উচিত নয় (যদিও জোড়াতালি অথবা জটিল ব্যবস্থাগুলি প্রায়শঃই সময় এবং ব্যয়-সঙ্কোচের পরিবর্তে, বাহুল্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়)। কিন্তু মেনন কিছুতেই এটা মানতে চাইতেন না। সময় এবং ব্যয় সঙ্কোচের ব্যাপারটিকে তিনি দিতে চাইতেন অগ্রাধিকার।

জম্মু এবং কাশ্মীরেও সৈনিকদের পারিবারিক বাসস্থানের অভাব ছিল। জম্মুতে অবশ্য মেজর জেনারেল মানেকশ আগেই এ কাজে সোৎসাহে লেগে পড়েছিলেন। ব্যাপারটি হয়েছিল বেশ মজার। সৈনিকদের গৃহাদি নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করানোর প্রথম দিকে ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। সামরিক মহলে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই স্বীয় বিরুদ্ধ মনোভাব সোচ্চারে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একে একে সবাই এ কাজে লেগে পড়তে, নিজে আর পিছিয়ে থাকতে পারলেন না। 'অমর' কিছুদিন পূর্বেই জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। মানেকশ আশা করলেন লোকে তাঁর প্রচেষ্টাটির প্রতিও অন্ততঃ খানিকটা আগ্রহ প্রদর্শন করবে। সেই আশা নিয়েই পূর্বেকার বিরোধী মনোভাব নিঃশব্দে পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে মেনে নিলেন নতুন পরিস্থিতিকে।

ফেরোজপুরেও অনুরূপ একটি পরিকল্পনায় হাত দিয়েছিলেন মেজর জেনারেল হরবক্স্ সিং। দেখা গেল, আমি ছাড়া ক্রমে ক্রমে আরও অনেকেই গৃহ-নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য এ ধরনের পরিকল্পনায় সৈনিকদের নিযুক্ত করবার সিদ্ধান্তটি ছিল তৎকালীন প্রধান সেনাপতি থিমায়ার। তাঁরই উৎসাহে এদিকে নজর দেন সবাই।

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণ মেনন শ্রীনগর পরিদর্শনে আসলে,

লেঃ জেনারেল এস. ডি. ভার্মা জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যান্য সেনা-কেন্দ্রে গৃহ-নির্মাণের কাজে সৈনিকদের নিযুক্ত করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তাঁর কাছে। মেনন সম্মতি দিলেন। শুধু তাই নয়, কাশ্মীরের অন্যান্য সেনা-কেন্দ্রে গৃহ-নির্মাণের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে পারবো কি না, আমার কাছে জানতে চাইলেন। আমার হাতে সে সময় অনেক কাজ ছিল। সেগুলি শেষ না হওয়া অবধি সীমিত সামর্থ্য নিয়ে নতুন কোন কাজে হাত দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে কথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে জানালাম; কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। একটি ফাইলে আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, 'কিছুটা হতাশাজনক; এবং পদাধিকারের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে কাজে বাধা দেবার যে ঝোঁক রয়েছে সেটা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব তথা ব্যর্থতা জেনারেলের উদ্যম ও কর্ম-শক্তিকে নিরুৎসাহ না করলেই মঙ্গল।' বিদ্রূপভরে আরও লিখলেন, ত্যধিক কাজের চাপে তিনি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।'

স্তব্যটি ভয়ানক বিশ্রী লাগলো আমার। থিমায়ার মারফৎ উত্তরে ।ম, আমার সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ এবং আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। অত্যধিক লিখ। চাপে ক্লান্তি, হতাশা অথবা নিরুৎসাহ কোনটাই আমি প্রকাশ কা নি। সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা প্রধান ক পতিকে যাতে জনসমক্ষে বিব্রত অবস্থায় ফেলতে না হয়, চেয়েছি শুধু ইটাই।

জবাবটার সঙ্গে থিমায়া একমত হলেন। মেননও এ নিয়ে আর উচ্চ-বাচ্য করলেন না।

অনেকগুলি বিভাগকে ঢেলে সাজাবার সঙ্কল্প করেছিলেন কৃষ্ণ মেনন। এই উদ্দেশ্যে নিজের মুখ্য উৎপাদক অধিকর্তারূপে (Production Chief) নির্বাচিত করেছিলেন রিয়ার এ্যাডমিরাল শঙ্করকে[১০] [এবং সি. সি. আর. অ্যাণ্ড ডি. রূপে (CCR & D) নির্বাচিত করেছিলেন মেজর জেনারেল কাপুরের মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে।] শঙ্কর ছিলেন কলকাতায়। সেখান থেকে তাঁকে দিল্লীতে বদলী করা হ'ল। বণ্টনের নিয়ম অনুযায়ী দিল্লীতে সে সময় অফিসরদের পারিবারিক আবাস পেতে অনেক সময় লেগে যেত। কিন্তু শঙ্করের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে মেনন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

১০। তাঁর পূর্বতন ব্যক্তি মেজর জেনারেল পি. নারায়ণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন।

বণ্টনের তালিকায় সেই সময় শঙ্করের উপরে ছিলেন দু' জন জেনারেল; মোতি সাগর এবং দুবে। দু'জনকেই বাদ দিয়ে শঙ্করকে একটি বাংলো দেবার আদেশ জারী করলেন মেনন। ন্যায়-বিরুদ্ধ এই আদেশ মান্য করতে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করলাম। আমার অনমনীয় মনোভাব দেখে অবশেষে মেনন নিজের আদেশ পরিবর্তন করেন এবং শঙ্করের জন্য অন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হয়ে বিরাট একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কৃষ্ণ মেননকে। সামরিক বাহিনীর অবস্থা তখন ছিল শোচনীয়। অহিংসার প্রতি সাতিশয় নিষ্ঠার প্রভাবে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত আমাদের নেতাদের ধারণা ছিল আধুনিক ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর কখনও প্রয়োজন হবে না তাঁদের। বস্তুতঃ ভারতের চিন্তাধারায় যুদ্ধের কোন স্থান না থাকার দরুন প্রতিরক্ষার সুস্পষ্ট নীতিও আমাদের ছিল না; এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় নি। স্বাধীনতার পর থেকে সামরিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীর অধিনায়কদের প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধির উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মেননের মতো খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হবার পর সকলেরই আশা হ'ল এবার হয়তো সরকারের নজর এদিকে পড়বে এবং প্রতিরক্ষার অতিপ্রয়োজনীয় সমস্যাগুলিরও একটা সমাধান হবে।

অবিন্যস্ত চেহারার মানুষ মেননের ব্যক্তিত্ব ছিল লক্ষ্যণীয়। কোন ব্যাপারই তাঁর চোখ কিংবা কান এড়াতো না। মানসিক চাঞ্চল্য সমস্ত সময় ফুটে থাকতো মুখের উপর। পছন্দ-অপছন্দ চেপে রাখতে পারতেন না কখনও। এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে ঘৃণা কিংবা ভক্তি করা যায়; কিন্তু কখনই উপেক্ষা করা যায় না।

মেননের সঙ্গে দেখা করা ছিল অত্যন্ত সহজ। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য ছিল না। জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত এবং বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াসেই যেন তিনি আনন্দ পেতেন।

কৌতুক রসবোধ তাঁর ছিল তীব্র। চটপট মোক্ষম জবাব দেওয়াতে ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না একেবারেই। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি থেকেই তাঁর বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে: 'আসল কিংবা কৃত্রিম যে ধরনের মাখন দিয়েই ভাজা হোক না কেন, মাছের তাতে কিছু

যায়-আসে না'; 'নিরামিষাশী ব্যাঘ্রের কথা কখনও আমি শুনি নি' ইত্যাদি। রাষ্ট্রপুঞ্জে ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে একবার তিনি তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন, 'ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে আমাকে কিছুমাত্র জ্ঞান দান করতে দেবো না আপনাকে। রীতিমতো পরিশ্রম করেই ভাষাটি আমি শিখেছি; আপনার মতো কুড়িয়ে পাই নি।' ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের নেতা স্যার পিয়ারসন্ ডিক্সন্‌কে লক্ষ্য করে একবার বলেছিলেন: 'কমনওয়েলথের বিভিন্ন সদস্যদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে কিছুটা ন্যায়বিচার করতে আপনাকে অনুরোধ করছি··অন্ততঃ জনসমক্ষেও।' লণ্ডনে একবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন: 'কমনওয়েলথের মধ্যে কমন (এজমালি) বলে কিছুই নেই···ওয়েল্‌থ্ (মঙ্গল) তো নেই-ই।'

তীব্র ব্যঙ্গ এবং নিষ্ঠুর মন্তব্য করবার স্বভাবের জন্যই লোকে মেননকে অপছন্দ করতে শুরু করে; এবং তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠে। বদমেজাজী, জেদী, উদ্ধত, সন্দেহবাতিক এবং খামখেয়ালী মেনন সর্বদাই কারও না কারও সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে বসতেন। বিনা কারণে সময় সময় নিজের বন্ধুদেরও সন্দেহ করতেন বিশ্বাসঘাতক বলে। সমমর্যাদার কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে ভদ্রতা-সূচক একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত করতেন না। তাঁর সঙ্গে কাজ করা ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। কোন ব্যক্তিকেই উপযুক্ত মনে হ'ত না তাঁর। নির্বোধ ব্যক্তিদের তো আদপেই সহ্য করতে পারতেন না। এই সমস্ত কারণে বহু লোক তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় সাজ-পোষাকের দিকে মেননের ভয়ানক লক্ষ্য ছিল। দিনের মধ্যে কতবার যে পোষাক পরিবর্তন করতেন তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য পোষাক, ভ্রমণের ছড়ি, টুপি এবং জুতোতে ভরা থাকতো তাঁর আলমারী। পোষাকপ্রিয় বহু ব্যক্তিরই ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এর উপর ছিল গতি সম্বন্ধে তাঁর পাগলামী। সামরিক বিভাগ থেকে পয়লা নম্বরের মোটর চালকদের বেছে নিয়ে তাদের দিয়ে নিজের গাড়ী চালাতেন মারাত্মক গতিতে।

ভারতের মঙ্গলের [১১] জন্য অনেক ভালো কাজও তিনি করেছেন। যেমন,

১১। আমাদের সামরিক সাঁজোয়া গাড়ীগুলি বহু পুরনো হয়ে গিয়েছিল। সেগুলির পরিবর্তে ভাইকারস্ জাতীয় ট্যাঙ্ক ভারতেই নির্মাণ করতে মনস্থ করেন মেনন। পরে এই ট্যাঙ্কগুলির নামকরণ করা হয় 'বিজয়ন্ত'।

সামরিক গুরুত্বের বহু পরিকল্পনাকে দ্রুত রূপায়ণ; বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে দ্রুত সৈন্য পরিবহণ; সৈন্য চলাচল তথা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিমূলক একাধিক পরিকল্পনা এবং সৈনিকদের পারিবারিক আবাস নির্মাণ ইত্যাদি। এবং এগুলিতে যথাসাধ্য সাহায্য আমি তাঁকে করেছি।

আবার, সম্ভবতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু কিছু কাজও তিনি করেছেন। সেগুলিতে বিরোধীতা করেছি তাঁর। সামরিক সরঞ্জামাদি আমদানীর ব্যাপারে যখন অন্য দেশকে বাদ দিয়ে বিশেষ কয়েকটি দেশের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন; সামরিক তৎপরতা অথবা প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্যক অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই অযথা হস্তক্ষেপ করেছেন; সৈনিকদের পারিবারিক আবাস নির্মাণের ব্যাপারে নিম্ন মানের সস্তা তথা ভঙ্গুর গৃহ নির্মাণ করতে চেয়েছেন, সামরিক সংস্থাগুলিতে অযথা শক্তির অপচয় করে নিজের খেয়াল-খুশী মতো তৈরী করিয়েছেন কফি অথবা শীতলীকরণ যন্ত্রের মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস (দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কালে এই ঘটনা অথবা উৎপাদন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সংশ্রব না থাকা সত্বেও, 'কারেন্ট'[১২] আমার বিরুদ্ধে কুৎসার ঝড় তোলে); অথবা, আমার বিবেচনায় ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য অতি-প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানীর ব্যাপারে বাধা দিয়েছেন; তখন তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি নি।

পড়াশুনা ছিল মেননের যথেষ্ট। বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রযুক্তি বিদ্যা, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থবিদ্যা, কৃষি এবং জীববিদ্যা প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়েই তিনি ছিলেন একটি জ্ঞানকোষ বিশেষ। বিমানের যন্ত্রপাতি, সাঁজোয়া যান-বাহন, ডুবোজাহাজ, বেতারযন্ত্র ইত্যাদি জটিল বিষয়গুলিতে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। কোন বিশেষজ্ঞই তাঁর উপস্থিতিতে স্বস্তিবোধ করতেন না। কিন্তু এ সমস্ত সত্বেও, নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন সামরিক তৎপরতা, তথ্য সংগ্রহ অথবা প্রশিক্ষণের মতো জরুরী ব্যাপারগুলির প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগই তিনি দেন নি; এবং এই দিকে কেউ কোন রকম চেষ্টা করলেও তার প্রতি মনোযোগ দেবার মতো সময় তাঁর হতো না।

মস্তিষ্ক যেন যন্ত্রের মতো কাজ করতো মেননের। অনেকবার দেখেছি মিটিংয়ের মধ্যে বসেই একইসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে উপস্থাপনের জন্য জরুরী সমস্ত

১২। বোম্বাইয়ের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা।

প্রস্তাব, সেই দিনই লোকসভায় পেশ করবার জন্য অতি-প্রয়োজনীয় বিবৃতি এবং বিদেশী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পর পর বলে গেছেন, এবং একজন সেগুলি লিখে নিয়েছেন।

অধীনস্থ কর্মচারীদের অনেকের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও, কিছু-সংখ্যক ব্যক্তিকে আপন রূঢ় আচরণ দিয়ে এমন করে আহত করতেন যার কোন যুক্তি হয় না। পরে কিন্তু দুঃখিতও হতেন সেজন্য। চেষ্টা করতেন নিজেকে সংশোধন করবার।

বর্তমানে বাহুল্য-বর্জিত একটি বাংলোর ছোট্ট একখানা ঘরে অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন মেনন। ঘরটির আগাগোড়া বই এবং কাগজপত্র দিয়ে ঠাসা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী নেহ্রুর বাসভবনের মুখোমুখি বিশাল বাড়ীতে যখন তিনি বাস করতেন, তখনও কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা ছিল এমনি আড়ম্বড়হীন, সরল। ক্ষমতার শীর্ষদেশে অবস্থানের সময়ে সর্বক্ষণ তাঁর কাছে লেগে থাকতো মানুষের ভীড়। মন্ত্রী, রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক, ছাত্র এবং নিজস্ব ব্যক্তিরা নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে হাজির হতেন তাঁর কাছে।

সে সময় অনেক রাত অবধি জেগে কাজকর্ম করতেন তিনি। সারাদিনের মধ্যে গরম দুধ আর চা পান করতেন অসংখ্যবার। নানারকম অসুস্থতার জন্য যাবতীয় যন্ত্রণাহর এবং অন্যান্য ঔষধপত্র সেবন করতেন। স্থায়ী কোন রন্ধনের ব্যবস্থা তাঁর বাসায় ছিল না। খাবার বলতে যা বোঝায়, অথবা ফল ইত্যাদি কিছুই গ্রহণ করতেন না। খেতেন শুধু স্যান্ড্উইচ্, বিস্কুট এবং কাজু বাদাম। ধূমপান কিংবা মাদকদ্রব্য স্পর্শ করতেন না কখনও।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ভ্রমণের সময় রোমাঞ্চকর কাহিনী পাঠ করা ছিল তাঁর একটা প্রিয় অভ্যাস। যাতায়াত করতেন বিমান বাহিনীর প্লেনে ; এবং গন্তব্য স্থলে পরদিন খুব ভোরে পৌছুবার উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে রওনা হতেন গভীর রাতে।

বিভিন্ন মহলে জনপ্রিয়তা অর্জনের একটা ঝোঁক ছিল তাঁর। উচ্চ-নীচ নির্বিচারে হাত মেলাতেন। শিশুদের ভালবাসতেন খুব। স্নেহভরে গাল টিপে আদর করতেন। হেসে উৎসাহিত করতেন তাদের। শিশুরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ত। মোট কথা, দেশের সামাজিক এবং অন্যান্য মহলে তাঁকে নিয়ে জোর আলোচনা চলতো সে সময়।

তাঁর খামখেয়ালী স্বভাবের একটা উদাহরণ দিই। একদিন নিজের অফিসে তিনি আমায় ডেকে পাঠান। ভুল করে তাঁর সম্মুখস্থিত যে চেয়ারটাতে বসলাম সেটা ছিল প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান অথবা তদ্রূপ পদমর্যাদার ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। কাজের কথা শুরু করবার আগেই মেনন শ্লেষভরে বললেন: জেনারেল! এটা আম্বালা নয়, দিল্লী। (আমার পূর্বতন কর্মস্থল ছিল আম্বালাতে)।

ব্যাপারটি সঠিক বোধগম্য হ'ল না। জবাব দিলাম, 'কোথায় রয়েছি সেটা আশাকরি আমার জানা আছে, স্যার।'

মেনন এবার বেশ রুক্ষ স্বরে বললেন: আপনি ভুল চেয়ারে বসেছেন।

এই সামান্য ঘটনা নিয়ে এত কাণ্ড করবার কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁর। চেয়ার আর যাই হোক, সিংহাসন নয়। অপমানিত বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে 'ভুল' চেয়ারটি ছেড়ে রাগের মাথায় কামরা থেকে বেরিয়ে গেলাম। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল। সেক্রেটারিয়েট থেকে বেরিয়ে মোটর নিয়ে সোজা ধরলাম গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

এই ধরনের প্রতিবাদ যে কেউ করতে পারে মেনন সেটা কল্পনাও করেন নি। ওভাবে বেরিয়ে যাওয়াতে বেশ চিন্তিতও হয়ে পড়েছিলেন। অফিসে এবং বাড়ীতে টেলিফোন করে খোঁজ করলেন আমার। কিন্তু কোন হদিস পেলেন না। ঘণ্টা দুয়েক পর অফিসে ফিরে এসে দেখি তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে একাধিক বার্তা পাঠিয়েছেন আমার নামে। তখন পর্যন্ত আমার রাগ পড়ে নি। বার্তাগুলির জবাবে জানিয়ে দিলাম, আমার উপরওয়ালা হলেন থিমায়া; তিনি নন। তাই এবার থেকে প্রয়োজন হলে আমাকে সরাসরি না ডেকে যেন থিমায়ার মারফত ডেকে পাঠান হয়।

এবার তাই করলেন মেনন। আমার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন প্রশাসনিক ব্যাপারে আলোচনার জন্য থিমায়াকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যেতে বললেন।

থিমায়ার সঙ্গেই এবার গেলাম তাঁর কাছে। কাজের কথা শেষ হবার পর থিমায়াকে মেনন বিদায় দিলেন। তারপর একলা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন, অকস্মাৎ ওভাবে তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেন তাঁকে অপমান করেছি। সঙ্কোচের আমার কিছুই ছিল না। স্পষ্ট বললাম, 'প্রত্যেকেরই

আত্মসম্মান বলে একটা বস্তু রয়েছে এবং সেটা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাও সবাই চায়। কৌতুক রসবোধ আমার যে নেই তা' নয়। তবে বিদ্রূপ সহ্য করতে রাজী নই।' খানিকটা অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের পর দু'জনেই হাত মিলিয়ে মিটমাট করে নিলাম ব্যাপারটা। মানুষকে এভাবে আঘাত দেওয়া বোধ হয় মেননোচিত একটা রসিকতাই ছিল।

মিটিংগুলিতে মেনন প্রায়ই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের সেক্রেটারী এবং মন্ত্রীদের ডেকে এনে একটা গুরুগম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতেন। যে কোন উপলক্ষ্যে সুযোগ পেলেই প্রতিরক্ষা বাহিনীর ত্রয়ী প্রধান, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ, বৈদেশিক, স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সেক্রেটারীগণ, গোয়েন্দা সংস্থার অধিকর্তা এবং অন্যান্য অনুরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের একত্রিত করতেন। সবাইকে না পাওয়া গেলেও কিছু সংখ্যক ব্যক্তি হাজিরা দিতেন ঠিকই; এবং মেননের সভা আলোকিত করে বসতেন। সাধারণতঃ অতি জরুরী কোন বিষয় আলোচনার ছুতা করেই তাঁদের ডাকা হ'ত। তারপর সবাই একত্রিত হলে অদ্ভুত একটা বিরক্তির ভাব মুখের উপর ফুটিয়ে তুলতেন তিনি। যেন অনাহূত কতগুলি অবাঞ্ছিত লোক তাঁর চারধারে বসে রয়েছে। কখনও কখনও আবার অত্যধিক কাজের ক্লান্তিতেই হোক অথবা যন্ত্রণাহর ঔষধের প্রভাবেই হোক বসে বসে ঝিমোতেন শুধু। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করার অভ্যাস তো ছিলই। আক্রান্ত ব্যক্তি নির্বিকার চিত্তে চুপ করে বসে থাকলে নিজেকে বিজয়ী মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন মেনন। কিন্তু সে ব্যক্তি আপত্তি করলে সকলের সম্মুখেই একটা কিংবা দুটো চোখই মটকে হাসতে থাকতেন। ভাবখানা দেখাতেন যেন মস্করা করছিলেন এতক্ষণ।

সভাগুলিতে আলোচ্য বিষয়সূচী কিংবা কার্যবিবরণী প্রায়শঃই কিছু থাকতো না। কারণ এ সব কিছু মেনন আদপেই সহ্য করতে পারতেন না। মিটিংগুলি শুরু হ'ত বেশ একটা শান্ত পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু অচিরেই হয়ে পড়তো বুদ্ধির এবং সচীৎকার বাদানুবাদের একটি যুদ্ধক্ষেত্র বিশেষ। শেষপর্যন্ত কোন না কোন ব্যক্তিকে দোষারোপ করতেনই তিনি। প্রশংসা সাধারণতঃ কারুর ভাগ্যেই জুটতো না। বিশেষজ্ঞদের অবজ্ঞা এবং বিদ্রূপ করবার ফলে ক্রোধ, চীৎকার এবং তর্ক-বিতর্কের তুফান বয়ে যেত। একবার এই ধরনের একটি মিটিংয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানদের সম্বন্ধে কতগুলি অসৌজন্যমূলক

মন্তব্য করেন মেনন ; এবং জনৈক ব্যক্তি সেগুলির আবার টেপ রেকর্ড করে রাখে। ঘটনাটি নিয়ে সে সময় বেশ একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়।

সভার মধ্যে মেননের মন্তব্যগুলি যে কী ধরনের হতো তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে কয়েকটি উদাহরণ দিলে। ধরা যাক, কোন জেনারেল হয়তো বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন : 'আমার ধারণায়…,' সঙ্গে সঙ্গে মেনন বলে উঠলেন : 'সৈনিকদের কোন ধারণা-শক্তিই নেই।' কোন অ্যাডমিরাল হয়তো বক্তৃতা শুরু করে বললেন : 'নৌ-বাহিনী…,' অমনি বাধা দিয়ে মেনন নিজেই বিদ্রূপভরে কথাটি শেষ করলেন এই বলে : 'সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেলেই ভালো হয়।' তিরস্কৃত ব্যক্তিরা মিটিং থেকে বেরিয়েই বন্ধু-বান্ধবের কাছে কাল্পনিক বিবাদের মনগড়া সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ দিতেন। কীভাবে মেননকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন, এই সমস্ত বলে বাহবা নেবার চেষ্টা করতেন। অথচ, এত সব হয়তো কিছুই ঘটে নি। মেননের সম্মুখে মনোভাব প্রকাশ করবার মতো সৎসাহস খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিরই ছিল।[১৩] অধিকাংশই ছিলেন সুযোগ-সন্ধানী। চাকুরীতে উন্নতিই ছিল তাঁদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তাই অপমানগুলিকে মুখ বুজে সহ্য করে যেতেন।

মেননের অফিস ঘরের দৃশ্যও ছিল বিচিত্র। পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে সাক্ষাতের জন্য তাঁর কামরার ভিতরে প্রবেশ করলেই দেখা যেত টেবিলের উপর সাজানো সারবন্দী টেলিফোন ক্রমাগত বেজে চলেছে। তারপর বেড়াল যেভাবে ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করে, ঠিক তেমনিভাবেই মেনন খেলা শুরু করতেন আগন্তুকের সঙ্গে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর্শনার্থী ব্যক্তিকে বাক্য-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বেরিয়ে আসতে হ'ত।

নিজের বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করে রাখবার ইচ্ছা হলে মেনন কথা বলতেন অস্পষ্ট স্বরে এবং বিকৃতভাবে। শ্রবণ শক্তিকে আপ্রাণ সজাগ রেখেও অপর পক্ষ একটা বর্ণও বুঝতে পারতেন না। পুনরুক্তির জন্য বার বার অনুরোধ করতে বাধ্য হতেন। এবং সেদিন রক্ষা পাওয়া যেতো একমাত্র নিজের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করেই।

সর্বক্ষণ নতুন চিন্তা এবং অদ্ভুত যতসব কল্পনা তাঁর মাথায় খেলা করতো। তিনিই সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা উৎপাদনকে বর্ধিত করেন। দিবারাত্র সমস্ত সময়

১৩। থাপার এবং সান্নিন কখনও মেননের কোন প্রকার অভদ্র আচরণ সহ্য করেন নি।

যেন নিজেকে উন্মত্ত কর্মব্যস্ততা দিয়ে ঘিরে রাখতেন। কখনও পরামর্শ করতেন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে, কখনও জারী করতেন নানা রকম আদেশ, কখনও বা আলোচনা করতেন দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে। সংসদ অথবা পার্টির মিটিং থেকে শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেই আবার তর্ক-বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়াতেই যেন আনন্দ ছিল তাঁর। অফিসের মধ্যে থাকতেন উত্তেজিত এবং অস্থির। অভিসম্পাত দিতেন একধার থেকে সবাইকে।

মেননের বিদেশ যাত্রার সময় প্রতিবারই পালাম বিমানবন্দরে যেন উৎসবের ধুম পড়ে যেত। সামরিক তথা অসামরিক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, প্রেস ফটোগ্রাফার তথা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ এসে জমায়েত হতেন। ব্যস্ত-সমস্ত মেনন কখনও দ্রুতপদে কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির কাছে যেয়ে সকলের শ্রুতিগোচর স্বরে কানে কানে তথাকথিত জরুরী এবং গোপনীয় কথা-বার্তা বলতেন (দর্শকবৃন্দ দেখে-শুনে চমৎকৃত হতেন) ; কখনও বা কষ্ট স্বীকার করে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে বিমানবন্দরে আসবার জন্য 'স্নেহভরে' তিরস্কার করতেন তাঁদের।

প্রভাবশালী প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের যে পরিতুষ্ট রাখা দরকার সেটা খুব ভালো করেই বুঝতেন মেনন। তাই বকশী গুলাম মহম্মদ, কায়রোঁ, পট্টনায়ক, কামরাজ এবং বি সি. রায়ের মতো ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট রাখতে প্রয়োজন হলে বিধিবহির্ভূত কিছু করতেও পিছপা হতেন না। নেহরু তাঁকে পছন্দ করতেন ; এবং একমাত্র তিনিই ছিলেন মেননের মুখ্য সমর্থক। তাই প্রধানমন্ত্রী যাতে অসন্তুষ্ট না হন তার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন তিনি।

মন্ত্রীসভার ভিতরে একমাত্র আজাদ, পন্থ এবং স্বল্পসংখ্যক আরও কয়েকজন ছাড়া কারুর প্রতি তাঁর সত্যিকারের শ্রদ্ধা ছিল না। বাকীদের মানুষ বলেই গণ্য করতেন না একেবারে। মোরারজী দেশাই এবং তাঁর মধ্যে ছিল মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভারতের শীর্ষস্থানে পৌঁছাবার পথে উভয়েই উভয়কে মনে করতেন বাধাস্বরূপ। এই বিরোধের কারণে আমাদের জাতীয় স্বার্থ বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষ্ণমাচারী এবং অশোক সেন এককালে তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের সঙ্গে মেননের প্রায় মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। মালব্য ছিলেন তাঁর অতি প্রিয় ব্যক্তি।

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে মেননের সম্পর্ক ছিল চলনসই গোছের। এই ব্যাপারটি এবং অন্য কতগুলি রাজনৈতিক সমস্যার জন্য বিভিন্ন কাজে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়।

নেহ্‌রুর চিন্তা-জগতের সঙ্গী তথা দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন মেনন। নেহ্‌রুর ধারণা ছিল, একমাত্র মেননই তাঁর ন্যায়-নীতি, আদর্শ এবং কূটনীতিগুলিকে আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। কীভাবে কঠোর, অনাড়ম্বড় জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে ঐকান্তিক অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তাসহকারে মেনন ১৯২৪ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ইংলণ্ডে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলম পরিচালনা করেছিলেন, সে কথা নেহ্‌রু ভোলেন নি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পুস্তকগুলি প্রকাশের ব্যাপারে ১৯৩৫ সালে মেনন কীভাবে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সেটাও নেহ্‌রুর মনে ছিল। লণ্ডনের প্রকাশক মহলে মেনন ছিলেন সুপরিচিত। বড্‌লে হেড-কে দিয়ে নেহ্‌রুর আত্মজীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি; এবং নিজে ছিলেন সম্পাদকের পরামর্শদাতা। নেহ্‌রুর 'গ্লিম্পসেস্ অফ্ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রী' পুস্তকখানির কিছু কিছু অদল-বদলের পরামর্শও তিনিই দেন। বহু ব্যাপারেই নেহ্‌রু এবং মেননের স্বার্থ ছিল অভিন্ন। ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং কর্মপদ্ধতির দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও উভয়েই ছিলেন পরস্পরের চিন্তা জগতের প্রতিচ্ছায়া।

নেহ্‌রুর উপর এই প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিষ্ঠার কারণে বহির্বিষয়ক মন্ত্রকে প্রভূত সম্মান ছিল মেননের। সেখানকার প্রতিটি ব্যাপারেই তাঁর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। বস্তুতঃ, বহির্বিষয়ক মন্ত্রকে নিয়মমাফিক কোন পদাধিকার না থাকলেও, মেনন ছিলেন সেখানকার মুকুটহীন রাজা। বৈদেশিক দফতরের অফিসরগণ সর্বদা তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকতেন। কাশ্মীরেও তাঁর পদমর্যাদা ছিল অসাধারণ। সেখানে পদার্পণ করলেই সম্পূর্ণ মন্ত্রীপরিষদ তাঁ' ক অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হতেন। এইটেই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা রেওয়াজ। এই সমস্ত সম্মান প্রদর্শনকে মেনন অবশ্য নিজের প্রাপ্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। নেহ্‌রুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং বছরের পর বছর ধরে আন্তর্জাতিক মহলে কাশ্মীর সমস্যাকে অসাধারণ দক্ষতায় তুলে ধরাই ছিল এসবের মূল কারণ। মুখে স্বীকার না করলেও, নেহ্‌রুর প্রিয়পাত্র বলেই বহু রাজনীতিক এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁকে খাতির করে চলতেন। সরকারের মূল নীতিগুলি নির্ধারণে তাঁর অপরিসীম প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে অনেকে আবার অক্ষম ক্রোধে তাঁর সমালোচনা করতেও ছাড়তেন না।

নেহ্‌রুর উপস্থিতিতে ভয়ে যেন কেমনধারা হয়ে যেতেন মেনন। কী কারণে

জানিনা, নেহ্রুকে দেখলেই তাঁকে যেন বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। হয়তো তিনি বেশ ভালো একটি বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই সময় নেহ্রু উপস্থিত হলেই বক্তব্যের সূত্র হারিয়ে ফেলে শুরু করতেন আবোল-তাবোল বকতে। নেহ্রু যেন সব সময়েই তাঁর কাছে ছিলেন একটা অস্বস্তির কারণ স্বরূপ। অসুস্থতার সময়ে নেহ্রু যাতে একবার এসে তাঁকে দেখে যান, তার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। সাধারণতঃ তাঁর সে প্রার্থনা পূরণও করতেন নেহ্রু।

একনিষ্ঠ সমাজতন্ত্রীরূপে সুপরিচিত ছিলেন তিনি, এবং বামপন্থী মহলে তাঁর প্রতিপত্তিও ছিল সুদৃঢ়। রাষ্ট্রপুঞ্জে অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে কাশ্মীর মামলা পরিচালনা করে ভারতের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পক্ষান্তরে, কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা তাঁকে নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করতো। নানা রকম গুজব ছড়াতো তাঁর নামে। শক্তিশালী শিল্পপতিদের আশ্রয়পুষ্ট সংবাদপত্রগুলি তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে ওঠে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে নিজেদের প্রচেষ্টার পথে দক্ষিণ পন্থীরা তাঁকে মনে করতে থাকে একটা অভিশাপ স্বরূপ।

ভারতের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কাজ করছেন বলে পাশ্চাত্য দেশগুলিও অনবরত অভিযোগ আনতে থাকে তাঁর বিরুদ্ধে। ফলে তাদের প্রতি ভয়ানক রুষ্ট হয়ে ওঠেন মেনন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদেশগুলির প্রতি তাঁর কঠোর মনোভাবের কারণও ছিল তাই। শীঘ্রই এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, নিজের সর্ত মতো যে দেশেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য উদগ্রীব হয়েছেন, সেই দেশই তাঁকে অপছন্দ করেছে।

উল্লিখিত কারণগুলির জন্যই বোধ হয় আমেরিকার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না তাঁর। লাল কাপড় দেখলেই যেমন ষাঁড় ক্ষেপে যায়, আমেরিকার নাম শুনলেই তেমনি জ্বলে উঠতেন মেনন। আমেরিকাকে সমর্থন করে তাঁর সঙ্গে কেউ তর্ক করলে, তার আর রেহাই ছিল না। স্বদেশে কিংবা বিদেশে, সুযোগ পেলেই তিনি আমেরিকাবাসীদের তিরস্কার করতেন। আমেরিকান সাংবাদিকগণ তাঁর অপছন্দ কোন প্রশ্ন করলেই ধমক খেতেন। তাঁদের প্রতিটি আচরণকেই সন্দেহের চক্ষে দেখতেন তিনি। বিদ্রূপ করতেন আমেরিকাবাসীদের জীবন-যাত্রা প্রণালীকে। তাঁদের সঙ্গে ভারতের কোন রকম সম্পর্ক থাক সেটা তিনি আদৌ চাইতেন না। ফলে আমেরিকাতে

তিনিও ছিলেন অপ্রিয়। তারা তাঁকে দুর্বৃত্ত, ভিমরুল, অহংকারী ইত্যাদি বিশ্লেষণে বিভূষিত করতো। রাশিয়া সম্বন্ধে সর্বদাই বেশ শ্রদ্ধা ভরে কথা বলতেন মেনন। তাই রাশিয়াতে তাঁর জনপ্রিয়তাও ছিল। কম্যুনিস্ট দেশগুলি পরিদর্শনের জন্য তিনি গেছেন কদাচিৎ। তবু বিখ্যাত ভারতীয় ব্যক্তিরা তাঁকে যতখানি না পছন্দ করতেন, তার চাইতে অনেক বেশী তাঁকে পছন্দ করতো কম্যুনিস্ট দেশগুলি। পাশ্চাত্য দেশগুলির সব জায়গাতে আবার তাঁর জনপ্রিয়তার অভাব সমান ছিল না। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি তাঁর উন্নাসিকতা পছন্দ না করলেও তাঁকে মোটামুটিভাবে সহ্য করতো। কারণ, মেনন ছিলেন তাদের অন্যতম দৃঢ় সমর্থক।

আমেরিকাতেও মেননের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র ধরনের। নিউইয়র্কে একবার এক ট্যাক্সি চালক কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলে: জানি, সেই মেনন পুতুলের সময়ই নেই আমাদের দিকে তাকাবার। তবু লোকটার মাথা আছে বলতেই হবে···লোকটা যদি আমাদের সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্ হতো, তা' হলে ওই হতচ্ছাড়া রাশিয়ানদের চাইতে অনেক আগেই আমরা চাঁদে পৌছুতে পারতাম।

জনৈক আমেরিকান এটর্নি একবার বেশ একটা মজার ঘটনা বলেন আমাকে। নিউইয়র্ক থেকে শিকাগো যাবার পথে বিমানে যে তাঁর পাশে মেনন বসে রয়েছেন সেটা তিনি বুঝতেই পারেন নি। বিমানযাত্রাটি একঘেয়ে হয়ে পড়াতে তাঁর ইচ্ছা হ'ল 'বিদেশী ভদ্রলোকটির' সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে একঘেয়েমিটাকে কিছুটা নিরসন করবেন। সেই উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কতদিন ধরে আমেরিকায় আছেন?'

'দশ দিন', রূঢ় স্বরে জবাব এলো।

'কি করেন এখানে?'

'কাজ', চাপা গর্জনের মতো শোনাল জবাবটা।

'কী ধরনের কাজ?' এটর্নি ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'রাষ্ট্রপুঞ্জে', সংক্ষিপ্ত উত্তর এলো মেননের কাছ থেকে।

'কোন প্রতিনিধি দলের সদস্য বুঝি?'

মেনন এবার যেন তেড়ে এলেন, 'আজ্ঞে না, ভারতীয় প্রতিনিধি দলের আমি নেতা। আর কিছু জিজ্ঞাস্য রয়েছে আপনার?'

এটর্নিটির তখন যেন মারা যাবার মতো অবস্থা। বিদেশী ভদ্রলোকের

সঙ্গে একটু বার্তালাপ করতে যেয়ে যে অজ্ঞাতে খুঁচিয়ে দিয়েছেন প্রচণ্ড আমেরিকা-বিরোধী মেননকে, সেটা বুঝতেই পারেন নি এতক্ষণ।

ক্যাবিনেট সহকর্মীদের অধিকাংশকেই নির্বোধ জ্ঞানে অবজ্ঞা করতেন মেনন। তাঁরাও আবার এই ধরনের দাম্ভিকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সর্বদা চেষ্টা করতেন তাঁকে অপদস্থ করবার। অনেকের হৃদয়েই নেহ্‌রুর উত্তরাধিকারী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল; এবং মেননকে আপন আপন পথের কাঁটা বলে মনে করতেন সবাই। মেননের ভাষায় এঁরা সবাই ছিলেন লক্ষ্যণীয়ভাবে আযোগ্য ব্যক্তি। তাঁদের দুরাশাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেও ছাড়তেন না।

মেনন সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মীর মনে নানা কারণেই একটা হীন মনোভাব জেগে উঠেছিল। অনেকেরই অভ্যাস ছিল ইস্ত্রি-বিহীন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করবার। উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবার সময় কখনও কখনও দাড়ি পর্যন্ত কামাতেন না। বাকিংহাম প্রাসাদ অথবা হোয়াইট হাউসে বিশ্রী পোষাক পরিধান করে যাবার মতো হতো ব্যাপারটা। বদ অভ্যাসগুলি মেনন লক্ষ্য করতেন; এবং স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় মাঝে মাঝে মন্তব্য করতেন: শবাধারই হ'ল এই সমস্ত মানুষের একমাত্র উপযুক্ত স্থান!

অধিকাংশ সহকর্মীই মেননের মতে ছিলেন বিকৃত মস্তিষ্কের। থাকতেন তাঁরা জাঁক-জমকপূর্ণ বাংলোতে; কিন্তু খরচের বেলায় ছিলেন কৃপণের বেহদ্দ। কাউকে নিমন্ত্রণাদি করতেন কদাচিৎ। অনেকের আবার খাবার অভ্যাস ছিল এমন বিশ্রী যে নিমন্ত্রণকর্তা পড়ে যেতেন মহা সমস্যায়। কথা বলতেন বড় বড়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যেত তাঁদের মতো দুর্বল এবং অলস আর হয় না। দেশের মহা সঙ্কটের সময়েও সুনিদ্রার ব্যাঘাত হ'ত না তাঁদের। কারও সঙ্গে দেখা হলে হাত জোড় করে মুখের উপর ফুটিয়ে তুলতেন বিনয়ের হাসি, এবং সেই সঙ্গে আন্তরিকতা-বিহীন, কৃত্রিম কতগুলি বাঁধা-ধরা বুলি আওড়াতেন। সামনাসামনি নেহ্‌রুকে মন খুলে প্রশংসা করতেন সবাই; কিন্তু আড়ালে করতেন নিন্দা। যখন দেখতেন জনগণের মত তাঁদের স্বপক্ষে, প্রতিপক্ষের পরাজয় হয়েছে নিশ্চিতভাবে এবং বিপদের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তখনই কেবল তাঁরা সাহস করে মুখ খুলতেন। জনতার সঙ্গে গলা মিলিয়ে যত সব সস্তা জিগির তোলবার ওস্তাদ ছিলেন সবাই; কিন্তু চোরাগোপ্তা করতেন অনেক কিছু।

মেননের সঙ্গে কারও তীব্র বাদানুবাদ হলে মাঝে মাঝে তিনি রাগে মুখ

গোমড়া করে থাকতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেলোয়াড়ী মনোভাব প্রদর্শনের জন্য অথবা খুশী করবার উদ্দেশ্যে উপহার স্বরূপ প্রতিপক্ষকে পাঠিয়ে দিতেন দামী এক বাক্স চকোলেট।

কাজের রুটিন তাঁর ছিল বিকারগ্রস্তের মতো। রাত্রে নিদ্রা যেতেন অতি সামান্য। সেই অনিদ্রাটুকুকে পুষিয়ে নিতে গিয়ে সারাদিন ধরে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বসে বসে ঝিমোতেন। অসীম কর্ম-শক্তিতে ঘুরে বেড়াতেন ঘুর্ণিঝড়ের মতো। অসংখ্য সম্মেলনে যোগদান কিংবা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করতে (ভারতে যার কোন অভাব নেই) কখনও ক্লান্তি ছিল না তাঁর। কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার সময় সে এক দেখার মতো দৃশ্য হ'ত। রাষ্ট্রদূতদের ভিতরে যাদের কূটনীতি তাঁর মনোমত হ'ত না, তাঁদের ধমকাতেন। অতি ব্যস্ততায় ছোটখাটো আসবাবপত্র ডিঙ্গিয়ে, অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে কারও প্রতি অকারণে চীৎকার করে এবং অন্যের প্রতি দোষারোপ করে যেন একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতেন !

সময় সময় সব কিছু জেনেও না জানার ভান করতেন মেনন। সংশ্লিষ্ট মহলে কোন সংবাদ পৌঁছে দিয়ে পরক্ষণেই সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভান করতে এতটুকুও সঙ্কোচবোধ করতেন না। অসম্ভব সমস্ত কাজের দায়িত্ব চাপাতেন লোকের উপর। আপত্তি করলে নেহ্‌রুকে বলে দেবার ভয় দেখাতেন। প্রকৃতপক্ষে সেরকম কোন উদ্দেশ্য হয়তো তাঁর থাকতো না। কথাটা বলতেন শুধু ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যেই। প্রবীণ সেনাপতি এবং অসামরিক অফিসরদের গুরুতর সমস্যা আলোচনার অছিলায় ডেকে পাঠাতেন সময়-অসময়ে। দিন কিংবা রাত অথবা রবিবারের বিকেল কোন তারতম্য থাকতো না। যে জন্য ডাকতেন সে ব্যাপারটি হয়তো তেমন কিছুই নয়। আসলে মানুষের বিশ্রাম কিংবা চিত্তবিনোদনের ব্যাঘাত ঘটানোই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য থাকতো। লোকে অসন্তুষ্ট হ'ত তার জন্য। আর, এটা তিনি করতেন কারণ বিশ্রাম যে কি জিনিস সে সম্বন্ধে নিজের কোন ধারণাই ছিল না তাঁর।

সময় সময় হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়তেন এবং সুস্থও হয়ে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে। দ্রুত আরোগ্য লাভ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। অসংখ্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতেও ভুগতেন ; এবং অসুস্থতার সময় চুপচাপ পড়ে থাকতেন বিছানায়।

আপন দফতরে একগাদা লোক এনে জুটিয়েছিলেন তিনি। কিছু -কিছু

দক্ষ লোক তাদের মধ্যে অবশ্য ছিল। কিন্তু অধিকাংশই ছিল অকর্মণ্য। সমালোচকেরা অবশ্য তাদের সবাইকে একই দলে ফেলে সমানভাবে অভিযুক্ত করতো।

রাত তখন তিনেটে। অকস্মাৎ টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। রিসিভারটি কানে ধরতেই শুনলাম, 'মেনন কথা বলছি। কয়েক মিনিটের জন্যে এখুনি একবার আমার এখানে আসতে পারবেন কি? ভয়ানক জরুরী ব্যাপার।'

জবাব দিলাম, 'এখনি আসছি।'

সে সময় শরীরে আমার ১০২ ডিগ্রি জ্বর। তাই নিয়েই মোটা একটা মাফলার গলায় জড়িয়ে এবং উপযুক্ত গরম কাপড়ে শরীর ঢেকে সঙ্গে সঙ্গে মোটরে বেরিয়ে পড়লাম। একগাদা ফাইলপত্তরের মধ্যে মেনন বসে ছিলেন। সারা রাত ধরে কাজ করে অতি-প্রত্যুষেই বিমানযোগে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে যোগদান করতে যাবার জন্য তখন তিনি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোল্যাণ্ড থেকে যে ঘোড়াগুলি আসবার কথা ছিল তার কী হ'ল জানেন কি?'

'পোল্যাণ্ডের ঘোড়া?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম। 'আমি তো কিছুই জানি না। ঘোড়ার ব্যাপারটা আমার অধীনেই নয়। ওটা দেখাশুনা করেন জেনারেল কোছার।'[১৪]

'তাই না কি?' মেনন দুঃখ প্রকাশ করলেন, 'ভয়ানক দুঃখিত জেনারেল। এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম।' কথাটা বলতে বলতে আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের হাতখানা আমার হাতে রেখেই চমকে উঠলেন, 'আপনার জ্বর হয়েছে দেখছি!'

'হ্যাঁ।'

'হায় ভগবান!', মেনন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখানে আসবার আগে এ কথাটা বললেন না কেন?'

কোন জবাব দিলাম না এ প্রশ্নের।

পরের দিন প্রত্যুষের প্লেনেই লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক যাত্রা করলেন মেনন। চার দিন পর স্থানীয় এয়ার ইন্ডিয়ার অফিস থেকে বেশ মোটা একটা পার্শেল

১৪। কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল।

পেলাম। লণ্ডন থেকে প্রীতি-উপহার স্বরূপ আমার পছন্দসই রংয়ের সুন্দর দু'টি জর্মন পুলোভার পাঠিয়েছেন মেনন। সেই শেষ রাতে অত জ্বরের মধ্যে আমায় বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। উপহার দু'টি ছিল তারই নিদর্শন। মাঝে মাঝে থাপার, সারিন এবং অন্যান্য কয়েকজনকেও অনুরূপভাবে উপহার দিতেন।

ফাইলের মধ্যে আপত্তিকর সমস্ত মন্তব্য লেখা আর একটি অভ্যাস ছিল তাঁর। এইরকম একটি মন্তব্যের উত্তরে আমিও অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করি; এবং তার জন্য মেনন আমার জবাবদিহি চান। কিন্তু যখন দেখলেন ঘটনাটির জন্য মোটেই আমি দুঃখিত নই, তখন রেগে ফাইলটি আমার দিকে ছুঁড়ে দেন। আমার দিকে কেউ কিছু ছুঁড়ে ফেলে এটা আদপেই আমি পছন্দ করি না। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে আমিও ফাইলটি নিয়ে কামরার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। এই স্পর্ধার জন্য সম্ভব হলে মেনন সেদিন আমায় জীবন্ত চিবিয়ে খেতেন।

ব্যবহারটি যদি একটু ভদ্র হতো, মেনন তা'হলে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বশ্রেণীর মানুষের অকৃপণ আনুগত্য লাভ করতে পারতেন। প্রথম দিকে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সর্বজনীন জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর। কিন্তু অবহেলার জন্য ক্রমশঃ সেই জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত কিছু লোকের সমর্থন থাকলেও, বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এরই সুযোগ গ্রহণ করে রাজনৈতিক সুযোগ-সন্ধানীরা। জনতার সঙ্গে নিজের সংযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলে ব্যাপারটিকে অনায়াসেই বাধা দিতে পারতেন তিনি। অনেকেই এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। মেনন কিন্তু ব্যর্থ হলেন নিজের দোষে।

বিভিন্ন মহলে গুজব শুনলাম মেনন না কি থিমায়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার পদোন্নতির আদেশ দিয়েছেন। ঘটনাটি যথার্থ হলে আমার পক্ষে থিমায়ার অধীনে কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে অনুচিত এবং বিব্রতকর। দফতরে যেয়ে তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের মনোভাব সুষ্ঠু করে জানালাম। কিন্তু থিমায়া বললেন, লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেলের দু'টি শূন্য পদ পূরণের জন্য তিনি চাকুরীর প্রবীণত্ব অনুযায়ী মেজর জেনারেল গ্যয়ানী, কুমারমঙ্গলম এবং আমার, এই তিন জনের নামের একটি তালিকা মেননের কাছে নির্বাচনের জন্য দাখিল করেছিলেন। (কুমারমঙ্গলম এবং

আমার চাকুরীর প্রবীণত্বের তারিখ ছিল অভিন্ন।) পদোন্নতির নিয়ম অনুসারে প্রার্থী অফিসরের পক্ষে ডিভিশনের অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। গ্যয়ানীর সেই অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন মেনন তাঁর পদোন্নতিতে আপত্তি করেন। শেষ পর্যন্ত মেনন এবং তাঁর উভয়েরই মতানুসারে কুমারমঙ্গলম এবং আমাকে শূন্য পদ দু'টিতে পদোন্নতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। (কিছুদিন একটি ডিভিশনে অধিনায়কত্ব করবার পর গ্যয়ানীরও কয়েকমাস বাদেই পদোন্নতি হয়।) থিমায়া স্পষ্ট বললেন, পদোন্নতির সিদ্ধান্ত তাঁর সম্মতি অনুসারেই নেওয়া হয়েছে; এবং সেই কারণেই এ ব্যাপারে আমার মনে কোন বিবেকদংশন থাকা অনুচিত।

কুমারমঙ্গলম এবং আমি দু'জনেই প্রায় ডজন খানেক অফিসরদের ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি লাভ করি। অথচ কুৎসা রটনা হ'ল শুধু মাত্র আমারই সম্বন্ধে। পদোন্নতিটি যেন যোগ্যতা অনুসারে লাভ করি নি; করেছি গোঁজামিল দিয়ে। কুমারমঙ্গলমের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি কেউ। অথচ সেই একই অফিসরদের ডিঙ্গিয়ে তিনিও পদোন্নতি লাভ করেন। কুমারমঙ্গলম এবং আমি একই তারিখে চাকুরীতে যোগদান করি, এবং উভয়েরই চাকুরীগত প্রবীণত্ব ছিল এক। তিনি স্নাতক হন উলউইচ থেকে এবং আমি স্যাণ্ডহার্স্ট থেকে। যোগ্যতার দু'টি বিভিন্ন পরীক্ষায় আমরা দু'জনেই উত্তীর্ণ হই। অধিকতর কোন যোগ্যতা নিয়েও তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি। লোকে বলতো কুমারমঙ্গলমের চাকুরীগত প্রবীণত্ব না কি আমার চাইতে অধিক। কিন্তু আসলে এটা ছিল একটা বিরাট অসত্য। সমর বিভাগের তালিকায় আমার উর্ধ্বে তাঁর নাম থাকার একমাত্র কারণ হ'ল তিনি ছিলেন গোলন্দাজ (Artillery) এবং আমি হলাম পদাতিক (Infantry) বাহিনীর লোক। কেবলমাত্র বিভাগীয় পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকারের নিয়মেই সামরিক তালিকায় ইন্‌ফ্যান্ট্রির আগে বসতো আর্টিলারির নাম।

মেননের আসবার আগেও চাকুরী জীবনে একাধিকবার অনেক ব্যক্তিকে ডিঙ্গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমার পদোন্নতি হয়েছে; এবং তা' হয়েছে একমাত্র আমার কর্মকুশলতার কারণেই। এ কথাটা বোধ হয় অনেকেরই জানা ছিল না। যেমন: ১৯৪২ সালে তিরিশ বছর বয়সে লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল পদে উন্নীত হই। সে সময় আমার চাকরী হয়ে ছিল মাত্র সাড়ে নয় বছরের।

মাত্র পনের বছর চাকরী করবার পর ১৯৪৮ সালে ছত্রিশ বছর বয়সে প্রমোশন পাই ব্রিগেডিয়ার পদে। ১৯৫৬ সালে সাড়ে তেতাল্লিশ বছর বয়সে যখন মেজর জেনারেল হলাম, আমার চাকরী তখন হয়েছে মাত্র তেইশ বছর। প্রতিবারই একাধিক ব্যক্তিকে ডিঙ্গিয়ে আমার পদোন্নতি হয়েছে। কিন্তু ছাব্বিশ বছর চাকরী করবার পর সাতচল্লিশ বছর বয়সে কর্মকুশলতাপূর্ণ চাকরীর ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই যখন আরও কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে ডিঙ্গিয়ে ১৯৫৯ সালে লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল পদে কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে পদোন্নতি লাভ করলাম, তখনই শুরু হ'ল হট্টগোল; এবং শুধু আমারই বিরুদ্ধে। ইন্ধন অবশ্য জুগিয়েছিলেন আমারই জনকয়েক সহকর্মী। 'রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দরুন' আমার মতো 'সাধারণ শ্রেণী'র একজন অফিসরকে মেনন অযথা গুরুত্ব দিয়েছেন, এই কথাটা প্রচার করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল।

প্রধান অভিযোগ ছিল, অধিকতর দক্ষতা সম্পন্ন চাকরীর ইতিহাস সংবলিত ব্যক্তিদেরও ডিঙ্গিয়ে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে আমায়। কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে এই 'অধিকতর দক্ষ' ব্যক্তিরা কারা; এবং তাঁদের চাকরীর ইতিহাস আমার চাইতে ভালোই বা হ'ল কী করে; (কেউ কি কষ্ট স্বীকার করে আমার চাকরীর কাগজপত্র পরীক্ষা[১৫] করে দেখেছিলেন?) অবশ্য মদ্যপান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি যদি উচ্চতর পদে যোগ্যতার মাপকাঠি হয়, তা' হ'লে অনেকেরই খুব তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাওয়া উচিত ছিল। কারণ এই সমস্ত বিষয়ে তাঁদের দক্ষতা ছিল অপরিসীম।

স্বল্প সংখ্যক কয়েকজন মেজর জেনারেলকে পদোন্নতি দেওয়া না দেওয়া নিয়ে সংবাদপত্র এবং পার্লিয়ামেণ্টে সোরগোল পড়ে গেল। অনেকেই বললেন, মেনন আসবার পর হতেই এ নিয়ে সামরিক বিভাগে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই অসন্তোষ কিন্তু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বহু পূর্বেই। সামান্য কয়েকজন প্রবীণ জেনারেলকে পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য এটা হয় নি। সেনা বিভাগের উচ্চতম পদগুলিতে পদোন্নতি

১৫। সংসদে মেনন এবং চ্যবন উভয়েই পদোন্নতির ব্যাপারে সরকারী নীতির ব্যাখ্যা করেছেন। শুধুমাত্র চাকুরীগত প্রবীণত্ব না, সংশ্লিষ্ট অফিসরের নেতৃত্ব তথা কর্মকুশলতার বাৎসরিক গোপন বিবরণের (Annual Confidential Report) উপর ভিত্তি করে একটি নির্বাচন সংস্থা (Selection Board) পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করে থাকেন।

দেবার আগে প্রার্থীদের যোগ্যতা, চাকুরীগত প্রবীণত্ব এবং আরও অনেক কিছুই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আমার মনে হয় পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত অফিসরগণই কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সকলে নয়। সামরিক বিভাগে 'সার্বিক' অসন্তোষের প্রচারকার্যটি ছিল তাঁদেরই কীর্তি।

প্রকৃতপক্ষে, অন্যায় যদি সত্যিই কিছু করা হয়ে থাকে, তবে তা' হয়েছিল লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল পদে অধিষ্ঠিত অফিসরদের ক্ষেত্রেই। এবং সে অন্যায় চলে আসছিল সেনা বাহিনীর বিভিন্ন প্রধানদের (Chiefs of Army Staff) আমল থেকে বহু বৎসর ধরে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে কৃষ্ণ মেননের আসবার অনেক আগে থেকে। প্রতিটি পদোন্নতি প্রার্থী অফিসরের দক্ষতা ইত্যাদি বিচার করবার জন্য নির্বাচন সংস্থা ব্যয় করতো দশ থেকে পনের মিনিট মাত্র সময় (এখনো বোধ হয় তাই করা হয়)। সতেরো থেকে আঠারো বছর ধরে যারা চাকরী করছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের যোগ্যতা কী ভাবে এত শীঘ্র বিচার করা সম্ভব? অতএব কাজ সারা হ'ত যত্র-তত্র ভাবে। এবং পদোন্নতির পরীক্ষায় অথবা সিনিয়র অফিসর কোর্সে অকৃতকার্য হয়েছেন বা আদৌ যোগদান করেন নি, কিংবা স্টাফ কলেজে শিক্ষালাভ অথবা নির্দিষ্ট ক্রমভুক্ত স্টাফ পদে কাজ করেন নি, এ ধরনের বহু অফিসরকে লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল ধাপে (Grade) প্রকৃত পদমর্যাদা (substantive rank) প্রদান করা হ'ত। ডাক্তারী পরীক্ষাতেও অনেকে আবার মান অনুযায়ী হতেন না এবং ইউনিটের অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতাও তাঁদের থাকতো না। তবু পদোন্নতি হ'ত তাঁদের। ব্যাপারটিতে প্রচুর সংখ্যক অফিসর জড়িত থাকলেও, যোগ্যতা বিচারের উপযুক্ত কোন মাপকাঠি সত্যিই ছিল না। এই সমস্ত অব্যবস্থার কারণেই সামরিক বিভাগের অফিসরদের মধ্যে অসন্তোষ জমে ওঠে।

যোগ্যতার অসম মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে আপত্তিকর ভাবে সামরিক বিভাগের বহু প্রবীণ অফিসরদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়। সেজন্য প্রচণ্ড আপত্তিও ওঠে। কিন্তু ১৯৫৯ . সালের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে সামরিক বিভাগের বাইরে জনসাধারণের সামনে যে ধরনের হৈ-চৈ শুরু করা হয়েছিল, তেমন আর কখনও হয় নি।)

যাই হোক, ঘটনাটি নিয়ে থিমায়ার সঙ্গে যে আমার কথাবার্তা হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। সপ্তাহ দশেক পর ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের

স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় তাই থিমায়ার পদত্যাগের সংবাদ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বেশ ফলাও করে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, সাম্প্রতিক প্রবীণ অফিসরদের পদোন্নতির ব্যাপারে মেননের অন্যায় হস্তক্ষেপের জন্য থিমায়া পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন। আমার কাছে থিমায়া যা বলেছিলেন তার সঙ্গে সংবাদটির কোন সামঞ্জস্য ছিল না। মেননের সঙ্গে কোন মত বিরোধ হ'লে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করাই তাঁর পক্ষে হ'ত স্বাভাবিক। তা' না করে, এতদিন অপেক্ষা করবারই বা কী অর্থ হ'তে পারে বুঝলাম না। আবার মনে হ'ল, স্বার্থান্বেষী লোকেরা হয়তো তাঁর মানসিক উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে পদত্যাগ করতে প্ররোচিত করেছে।

ব্যাপারটি যাই ঘটে থাকুক, এ নিয়ে খোলাখুলি থিমায়ার সঙ্গে কথা বলাই ভালো মনে হ'ল। তাই দেরী না করে রওনা হলাম থিমায়ার বাড়ীতে। থিমায়া তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি। আমি তাঁকে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকাটি দেখালাম। স্টেট্‌স্‌ম্যানের সংবাদটি পাঠ করে থিমায়া আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পদোন্নতির প্রশ্ন নিয়ে মেননের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন, এই মর্মে কোন বিবৃতি কাউকে দিয়েছেন বলে অস্বীকার করলেন। তবে একটা কথা স্বীকার করলেন। মানসিক প্রকৃতির দিক থেকে মেননের সঙ্গে মানিয়ে চলা তাঁর পক্ষে যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে সে কথা নেহ্‌রুকে তিনি বলেছেন। কারণ, কাজের কোন সময়-অসময় নেই মেননের। লোকের যখন বিশ্রামের সময়, তখন তিনি বিনা প্রয়োজনে আলোচনার অজুহাতে ডেকে পাঠান। এভাবে আর কাজ চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

লিখিতভাবে একখানা পদত্যাগ পত্র সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম। থিমায়ার বক্তব্য শেষ হতেই সেখানা এগিয়ে দিয়ে তাঁর পদত্যাগ পত্রের সঙ্গে সেটাকেও গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালাম। বললাম, আমারই জন্যে যদি সেনাবাহিনীর প্রধানকে পদত্যাগ করতে হয় অথচ আমি চাকরীতে বহাল থাকি, তবে তা' নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। সত্যটাও চাপা পড়ে থাকবে চিরকালের জন্য। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই আমাদের দু'জনের পক্ষেই সরে দাঁড়ান যুক্তি-যুক্ত।

যুক্তিটাকে অস্বীকার করতে পারলেন না থিমায়া। ঘটনাটি মোটামুটি উপরিউক্ত ভাবে টাইম্‌স্‌ অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন প্রেম ভাটিয়া; এবং থিমায়াও তার কোন প্রতিবাদ করেন নি।

সেই দিনই কার্যোপলক্ষ্যে নেহ্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে মেননের বিরুদ্ধে থিমায়ার অভিযোগের কথাটি তিনিও আমায় কথা প্রসঙ্গে জানান। উভয়ের মন কষা-কষির অন্য কোন কারণ রয়েছে কি না তাও জিজ্ঞাসা করেন। বিশদ ঘটনা জানা না থাকায়, আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হয় না নেহ্রুকে।

মেননের সঙ্গেও এই ব্যাপারে নেহ্রু কথা বলেছিলেন। ঘটনাটি হয়তো এখানেই চাপা পড়ে যেত। গেল না শুধু মেননের জন্য। তাঁকে ডিঙ্গিয়ে নেহ্রুর সঙ্গে দেখা করার জন্য থিমায়ার কাছে দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করলেন মেনন। ফলে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে উপেক্ষা করেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে থিমায়া পদত্যাগপত্র পেশ করলেন লিখিতভাবে।

ব্যাপারটি ক্রমশঃ জটিল হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত থিমায়াকে ডেকে পাঠালেন নেহ্রু। সামান্য কারণে এই ধরনের আচরণ যে অপত্তিজনক সে কথা বুঝিয়ে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন তাঁকে; বিশেষ করে চীন এবং পাকিস্তানের দিক থেকে আমাদের বিপদের আশঙ্কা যখন ক্রমবর্ধমান। নেহ্রুর অনুরোধে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন থিমায়া।

পরে একসময় সংসদে থিমায়ার এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেন নেহ্রু। অসামরিক প্রশাসনের উপর সৈনিকদের এই ধরনের চাপ সৃষ্টি করবার অভ্যাসের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথমে পদত্যাগ করে পরে সেটা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় থিমায়ার জনপ্রিয়তা বরঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শত্রুপক্ষ এই সময় আমার প্রতিটি কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করে এবং বিরুদ্ধ প্রচার কার্যও হয়ে ওঠে তীব্রতর। বোম্বাইয়ের ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কারেন্ট' ছিল এই প্রচার কার্যের অগ্রণী। সেনাবিভাগের আমার কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়ে, আমার বিরুদ্ধে বিকৃত তথ্যপূর্ণ সমস্ত কল্পিত কাহিনী প্রকাশ করতে থাকে তারা। পত্রিকাটির সম্পাদক ডি. এফ. করাকা কেন যে আদা-জল খেয়ে আমার পিছনে লেগেছিলেন জানি না। এ বিষয়ে জনৈক বন্ধু একবার আমায় প্রশ্ন করলে একটা গল্প মনে পড়ে যায়। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে একবার কেউ জানায়, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নামে ক্রমাগত কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে। শুনে, বিস্ময়াভিভূত বিদ্যাসাগর বলেন, 'কই, কখনও

তাঁর কোন উপকার করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে তিনি আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছেন কেন?'

ব্যাপারটি ক্রমশঃ চরমে উঠলো। শেষ পর্যন্ত থিমায়া, মেনন এবং নেহ্‌রু সকলের কাছে আবেদন জানালাম, এই ধরনের মিথ্যা কলঙ্ক রটানোর জন্য হয় সরকার পক্ষ থেকে 'কারেণ্টে'র বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়েব করা হোক, নচেৎ আমাকে সেজন্য অনুমতি প্রদান করা হোক। কিন্তু নেহ্‌রু কোনটাতেই সম্মতি দিলেন না। আশ্বাস দিলেন, সুযোগ মতো কোন সময় তিনি নিজেই অভিযোগগুলির যথাযথ উত্তর দেবেন। ইতিমধ্যে কিন্তু মিথ্যা কলঙ্ক রটনা চললো অব্যাহত গতিতে।

১৯৫৯ সালের ২৬শে আগস্ট তারিখের সংখ্যায় 'কারেণ্ট' একাধিক অভিযোগ আনলো আমার বিরুদ্ধে। তার মধ্যে একটি হ'ল, ১৯৪৮ সালে ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদূতের দফতর থেকে সরকার আমায় প্রত্যাহার করে নেন। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কাশ্মীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আপন অনুরোধেই এবং নেহ্‌রুর সম্মতি অনুসারে আমি ভারতে ফিরে এসেছিলাম (এর লিখিত প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে)। অপর অভিযোগ হ'ল, ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব গ্রহণের পূর্বে ছোট ছোট ইন্‌ফ্যান্ট্রি ইউনিটগুলি পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা আমার হয় নি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইন্‌ফ্যান্ট্রির একটি প্লেটুন এবং একটি কোম্পানীর অধিনায়কত্ব আমি করেছিলাম। ব্যাটেলিয়নের[১৬] অধিনায়কত্ব করা ভাগ্যে ঘটে নি সরকারের আদেশেই। এ কথাটা আগেই বলেছি। ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করবার পূর্বেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূতের প্রথম সামরিক সহকারীরূপে কর্ণেলের পদমর্যাদা দিয়ে সরকার আমাকে ওয়াশিংটন পাঠান। প্রত্যাবর্তনের পর সামরিক কর্তৃপক্ষ পুনরায় আমাকে একটি ব্যাটেলিয়নের কর্তৃত্বভার প্রদান করেন কিন্তু এবারেও বাধা আসে সরকারের তরফ থেকে। সে সময় কাশ্মীরে যুদ্ধ চলছে। এবং, জম্মু ও কাশ্মীর ডিভিশিয়ার অধিনায়কের পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় আমাকে।

আদৌ কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি কিনা তা' নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয় 'কারেণ্ট' পত্রিকায়। ভারতের বর্তমান সামরিক বাহিনীর পক্ষে

১৬। এ ব্যাপারে আমিই কিন্তু একমাত্র ব্যক্তি ছিলাম না। আমার অন্যতম সহকর্মী লেঃ জেনারেল মানেকশও কখনও কোন ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কত্ব করেন নি।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ছিল মাত্র তিনটি : ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন সংঘর্ষ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং কাশ্মীর অভিযান। এই তিনটিতেই আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

আরও মন্তব্য করা হয়, ডিভিশনের অধিনায়কত্ব গ্রহণকালে যথেষ্ট সামরিক অভিজ্ঞতা আমার ছিল না; এবং যে সামান্য বছর দুয়েক ডিভিশনের অধিনায়কত্ব করেছি তাও ব্যয় করেছি গৃহ-নির্মাণের জন্য। সত্য ঘটনা কিন্তু ছিল অন্য রকম। ডিভিশনের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সাড়ে তিন বৎসর ধরে আমি অধিনায়কত্ব করেছিলাম একটি ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি ব্রিগেডের। ডিভিশনের অধিনায়ক ছিলাম প্রায় চৌত্রিশ মাস, এবং তার মধ্যে মাত্র সাত মাস সময় ব্যয় করেছিলাম আমার সৈনিকদের জন্য গৃহ-নির্মাণের কাজে। বাকী সময়গুলি সামরিক দায়িত্ব পালন এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণের কাজেই ব্যয়িত হয়।

'কারেণ্ট' আরও বলে আমি নাকি বিনা খরচায় 'অমর' প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে অঙ্গীকার করেছিলাম। এটাও ছিল একটা বিরাট মিথ্যা। এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি আমি কখনই দিই নি। আসলে, সরকারী হিসাবের চাইতে অনেক কমে এবং এক কোটি টাকা মতো ব্যয়ে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে পারবো বলেছিলাম।

পাইকারী হারে সৈন্য-শক্তি অপব্যবহারের অভিযোগও আনা হয়েছিল আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু 'অমর' প্রকল্পে সৈনিকদের নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত আমি নিই নি; নিয়েছিলেন সরকার এবং সৈন্য বিভাগ; নিয়েছিলেন আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মেনন, থিমায়া, কলবন্ত সিং এবং চৌধুরী।

১৯৫৮ সালে প্রতিরক্ষা মঞ্চ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে আমার পুরো ডিভিশনকে (২০,০০০ লোকের) নিযুক্ত করার অভিযোগও আমার বিরুদ্ধে ছিল। সত্যের এত বড় অপলাপ আর হয় না। প্রকল্পটিতে অধিকাংশই ছিল অসামরিক শ্রমিক। সৈনিক ছিল মাত্র কয়েক শত।

নাটক মঞ্চস্থ করা নিয়েও আমাকে কটাক্ষ করা হয়। বৃথা সময় না কি নষ্ট করেছি এর পিছনে। বস্তুতঃ, অন্যান্য বহু সামরিক অফিসরদের মত নাটক আমারও হ'ল একটা শখের জিনিস। সাত বছর পূর্বে ১৯৫২ সালে দিল্লীতে 'আনার কলি' নাম দিয়ে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। তার আগে করেছিলাম বোধ হয় আরও দু'একটি। কুঁড়ি বৎসরের মধ্যে সামান্য এই

কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করাতে আমার সামরিক দক্ষতা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। সৈনিকদেরও যে শখ থাকতে পারে এবং অবসর সময়ের খানিকটা তার পিছনে ব্যয়ও করা যেতে পারে আশা করি আমার চরম শত্রুরাও সেটা মানবেন। তা' সে নাটক মঞ্চস্থ করাই হোক, অথবা ছবি আঁকাই হোক। এবং এর জন্য সামরিক দায়িত্বের প্রতিও এতটুকু অবহেলা প্রদর্শন করি নি আমি। তা' সত্ত্বেও অবসর সময়ে দু'একটি নাটক মঞ্চস্থ করা নিয়ে 'কারেণ্টে'র মতো কতগুলি পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করলো। অথচ আমার দেশ সেবার একাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বগুলির প্রতি কারও দৃষ্টি পড়ল না।

পদোন্নতির ব্যাপারটিও 'কারেণ্ট' বাদ দেয় নি। আমার চাইতে না কি অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন এবং শ্রেষ্ঠ প্রায় জন বারো জেনারেলকে বাদ দিয়ে অন্যায় ভাবে আমার পদোন্নতি করা হয়েছিল। এ তথ্যও কিন্তু ছিল সত্যের বিপরীত। প্রকৃত ঘটনা পূর্বেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি।

আলোচ্য প্রবন্ধটির মধ্যে আরও অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল। যেমন, আমার চাকরী না কি শুরু হযেছিল 'ক্যাভ্ল্রি' বাহিনীতে। আসলে কিন্তু আমি ইন্ফ্যান্ট্রি বাহিনীতে (রাজপুতানা রাইফেল্স্) চাকরী শুরু করি। 'আর্মি সার্ভিস্ কোর'-এ (A. S. C.) আমাকে না কি বদলী করা হয়েছিল শুধু মাত্র দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ লাভের জন্য (এ. এস. সি তে সুযোগ্য তরুণ অফিসরদের উন্নতির বহু সুযোগ থাকে)। কিন্তু স্বল্পকালের জন্য কী ভাবে এ. এস. সি-তে আমাকে বাধ্য হয়ে যেতে হয়, সে কথাও আগেই বলেছি। বেতন কমিশনে আমার যোগদানের কথাও বলা হয় প্রবন্ধটিতে। আসলে কিন্তু এ ধরনের কোন কমিশনে কস্মিন্কালেও আমি ছিলাম না। প্রত্যেকটি তথ্যই এই ভাবে ছিল বিকৃত এবং অসত্য।

এই বিষয়ে থিমায়া মেননকে একটা নোটও পাঠান (নোটটির প্রতিলিপি এখনও আমার কাছে রয়েছে)। ভিত্তিহীন অভিযোগপূর্ণ 'কারেণ্টে'র আলোচ্য প্রবন্ধটি আমার সুনামের পক্ষে হানিকর হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে থিমায়া সুপারিশ করেন, 'সম্পাদকের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি সরকার যেন বিবেচনা করে দেখেন। কারণ, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ জনসাধারণ এবং সৈন্যবাহিনীর উপর আপত্তিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য।' প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেবার জন্যও অনুমতি প্রার্থনা করেন থিমায়া।

অনুমতি অবশ্য কোন দিনই দেওয়া হয় নি। কারণ মাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেই আমার সমর্থনে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন নেহ্‌রু।

আশ্চর্যের কথা, যে 'কারেণ্ট' সম্পাদক ডি. এফ. করাকা নিজের পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, তিনিই আবার ১৯৬০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একখানা চিঠিতে আমাকে লিখলেন :

সামরিক সদর দফতরের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে গতকাল জানতে পারলাম, (অনুমান করি, অনুরূপ সূত্র থেকেই আমার বিরুদ্ধে প্রবন্ধগুলি প্রকাশে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন) ১৯৫৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের 'কারেণ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের 'অ্যাসেস্ ফর দি আর্মি' (Assess for the Army) শীর্ষক প্রবন্ধটিতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে; বিশেষ করে আপনার সম্পর্কিত মন্তব্যগুলিতে।...এই সুযোগে তাই আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে লিখে জানাচ্ছি যে, যে কোন ভুলের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত; এবং কোথায় কোথায় আমাদের ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে সেগুলি আমায় জানালে বাধিত হব।...আমাদের সাংবাদিকদের অত্যুৎসাহের কারণে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে, তার জন্য পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সেগুলিকে সংশোধন করা আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি।

প্রয়োজন বোধ করলে আপনাদের প্রধান সেনাপতি থিমায়ার কাছে আমার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে পারেন। এই চিঠিখানার একটি প্রতিলিপি তাঁকেও পাঠালাম।

[১৯৬০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে থিমায়া আমাকে সরকারী ভাবে জানান যে করাকার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তিনি কোন দায়িত্ব নিতে পারবেন না; এবং করাকার-বক্তব্যের প্রকৃত অর্থও তাঁর বোধগম্য হয় নি।]

করাকা আমাকে উপরি-উক্ত চিঠিখানা লেখবার আগেই ১৯৫৯ সালের ২৬শে আগস্ট, ১৮ই নভেম্বর এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের 'কারেণ্ট' পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করে তিনখানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহ্‌রু বললেন :

কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন প্রবীণ জেনারেল, লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল বি. এম. কলকে আক্রমণ করে (কারেণ্ট পত্রিকায়) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।···এই ধরনের (সামরিক) ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা অত্যন্ত অন্যায় এবং আপত্তিকর। তথ্যগুলি ভুল হবার দরুন ব্যাপারটি হয়ে পড়েছে আরও বিশ্রী। লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল কল আমাদের একজন অতীব দক্ষ এবং কর্মক্ষম জেনারেল। যতদূর সম্ভব আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বাদ-প্রতিবাদ কিংবা অভিযোগ-প্রত্যাভিযোগ আমি পছন্দ করি না। জেনারেল কলের অনিয়মিত পদোন্নতি সম্বন্ধে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ কোন যুদ্ধে অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। ব্যাপারটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে অবাক হয়ে যাই। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কেবলমাত্র বিগত মহাযুদ্ধের সময়েই ব্রহ্মদেশে সক্রিয় ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, পূর্বতন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পরবর্তীকালে কাশ্মীর অভিযানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কাশ্মীরে যখন গোলযোগ শুরু হয় তখন তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনে আমাদের দূতাবাসের সামরিক সহকারী। কিন্তু সেই নিরীহ কাজ মনোমত না হওয়ায়, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার প্রার্থনা জানান। আমরা সে প্রার্থনা অনুমোদন করে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করি। এরও পূর্বে, ব্রহ্মদে শ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সক্রিয় যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।···অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই বলে অভিযোগ করা হয়েছে।···কিন্তু প্লেটুন, কোম্পানী, ব্রিগেড এবং ডিভিশন সব-কটি সামরিক সংস্থারই তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন।···এমন কতগুলি দোষারোপ করা হয়েছে, বাস্তবে যেগুলির আদৌ কোন ভিত্তি নেই।···

আমার অনিয়মিত পদোন্নতি সম্বন্ধে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে নেহ্‌রু বলেন, সংসদেই এ বিষয়ে তিনি সব কিছু পরিষ্কার করে বলেছেন। সামরিক বিভাগের উচ্চতর পদগুলিতে 'নিয়মিত'-ভাবে কোন পদোন্নতি দেওয়া হয় না। কারণ, যোগ্য-অযোগ্য নির্বিচারে পদোন্নতি দিলে সৈন্যবিভাগ কতগুলি নির্বোধের আস্তানা হয়ে দাঁড়াবে। তাই যোগ্যতার উপরেই গুরুত্ব

দেওয়া হয় সর্বাধিক ; এবং সেই ভিত্তিতেই পদোন্নতিও প্রদান করা হয়। পদটি যত উচ্চতর হয়, পরীক্ষাও হয় তত কঠিন।

ব্রিটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া ইত্যাদি দেশের সামরিক বাহিনীর উচ্চতর পদগুলিতে পদোন্নতির প্রশ্নে কেবলমাত্র চাকুরীগত প্রবীণত্বই যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। মূল লক্ষ্য রাখা হয় যোগ্যতার প্রতি। বারো জন জেনারেল সহ মোট চল্লিশ জন অফিসরকে ডিঙ্গিয়ে জেনারেল জনসন (প্রেসিডেণ্ট জনসনের কেউ নয়) আমেরিকার সামরিক প্রধান হন। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল টেলর্ ভিয়েতনামে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হ'লে, জেনারেল হুইলার তাঁর জায়গায় 'জয়েণ্ট চীফ অফ্ স্টাফে'র সভাপতি পদে নিযুক্ত হন ডজনখানেক অফিসরকে ডিঙ্গিয়ে। কিন্তু, এ দু'টির কোন ক্ষেত্রেই কেউ একটি কথাও বলেনি। কারণ পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাতিল-করার ব্যাপারটি সে সমস্ত দেশে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে করা হয়ে থাকে। (অকিনলেক এবং মাউণ্টব্যাটেনও অসংখ্য অফিসরকে ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন।) একমাত্র এই ব্যবস্থার মারফতই যোগ্য সৈনিকগণ উচ্চতর পদে আরোহণ করতে পারে। এই সত্যটি ১৯৫২ সালে ভারতের কেউ উপলব্ধি করেন নি। (তারপর থেকে অবশ্য বাতিলের ঘটনাটিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রশাসনিক উচ্চতর পদগুলিতে বাছাইয়ের ভিত্তিতেই লোক নেওয়া উচিত ; চাকুরীগত প্রবীণতার ভিত্তিতে নয়। এবং সাধারণতঃ হয়েও থাকে তাই।)

নেহ্‌রু আরও বলেন, স্থল বাহিনীর প্রধান সেনাপতির সুপারিশ অনুযায়ী তিনজন মেজর জেনারেলের একটি তালিকা থেকে কল সহ দু'জনকে পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করা হয়। তৃতীয় ব্যক্তিকেও (গ্যয়ানী) পদোন্নতি দিয়ে গাজাতে আমাদের বাহিনীর অধিনায়করূপে প্রেরণ করা হচ্ছে। (যে কারণে প্রথমে তাঁকে পদোন্নতি দেওয়া হয় নি তা' পূর্বেই উল্লেখ করেছি।) সমাপ্তিতে নেহ্‌রু বলেন :

আমাদের সৈনিকদের পারিবারিক আবাসস্থলের তীব্র অভাব ছিল ; এবং সেই সমস্যা সমাধানের অভিনব এক দায়িত্ব দেওয়া হয় কলকে :... হতভাগ্য এই সৈনিকরা বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছে কাশ্মীর অথবা নাগা ভূমির পার্বত্য প্রদেশে। কিন্তু ফিরে আসবার পর পরিবারবর্গের সঙ্গে

বাস করবার জন্য তাদের আমরা বাড়ী-ঘর কিছুই দিতে পারি নি। পারিবারিক জীবন বলতে তাদের কিছুই ছিল না।…তাই স্থির করা হয়েছিল, সৈনিকদেরই তাদের নিজেদের বাড়ী-ঘর তৈরী করে নিতে বলা হবে। জেনারেল কলের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল এই দায়িত্বভার। এ ব্যাপারে সৈনিকদের উপর কোন রকম জোর-জবরদস্তি করা হয় নি। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই প্রশংসনীয় কাজটি তারা করেছে। আজ প্রচার করা হচ্ছে, বাড়ীগুলি ভালো নয় এবং ছাদ দিয়ে জল পড়ে। এ হ'ল একটা ভিত্তিহীন প্রচার। নিজে আমি সেই সময় বাড়ীগুলি পরীক্ষা করেছিলাম।…সৈনিকদের প্রশিক্ষণ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও প্রচার করা হচ্ছে। এটাও সত্য নয়।… নিজেদের সব সময় হীন প্রতিপন্ন করবার আমাদের এই প্রয়াস দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেছি,… এতে যেন অদ্ভুত একটা আনন্দ আমরা পাই।

তিব্বত অধিকার করবার পর যে মুহূর্তে চীনারা সেখানকার অধিবাসীদের উপর নিজেদের মতবাদ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করে সেই মুহূর্ত থেকে আসতে থাকে প্রচণ্ড বাধা। অতএব দালাই লামাকে[17] লাসা থেকে পিকিং-এ সরিয়ে দিলেই তিব্বতে তাদের পরম-সত্য প্রসারের পথ নির্বিঘ্ন হবে বলে ধারণা হ'ল চীনাদের। সেই অনুসারে তিব্বতের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কথাটা তারা ইঙ্গিতে উত্থাপনও কর্ে। সঙ্গে সঙ্গে দালাই লামার অনুচরদের আশঙ্কা হয়

১৭। বর্তমান চতুর্দশ দালাই লামা’ জন্ম হয় ১৯৩৫ সালের ৬ই জুন তারিখে। চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের পূর্বে, ১১০টি দজোং অথবা জেলার উপর তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাঁর নাম হ'ল জেৎসাম্ জাম্পাল্ ন্গাওআং লব্সাং ভিশ্বে তেনজিং গিয়াৎসো শিশুন্ওয়াংগুর শুম্পা জেৎসন মাপাল্ ধেপাল্ সাংগো।

যে ভাবে তিব্বত দখল করে চীন ১৯৫১ সালের মে মাসে দালাই লামার উপর জোর করে একটি চুক্তি চাপিয়ে দেয়, তাতে নেহ্রু অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিন্তু তাঁর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। তাই অন্যদিক দিয়ে চেষ্টা করেন তিনি। তিব্বতকে স্বয়ং শাসিত অঞ্চলরূপে গণ্য করবার জন্য চীনকে অনুরোধ জানান। ১৯৫৪ সালে দিল্লীতে যখন চৌ-এন্ লাই এবং নেহ্রুর সাক্ষাৎ হয়, চৌ সেই সময় নেহ্রুর কাছে পরিষ্কার বলেন যে তিব্বত চীনের কোন প্রদেশ নয়। তিব্বত হ'ল একটি স্বয়ং শাসিত অঞ্চল; এবং তিব্বতের উপর বলপূর্বক প্রগতি চাপিয়ে দেবার, অথবা তাদের ধর্ম তথা জীবনযাত্রায় কোনরকম হস্তক্ষেপ করবার সঙ্কল্প চীনের নেই। চৌ একথাও বলেন যে তিব্বতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পঞ্চাশ বছর সময় লাগবে :

লাসায় অবস্থান করলে হয়তো জীবনও সংশয় হতে পারে তাঁর। ইতিমধ্যে লাসার চীনা সামরিক অধিনায়ক দালাই লামাকে 'নিমন্ত্রণ' করেন। রক্ষীদল ছাড়াই তাঁকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসতে বলা হয়। ব্যাপারটিতে আরও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন দালাই লামার শুভাকাঙ্ক্ষীরা। তাঁদের দৃঢ় আশঙ্কা হয়, দালাই লামাকে জোর করে পিকিং-এ নিয়ে যাবার চক্রান্ত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গোপন একটি পরামর্শ সভায় স্থির হয় অবিলম্বে লাসা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়াই দালাই লামার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, কার্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। প্রথমতঃ ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অনুচর-বর্গসহ যাবার সময় বহুদূর থেকেই সীমান্তের চীনা প্রহরীদের নজরে পড়ে যাবে দলটি। এবং সর্বশেষে, যাত্রাটি হবে একটি অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রমের ব্যাপার।

তবু, ১৯৫৯ সালের এক ভোর রাতে পরিজনবর্গ এবং শ' খানেক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লাসা ত্যাগ করলেন দালাই লামা। সম্ভাব্য অনুসরণকারী চীনা সৈন্যদের বাধা দেবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র একদল তিব্বতী সৈন্য পিছনে রয়ে গেল। চীনারা এদের আক্রমণ করে; কিন্তু দালাই লামা নিরাপদ দূরত্বে চলে না যাওয়া অবধি চীনাদের বাধা দিয়ে রাখে তারা। (দালাই লামা যখন পলায়ন করেন, লাসায় তখন পঞ্চাশ হাজার চীনা সৈন্য ছিল।) এইভাবে দালাই লামা সদলে নিফার ছোঠাং মো'র পথে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে ভারতে উপস্থিত হলেন।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে চীনারা ক্রুদ্ধ হয়েছিল। এইবার তারা সুসম্বদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করল তিব্বত থেকে দালাই লামার সমস্ত প্রভাব মুছে ফেলে নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কাজে। একাধিক শিক্ষায়তন আগেই তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল এখানে। ছাত্রদের এবার নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল, সঙ্কট মুহূর্তে দালাই লামা তাদের ফেলে পলায়ন করেছেন। প্রকৃতই যদি তিনি ঈশ্বরের অবতার হন, তা' হলে ভয় পেয়ে পলায়ন করবেন কেন? সেই সঙ্গে ব্যাপক প্রচার কার্য শুরু হ'ল তিব্বতীদের মধ্যে: চীন একটি মহান দেশ, 'সেখানে সকালের জন্য রয়েছে সমান সুযোগ-সুবিধা'; নিজের স্বার্থেই চীনের সঙ্গে তিব্বতের যোগদান করা উচিত; একমাত্র প্রজাতন্ত্রী চীনই তিব্বতের মঙ্গল সাধন করতে পারে, দালাই লামা নন।

পরিচিত গিরিপথগুলি বন্ধ করে দিয়ে চীনারা সে সমস্ত স্থানে কড়া পাহারা বসিয়েছিল। এদিকে হাজারে হাজারে তিব্বতী শরণার্থী রওনা হ'ল ভারতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য। চীনা প্রহরীদের নজর এড়াবার উদ্দেশ্যে দুর্গমতম গিরিপথ ধরলো তারা। চলাফেরা করতো রাতের দিকে। অন্ধকারে পথ-ঘাট চেনা হয়ে পড়ত দুঃসাধ্য। তার উপর কোন মানচিত্রও ছিল না তাদের কাছে। নদীর রেখাই ছিল পথ চেনবার একমাত্র উপায়। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করে, সেই প্রচণ্ড শীতে কোমর অবধি বরফের ভিতর দিয়ে হেঁটে, অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে নিফার বিভিন্ন স্থান দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলো। লং-জু এবং অন্যান্য স্থান দিয়ে যারা এসেছিল তাদের তিব্বতে ফেরত পাঠাবার জন্য আমাদের অনুরোধ করলো চীন। তাদের বক্তব্য ছিল এই শরণার্থীদের অধিকাংশই খাম্পা। আমরা জবাব দিলাম, ভারতের কাছে তারা আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। অতএব 'ফেরত' পাঠাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই চীনারা লং-জু'র কাছে আমাদের সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে। সংসদের ভিতরে এবং বাইরে এ নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নেহ্‌রুকে। লং-জু সম্বন্ধে নেহ্‌রু আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন এই সময়। কিন্তু ব্যক্তিগত কোন ধারণা না থাকার দরুন বিশেষ কিছুই বলতে পারলাম না। তাই নিজে সেখানে গিয়ে সব দেখে শুনে একটা বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে আসবার প্রস্তাব করলাম। সানন্দে সম্মতি দিলেন নেহ্‌রু। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে বিপুল সংখ্যক তিব্বতী ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করাতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সে কথা বললেন আমায়। লং-জু পরিদর্শন ছাড়াও, মিশামারিতে তিব্বতী শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য কি করা যেতে পারে তাও চিন্তা করে দেখতে বললেন।

প্রশাসনিক কারণে এই সুযোগে নিফা এবং নাগাভূমিও পরিদর্শন করতে মনস্থ করলাম। কোয়ার্টারমাস্টার জেনারল হিসাবে এটা আমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। পরদিনই প্রয়োজনীয় অনুমতি নিলাম থিমায়ার কাছ থেকে। লং-জু'র বিপজ্জনক পথ এবং সাধারণভাবে উক্ত অঞ্চলের দুর্গমতা সম্বন্ধে অনেক কল্পিত বিবরণই এর আগে শুনেছিলাম। স্বচক্ষে সেগুলি যাচাই করবার একটা সুযোগ এসে গেল।

দিল্লী থেকে বিমান যোগে রওনা হয়ে মিশামারি পৌঁছে তিব্বতী শরণার্থী

শিবিরটি প্রথমে পরিদর্শন করলাম। শিবিরে সে সময় একজন 'কশগ'-সহ (তিব্বত সরকারের মন্ত্রী) ১৪০ জন স্ত্রীলোক এবং ৩০০০ পুরুষ আশ্রয় নিয়েছিল। শুনলাম অসম্মানজনক মনে করে প্রথম দিকে কোন রকম কাজ-কর্মই করতে রাজী হয় নি তারা। পরে অবশ্য অবস্থার সঙ্গে নিজেদের থাপ খাইয়ে নেয়।

তিব্বতের অধিবাসীরা সাধারণতঃ সবল, স্বাস্থ্যবান, সরল প্রকৃতির এবং অতিশয় সম্মানী। জিহ্বা বার করে তারা অভিবাদন জানায়। পায়ে হেঁটে সারাদিনে যতদূর যাওয়া যায়, তাই দিয়ে দূরত্বের হিসাব করে। দিক নির্ণয় করে সূর্যের ছায়া দিয়ে।

বারো হাজারের মতো তিব্বতী নিজেদের ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই চীনাদের কর্তৃত্ব পছন্দ করে নি; অনেকের উপর আবার করা হয়েছিল কঠোর নির্যাতন। প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র পেলে আরও বহু তিব্বতী চীনা প্রহরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পথ করে নিয়ে ভারতে প্রবেশ করতো।

মিশামারির তিব্বতী শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের পর নাগাভূমিতে উপস্থিত হলাম। ৬,৬০০ বর্গমাইল আয়তনের এই অঙ্গরাজ্যটি কোহিমা, মোকোকচং এবং তুয়েন্ সাং—এই তিনটি জেলায় বিভক্ত। একাধিক উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত এই অঞ্চলটির মোট জন সংখ্যা সাড়ে চার লক্ষের মতো; এবং প্রধান উপজাতি হল আও, অংগামি, লোথা, কোন্যাক এবং সেমা। দৈহিক তথা নৈতিক বলে বলীয়ান এই সমস্ত উপজাতীয়দের প্রধান পেশা হল চাষ-বাস। নিজস্ব আইন কানুন রয়েছে এদের। ঋতুর সঙ্গে তারা আনন্দ-উৎসব পালন করে। অধিকাংশই বিশ্বাস করে ভূত-প্রেত ইত্যাদিতে এবং পূজা করে পিতৃ-পুরুষের। কোহিমা এবং মোকোকচং-এর ত্রিশ ভাগ উপজাতীয়ই হ'ল খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত।

অতীতে নাগারা কখনও কারও কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে নি। দেশ বিভাগের পর তাই স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে অভিহত হতে তারা আপত্তি করে এবং ক্রমশঃ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। উন্নতির জন্য যা' কিছু করা হয় তাতেই আসতে থাকে প্রচণ্ড বাধা। বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয়, এবং স্বাধীন নাগাভূমির দাবী ওঠে। শিক্ষিত নাগা সম্প্রদায় অবশ্য বহুদিন ধরেই স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছিলেন।

১৯২৯ সালে স্যার জন সাইমনের কাছে তাঁরা নাগাভূমির স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন ; এবং গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করেছিলেন এই নিয়ে।

ভারতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের নেতা ফিজো ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একজন সুবেদার। সেই সময়েই তিনি গেরিলা যুদ্ধ-কৌশল আয়ত্ব করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা প্রচারে নাগাদের প্ররোচিত করেন। অমনি তুয়েন সাং জেলায় শুরু হয়ে যায় অশান্তি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নাগারাও যে স্বাধীন হয়েছে এই সাদা কথাটি কিছুতেই তাদের বোঝানো গেল না। বরং হিংস্রতা আরও তীব্র হ'ল। অগত্যা ১৯৫৬ সালে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হলাম। জানতাম, নাগারা আমাদের শত্রু বলতে যা' বোঝায় তা' নয়। তারা হ'ল আমাদেরই বিপথে-চালিত দেশবাসী ; এবং আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতেই হবে তাদের।

১৯৫৭ সালে প্রথম নাগা সম্মেলনে উপজাতীয় প্রতিনিধিদের ভোট গ্রহণ করা হয়, এবং অধিকাংশই ভারতের সঙ্গে থাকার স্বপক্ষে ভোট দেন। দ্বিতীয় আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে। এই সম্মেলনেও সমস্ত উপজাতীয় প্রতিনিধিগণ সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের একটি অংশরূপে গণ্য হবার অনুকূলেই মতামত প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় সম্মেলনটির কয়েকদিন পরেই আমি কোহিমায় উপস্থিত হই। সেখানকার সামরিক তথা অসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করি। তারপর যাই কোহিমার বিখ্যাত সমাধি স্থানটি দেখতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে শহরটিকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সমাধিগুলির উপর আবেগপূর্ণ ভাষায় সমস্ত লিপি উৎকীর্ণ করা রয়েছে এখানে।

কোহিমা থেকে উপস্থিত হলাম মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফলে। ছবির মতো সুন্দর এই শহরটি ; এখানে মনে হয় যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল সঙ্গীত এবং নৃত্য। মনোরম পর্বতশ্রেণী এবং হ্রদ-শোভিত প্রকৃতির এই রঙ্গমঞ্চে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত সুন্দরীদের রঙ্গীন পোষাকে নৃত্য দর্শকদের দুর্নিবার আকর্ষণ করে।

মোকোকচং এবং তুয়েনসাং-ও পরিদর্শন করলাম। মোকোকচং-এর অবস্থান হ'ল একটি পর্বতশীর্ষের উপর। স্থানটি মেঘাবৃত থাকার দরুন আমাদের

হেলিকপ্‌টার প্রথমে কোন অবতরণ ক্ষেত্রই খুঁজে পেল না। বাধ্য হয়ে একটি নালা-গর্ভে অবতরণ করতে হ'ল। ঘাস পানি নামক একটি স্থান এবং বৈরী নাগাদের গ্রাম কিদিমা ও চাকাবামাও পরিদর্শন করলাম।

এখানকার সমস্যাটি হ'ল মূলতঃ রাজনৈতিক। সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা এ সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভবপর কি না সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগে নাগাভূমি পরিদর্শনের পরই। নাগাভূমি সম্বন্ধে আমাদের নীতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই; অবশ্য সেই নীতিকে যদি আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যকরী করা হয় তবেই। অনেকে নাগাদের বিরুদ্ধে নানা রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। সেটা অবশ্য আমরা করতে পারি। তাদের অনাহারে রাখতে পারি, গ্রামগুলিকে বিচ্ছিন্ন[১৮] অথবা অবরোধ করে রাখতে পারি, শস্যাদি বিনষ্ট করে দিতে পারি, এমন কি জেনারেল রবার্টের 'দেখা মাত্রই গুলি করা'র নীতিও অনুসরণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হবে না। আমাদের প্রতি তাদের শত্রুতা দূরীভূত হবার পরিবর্তে চিরস্থায়ীই হবে শুধু। কেবল তাই নয়, সাহসী এবং তীব্র আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন এই লোকগুলিকে জোর করে শাসনাধীনে রাখলে আমাদের সীমান্তে আরও একটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হবে। পৃথিবীর এই অংশে আমাদের ভবিষ্যৎ-শত্রুদের চিরস্থায়ী সহযোগী হয়ে উঠবে এই সমস্ত উপজাতীয় লোকগুলি। অতএব অবস্থার উন্নতি করবার একমাত্র পন্থা হ'ল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সম্মত করানো। কারণ, শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কখনই বিশ্বস্ত নাগরিক সৃষ্টি হয় না।

নাগাভূমি থেকে গেলাম নিফায়। পঁচিশ হাজার বর্গমাইল আয়তনের এবং পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যার এই অঞ্চলটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ভূটান, তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশ। অনেকাংশেই নাগাভূমির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে অঞ্চলটির। নদীর নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে এর পাঁচটি জেলার: কামেং, সুবণশিরি, সিয়াং, লোহিত এবং তিরাপ।

এখানকার গ্রামগুলির দেখাশুনার ভার থাকে গাম্‌-এর উপর। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই 'গাম্‌' নির্বাচিত হন এবং বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারী না

১৮। অনুপ্রবেশ রোধ করবার জন্য গ্রামগুলিকে একাধিক ভাগে ভাগ করে ব্যূহ নির্মাণ-পূর্বক সেই ভাগগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা।

হলেও, সরকার কর্তৃক তাঁরা অনুমোদিত। সরকার থেকে তাঁদের কর্তৃত্ব-সূচক একটি সার্টিফিকেট এবং লাল কোট দেওয়া হয়। গ্রামগুলির প্রশাসনিক দায়িত্ব আবার অর্পিত থাকে 'কেবাং'-এর (পরিষৎ) উপর।

নিফার অধিবাসীরা সুখী, সাদাসিদা, সরল এবং সৎ প্রকৃতির। নিজেদের কথ্য ভাষার প্রতি তাদের অগাধ মমত্ব (যেটা আমাদের অধিকাংশ সভ্য মানুষেরই নেই)। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং উপজাতীয়সুলভ বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তীব্র সচেতন এই মানুষগুলি তাদের বাসভূমি এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি সামান্যতম হস্তক্ষেপও সহ্য করে না।

লংকা এবং লবণ সহযোগে ভাতই হ'ল এদের প্রধান খাদ্য। তার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে থাকে পোড়া মাছ এবং সব্জী হিসাবে ভক্ষণ-যোগ্য গাছের মূল অথবা বাঁশের অঙ্কুর। মাংস কিংবা দুধ থাকে কদাচিৎ। পূজা-আর্চায় দরকার হয় বলে খাবার জন্য মুরগী অথবা ডিম পাওয়া যায় না বললেই চলে। চাল এবং ভুট্টা থেকে প্রস্তুত মদ পান করা হয়। গোষ্ঠী-নৃত্যের প্রচলন রয়েছে এদের মধ্যে। একজন দলপতি দাঁড়িয়ে গানের ধুয়া ধরে, আর তাকে ঘিরে সমবেতভাবে গান করে নারী ও পুরুষের দল। বনজ-সম্পদ এবং নদীর উপর নিজেদের উপজাতীয় অধিকার সম্বন্ধে এরা অত্যন্ত সচেতন। সূর্য-চন্দ্র (দোনি পাল্লো) দেবতাকে এরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে।

আকাশ পথে ওয়ালং যাত্রা করলাম। নামবার সময় বিপজ্জনকভাবে অবতরণ করতে হ'ল। (তখন কি জানতাম, বছর দু'য়েক পরে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আবার আমায় এখানে আসতে হবে।) যাই হোক, ওয়ালং পৌঁছুতেই নিফার প্রথা অনুসারে স্থানীয় অধিবাসীগণ আমাকে একখানি স্কার্ফ উপহার দিল। সেখান থেকে গেলাম ডিগবয়, তুতিং এবং মাচুকা। আলং পৌঁছে দেখা হ'ল হলদিপুরের পলিটিকাল অফিসরের সঙ্গে। চমৎকার লোক ছিলেন অফিসরটি। আমাদের বিমানটির তেল কমে এসেছিল। কিন্তু তেল ভরবার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। অথচ সেই দিনই আমাদের জোরো পৌঁছুবার কথা। এই অবস্থায় পলিটিকাল অফিসরটির উদ্ভাবন দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কোনরকমে কাজ চালাবার জন্য তিনি এবং তাঁর সহকারী ডি'সিলভা প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত উপকরণ জোগাড় করে ফেললেন। কর্মীদের সঙ্গে নিজেরাও হাত লাগিয়ে ভারী ভারী পিপাগুলি তুলে এনে তাই

থেকে মুখ দিয়ে তেল টেনে তুলে ফেলতে লাগলেন বিমানের তৈলাধারে। এমন আদর্শ কর্মী সচরাচর দেখা যায় না।

এ অঞ্চলে সূর্যাস্ত হয় খুব তাড়াতাড়ি। আমাদের দেরী হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তাই আমাদের বিমান-চালক ফ্লাইট লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জগজিৎ সিং সেদিনের মতো আলং-এই থেকে পরের দিন জেরো যাত্রার প্রস্তাব করলেন। আমি কিন্তু নির্ধারিত সময়সূচী পরিবর্তনের পক্ষপাতী নই। তাই সেই অপরাহ্ণেই যাত্রার জন্য জেদ ধরলাম।

বিমানটি আকাশে উঠতেই মুখোমুখি সূর্য পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিল বিমান চালকের। সঙ্গের মানচিত্রটিও সঠিক ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মনে হ'ল পথ ভুল হয়ে গেছে। অগত্যা দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে গন্তব্যস্থল খোঁজবার জন্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমরা। ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম অবিলম্বে জেরো খুঁজে না পেলে সমূহ বিপদ হবে। অন্ধকার গভীর হবার পর অবতরণের চেষ্টা করলেই অন্ধ বাদুড়ের মতো বিমানখানা আছড়ে পড়বে কঠিন পাহাড়ের গায়ে। আলং ফিরে যাবার মতোও সময় কিংবা তেল কোনটাই ছিল না। নিরুপায় হয়ে আবছা আলোর মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এমন সময় ঘন জঙ্গলের মধ্যে নজরে পড়ল একখণ্ড সমতল ভূমি। ভগবানের নাম নিয়ে অবতরণ করা হ'ল সেইখানেই। আশ্চর্যের কথা, সেইটাই ছিল আমাদের গন্তব্যস্থল জেরো। বিমান চালকের সাহস এবং দক্ষতার জন্যই আমাদের জীবন রক্ষা হ'ল সেদিন।

লং-জুর অদূরস্থিত মাজা যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ দেবার পূর্বে, কীভাবে সেই বছরেরই প্রথম দিকে লং-জুতে আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করা হয়, এবং কীভাবেই বা লং-জু ত্যাগ করে মাজাতে পিছিয়ে আসতে হয় সেই কথা বলবো।

লং-জু আসলে আমাদেরই জায়গা; কিন্তু চীনারা সেটাকে দাবী করতে থাকে নিজেদের বলে। তাই সেখানে একটি ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্যাপ্‌টেন অধিকারীর অধীনে আসাম রাইফেল্‌স্‌-এর ছোট একটি দলকে প্রেরণ করা হয়। দাপোরিজোতে জনৈক পলিটিকাল অফিসরের কাছে জানতে পারি, লং-জু যাত্রার সময় অধিকারীকে একটি লাল কোট দিয়ে বলা হয় সেখানকার কোন প্রবীণ গ্রামবাসীকে 'গাঁও-বড়া' (গ্রামের মোড়ল) নিযুক্ত করে আমাদের কর্তৃত্বসূচক লাল কোটটি যেন তাকে দেওয়া হয়।

পরবর্তী ঘটনা শুনি জোরহাটে জমাদার লিম্‌বুর কাছে। (কিছুদিন পূর্বে লং-জুর যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।) নির্দেশ মতো ক্যাপ্‌টেন অধিকারী লং-জুতে উপস্থিত হয়ে একজন 'গাঁও-বড়া' নিযুক্ত করেন এবং লাল কোটটি তাকে উপহার দেন। তারপর একটি পরিদর্শক দল প্রেরণ করেন পারিপার্শ্বিক অঞ্চল পরীক্ষা করে দেখার জন্য। চীনারা যথা সময়ে এ ঘটনার কথা জানতে পারে। লং-জুর অদূরে মিগিত্থুন্‌-এ তাদেরও একটি পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি ছিল। আমাদের পর্যবেক্ষক দলটিকে দেখে অকারণেই তারা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে; এবং লং-জুর আশে-পাশে নিজেদের পর্যবেক্ষণ তৎপরতা বৃদ্ধি করে। তাদের দেখাদেখি আমরাও নিজেদের তৎপরতা তীব্রতর করি। তারপর অকস্মাৎ একদিন বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্য আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে লং-জু অধিকার করে নেয়। এ ঘটনা ঘটল ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে।

ইতিমধ্যে অধিকারী অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্‌ রোগে আক্রান্ত হলেন। অতএব তাঁকে অপসারণ করে সে জায়গায় ক্যাপ্‌টেন মিত্রকে পাঠানো হ'ল লং-জু পুনরাধিকারের একটা অবাস্তব আদেশ দিয়ে। অকুতোভয় ক্যাপ্‌টেন মিত্র অবশ্য লং-জুর পরিবর্তে ছয় মাইল দক্ষিণে মাজাতে একটি ঘাঁটি স্থাপন করলেন। (মাজা থেকে লং-জুর সোজাসুজি দূরত্ব হবে তিন মাইলের কিছু কম।)

একখানি হেলিকপ্‌টার নিয়ে জেরো থেকে প্রথমে দাপোরিজো, তারপর লাইম্‌-কিংএ উপস্থিত হলাম। শুনেছিলাম এই যাত্রাটুকু নাকি ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু দেখলাম, সে সমস্ত কিছু নয়। দু'টি সু-উচ্চ পর্বতমালার মধ্যে সুবণশিরি নদীর তীরে অবস্থিত লাইম্‌-কিং হ'ল সভ্য জগৎ থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন একটি স্থান।

লাইম্‌-কিং এর পর থেকে দেখলাম একমাত্র পদযুগলের উপর নির্ভর করা ছাড়া যাতায়াতের অন্য কোন উপায় নেই। অগত্যা পদব্রজেই রওনা হলাম। আমার ভারবাহকেরা এবং পথপ্রদর্শক তাও সবাই ছিল থাগিন। টানা-টানা চোখ, সরল এবং সৎ এই লোকগুলি সাধারণতঃ খুব হাসিখুশী মেজাজের হয়। ধর্ম বিশ্বাসে এরা ভয়ানক কুসংস্কারাচ্ছন্ন; এবং এদের কোন দেবতা নেই। পূজা করে রোজাদের। সাপ মারে না কখনও; এমন কি সর্প দংশনের চিকিৎসাও করে না। আমার পথ-প্রদর্শক তাও ছিল সুদর্শন, কর্মঠ, চটপটে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; হিন্দুস্থানী খুব ভালো বলতে পারতো. এবং নিফা অঞ্চলের

বিবরণ ছিল তার নখাগ্রে। দুর্গম পাহাড়ী পথে চলাফেরা করতে ওস্তাদ এই লোকটির কাছে পাহাড়ে চড়া ছিল একটুকরো মিষ্টি খাওয়ার মতো সহজ। বুঝতেই পারতো না সমতলের লোকেরা পর্বতারোহণে এত ভয় পায় কেন।

লাইম্-কিং এ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অপরাহ্ণের দিকে ব্রিগেডিয়ার গুরায়া এবং ক্যাপ্টেন মিত্রকে সঙ্গে করে সেই দুর্গম পথে পা বাড়ালাম। সঙ্গী হিসাবে দু'জনেই ছিলেন চমৎকার। লং-জুর সন্নিকটস্থ পার্বত্য অঞ্চলে এর আগে কখনও কোন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী পদার্পণ করেন নি।

সরু পায়ে চলা পথ ধরে ক্রমশঃ আমরা নেমে এলাম একটা নদীর কাছে। টুকরো টুকরো কাঠ বেঁধে তৈরী করা ঝুলন্ত সেতুটি পার হয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা তিনেক কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার ঠিক পরেই উপস্থিত হলাম প্রথম বিশ্রাম স্থলে। হাত-পা সমস্ত ব্যথা করছিল। আকণ্ঠ পিপাসায় গলা গিয়েছিল কাঠ হয়ে। সারারাত বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু হ'ল।

পথ এবার হয়ে উঠল আরও দুর্গম। কখনও অসংখ্য নুড়ি ভর্তি শুষ্ক নদী-গর্ভ, কখনও বা বৃহদাকার শিলাস্তূপের মধ্য দিয়ে কোন রকমে এগিয়ে চললাম আমরা। মাথার উপর জঙ্গলও ঘন হয়ে উঠল আরও। নীচে নিবিড় ঝোপ-ঝাড়। অসংখ্য চড়াই উতরাই এবং খাড়া পাথরের উপর দিয়ে সিঁড়ির মতো উঠতে হ'ল। ক্রমাগত ব্যবহারে শিথিল পাথরগুলি যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে। যা আশঙ্কা করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত হ'লও তাই। বেতার যন্ত্রটি নিয়ে একজন ভারবাহক একটা পাথরের উপর থেকে পা ফস্‌কে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে নদীগর্ভে বালির মধ্যে গিয়ে পড়ল। সৌভাগ্যবশতঃ সামান্য কয়েক জায়গায় কেটে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নি তার। বহুস্থানে পথের কোন চিহ্নই পেলাম না। পাহাড়ের গায়ে লতার উপর ভর করে আর ঝোপ-ঝাড় কিংবা গাছের শিকড় ধরে প্রাণ হাতে নিয়ে সে সমস্ত স্থান পার হতে হ'ল।

এ অঞ্চলে ঝুলন্ত সেতুর অভাব নেই। প্রথমটি পার হবার সময় সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। বাঁশের তৈরী পুল প্রতি পদক্ষেপে এমনভাবে দুলছিল যেন আমাদের নীচে ফেলে দেবে। কিন্তু কয়েকটি পার হবার পর কায়দাটা রপ্ত হয়ে গেল। বরং দেখলাম পিছল কাঠের পুল পার হওয়া আরও সাংঘাতিক ব্যাপার। কাঠ বলতে কয়েকটি গাছের গুঁড়ি পাহাড়ের খাঁজে অথবা নদীর উপর আড়া-আড়ি ভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নীচে গভীর

খাদ। যে কোন মুহূর্তে গুঁড়িগুলি সরে যেতে পারে। ছ'টি গুঁড়ির মধ্যে হাঁ-করা জায়গাগুলির দিকে চোখ পড়লেই শরীরের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। একবার পা ফসকালেই জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কের সেখানেই সমাপ্তি। একাধিকবার আমি হোঁচট খেলাম; কারণ সারকাসের খেলোয়াড়দের মতো দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার কৌশল আমি জানি না। তাই গুঁড়িগুলির উপর দিয়ে যাবার সময় ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছিলাম না। কিন্তু প্রতিবারই তাও আমার সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। কখনও আমার পা রাখবার জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে, কখনও বা ঠিক পা ফসকাবার মুহূর্তে আমার হাত কিংবা পা ধরে ফেলে রক্ষা করলো নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। তারপর রুক্ষ-শুষ্ক খানিকটা স্থান অতিক্রম করে ট্সারিচু নদীর সাক্ষাৎ পেলাম। নদীটি তিব্বত থেকে নির্গত হয়ে সুবণশিরি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আমাদের প্রতিদিনের কার্যতালিকা ছিল ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা খেয়ে ছ'টা নাগাদ যাত্রা শুরু করা। ঘণ্টা আড়াই হাঁটবার পর প্রাতরাশের জন্য থামা হ'ত। দ্বিপ্রহরের খাবার থাকতো আমাদের হ্যাভারস্যাকের মধ্যে। প্রাতরাশের সঙ্গেই পাচক সেগুলিকেও প্রস্তুত করে নিত। তারপর আবার আরম্ভ হ'ত ঘণ্টা তিনেক ধরে এক নাগাড়ে পথ চলা। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য প্রায় একঘণ্টা বাদ দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করতাম। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামস্থল চোখে পড়লেই অজান্তেই বেরিয়ে আসতো স্বস্তির নিঃশ্বাস। এ অঞ্চলে সূর্যাস্ত হয় অনেক আগে। আমরাও যাত্রা বন্ধ করতাম সাড়ে চারটে নাগাদ। ভার-বাহকেরা বাঁশ এবং ঝোপ-ঝাড় কেটে এনে তাই দিয়ে কোন রকমে একটা খুপরি মতো তৈরী করে উপরে তিরপল চাপিয়ে রাতের আস্তানা তৈরী করতো। শুকনো ঘাস বিছিয়ে হতো আমাদের শয্যা। রাতের আহার শেষ হয়ে যেত সাতটা নাগাদ। অতঃপর, পরবর্তী দিনের কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়ে খানিকটা গল্পগুজব করে কেরোসিন-বাতি নিভিয়ে দেওয়া হ'ত। শুয়ে পড়তাম সবাই। কিন্তু খরস্রোতা নদীর একটানা তীব্র গর্জনের জন্য সারারাত ঘুম হ'ত না আমার। সেই শব্দের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করতাম। এমন কি কানের মধ্যে তুলো গুঁজে দিয়েও চেষ্টা করেছি একটু ঘুমোবার। তার উপর

ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তুষার রেখার যত নিকটবর্তী হচ্ছিলাম, শীতের তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জোঁক, বোলতা, মৌমাছি আর সাপে ভর্তি পথ ধরে এই ভাবে আমরা চলেছি, কখন্ যে জোঁক লেগে যেত বুঝতাম না। বেশ খানিকটা রক্ত শুষে নেবার পর খেয়াল হ'ত। লবণ কিংবা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে তখন ছাড়াতাম সেগুলোকে; এই দু'টি বস্তুই তাদের উপর বিষবৎ কাজ করে। গাছ এবং ঝোপ-ঝাড় থেকে সাপ ঝুলে থাকতো। কতবার তাদের ছোবল থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। সারা-দিন ধরে কানে আসতো নানা রকমের জংলী পাখীর ডাক। বিভিন্ন রকমের শিকারও চোখে পড়ত। বুনো শুয়োর দেখলেই থাগিনরা যেন মেতে উঠত শিকারের হিংস্রতায়।

উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতি সন্ধ্যায় বেতার মারফত নিজেদের অবস্থান জানাতাম। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরেও বেতার মারফত কোন সংবাদ না দিলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের সেই অশুভ নিস্তব্ধতাকে লক্ষ্যই করবেন না; খোঁজ খবর করা তো দূরের কথা। কিন্তু গুরায়া কিছুতেই আমার কথা মানলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের খোঁজ খবর করা হবেই। এই নিয়ে এক টাকার বাজি ধরলাম তাঁর সঙ্গে। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে বেতারে কোন সংবাদাদি দিলাম না আমাদের; এবং সত্যি সত্যিই কারও এতটুকু মাথাব্যথা হ'ল না আমাদের সংবাদ না পেয়ে।

যাই হোক, এই ছিল আমাদের প্রতিদিনকার কাজ। বিপজ্জনক ঝুলন্ত সেতু অথবা কাঠের পুল পার হবার সময়, কিংবা মাঝে মাঝে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঢালু পথে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠবার সময় বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকতো। মনে হ'ত ভিতরের সব কিছু যেন বাইরে বেরিয়ে আসছে। উপরে উঠতাম, আবার নীচে নামতাম শুধু পুনরায় উপরে ওঠবার জন্য। এ যেন ছিল সাপ-সিঁড়ি খেলার মতো। মাথা থেকে শুরু করে সারা শরীর ব্যথায় অবশ হয়ে পড়ত। দম নেবার জন্যে হাঁফাতে থাকতাম। প্রতিজ্ঞা করতাম এ ধরনের কাজে আর কোন দিন নয়। (এ প্রতিজ্ঞা কতবার করেছি; তবু বিভিন্ন অভিযানে বারংবার ছুটে গেছি সেই ভয়ঙ্কর উচ্চতায়।) আমার সহকর্মীদের মধ্যে একজনও তথাকথিত 'সুদক্ষ' সৈনিক এ ধরনের কাজে আজ অবধি হাত দেন নি।

এ ধরনের পথ চলাতে কোন উত্তেজনা নেই। নেই খবরের কাগজ, চিঠিপত্র, টেলিফোন, সভা-সমিতি কিংবা জটিল কোন সমস্যা। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অনেক বড় বড় ব্যাপারকেই ক্ষুদ্র এবং হাস্যকর মনে হয়। পক্ষান্তরে দড়ি, ছড়ি এবং জলের মতো ছোট তথা সামান্য জিনিসকে মনে হয় অনেক বড়, অনেক মূল্যবান। যে কোন খাবারই মনে হয় অমৃতের মত। সঙ্গে আমাদের কোন চিকিৎসক ছিল না। সামান্য যে কয়েকটি ঔষধ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সর্ব-রোগ-হর।

নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে কত স্মৃতিই মনে জাগত! এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে একমাত্র আত্মশ্লাঘাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের। জানতাম, অনেকেই আমাদের উপর নজর রেখেছে। তাই সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেও হাসিমুখে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেছি শুধুমাত্র একটা আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে।

এই ভাবে চতুর্থ দিনে বেলা একটা নাগাদ মাজা পৌছুলাম। জায়গাটির অবস্থান হ'ল চারপাশে সু-উচ্চ পর্বত বেষ্টিত গামলার আকারের একটি স্থানে। প্রধান দলটি সেনানায়কের সঙ্গে নদীর ধারে ঘাঁটি করেছিল। সেনানায়কের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, আশে-পাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি একেবারেই উদাসীন। আরও লক্ষ্য করলাম, অবস্থার যে সমস্ত বিবরণ তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেছেন তার একটিও পুরোপুরি সঠিক নয়। নিশ্চয়ই সেগুলি কর্তৃপক্ষকে ভুল পথে চালিত করেছে। সেনানায়কটির বিশ্বাস ছিল তাঁর বিবরণের সত্যতা কোন দিনই যাচাই হবে না। কারণ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কেউ আজ অবধি মাজা পরিদর্শন করতে আসেন নি। এ ছাড়া, তাঁর স্বভাবও খুব একটা সংযত ছিল না।

রসদ এবং চিঠিপত্র এখানে পাঠানো হ'ত একমাত্র বিমান থেকে নিক্ষেপ করে। তা'ও আবহাওয়া ভালো থাকলে; এবং সেটাও ছিল দুর্লভ। আমাদের লোকজনদের পক্ষে এখানে থাকাটা সত্যিই ছিল একটা কঠিন পরীক্ষার মতো। বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে অবশ্য কয়েকজন বহুদিন ধরে ছুটি না পাওয়ার এবং দু'একজন বাকী বেতন আটকে থাকার অভিযোগ করে। সঙ্গে কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিলাম। জন দু'য়েকের অবিলম্বে ছুটির আদেশ দিলাম (যাতে

পরের দিন আমাদের সঙ্গেই তাঁরা রওনা হতে পারে)। ব্যবস্থা দু'টিতে বাকী লোকগুলির মনোবলের উপর অদ্ভুত প্রভাব পড়লো।

মাজা পৌঁছে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চারপাশ ভালো করে দেখার উদ্দেশ্যে সুবিধাজনক একটি স্থানে আরোহণ করলাম। শৈল শিরার আড়ালে পড়বার দরুন লং-জু দেখা গেল না এখান থেকে। শুনলাম, নিজেদের ঘাঁটি অবধি মোটর চলাচলযোগ্য পথ তৈরী করে নিয়েছে চীনারা। লং-জুর অদূরেই হ'ল মিগ্যাইথুন্। থাগিনরা এ স্থানকে বলে হোলু। মিগ্যাইথুন্ থেকে লং-জুর মধ্যে পর পর পড়ে চিক্‌চর্, তোম্‌জে, স্থলা, লাডো এবং নাম্‌ড্ জং।

মাজার এই সেনানায়কটিকে অবিলম্বে বদলির আদেশ দিলাম কারণ এখানকার দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে আমি তাঁর যোগ্যতায় সন্দিহান ছিলাম।

সার্থক যাত্রা শেষে এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। এখানে পৌঁছেছিলাম ১৯৫৯ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে একটি গাছের গুঁড়িতে তারিখটি খোদাই করে দিলাম। তারপর ফিরে এলাম লাইম্-কিং এবং মিশামারিতে। প্রথম পর্যায়ে সময়াভাবে বম্‌ডি-লা অবধি রাতেই চলতে হ'ল। প্রবল বারিপাতের দরুন ধ্বস নামায় পথটিতে যান-বাহন চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতএব যাত্রার শেষ পর্যায়ে বেশ কয়েক মাইল অবশিষ্ট পাহাড়ী-পথ ভোর রাতে পদব্রজেই অতিক্রম করলাম। তারপর আসামের রাজধানী শিলং[১৯] হয়ে বিমান যোগে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে থিমায়া এবং নেহ্‌রুর কাছে নাগাভূমি ও নিফা পরিদর্শনের বিবরণ দাখিল করলাম। যাওয়া-আসা মিলিয়ে আমার প্রায় তিন সপ্তাহ মতো সময় লেগেছিল।

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফিল্ড মার্শাল মণ্ট্‌গোমারি দিল্লী পরিদর্শনে আগমন করেন, এবং দিল্লী গ্যারিসনের অফিসরদের সম্মুখে আকর্ষণীয় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: 'শীঘ্রই চীন পরিদর্শনে যাবার আশা করছি আমি, এবং এ ব্যাপারে মাও-কে চিঠিও দিয়েছি। অনুরোধ করেছি, শুক্রবারের মধ্যে তিনি যেন আমাকে তাঁর জবাব দেন'; (মাও যেন তাঁর অধীনস্থ একজন সেনানায়ক)। আরও বললেন, 'রাজনীতির

১৯। এর পূর্বে চেরাপুঞ্জীতেও যাই। এখানকার বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ হ'ল ৪২৬ ইঞ্চি এবং পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক বারিপাত এখানেই হয়।

সফলতা হ'ল ভোটে, এবং সৈনিক বৃত্তির সফলতা হ'ল সাফল্য লাভে'। তাঁর সফলতাকে যদি ভোট দিয়ে বিচার করা হ'ত তা'হলে তাঁকে সরে যেতে হ'ত অনেক আগেই।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অশ্ব প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকার জন্য ভারতীয় স্থল বাহিনী পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মহম্মদ মুসাকে আমন্ত্রণ জানায়। আগেই বলেছি ১৯৪৬-৪৭ সালে আমি যখন লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল পদে ছিলাম, সেই সময় তিনি ছিলেন আমার অধীনে একজন মেজর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পদমর্যাদাও হয়ে গিয়েছিল পরস্পরের বিপরীত। আলোচ্য সময়ে তিনি ছিলেন একজন জেনারেল, এবং আমি ছিলাম তাঁর এক ধাপ নীচে। মুসা যেদিন দিল্লী পৌছান, সেই দিনই আমাকে তাঁর সঙ্গে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনের পর নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন আমায়। অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হ'ল। চিরকালের বন্ধুত্ব যেন ফিরে এল আমাদের মধ্যে, এবং উভয়ের সাহচর্যে আর একবার পূর্বের মতোই আনন্দ লাভ করলাম। উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষহীন আন্তরিকতা থাকলেও, আমাদের পরস্পরের দুই দেশের মধ্যে সে রকম সম্পর্ক নেই এ একটা ভাগ্যের পরিহাস। উভয়েই স্বীকার করলাম, ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের বর্তমান অধিবাসী আমরা অনেকেই পরস্পরকে ভালো মতো জানি, এবং অতীতে ঘনিষ্ঠভাবে এক সঙ্গে বসবাস করেছি। তা' সত্ত্বেও যদি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারি তবে আমাদের পরবর্তী বংশধরদের পক্ষে তা' প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ পরস্পরকে জানার এই সুযোগ তাদের থাকবে না। তা ছাড়া কাশ্মীরের মতো সমস্যাগুলি অমীমাংসিত থাকার অর্থই হ'ল ক্রমশঃ তিক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এই গোলযোগের মূল হ'ল রাজনৈতিক এবং সৈনিকদের আয়ত্তের বাইরে। এরপর অতীতের যে মধুর দিন-গুলিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করতাম তাই নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল।

মুসার দিল্লীতে আসার কথা নেহ্‌রুকে জানিয়েছিলাম। আন্তরিকতার সঙ্গে নেহ্‌রু তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং পরের দিন দুইপুত্র সহ[20] তাঁকে নিজের বসায় প্রাতরাশে নিমন্ত্রণ করেন।

২০। মুসার সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবখানের পুত্রও এসেছিলেন। তাঁকেও নেহ্‌রু নিমন্ত্রণ করেন।

নেহ্‌রু এবং আমার দফতরের দূরত্ব খুব একটা বেশী ছিল না। একদিন সকালে আমার গাড়ী দাঁড় করাচ্ছি এমন সময় দেখলাম নেহ্‌রুর দফতরের বিপরীত দিকে তাঁর গাড়ীর সামনে বছর কুড়ি বয়সের নগ্নপদ এবং জরাজীর্ণ পোষাকের একটি যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে কৌতুহল হ'ল। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যুবকটি বললো, বাংলা দেশের একটি গ্রামে তার বাস। মা পাগল হয়ে গেছেন। একটি মাত্র বোন; সেও পঙ্গু। বাবা মারা গেছেন বহুদিন হ'ল। অতি দরিদ্র এই পরিবারটিকে সাহায্য করবার মতো কেউ নেই। কে একজন তাকে বলেছে নেহ্‌রুর সঙ্গে দেখা করলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবেন তিনি।

সেই আশাতেই বাংলাদেশ থেকে দিল্লীতে ছুটে এসেছে বিনা টিকিটে; এবং গত কয়েকদিন ধরে বিশেষ কিছু খাবারও জোটে নি বেচারীর। যুবকটির পায়ের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম প্রচণ্ড শীত আর অন্য কোন রোগে ক্ষত-বিক্ষত পা'টা দিয়ে রক্ত ঝরছে। করুণভাবে অনুযোগ করল, নেহ্‌রুর সঙ্গে কেউ তাকে দেখা করতে দিচ্ছে না। তার এই দুরবস্থা দেখেও কারও প্রাণে এতটুকু দয়া হয় নি।

কথাগুলি শুনে বড় দুঃখ হ'ল। সরল প্রকৃতির এই গ্রাম্য যুবক নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে দেশের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। জানে না, সমস্যাটি তার কাছে বিরাট হলেও, ভারতের রাজধানীতে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার মতো কেউ নেই।

সঙ্গে করে তাকে নিয়ে এলাম নিজের দফতরে। পায়ের ক্ষতগুলিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধাবার ব্যবস্থা করলাম আগে। তারপর পেট ভরে খাওয়ালাম। একটু ঠাণ্ডা হবার পর বুঝিয়ে বললাম, নেহ্‌রু অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। প্রতিদিন হাজার হাজার সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সন্তুষ্ট করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর সে যাতে হতাশ না হয়ে পড়ে সে জন্য বললাম, তার হয়ে আমিই নেহ্‌রুর সঙ্গে দেখা করবো। কিছুক্ষণ পর দু'শ টাকা দিলাম তার মা এবং বোনের চিকিৎসার জন্য। ভাবখানা এমন দেখালাম যেন ইতিমধ্যে নেহ্‌রুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, এবং টাকাটা তিনিই দিয়েছেন। আনন্দের কোন সীমা-পরিসীমা রইল না যুবকটির। শেষ পর্যন্ত তার দিল্লী আসা সার্থক হয়েছে বলে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

কিন্তু সামান্য এই কয়েকটি টাকা দিয়ে বাংলা দেশে তাকে ফেরত

পাঠাবার ইচ্ছা আমার ছিল না। এ টাকা শেষ হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। তারপর যে তিমিরে সেই তিমিরেই। প্রকৃত সাহায্য হয় যদি তাকে কোন একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া যায়। তাই সস্তায় জুতো তৈরী শেখবার জন্য একটি সংস্থায় তাকে ভর্তি করে দিলাম। জিনিসটা শিখে অন্ততঃ গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের মতো রোজগারটুকু করতে পারবে।

আর এক দিনের ঘটনা। দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে দফতরে ফিরছি। হঠাৎ একজন পথিক আমার গাড়ীর সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেল। লোকটির জ্ঞান ফিরে আসবার পর জিজ্ঞাসা করে জানলাম সে পঞ্জাবের একজন উদ্বাস্তু এবং পাহাড়গঞ্জে ফলের ব্যবসা করত। ইতিমধ্যে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসার খরচ জোগানর জন্য দোকানটিকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। তারপর এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে। মাথা গোঁজবার মতো একটু ঠাঁই পর্যন্ত নেই। নিজের পুরনো দোকানের কাছে পূতিগন্ধময় একটি নর্দমার ধারে কোন রকমে একটা আশ্রয় জোগাড় করেছে। অর্থাভাবে প্রায়ই অনাহারে থাকতে হয়, এবং গত কয়েকদিন ধরে বলতে গেলে কিছুই জোটে নি। এই কারণেই মাথা ঘুরে আমার গাড়ীর সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করে আরও জানলাম একাধিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে সাহায্যের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নি। চিঠিগুলিও দেখাল আমাকে।

লোকটিকে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। একখানা কম্বল আর কয়েকটি জামা-কাপড় দিয়ে আশ্রয় দিলাম আমার কাছেই। তারপর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে বেশ কিছু অর্থও সংগ্রহ করলাম তার জন্যে। ছয় মাস ধরে যত্ন ও চিকিৎসার পর সে সুস্থ হয়ে উঠল।

এবার সমস্যা হ'ল তার একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা। চেষ্টা করতে লাগলাম তার দোকানটিকে আবার কিনে নিতে। কিন্তু নতুন মালিক কিছুতেই বিক্রি করতে সম্মত নয়। অগত্যা পুলিশের সাহায্য নিতে হ'ল। পুরানো মালিকের কাছেই বেশ কিছু লাভ নিয়ে দোকানটি বিক্রি করে দিল শেষ পর্যন্ত। যাই হোক, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেল আমার। আমার পথের বন্ধু নিজের দোকানটি ফেরত পেয়ে জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

১৯৬০ সালে ব্রিগেডিয়ার এম. এম. বাদশাহ্‌র কাছে শুনি লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল প্রিন্স নামে জনৈক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অফিসর জীপ দুর্ঘটনায় নিহত

হয়েছেন। দুর্ভাগ্য কখনো একা আসে না। স্বামীর মৃত্যুর পর দু'টি শিশুসন্তান নিয়ে বাসস্থান এবং অর্থাভাবে মহা সঙ্কটে পড়েন মিসেস প্রিন্স। সন্তান দু'টির মধ্যে একটি আবার ছিল পঙ্গু। সহানুভূতি স্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করি তাঁকে। দুর্দশার অন্ততঃ কিছুটা লাঘব হয়েছিল তাতে। এ ছাড়া অন্যান্য সমস্যাগুলিরও যথাসাধ্য সমাধান করে দিয়েছিলাম।

শাসন কার্যের ব্যাপারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন উদার একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনরূপ হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতেন না। বঙ্গদেশের প্রতি তাঁর মমতা এবং একদা গান্ধীর চিকিৎসক ছিলেন বলে জনসাধারণও তাঁর উপর গভীর আস্থা পোষণ করত।

সৈনিকদের জন্য গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ মেনন কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে খানিকটা জমি সংগ্রহ করতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের তাতে আপত্তি ছিল। এই সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ মেনন এবং আমি উভয়েই কলকাতা যাই। কিন্তু হতাশ হয়ে দিল্লী ফিরে আসতে হয়।

কয়েকদিন পরেই যে ভাবেই হোক ডাঃ রায়ের সম্মতি আদায়ের জন্য মেনন পুনরায় আমাকে কলকাতা পাঠালেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথাটা উত্থাপন করতেই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন আমাকে। জিজ্ঞাসা করলেন, পশ্চিমবঙ্গের নিজেরই যখন জমির একান্ত প্রয়োজন, তখন অন্যকে জমি দেবার উপযুক্ত কোন কারণ আমি দেখাতে পারি কি না। তাঁকে সন্তুষ্ট করার মতো উপযুক্ত কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে হাল্কা স্বরে বললাম:

'জমি দেবার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথম, আগামী কাল আপনার জন্ম দিন। সেই উপলক্ষ্যে আপনাকে কিছু দান করতেই হবে। আর দ্বিতীয় হ'ল, সেদিন আপনাকে সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান 'ভারত-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে তাই।'

অসার যুক্তিটি শুনে যেন বেশ আমোদ পেলেন ডাঃ রায়। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হৃষ্ট চিত্তে আমাদের প্রায় সমস্ত অনুরোধই মেনে নিলেন। অথচ আগে এই ব্যাপারেই অনমনীয় একটা মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।

স্থল বাহিনী চণ্ডীগড়ে একটি সেনানিবাস স্থাপন করতে মনস্থ করে। কায়রোঁ এবং মেনন উভয়েই এ সম্বন্ধে সমান ভাবে আগ্রহী ছিলেন। কায়রোঁর মনোভাব ছিল, সেনানিবাস স্থাপিত হলে পঞ্জাবের রাজধানীর অর্থনৈতিক

দিক থেকে অনেক সুবিধা হবে। এবং, মেননের মত ছিল মনস্তাত্ত্বিক কারণে পঞ্জাবের রাজধানীতে একটি সেনানিবাস স্থাপন করা খুবই জরুরী। প্রকল্পটি অবিলম্বে আরম্ভ করতে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মেনন। কোয়ার্টার-মাস্টার জেনারেল হিসাবে দায়িত্বটি পড়ে আমার উপর।

পঞ্জাব সরকার জমির মূল্য বাবদ ধরেছিলেন সত্তর লক্ষ টাকা। বেসরকারীভাবে ব্যাপারটি অর্থ মন্ত্রকে পেশ করলে, আমায় জানান হ'ল জমি বাবদ চল্লিশ লক্ষ টাকার বেশী দেওয়া যাবে না। কায়রোঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয় ছিল। অবিলম্বে বিমানযোগে চণ্ডীগড় যেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানালাম জমির দাম অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা কম না করলে প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজনীয় মঞ্জুরি পাওয়া যাবে না; কারণ, এই উদ্দেশ্যে খরচ বাবদ যথেষ্ট অর্থ নেই। সমস্যাটি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কায়রোঁ। মূল দামকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা সহজ কথা নয়। তবু কায়রোঁ উঠে পড়ে লাগলেন। সমস্ত রকম আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি পার হয়ে জমির মালিক তথা সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের ডেকে জমির দাম পুনর্বিবেচনা করবার জন্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় দিলেন তাঁদের। খানিকটা ইতস্ততঃ ভাব দেখা দিয়েছিল সকলের মধ্যে। কিন্তু কায়রোঁ তাঁদের কী বললেন জানি না। শুধু দেখা গেল দিনের শেষে জমির দাম প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা কম করতে সবাই রাজী হয়েছেন। এতবড় একটা সমস্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমাধান ভারতবর্ষে খুব বেশী কেউ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।

১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত সামরিক সদর দফতরের সমস্ত মুখ্য স্টাফ অফিসরদের[২১] (P. S. O.—Principal Staff Officers) পদমর্যাদা ছিল লেফ্‌টেনান্ট্‌ জেনারেল, এবং বেতন ছিল মাসিক চার হাজার টাকা। দেশ বিভাগের পর প্রতিরক্ষা বাহিনী ইংরেজদের হাত থেকে আমাদের হাতে চলে আসে। সেই সঙ্গে ভারতীয় অফিসরদের চাকুরী অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের হবার দরুন এবং অভিজ্ঞতাও কম হবার কারণে উক্ত পদগুলিকে মেজর জেনারেলের পদমর্যাদায় নামিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাবে বারো বছর অতিবাহিত হ'ল। এতদিনে অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পেল আমাদের। পদগুলির পূর্ব

২১। সামরিক সদর দফতরের চীফ্‌ অফ জেনারেল স্টাফ্‌, অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল, কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল এবং মাস্টার জেনারেল অফ অর্ডনান্স, এই পদগুলিকে প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ্‌ অফিসরস (P.S.Os.) নামে অভিহিত করা হয়।

মর্যাদা ফিরিয়ে আনবার জন্য শুরু হ'ল অনুরোধ-উপরোধ। সরকার মেনে নিলেন, কিন্তু মাসিক বেতন চার হাজার টাকার পরিবর্তে ধার্য করা হ'ল সাড়ে তিন হাজার টাকা। ন্যায়-নীতির দিক থেকে সিদ্ধান্তটি কোন মতেই যুক্তি-যুক্ত ছিল না। কারণ নৌ অথবা বিমান কোন বাহিনীরই অনুরূপ পদগুলিতে এ ধরনের বেতন কম করা হয় নি। থিমায়া এটিকে সংশোধনের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। মেনন এবং নেহ্‌রু উভয়েই সম্মত হলেন, কিন্তু বেঁকে বসলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। তাঁর যুক্তি ছিল এই কঠোর ব্যয় সঙ্কোচের সময়ে উচ্চ বেতন-ভোগীদের বেতন আরও বৃদ্ধি করা অনুচিত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এটা বেতন বৃদ্ধির কোন প্রশ্ন ছিল না; ছিল পূর্বতন বেতন পুনঃ প্রবর্তনের প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে কয়েকজন সহকর্মী আমাকে বিষয়টি বিধিবর্হিভূতভাবে নেহ্‌রুর গোচরে আনতে অনুরোধ করলেন। থিমায়ার জ্ঞাতসারে এবং অনুমতি নিয়ে নেহ্‌রুর কাছে কথাটা তুললাম একদিন। সব শুনলেন তিনি। তারপর জানালেন একমাত্র মন্ত্রীপরিষদের প্রতিরক্ষা সমিতিই (D.C.C.) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তাই পণ্ডিত পন্থ এবং মোরারজী দেশাই-এর সম্মতি আগে আনা দরকার। অতএব তাঁর তরফ থেকে উভয়ের সঙ্গেই আমাকে দেখা করতে বললেন নেহ্‌রু। পন্থের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু গোলমাল বাধলো মোরারজী দেশাই-এর কাছে। তাঁর তরফ থেকে যে আমি যাচ্ছি একথাটা নেহ্‌রু পূর্বাহ্নেই মোরারজীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবু, সব কিছু শুনেও তিনি সম্মত হলেন না। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বিষয়টি তিনি আগেই বিবেচনা করে দেখেছেন এবং পূর্বতন বেতন পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী তিনি নন।

এরপর মন্ত্রীপরিষদের প্রতিরক্ষা সমিতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনাতেও আমিও উপস্থিত ছিলাম। যে মুহূর্তে নেহ্‌রু সম্মতি জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে মোরারজী দেশাই সহ সমস্ত মন্ত্রীরাও সম্মতি জানালেন নিজেদের। মোরারজী যে কী কারণে আপন অভিমত পরিবর্তন করলেন তা আজও বুঝতে পারি নি।

গ্রীষ্মকালে দিল্লীর অসামরিক মহাকরণের সমস্ত অপর সচিব (Additional Secretaries) এবং তদূর্ধ্ব সরকারী কর্মচারীগণ আপন আপন দফতর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করাবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু লেফ্‌টনান্ট্‌

জেনারেলগণ পদমর্যাদায় অপর-সচিবদের ঠিক উপরে হলেও এই সুবিধা থেকে ছিলেন বঞ্চিত। সামরিক বিভাগে এই নিয়ে সবাই ক্ষুব্ধ ছিলাম। বহু লেখা-লেখি করেও নিয়মটির পরিবর্তন করা যায় নি। সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কয়েকজন সহকর্মী আমাকে একবার চেষ্টা করে দেখতে অনুরোধ করেন। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে সরকারের কাছ থেকে মুখ্য স্টাফ অফিসরদের দফতরও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করাবার অনুমতি আদায় করি। ব্যাপারটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ফাইলে কৃষ্ণ মেনন মন্তব্য করেন: 'আশা করি এরপর থেকে কিছু সংখ্যক পি. এস. ও. (আমাকে কটাক্ষ করে!) মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন এবং অন্যেরা (অন্যদের কটাক্ষ করে!) আয়েসপ্রিয় হয়ে পড়বেন না।'

উপরি-উক্ত ঘটনার পর থেকে উপর মহলে আমার অসঙ্গত প্রভাব রয়েছে বলে গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা হতে থাকে। বারংবার এই ব্যাপার ঘটেছে। সহকর্মী অথবা উপরওয়ালারা যখনই উর্ধ্বতন মহলে কোন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন তখনই এসে অনুরোধ করেছেন আমায়। এবং বিভাগীয় স্বার্থের খাতিরে কাজটি আমি সম্পন্ন করতেই রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

ভারতের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী কিছুদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সড়ক নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিল। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, জটিল পরিচালনা পদ্ধতি, যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম তথা পরিদর্শনকারী কর্মচারীর অভাব ইত্যাদি নানাবিধ অসুবিধার কারণে কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নি। আসল গলদ ছিল অন্য জায়গায়। সামরিক প্রয়োজনে সড়কগুলির গুরুত্ব অধিকাংশ ব্যক্তিই অনুধাবন করেন নি। সরকার এগুলিকে আর দশটা সাধারণ সড়কের মতোই মনে করেছিলেন।

১৯৬০ সাল নাগাদ আমাদের সীমান্তে চীনা অনুপ্রবেশের ঘটনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এতদিনে সরকারের টনক নড়ে; এবং নেহ্‌রুর সভাপতিত্বে সীমান্ত সড়ক উন্নয়ন সংস্থার (Border Roads Development Board) প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্থার সহ-সভাপতি ছিলেন মেনন, এবং সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক এবং পরিবহন দফতরের সচিবগণ, স্থল ও বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়কদ্বয় ও তাঁদের দুইজন

সচিব এবং অমায়িক ও দক্ষ এস. কে. মুখার্জি। নির্ভরযোগ্য সামরিক ইঞ্জিনীয়ার মেজর জেনারেল কে. এন. দুবে ছিলেন সংস্থার মহা-অধিকর্তা (Director General); এবং বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত যোগ্যতার জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়। সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কর্মপরিচালনা পদ্ধতিকে দ্রুততর করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সড়ক নির্মাণের কাজটিকে ত্বরান্বিত করা।

১৯৬০ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে নেহ্রুর বাসভবনে সংস্থার প্রথম অধিবেশন বসে। দ্রুত চলাচলের অসুবিধাই ছিল আমাদের প্রধান সমস্যা। সে কথার উল্লেখ করে নেহ্রু প্রথমেই গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার স্থির করে নিয়ে প্রয়োজনীয় সড়কগুলি নির্মাণের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে বলেন। লাদাক এবং নিফাতেই যে আমাদের সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত সে কথাও বলেন তিনি। স্থির হয়, যত্নসহকারে আগে সড়কগুলির পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নিয়ে তারপর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, শ্রমিক, মাল-পত্র এবং তত্ত্বাবধানের জন্য লোকজনের যথাশীঘ্র বন্দোবস্ত করা হবে। এও স্থির হয় যে বিভিন্ন প্রদেশের সীমান্তবর্তী সড়কগুলির উন্নয়ন কার্যের সমন্বয় সাধনের দিকটিও এই সংস্থাই দেখাশুনা করবে। পরিশেষে নেহ্রু বলেন, ভবিষ্যতে সীমান্ত সমস্যার উন্নতি হলেও, প্রয়োজনীয় পথ ঘাট নির্মাণের কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে অব্যাহত গতিতে।

মেজর জেনারেল দুবে এবং আমি দু'জনে বসে হিসাবপত্র করে দেখলাম, প্রয়োজনীয় নতুন সড়ক নির্মাণ এবং পুরাতনগুলির মেরামত, সমস্ত মিলিয়ে প্রায় চার হাজার মাইলের মতো সড়কের কাজটি সমাপ্ত করতে সময় লাগবে দুই থেকে তিন বৎসরের মতো (বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুসারে পাঁচ বৎসর সময় লাগবার কথা), এবং খরচ পড়বে আনুমানিক দুইশত কোটি টাকা। অর্থাৎ মোটামুটি মাইল প্রতি চার লক্ষ টাকার মতো। আমাদের এই প্রস্তাবটি বিনা কাটছাঁটেই অনুমোদন করা হয়।

সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। তাই প্রয়োজন মতো তাড়াতাড়ি দক্ষ এবং অদক্ষ উভয় শ্রেণীর শ্রমিক জোগাড় করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তার উপর সেটা ছিল ফসল কাটার মরসুম। এই সময় লোক সংগ্রহ করা আরও কঠিন। সমতল অঞ্চল থেকে লোক এনেও কোন লাভ হ'ত না। কারণ যে সমস্ত জায়গায় কাজ হবে, সেখানকার উচ্চতার কঠোরতা

সমতল প্রদেশের অধিবাসীরা সহ্য করতে পারে না। সড়ক তৈরী করতে হবে বহু উঁচুতে। বিস্ফোরকের সাহায্যে পাথর ফাটান, পাথরগুলিকে আটকে রাখার জন্য পাহাড়ের গায়ে দেয়াল গাঁথা, পথের নীচ দিয়ে ছোট ছোট সেতু এবং বাঁধ নির্মাণ করা ইত্যাদি অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর সঙ্গে রয়েছে শীতকালে তুষার এবং বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত। সে সময় কাজ বন্ধ রাখতে হয়। বাধা ছিল আরও অনেক। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাক্টর, কম্প্রেসর, মোটর গ্রেডার, সহজে বহনযোগ্য পাথরে ছিদ্র করবার তুরপুন, বরফ সরানো তথা সেতু নির্মাণের সাজ-সরঞ্জাম, বিস্ফোরক পদার্থ, গাড়ী ইত্যাদি ক্রয়ের এবং চলন্ত কারখানা স্থাপন করার ব্যবস্থা করা। তত্ত্বাবধানের জন্য কর্মী জোগাড় করাও সহজ ছিল না। সামরিক এবং অসামরিক উভয় বিভাগেই এই শ্রেণীর কর্মীর ছিল তীব্র অভাব। সবার উপরে, বৈদেশিক মুদ্রার অনটন এবং আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি। কাজের বিলম্ব হয় এই সমস্ত কারণেই।

এত সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও কাজ এগিয়ে চলল। সেই সঙ্গে সমান তালে শুরু হ'ল তার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য। আসলে কী যে হচ্ছিল, কোন্ কোন্ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল আমাদের এবং কী ভাবেই বা সেগুলিকে আমরা কাটিয়ে উঠছিলাম, সে সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই সম্যক্ ধারণা ছিল।[২২]

আমাদের আড়াই হাজার মাইল সীমান্ত বরাবর সড়কগুলি সমস্তই দুরূহ পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে নিফায় দিরোং ড্জং থেকে টুসে লা ও তোওয়াং, এবং কাশ্মীরে জোজি লা হয়ে কারগিল এবং লেহ্ পর্যন্ত সড়ক-গুলি আগে ছিল শুধু জীপ গাড়ী চলাচলের মতো। সেগুলিকে ভারী লরী চলাচল যোগ্য করা হয়। অনেকগুলি সড়কের গতিপথও পরিবর্তন করতে হয় আবার। সেটাও ছিল একটা বিরাট কঠিন কাজ।

সীমান্ত সড়ক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নেহরুর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হ'ত; বিশেষতঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং

২২। পুরোদমে কাজ শুরু হয় । তাই অক্টোবর মাসে যখন চীনা-আক্রমণ হয়, সে সময় সড়ক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নি। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, দুঃসাহসিক কর্ম-প্রচেষ্টা এবং অভূতপূর্ব প্রযুক্তি-দক্ষতায় আমাদের ইঞ্জিনীয়ারগণ এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় অগ্রগতি লাভ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যা জড়িত থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও নেহ্‌রুকে যেন দুর্বল মনে হয়েছে আমার। পন্থের সঙ্গেও বহুবার আলোচনা করেছি এবং প্রতিক্ষেত্রেই অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছি তাঁর।

পন্থ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই ভারতের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর অসীম দানের কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ প্রশাসক। সাধারণতঃ কৌশলে কার্যোদ্ধারের পক্ষপাতী হলেও, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতেও পশ্চাদপদ হতেন না। কোন বিষয় এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্য থাকলে সে জন্যে আপাতঃ ন্যায়সঙ্গত নিজস্ব একটা বিশেষ কৌশলও ছিল তাঁর। সেই সঙ্গে ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং মানুষ চেনবার অদ্ভুত ক্ষমতা। নেহ্‌রু বিশেষভাবে নির্ভর করে থাকতেন তাঁর উপর।

[৬ই মার্চ তারিখে পন্থের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে ভারত একজন সার্থক প্রশাসক এবং অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞকে হারায়। বলতে গেলে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের ভিতরে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি; এবং ছিলেন নেহ্‌রুর দীর্ঘকালের সহকর্মী, দৃঢ় সমর্থক এবং শক্তির প্রধান উৎস স্বরূপ। নেহ্‌রু তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন; বহু জটিল সমস্যায় পরামর্শ গ্রহণ করতেন তাঁর। এই সময়েই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেহ্‌রুর বিরুদ্ধবাদীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে; এবং পন্থের মৃত্যুতে নিঃসহায় হয়ে পড়েন নেহ্‌রু।]

সীমান্ত সড়ক সংস্থার কাজ গুরুতর রূপে ব্যাহত হচ্ছিল গাড়ীর অভাবে। মেননের আদেশ ছিল কোন অবস্থাতেই যেন মার্সিডিজ বেঞ্জ লরি খরিদ করা না হয়। অভাব পূরণ করতে হবে একমাত্র জাপানী অথবা ভারতে প্রস্তুত গাড়ী দিয়ে। এগুলির কোনটিই অবিলম্বে সহজলভ্য ছিল না। অথচ জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের কাছে কিছু সংখ্যক নতুন মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ী উদ্বৃত্ত পড়ে ছিল। সেগুলি অনায়াসেই খরিদ করা যেত। কিন্তু মেননের আদেশে সেটা ছিল নিষিদ্ধ।

ইতিমধ্যে গাড়ীর অভাবে সোনামার্গ-লেহ্‌ সড়কের কাজ হয়ে গেল বন্ধ। তাই জম্মু ও কাশ্মীর সরকার আমার কাছে প্রস্তাব করলেন উদ্বৃত্ত মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ীগুলি তাঁদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে সোনামার্গ-লেহ্‌ সড়কের কাজ ত্বরান্বিত করতে। প্রস্তাবটিতে যুক্তি ছিল যথেষ্ট। তাই কৃষ্ণ মেননের আদেশ অমান্য করে সীমান্ত সড়ক সংস্থার মহা-

অধিকর্তাকে নির্দেশ দিলাম কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত গাড়ীগুলি কিনে নিতে। দু'দিন পর শ্রীনগরে এক নৈশ ভোজ সভায়[২৩] শুনলাম ব্যাপারটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কানে পৌঁছে গেছে।

পরে, আদেশ অমান্য করার জন্য কৃষ্ণ মেনন আমার কৈফিয়ৎ তলব করেন। জবাবে জানিয়ে দেই, গাড়ীর অভাবে যখন অতিপ্রয়োজনীয় সীমান্ত সড়কগুলির নির্মাণ কার্য বন্ধ রয়েছে, তখন সহজলভ্য চমৎকার মার্সিডিজ বেঞ্জ অথবা যে কোন উৎকৃষ্ট ধরনের গাড়ী ক্রয় না করার কোন যুক্তিই হয় না।

ভূটানের আয়তন ১৮,০০০ বর্গ মাইল, এবং জনসংখ্যা হ'ল মাত্র ছয় লক্ষ। রাজা শাসিত এই স্বাধীন রাষ্ট্রটি তিব্বত এবং ভারতের মধ্যে অবস্থিত এবং চার পাশে অন্যান্য রাষ্ট্রের সীমানা দিয়ে ঘেরা। রাজ্যের রাজধানীর নাম পারো (অথবা থিম্‌পু)। জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ ভাগই হ'ল নেপালী বংশোদ্ভূত। রাজ্যের ভিতর দিয়ে রইডাক্, শাংকোশ এবং মানস নামে তিনটি নদী প্রবাহিত। একাধিক পর্বতশ্রেণী চলে গেছে ভূটানের মধ্য দিয়ে। ভারত সীমান্তে এই পর্বতগুলির উচ্চতা শুরু হয়েছে পাঁচ হাজার ফিট থেকে, এবং শেষ হয়েছে চব্বিশ হাজার ফিট উচ্চ-জুলা কাংগ্‌ড়ি পর্বতে। গভীর অরণ্যে ঘেরা রাজ্যটিতে প্রচণ্ড বারিপাত হয়।

ভূটানের অধিবাসীগণ সরল এবং অনুভবনশীল। ভারত এবং ভূটানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে আমরা যাতে তাদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু না করি তার জন্য ভূটানের নেতৃবর্গ মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে আচরণে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করেন।

১৯৪৯ সালের একটি সন্ধিপত্রে ভারতের সঙ্গে ভূটান তার ১৯৪৭ পূর্ববর্তী সম্পর্ককে পুনর্ঘোষিত করে। সেই সন্ধি অনুসারে ভূটানের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় দিল্লী থেকে।

২৩। কাশ্মীরে এই ধরনের ভোজসভাগুলিতে বেশ একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। ভারতের মদ্যপান নিরোধ নীতি অনুসারে সর্বসাধারণ্যে কোন মদ্য সরবরাহ করা হয় না। কিন্তু ভোজসভা যে বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় তারই কোন এক স্থানে মদ্যপানের ব্যবস্থা সর্বদাই মজুদ থাকে। সেখান থেকে, 'ট্রাঙ্ককল' এসেছে বলে সম্মানিত অতিথিদের কাছে ক্রমাগত 'সাঙ্কেতিক' আহ্বান আসে। ব্যাপারটি অনেক সময় অন্যেরা শুনেও ফেলে। অতিথিরা সেই অজুহাতে চট করে গিয়ে মদ্য পান করে আবার ফিরে আসেন।

১৯৬১ সালে ভূটানের মোট রাজস্ব ছিল ত্রিশ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বিরাট একটি অংশ বরাদ্দ ছিল রাজা এবং বৌদ্ধ বিহারগুলির জন্য। ফলে, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ভূটানের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এই রাজ্যটির আভ্যন্তরিক কলহে আমরা যাতে জড়িয়ে না পড়ি তার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন নেহ্‌রু। (তাঁর আশঙ্কা ছিল, আমাদের দেখাদেখি চীন কিংবা অন্য কোন বৈদেশিক শক্তিও তা'হলে ভূটানের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করবে।)

প্রধান মন্ত্রী জিগ্‌মি দোরজিকে সঙ্গে নিয়ে ভূটানের রাজা ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লী আগমন করেন এবং ভূটানের উন্নয়নের জন্য ভারতের সাহায্য (বেশ কয়েক কোটি টাকার মতো) প্রার্থনা করেন। সাধারণভাবে এই বিষয়ে নেহ্‌রুর সাথে কথাবার্তা বলার পর জিগ্‌মি দোরজি আলোচনার উদ্দেশ্যে যান মেননের কাছে। এই সাক্ষাৎকারের পূর্বে নেহ্‌রুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমাদের সীমান্তে ভূটানের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পক্ষে তার সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং সর্বরকম সাহায্য প্রদান করার প্রয়োজনীয়তার কথা নেহ্‌রু আমার কাছে উল্লেখ করেন। ভূটানের মত ক্ষুদ্র দেশগুলিকে নিজেদের সমকক্ষ জ্ঞান করার, এবং তাদের আমরা 'সভ্য' করে তুলছি এ রকম কোন ধারণার যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য সর্বতোভাবে যত্ন নেবার, প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করেন তিনি। জিগ্‌মি ও মেননের সাক্ষাৎকারের সময় মেজর জেনারেল কে. এন. দুবেও উপস্থিত ছিলেন। জিগ্‌মি বলেন ভূটানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা ছাড়াও, তার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও ভারত সাহায্য করতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভারত সীমান্ত থেকে পূর্ব ভূটানের তাসি গং ড্‌জোং অবধি সড়কটি সীমান্ত সড়ক সংস্থা কতদিনে সম্পূর্ণ করতে পারবে তাও জানতে চান। দুবের সঙ্গে পরামর্শ করে জানালাম দুই বৎসরের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা যাবে বলে মনে হয়। শুনে, অবিশ্বাস তথা ব্যঙ্গভরে জিগ্‌মি মন্তব্য করলেন, বহু ভারতীয় কর্মচারীই 'এই ধরনের' হিসাব তাঁকে দিয়েছেন; এবং দুই বৎসরের মধ্যে যে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় সে বিষয়ে তিনি বাজী ধরতে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, ভারতের প্রতি এই কটাক্ষ আমার সহ্য হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম: 'এর চাইতে বিশ্বাসযোগ্য হিসাব যদি অন্য কোথাও পান, তবে সেখানে চেষ্টা করে দেখতে পারেন……।' কথাটা বলতেই গভীর একটা নিস্তব্ধতা নেমে

এল ঘরের মধ্যে।[২৪] হয়তো বেফাঁস বলে ফেলেছিলাম; কিন্তু মাতৃভূমির প্রতি এ ধরনের কটাক্ষ কখনই আমি সহ্য করতে রাজী নই।

কিছুক্ষণ পর জিগ্‌মি প্রশ্ন করলেন, 'সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে পূর্ব ভূটানে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ কবে নাগাদ শুরু করতে পারবেন বলে মনে করেন?'

'আগামীকাল থেকে।'

'আগামীকাল থেকে?' জিগ্‌মি যেন আঁতকে উঠলেন, 'ভগবানের দোহাই, আগামীকাল থেকে নয়। আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে খবরা-খবর দিতে হবে। এক দিনের ভিতরে সেটা সম্ভব হবে না।'

গম্ভীর ভাবে টিপ্পনী করলাম, 'আমার ধারণা ছিল আপনাদের তাড়া রয়েছে।'

কয়েক দিন পর মেজর জেনারেল ত্নবেকে সঙ্গে নিয়ে বিমানযোগে দিল্লী থেকে গৌহাটি উপস্থিত হলাম। তারপর সেখান থেকে একটি 'অটার্' নিয়ে ভারত-ভূটান সীমান্তের দাররাঙ্গা নামক একটি স্থানের ফুটবল খেলার মাঠে 'বিনা প্রস্তুতিতে' অবতরণ করলাম বিকেল তিনটের সময়। মাঠটিতে বিমান অবতরণের ঘটনা সেই বোধ হয় ছিল প্রথম। আমাদের আগমনের সংবাদ ভূটানী কমিশনারের কাছে পৌছায় নি। কারণ, যে সময়ের কথা বলছি তখন ভূটানের কোন কোন স্থানে ডাকহরকরারা পায়ে হেঁটে টেলিগ্রাম বিলি করতো। (কমিশনারকে অবশ্য তাঁদের প্রধান মন্ত্রীর মৌখিক সম্মতির কথা জানিয়েছিলাম।) যাই হোক, কাজটির গুরুত্ব বিবেচনা করে অবতরণের আধ ঘণ্টার মধ্যেই পদব্রজে রওনা হয়ে পড়লাম। অনেক রাত অবধি অসংখ্য নালা আর পাহাড় অতিক্রম করে মেজর জেনারেল ত্নবে এবং আমি সরকারী অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করলাম ভূটানে। সড়ক নির্মাণের সমস্যাগুলি বিভিন্ন

২৪। সড়ক নির্মাণের কাজ অগ্রসর হবার সাথে সাথে আমার এবং ত্নবের সঙ্গে জিগ্‌মির বেশ একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমাদের তিনি এতখানি বিশ্বাস করতেন যে, সড়ক সম্পর্কে আমাদের বৈদেশিক দফতরে তাঁর কয়েকটি চিঠির মুসাবিদা পর্যন্ত আমাদের করতে দেন। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের পলিটিকাল এজেণ্ট আপ্পা পন্থের অনেকখানি কৃতিত্ব ছিল। সময় পেলেই জিগ্‌মি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। নিমন্ত্রণ এবং উপহার আদান-প্রদান তো ছিলই।

দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং অন্যান্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি সেই স্থানেই আলোচনা করে নিয়ে দিল্লী ফিরে এলাম আমরা।

তারপর যথোচিত গুরুত্ব সহকারে কাজটিতে হাত দেওয়া হ'ল। ভূটান সরকারও প্রকল্পটির পূর্ণোদ্যমে দ্রুত রূপায়ণের ব্যাপারটিকে জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নরূপে গণ্য করেন। এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করে, শ্রমজীবীদের মধ্যে কাজের উৎসাহ জাগিয়ে নিজেদের আন্তরিকতার পরিচয় প্রদান করেন।[২৫]

এই সময়টাতে আমি জিগ্‌মি দোরজির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি এবং এই চমৎকার মানুষটিকে ভালো করে চেনবার সুযোগ পাই। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল অথচ প্রাচীনপন্থী; ভূটানের অভ্যন্তরে নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় ছিলেন না।[২৬] প্রায়ই বলতেন, চীনের নানাবিধ ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ভারত এবং ভূটানের সম্পর্ক দিনের পর দিন দৃঢ়তর হবেই।]

সীমান্ত সড়ক সংস্থার কর্মতৎপরতা বিস্তৃত ছিল কাশ্মীর থেকে নিফা অবধি আমাদের সীমান্ত বরাবর; এবং এই সংস্থার সঙ্গে কাজ করে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি।

স্থানীয় ভাষায় সিকিমকে বলা হয় দ্রেস্ মো জোং, অর্থাৎ চাউলের উপত্যকা। তিন হাজার বর্গ-মাইলেরও কম আয়তনের এই রাজ্যটি ১৯৪৯ সালের এক সন্ধি-চুক্তি অনুসারে ভারতের আশ্রিত রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়, এবং তার বৈদেশিক ব্যাপার, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয় ভারতের উপর। রাজ্যের মোট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জন সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশই হ'ল নেপালী বংশোদ্ভূত এবং অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের প্রধান তিনটি সম্প্রদায় হ'ল লেপচা, তিব্বত থেকে আগত ভূটিয়া এবং নেপালী। রাজ্যের রাজধানী হ'ল গ্যাংটক। এক পাশে নেপাল এবং অন্যপাশে ভূটানের মধ্যে অবস্থিত সিকিমের উপর উক্ত দুইটি রাজ্য কর্তৃক অতীতে বারংবার হামলা হয়েছে। বহু যুগ থেকে ভারত এবং তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যিক লেন-দেনের ব্যাপারে অর্থনৈতিক মধ্যস্থতার মিকা গ্রহণ করেছে সিকিম।

২৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী সড়ক নির্মাণের কাজ যথাযথ চলতে থাকে। তারপরেও আশানুরূপ অগ্রগতি হয়।

২৬। জনৈক স্বদেশবাসীর হাতে তিনি ভূটানেই নিহত হন।

তীক্ষ্ণধী এবং আলোকপ্রাপ্ত সিকিমের বর্তমান মহারাজা চউগিয়াল পলদেন থোনডুপ নামগিয়াল হলেন লেপচা বংশোদ্ভুত। ১৯৫৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে জাঁকজমক-পূর্ণ সের-থি্ঙ-সোল অভিষেক অনুষ্ঠানের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকিম দেশীয় পঞ্জিকা অনুসারে তারিখটি ছিল কাষ্ঠসর্প বৎসরের দ্বিতীয় মাসের তৃতীয় দিবস।

সংখ্যাগুরু নেপালী সম্প্রদায় পাছে সংখ্যালঘু লেপচাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে সে জন্য মহারাজা সর্বদা শঙ্কিত। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সিকিমের পৃথক সত্তা রক্ষার জন্যও তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করেন যে, ভারতের বন্ধুত্ব এবং সহায়তা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে নেহ্‌রুর অভিমত ছিল, সিকিমের অধিবাসী তথা মহরাজার বন্ধুত্ব অর্জন এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত মিত্র রাষ্ট্ররূপে সিকিমের অগ্রগতি ভারতের নিজের স্বার্থের খাতিরেই সমধিক প্রয়োজন। তা' ছাড়া, সিকিমের প্রতিরক্ষা যে শুধুমাত্র চুক্তি অনুসারে আমাদের একটা দায়িত্ব তাই নয়; এটা হ'ল ভারতের পক্ষে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মহারাজা আশা করি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিকিমকে ক্রমে ক্রমে পুনর্গঠিত করে তুলবেন। এটি করতে গিয়ে অবশ্য যাতে রাজ্যের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা এবং সংহতি বিনষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে তাঁকে।

সিকিম ও ভূটানের অধিবাসী তথা মহারাজাদের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন নেহ্‌রু। ভারতের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন দৃঢ়তর করবার জন্য তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাঁদের উৎসাহিত করতেন। নেহ্‌রুর এই নীতিকে রূপদান করতে যেয়ে অতীতে অবশ্য কিছু সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেন; এবং তার ফলে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ভূটান এবং সিকিমকে স্বীয় প্রভাবাধীনে আনবার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় চীন। এমত ক্ষেত্রে, এই দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন তথা তাদের রাজ্য অথবা জীবনধারার প্রতি আমাদের যে কোনরূপ দুরভিসন্ধি নেই সে সম্বন্ধে নিশ্চিত আশ্বাস প্রদান করা আমাদের নীতির দূরদর্শীতারই পরিচয় বহন করে।

১৯৬০ সালে থিমায়ার অনুমতি নিয়ে রমণীয় সিকিম পরিভ্রমণে যাত্রা করলাম। পথে দার্জিলিংও দেখা হয়ে গেল। আর দেখার সৌভাগ্য হ'ল টাইগার হিল থেকে বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং বহুদূরবর্তী মাউন্ট্ এভারেস্টের

পূর্ণ দৃশ্য। অবিশ্বাস্য সে সৌন্দর্যের স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হবার নয়। উষার গোধূলি লগ্নে দৃশ্যটি থাকে অস্পষ্ট। তারপর 'ধীরে ধীরে রং বদলাতে বদলাতে সূর্যোদয় হওয়া মাত্রই যেন আগুন ধরে যায়।' সে দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত !

দার্জিলিংয়ের অদূরেই মনোরম শৈলাবাস কালিংপঙ। গ্যাংটক যাবার পথে কর্মোপলক্ষ্যে একটা রাত সেখানেও অতিবাহিত করলাম। স্থানীয় কমাণ্ডার ক্যান্টনমেণ্টের নিকটেই তাশি দোরজির[২৭] প্রাসাদোপম অট্টালিকায় আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাতে আহারাদির পর কথা প্রসঙ্গে শ্রীমতী তাশি দোরজি বললেন, চীন এবং ভারতের মতো দুই বিশাল দেশের মধ্যে অবস্থানের দরুন ভূটান উভয় দেশকেই ভয় করে চলে। ভারত অবশ্য ভূটানকে কিছুটা সাহায্য প্রদান করেছে; তবু ভূটানীরা নিশ্চিন্ত নয়। ভারতের প্রতি মহিলার মনোভাব অনুকূল মনে হ'ল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর দেশের পক্ষে কোন্ পথ আমি উপযুক্ত মনে করি: বিচ্ছিন্ন, অনুন্নত এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকা; অথবা বিদেশ থেকে সাহায্য নেওয়া এবং সভ্যতার সংস্পর্শে আসা। উত্তর দিলাম, বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করা ও সভ্যতার আলোক-স্পর্শ পাওয়া যে তাঁর দেশের পক্ষে আশু প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন্ দেশের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া হবে সেইটাই হ'ল প্রশ্ন। এ ব্যাপারে অবশ্য ভূটান নিজেই তার কর্তব্য স্থির করবে। তথাপি তার ভৌগলিক অবস্থান এবং আদর্শগত ঐক্যের কথা বিচার করে মনে হয়, প্রতিবেশী ভারতের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াই তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে। অবশেষে বললাম, উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘকালের মৈত্রী-বন্ধন এবং নেহ্রুর কেবল-মাত্র সদিচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে ভূটানের কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকা উচিত নয়। বলবার সময় বেশ বুঝতে পারছিলাম শ্রীমতী দোরজি আমার কথাগুলিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

পরের দিন গ্যাংটকে উপস্থিত হয়ে মহারাজা, তাঁর দুই কন্যা ও মহারাজকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর যাত্রা করলাম মধ্য-সিকিমের

২৭। এই মহিলা ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভূটান থেকে কাঠমাণ্ডুতে পলায়ন করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করেন। ভূটান মহারাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী এই সমস্ত ভূটানী-বিদ্রোহী সে সময়ে নেপাল রাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

কোংড়া-লা অভিমুখে। গিরিপথটির উচ্চতা হ'ল ষোল হাজার ফিটেরও বেশী; এবং সেখানে যাওয়াও ছিল দুরূহ। সঙ্গে আমার দু'টি কন্যাকেও নিয়ে এসেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল তাদের খানিকটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করানো। দলের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেড অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার ভগবতী সিং, আঞ্চলিক ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নটির অধিনায়ক লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল ব্রার, উক্ত ব্যাটেলিয়নেরই মেজর অমর সিং ও নায়েক প্রেম সিং এবং একজন চিকিৎসক ক্যাপ্‌টেন গান্ধী। প্রথম তিনটি পর্যায়ে যাত্রাটি বেশ উপভোগ্যই লাগল। কিন্তু চারপাশের পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠতে লাগল শীতের তীব্রতা।

পনের হাজার ছয় শত ফিট উচ্চতায় চড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে রাতের বিশ্রাম স্থল নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে যে যার মতো শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হবার কারণে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের আশা ত্যাগ করতে হ'ল। প্রথমে মনে হ'ল নতুন আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত থাকার দরুন এরকম হচ্ছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু রাত বারোটা নাগাদ আমার দুই কন্যা অসহ্য মাথার যন্ত্রণা এবং দৈহিক পীড়ায় কাতর হয়ে পড়ল। জীবনে কোন দিন তারা নয় হাজার ফিটের বেশী উচ্চতায় আরোহণ করে নি। ডাঃ গান্ধী পাশের তাঁবুতেই ছিলেন। চীৎকার করে তাঁকে ডাকলাম। জবাবে প্রায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে গান্ধী বললেন তাঁর অবস্থাও তথৈবচ; পৃথিবীর উপর আছেন বলেই মনে হচ্ছে না; তবু যত শীঘ্র সম্ভব আসবার চেষ্টা করছেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই ডাঃ গান্ধী টলতে টলতে আমাদের তাঁবুতে প্রবেশ করে কন্যা দু'টিকে পরীক্ষা করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ বিশেষ কিছুই হয় নি তাদের। কষ্টটা হচ্ছিল অতটা উচ্চতায় আরোহণের জন্য।

পরের দিন সকালে সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গেল তাদের। আমাদের আরোহণ করবার কথা ছিল ১৬,৫০০ ফিট পর্যন্ত। তাই চিন্তায় পড়লাম, ওদের সঙ্গে নেবো, না কারো হেফাজতে এখানেই রেখে যাবো। শেষ অবধি বিচারের ভার ওদেরই হাতে ছেড়ে দিলাম। সানন্দ বিস্ময়ে দেখলাম আমাদের সঙ্গে কোংড়া-লা অবধি যাবার জন্য দু'জনেই প্রস্তুত।

দুপুর নাগাদ উপস্থিত হলাম কোংড়া-লা গিরিপথের উপর। আশ-পাশের

কোন কোন পর্বত শিখর বাইশ হাজার ফিট অবধি উঠে গেছে। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাবার মতো অবস্থা হ'ল আমাদের। মেয়ে দু'টি কিন্তু নিজেদের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে পড়ল। যাই হোক, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পড়ি-মরি করে নীচের ক্যাম্পে ফিরে এলাম। শেষ রাতটা আবার অতিবাহিত করা হ'ল সেখানে।

প্রায় দুই সপ্তাহ পর আবার আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম।

নাগাভূমির দূর-দুর্গম বিচ্ছিন্ন পার্বত্য-অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদের একাধিক সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। পার[২৮] হ'ল তাদের মধ্যে একটি। আট মাইল দূরবর্তী নিকটতম জেলা সদরের সঙ্গে পার-এর এক-মাত্র যোগসূত্র হ'ল খচ্চর চলাচল যোগ্য একটি পথ। দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর উপরিস্থিত একটি কাঠের সেতুর উপর দিয়ে এই পথটি চলে গেছে। ১৯৬০ সালের ২৬শে আগস্ট তারিখের ভোর রাতে ৫০০ জন স্বাধীনতাকামী, সশস্ত্র বিদ্রোহী নাগাদের একটি দল এই ঘাঁটিটিকে আক্রমণ করে। আক্রমণের পূর্বে কাঠের সেতুটিকে ধ্বংশ করে অতি সহজেই তারা ঘাঁটিটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে, সেখানে খাদ্যদ্রব্য এবং গোলাগুলি সরবরাহের কাজে ভাড়া করা বেসরকারী বিমান সংস্থার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইল না। সংঘর্ষ শুরু হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিবেচকের মতো ব্যবহার করবার ফলে গোলাগুলির মজুত ভাণ্ডার আশংকাজনক ভাবে কমে যায়। স্থল বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করে তখন পার-এর ঘাঁটি থেকে বেতারযোগে অনুরোধ আসে। সেই সঙ্গে বিমান থেকে নিক্ষেপ করে গোলাগুলি (এবং জল) সরবরাহের জন্যও প্রার্থনা জানানো হয়।

ভূমি থেকে বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মুখে বেসামরিক কোন বিমানের পক্ষে সেখানে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল না। কাজটি তাই দেওয়া হয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি পরিবহন বিভাগের উপর। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে একদিন দু'খানি বিমান এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ঘাঁটিটির কাছাকাছি পৌছুতেই ভূমি থেকে

২৮। এই ঘাঁটিতে আমাদের প্রায় নব্বই জন লোক ছিল।

নিক্ষিপ্ত শত্রুপক্ষের গুলিতে একটি বিমান ঘায়েল হয়, এবং পার-এর অদূরে তেজু নদীর তীরে একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে অবতরণ করতে বাধ্য হয়। (বিদ্রোহীরা সঙ্গে সঙ্গে বিমানের চারজন আরোহীকেই বন্দী করে।) অপর বিমানখানির ক্যাপ্‌টেনের ধারণায় হয়ত শৌর্যের চাইতে বিচক্ষণতাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল। অতএব স্বীয় দায়িত্ব পালন না করেই তিনি ফিরে আসেন।

বিমান বাহিনীর অবস্থা যখন এই, তখন অবরুদ্ধ ঘাঁটিটিকে সাহায্যের জন্য প্রেরিত স্থল বাহিনীর একটি দল বিধ্বস্ত কাঠের সেতুটির কাছে যেয়ে ২৬ তারিখের সারাটা দিন আটক পড়ে থাকে। বিমান থেকে নিক্ষেপ করে কোন রকম সাহায্যের প্রচেষ্টা বিমানবাহিনীও সেদিন আর করে না। ফলে, স্থল বাহিনীর সাহায্যকারী দলটির পক্ষেও সময় মতো পার-এ পৌছান সম্ভব হয় না সেদিন। নাগারা যে কেন ২৬ তারিখেই আমাদের ঘাঁটিটিকে ধূলিসাৎ করে দেয় নি, তারাই জানে। হয়তো ভেবেছিল, অবস্থা তাদের আয়ত্তের মধ্যে এবং খানিকটা সুযোগের অপেক্ষা করা যেতে পারে। অথবা আমাদের ঘাঁটিটির শোচনীয় দুর্বলতার কথা আদৌ তাদের জানা ছিল না।

যাই হোক, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল কে. এল. সোন্ধী ইতিমধ্যে বৈরী নাগাদের ঘাঁটিগুলির উপর বিমান আক্রমণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে দিল্লী কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে তখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। এদিকে অবরুদ্ধ বাহিনীটির অবস্থা আরও শোচনীয় হতে থাকে। অগত্যা ২৭শে আগষ্ট তারিখের সকালে সোন্ধী নিজেই সদর দফতর থেকে জোরহাটের বিমান ঘাঁটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; এবং আকাশ থেকে নিক্ষেপ করে সরবরাহ অব্যাহত রাখবার জন্য নিজেই একখানা বিমান নিয়ে 'পার' রওনা হন। অধীনস্থ বৈমানিকদের সামনে দায়িত্ববোধের একটা আদর্শ স্থাপন করাও উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। উক্ত অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় তাঁর বিমানটি নীচে থেকে শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হয় এবং অল্পের জন্য রক্ষা পায়।

এদিকে অবস্থার মোকাবিলা করা এবং বন্দী বৈমানিকদের মুক্তির জন্য আশু কর্তব্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে নেহ্‌রুর সভাপতিত্বে একটি জরুরী

পরামর্শ-সভা বসে। সভায় থিমায়া নাগাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করার প্রস্তাব করতেই নেহ্রু তীব্র স্বরে মন্তব্য করেন : 'স্থলবাহিনী বহুদিন থেকেই কথাটি বলে আসছে, কিন্তু শুধুমাত্র মৌখিক প্রস্তাব ছাড়া আসলে কিছুই করে নি। আরও বলেন, কাজের চাইতে কথা বেশী বলার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের।'

মেনন এবং নেহ্রু দু'জনেরই ইচ্ছা ছিল 'পার'-এ যেয়ে অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসে আমি তাঁদের কাছে একটা বিবরণ দাখিল করি; বিশেষ করে সৈন্য চলাচল এবং সরবরাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। সেই অনুসারে অবিলম্বে দিল্লী থেকে বিমানযোগে রওনা হয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দমদমে অবতরণ করলাম। সেখান থেকে বিমান চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এয়ার কমোডোর মালসে। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করেই দমদম ত্যাগ করলাম। ঝড়ের দাপটে বিমানখানা যেন ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো দুলতে শুরু করল। যত উপরে উঠতে লাগলাম ততই চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতে লাগল উন্মত্ত মেঘের দল। বিমান চালনা হয়ে উঠল অসম্ভব। এই অঞ্চলে বিমান-তৎপরতা অবিরত বাধাপ্রাপ্ত হয় এই কারণেই। বিশেষ করে বছরের এই সময়টিতে। বহুবার অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলাম আমরা। এয়ার কমোডোর মালসের দক্ষতা এবং সাহসের জন্যই বিপদ ঘটল না কোন। এইভাবে পৌছুলাম জোরহাট।

অবিলম্বে 'পার'-এ যাবার অভিপ্রায় ছিল। তাই জোরহাট থেকে একখানা হেলিকপ্টার নিয়ে আবার যাত্রা করা গেল। কিন্তু ঘাঁটির কাছাকাছি যেতেই মনটা মূষড়ে পড়ল। চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ঘন মেঘে। অবতরণ করা অসম্ভব। অতএব চেষ্টা করতে লাগলাম 'পার' থেকে কয়েক মাইল দূরে 'ফেক'-এ নামা যায় কি না। নাগাভূমিতে আমাদের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল 'দানী' মিশ্র সেই সময় 'ফেক'-এ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের অবতরণের চেষ্টা করতে দেখে বেতার মারফত বারণ করলেন। কারণ 'ফেক'-এর ঘাঁটিতে যে কোন মুহূর্তে শত্রুপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন তিনি। কিন্তু বারণ না শুনে চালককে বললাম সেইখানেই অবতরণ করতে। 'ফেক'-এর ঘাঁটিটি ছিল চাকসাং অঞ্চলে, কোহিমা থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে।

অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে মিত্র এবং লেফ্টনাণ্ট জেনারেল উমরাও সিং

এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। কয়েকদিন আগেই ৩৩ নং কোরের অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন উমরাও সিং।

যাই হোক, চারদিক ভালো করে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সুবিধাজনক একটি স্থান খুঁজতে লাগলাম। ধাঁধাঁর মতো বিসর্পিল, বিপদসঙ্কুল পথ ধরে শেষ পর্যন্ত একটি পাহাড়ের উপর আকাঙ্ক্ষিত স্থানটি পাওয়া গেল। পরিষ্কার দেখতে পেলাম চারপাশের অঞ্চল। আমাদের ঘাঁটিটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মনে হ'ল ত্রুটিপূর্ণ। কোনরকমে চলনসই গোছের করে ঘাঁটিটি স্থাপন করা হয়েছিল। অধিনায়কের আর একটি গাফিলতিও লক্ষ্য করলাম। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কী পরিমাণ লাগতে পারে এবং গোলা-গুলির অবস্থাই বা কী, সে সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা আছে বলে মনে হ'ল না। মর্টারগুলির মধ্যে একটিকে এনে বেশ সুবিধাজনক স্থানে বসিয়েছিলেন। কিন্তু তার গোলা-বারুদ পড়ে ছিল ত্রিশ মাইল পিছনে।

আশঙ্কা করা হয়েছিল শত্রুপক্ষ আমাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে 'পার'-এর পরিবর্তে 'ফেক'-এর উপর সেই রাতেই আক্রমণ চালাবে। ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে যথাসম্ভব ঠিকঠাক করে নিয়ে আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। দর্শকবৃন্দসহ সবাইকেই খানিকটা করে এলাকা ভাগ করে দেওয়া হ'ল। শেষ অবধি আক্রমণ কিন্তু আর হ'ল না। পরের দিনই 'ফেক' ত্যাগ করলাম।

বিধ্বস্ত ডাকোটাটির আটক চারজন বৈমানিকের ভিতরে ফ্লাইট্ লেফ্টনাণ্ট্ সিংহও ছিলেন। আমাদের তরফ থেকে তাঁদের উদ্ধার করবার সমস্তরকম প্রচেষ্টাই নাগা বিদ্রোহীরা কৌশলে ব্যর্থ করতে থাকে। আমাদের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলা শুরু করেছিল তারা। বেগতিক দেখলেই সীমান্ত পার হয়ে গা' ঢাকা দিত ব্রহ্মদেশে গিয়ে। জানতো, ব্রহ্ম-সীমান্ত আমরা অতিক্রম করতে পারব না, এবং তারাও নিশ্চিন্ত থাকবে। অগত্যা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে স্থির করা হ'ল, যেখানেই তারা পলায়ন করুক, আমরাও পশ্চাদ্ধাবন করবো। ব্রহ্ম সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাই করা হ'ল। পশ্চাদ্ধাবন করে আমাদের সৈনিকরা প্রবেশ করলো ব্রহ্মদেশের ভিতরে। ভীত, ত্রস্ত নাগারা অবশেষে আটক বৈমানিকদের মুক্তিদান করে। ব্যাপারটি আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা ইজ্জতের লড়াই। এবং সেই লড়াইয়ে জয়লাভ করে আমাদের সৈনিকরা নিজেদের এলাকায় ফিরে আসে।

নাগাভূমি এবং পূর্বসীমান্তবর্তী এলাকার সফর শেষ করে ১৯৬০ সালের এক অপরাহ্ণে বেলা দুটো নাগাদ তেজপুরে ফিরে এলাম। কলকাতা থেকে কোন বেসামরিক বিমান ধরে সেই রাতেই দিল্লী প্রত্যাবর্তনের তাড়া ছিল আমার। জানতাম বিমান বহরের দ্রুতগামী কোন যুদ্ধ-বিমানে করে তেজপুর থেকে রওনা হতে না পারলে সময়মতো কিছুতেই কলকাতা পৌঁছুতে পারব না। দিনটা এমনিতেই ছিল মেঘলা। কপালগুণে সেই সাথে দেখা দিল ঝড়ের পূর্বাভাস। তার উপর জানা গেল, যে জেট বিমানটিতে আমার যাত্রা করার কথা, তার তৈলাধারে ছিদ্র হয়েছে। স্থানীয় বিমান বহরের স্টেশন কমাণ্ডার পদে অস্থায়ী বদলী হিসাবে সে সময় কাজ করছিলেন স্কোয়াড্রোন লীডার সুরিন্দর সিং। প্রথমে তিনি আমায় অনুরোধ করলেন পরের দিন যাত্রা করতে। কিন্তু আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখে শেষ পর্যন্ত নিজেই লেগে পড়লেন ছিদ্রটি মেরামতের কাজে।

অপরাহ্ণ দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আকাশে পাখা মেলল আমাদের বিমান। আবহাওয়া ক্রমশঃ হয়ে উঠল বিক্ষুব্ধ। ঝড়ের গতিপথকে পাশ কাটাবার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির কাছাকাছি বিমানটি প্রায় ত্রিশ হাজার ফিট উপরে উঠল; এবং সেটা করতে গিয়ে অনেকখানি সরে গেল মাউণ্ট্ এভারেস্টের দিকে। ঠিক সেই সময়েই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করতে লাগলাম আমি। চালককে জানাতে, শুনলাম অক্সিজেন সরবরাহে কিছু গোলযোগ ঘটেছে। যাই হোক, মিনিট কয়েকের ভিতরেই ত্রুটিটুকুকে তিনি মেরামত করে ফেললেন। তারপর সেই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সন্ধ্যা নাগাদ এসে পৌঁছুলাম দমদমে। সেখান থেকে একখানি অসামরিক বিমান ধরে রাত বারোটা নাগাদ ফিরে এলাম দিল্লীতে।

পরের দিন দফতরে একটা মিটিং-এ বসে আছি, এমন সময় অকস্মাৎ মনে হ'ল শরীরের সম্পূর্ণ ডান পাশটা যেন অসাড় হয়ে গেছে। প্রথমে এটাকে একটা অলীক কল্পনা বলে মনে করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন একটুও কমলো না তখন একজন বড় ডাক্তার দেখালাম। দেখে শুনে ডাক্তার বললেন, অক্সিজেন ছাড়া অধিক উচ্চতায় বাস করবার পর ক্রমাগত অস্বাভাবিক পরিশ্রম করলে রক্ত-চলাচল প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয় এবং সময় সময় পক্ষাঘাতও হতে পারে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়ে গেলাম। পক্ষাঘাতের আশঙ্কা পুরো দু'টি দিন ধরে আমাকে দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন করে

রাখল। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম শরীরে কোন কষ্ট নেই।

চীনারা প্রথমে আকসাই-চীন উপত্যকা অধিকার করে নেয়। তারপর ক্রমশঃ লাদাক এবং অন্যান্য অঞ্চলে আমাদের ভূমি একটু একটু করে দখল করতে থাকে। অতএব, আত্মরক্ষার খাতিরে আমাদের অনেকগুলি নতুন নতুন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে হয়। ঘাঁটিগুলি সবই ছিল দুর্গম পার্বত্য এলাকায়। দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে আহত ব্যক্তিদের সরানো, অতি জরুরী মালপত্র, গোলাগুলি, ঔষধপত্র আনা-নেওয়া এবং পরিদর্শন পরিক্রমা ইত্যাদি কাজে ভয়ানক অসুবিধা হ'ত। তাই বেশ কিছু সংখ্যক শক্তিশালী হেলিকপ্টারের প্রয়োজন পড়ল আমাদের।

১৯৬০ সালে বিমানবাহিনীর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে স্থির করেন, তুলনামূলক কার্যকারিতা বিচারে আমেরিকা, রাশিয়া এবং ফ্রান্সের হেলিকপ্টারগুলিই হ'ল আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে সবচাইতে উপযুক্ত। দুই ধরনের রাশিয়ান হেলিকপ্টারের মধ্যে একটি ছিল সর্বাধুনিক। কিন্তু সেটা আবার পাওয়া যাচ্ছিল না। অপেক্ষাকৃত পুরনো ধরনেরগুলি দামে ছিল সস্তা এবং পাওয়াও যাচ্ছিল প্রয়োজন মত। সর্বাপেক্ষা সুবিধা ছিল এগুলির দাম দেওয়া যেত ভারতীয় মুদ্রায়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন নিজের বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়ে প্রত্যেক ধরনের হেলিকপ্টারেরই কার্যকারিতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি আমেরিকা আর ফরাসী দেশের হেলিকপ্টার জোগাড় করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু ছিল নমুনা হিসাবে পাওয়া আর বাকীগুলি নগদ দাম দিয়ে ক্রয় করা। কিন্তু থোক খরিদের জন্য নির্বাচন করা হ'ল রাশিয়ান হেলিকপ্টার।

এই রাশিয়ান হেলিকপ্টারগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় কেবলমাত্র দিল্লীর আশে-পাশে; এবং যে অবস্থার মধ্যে পরীক্ষাকার্য চালনা হয় সেটাও বাস্তব দৃষ্টিসম্মত বলে মনে হয় নি আমাদের। পক্ষান্তরে অন্য দেশের হেলিকপ্টারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছিল নানা ভাবে। তাই রাশিয়ান হেলিকপ্টারগুলিকে অধিকতর উচ্চতায় পরীক্ষা করে দেখবার অভিপ্রায় ছিল আমাদের। কারণ, শেষ পর্যন্ত সু-উচ্চ, দুর্গম, পার্বত্য অঞ্চলেই কাজ করতে হবে তাদের। মেনন কিন্তু দিল্লীর পরীক্ষাটুকুকেই যথেষ্ট বলে মনে

করেছিলেন, এবং আমাদের ক্রয় করবার সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছিলেন রাশিয়ানদের।

বিমান বাহিনীর বিশেষজ্ঞদের মতে ফরাসী হেলিকপ্টারগুলির কার্যকরী ক্ষমতাই ছিল অধিক। এছাড়া, সীমান্ত সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে আর একটি জিনিসও আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। অনেক ক্ষেত্রেই রাশিয়ানরা নানা অজুহাতে সময় মতো যন্ত্রপাতি সরবরাহ করত না। আমার তাই আশঙ্কা ছিল, হেলিকপ্টার সরবরাহের ব্যাপারেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। (বস্তুতঃ হয়েও ছিল তাই)। ঠিক এই সময়েই রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করতে মেনন চলে যান নিউইয়র্ক।

হেলিকপ্টার সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু ঠিকমত পরখ না করেই যে একটি নতুন ধরনের যন্ত্র খরিদ করতে যাওয়া হচ্ছে, এই ব্যাপারটিই আমাকে অত্যন্ত ভাবিত করে তোলে। এই বিমানগুলো নিয়ে আমাদের বৈমানিকদের কাজ করতে হবে অত্যুচ্চ এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। দুর্ভাবনা আরও বেশী ছিল সেই কারণেই। এবং বিমান বাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলের অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল পিণ্টো এবং আরও অনেকে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে ছিলেন একমত।

উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। প্রশ্নটি ছিল, সরকারের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, বিবেকবিরুদ্ধ হলেও সেটা আমরা মেনে নেবো কি না ; অথবা, জোর করে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলব। এ বিষয়ে আমি অবশ্য আমার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলাম। আমাদের বৈমানিকদের অমূল্য জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে কিছুতেই দেওয়া হবে না। তাই বিমান বাহিনীর লোক না হয়েও ব্যাপারটির একটা ফয়সালা করতে মনস্থ করলাম। এয়ার ভাইস মার্শাল পিণ্টোকে অনুরোধ করলাম লাদাক অঞ্চলে পরীক্ষা করে দেখার জন্য সাম্প্রতিক খরিদ করা রাশিয়ান হেলিকপ্টারগুলি থেকে একটি আমাকে দিতে। খুলে বললাম, এ ধরনের কাজ আমার করবার কথা নয় সেটা বুঝি ; কিন্তু করতে বাধ্য হচ্ছি পরিস্থিতি বিবেচনা করে। আগেই বলেছি, আমার আশঙ্কার সঙ্গে পিণ্টোও ছিলেন একমত। সে কথাটা আবার স্বীকার করে জানালেন, নিউইয়র্ক যাত্রা করবার পূর্বে কৃষ্ণ মেনন কড়া আদেশ দিয়ে গেছেন যেন হেলিকপ্টারগুলি নিয়ে আর কোন রকম পরীক্ষাকার্য চালান না হয়। আরও বললেন, লাদাকের যে অত্যুচ্চ অঞ্চলে হেলিকপ্টার নিয়ে আমি

পরীক্ষা চালাতে মনস্থ করেছি, বছরের এই সময়টিতে সেখানে বিমান চালনা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমার কিন্তু সবচাইতে বেশী প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই পরীক্ষাকার্য চালাবার উদ্দেশ্য ছিল। তা হলেই কার্যকারিতা ঠিক মতো বোঝা যাবে। দিল্লীর পরীক্ষাটি মোটেই যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। কথাটা বললাম পিণ্টোকে। অবশেষে খানিকটা তর্ক-বিতর্কের পর পিণ্টো রাজী হলেন। এমন কি আমার সঙ্গে যাবারও সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন। এটা হ'ল ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা।

দিল্লী থেকে একটি ডাকোটা বিমানে জম্মু যাত্রা করলাম আমি আর পিণ্টো। পিণ্টো আদেশ দিয়ে গেলেন, রাশিয়ান হেলিকপ্টারটি যেন পরের দিন লেহ্-তে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু পরদিন সকালে জানা গেল রাশিয়ান বিমান-চালক সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, অস্বাভাবিক ঠাণ্ডার দরুন হেলিকপ্টারের জ্বালানী তেল জমাট বেঁধে গেছে, এবং শ্রীনগর থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে লেহ্ যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আশ্চর্য লাগল। এই বিজ্ঞানের যুগে জমাট বাঁধা জ্বালানী তেল গলানো যায় না এটা অবিশ্বাস্য। পিণ্টো এবং আমি ব্যাপারটিতে ভয়ানক বিরক্তি বোধ করলাম। আদেশ পাঠালাম, যে করেই হোক এ বাধা অপসারণ করতেই হবে।

লেহ্-তে যখন পৌঁছুলাম, আবহাওয়া তখন চমৎকার। নির্মেঘ, নীল আকাশে ঝলমল করছে সূর্যকিরণ। স্থির, শান্ত বাতাস। দেখলাম, জমাট-বাঁধা জ্বালানী গলিয়ে নিয়ে রাশিয়ান চালক হেলিকপ্টার সহ লেহ্-তে হাজির। পিণ্টো এবং আমার উভয়েরই একসঙ্গে যাবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু রাশিয়ান চালক জেদ ধরলেন যে কোন একজনকে সঙ্গে নেবেন তিনি।

আগ্রহটি ছিল আমারই বেশী। অতএব খুশীমনেই পিণ্টো সুযোগটি আমাকেই ছেড়ে দিলেন। আমি ছাড়া, হেলিকপ্টারের যাত্রী এবার হলেন তিনজন, একজন রাশিয়ান এবং দু'জন ভারতীয় চালক।

যাত্রা শুরু হ'ল। লেহ্-র উপরে উঠলাম আমরা। ক্রমশঃ অগ্রসর হতে লাগলাম কারাকোরম গিরিপথের দিকে। চারদিক থেকে ঘিরে ধরল পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী (কে-২, উচ্চতা ২৮,০০০ ফিটেরও বেশী), এবং তুষারাচ্ছাদিত অসংখ্য নামগোত্রহীন পর্বতশিখর। নয়নাভিরাম সেই দৃশ্যের সামনে বিস্ময়ে আমরা মূক হয়ে গেলাম!

কারাকোরম গিরিপথের নিকটেই আমাদের একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল।

রাশিয়ান চালককে বললাম সেইখানেই অবতরণ করতে। কিন্তু চারদিক দেখে এবং মানচিত্র পর্যালোচনা করে তিনি জানালেন স্থানটি চীন সীমান্তের অত্যন্ত নিকটে বলে সেখানে অবতরণ করা ঠিক হবে না। তা' ছাড়া বললেন, নামবার মতো উপযুক্ত স্থানও নেই! কথাগুলি ভালো লাগল না আমার। অনেকটা যেন অনধিকার চর্চা বলে মনে হ'ল। বললাম, চীন সীমান্ত সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার কোন কারণ নেই। সেটা বুঝবো আমরা। এবং, অবতরণ স্থান সম্বন্ধেও আমার মনে হয় স্থানটি বেশ উপযুক্ত। শুনে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে রাশিয়ান চালক উত্তর দিলেন, যুদ্ধ এবং শান্তির সময় সমস্ত মিলিয়ে তিনি অনেক ক' হাজার ঘণ্টা বিমান চালনা করেছেন, এবং সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে ঢালু স্থানটি অবতরণের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়; এবং হঠকারীর মতো নামবার চেষ্টা করলে হেলিকপ্টারটির ক্ষতি হতে পারে।

এবার আমারও কেমন জেদ চেপে গেল। বললাম, বিশেষ করে ওই স্থানটিতেই আমি নামতে চাই; এবং হেলিকপ্টারটির পক্ষে সেখানে নামতে না পারার অর্থ ই হবে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া।

এইবার কাজ হ'ল। পাছে এই কারণে একটি কূটনৈতিক লেন-দেন ভেস্তে যায় এবং তাঁকেই দায়ী করা হয়, তাই রাজী হলেন চালক। এবার সহাস্যে বললাম, রুশরা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করতে সক্ষম বলে দাবী করে; অথচ এই সামান্য জায়গায় অবতরণ করতে এত চিন্তিত হবার কারণ কি! কথাটা শেষ হতে না হতেই হেলিকপ্টার সোজা নীচের দিকে ছুটে গেল এবং নিরাপদে অবতরণ করল নির্দিষ্ট স্থানে।

সঙ্গে একটি ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলাম। আশে-পাশের অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে কয়েকখানা ছবি তুলছি এমন সময় রাশিয়ান চালকের ডাকে ফিরে যেতে হ'ল। ঠাণ্ডায় ইঞ্জিনের জ্বালানী তেল জমাট বাঁধবার আগেই ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। যাই হোক, দু' একবার আওয়াজ তুলেই বিমানের যন্ত্র সজীব হয়ে উঠল। তারপর লেহ্ অভিমুখে ফিরে চললাম আমরা।

২১,০০০ ফিটেরও উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল আমার। চালকদের মধ্যে একজনের কথার শব্দে চট্ করে সেটা ছুটে গেল: 'লেহ্ আর কয়েক মিনিটের পথ; কিন্তু জ্বালানী আর অক্সিজেন দুই-ই তো বিপজ্জনকভাবে কমে আসছে। ইঞ্জিনও ঠিক মতো চলছে না।

যে কোন মুহূর্তে হয়তো আমাদের বাধ্য হয়ে নামতে হতে পারে। এখন একমাত্র ভরসা যদি কোন রকমে এই উঁচু পাহাড়গুলো পেরিয়ে ওপাশের উপত্যকায় নামতে পারি।'

মাথার উপরে মেঘহীন সুনীল আকাশ। নীচে অন্তহীন তুষারের উপর সূর্যকিরণ যেন ঠিকরে পড়ছে। এমন একটা মনোরম প্রভাতে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার চাইতে দুঃখের আর কিছু নেই। ভগবানের নাম জপ করতে করতে আশা করতে থাকলাম সে রকম কিছুই হবে না। কিন্তু সে আশাকে নির্মূল করে দিয়ে হেলিকপ্টারের উচ্চতা কমে আসতে লাগল দ্রুত গতিতে। আসন্ন সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম আমরা।

কিন্তু ভাগ্য সেদিন আমাদের ছিল সুপ্রসন্ন। কোন রকমে পাহাড়গুলি পেরিয়ে ওপাশের উপত্যকায় পৌঁছে নেমে পড়তে বাধ্য হলাম। অদূরেই ছিল 'থোইসে'র সামরিক ঘাঁটি। পার্শ্ববর্তী সুউচ্চ পর্বতমালার ওপাশেই হ'ল লেহ্। হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতির মধ্যে রুক্ষ, শুষ্ক প্রস্তরময় ভূমির উপর নেমে পড়ল আমাদের হেলিকপ্টার। স্বয়ংক্রিয় জ্বালানী-মিশ্রন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি বিকল হয়ে গিয়েছিল। সেটা সারাবার সবরকম চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। বিকল হেলিকপ্টারের আকাশে ওড়বার কিছুমাত্র আশাই দেখা গেল না। অগত্যা লেহ্-তে এয়ার ভাইস মার্শাল পিণ্টোকে বেতারে আমাদের অবস্থান এবং দুর্ভাগ্যের সংবাদ জানিয়ে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে বললাম। অবিলম্বে উদ্ধারের সর্বপ্রকার ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভয় দান করলেন পিণ্টো।

আনুমানিক ঘণ্টাখানেক পর আকাশে বিমানের গুঞ্জন শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানি ডাকোটা বিমান প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অতিকষ্টে অবতরণ করল সেখানে। যেখানে নামল, সেটা ছিল একটি নদীর ধারে সঙ্কটজনকভাবে অবস্থিত কাজ চালাবার মতো একটি বিমান-অবতরণ ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটির আয়তন ডাকোটা নামবার পক্ষে যথেষ্ট নয়; এবং ভূমিও রুক্ষ এবং বন্ধুর। যাই হোক, উল্লসিত চিত্তে দেখলাম ডাকোটা থেকে পিণ্টো বেরিয়ে এলেন।

দিনের আলো ক্রমশঃ কমে আসছিল। তাগাদা দিতে লাগলেন পিণ্টো। অতএব এম্ আই-৪নং হেলিকপ্টারটিকে সেখানেই ফেলে রেখে রাশিয়ান চালকসহ ডাকোটার দিকে ছুটলাম আমরা। অবতরণের সময় ডাকোটাটির

একটি চাকা সামান্য জখম হয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেটাকে মেরামত করে নেওয়া হ'ল। এবার আশা হ'ল অবিলম্বে যাত্রা করতে পারব।

'রানওয়ে'তে এসে ঘুরে দাঁড়াল ডাকোটাটি। যন্ত্রপাতির প্রাথমিক সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে নিলেন চালক। বিমান বন্দরে বিমান ছাড়বার সঙ্কেত দেওয়া হয়ে থাকে একটি উঁচু স্তম্ভ থেকে। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে সে সবের কোন প্রয়োজনই ছিল না। বিমানের 'ব্রেক'গুলিকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ক্রমশঃ সক্রিয় হয়ে উঠল ইঞ্জিন। তারপর 'রানওয়ে' ধরে খানিকটা ছুটেই আকাশে পাখা মেলে দিল আমাদের ডাকোটা।

অস্তমিত সূর্যের স্তিমিত আলোর মধ্যে কয়েক মিনিট বাদেই লেহ্ দেখা গেল। তৈরী হয়ে নিলাম সবাই। 'সেফ্টি বেল্ট্'গুলি যে যার মতো পরে নিলাম। অবতরণের পূর্বে যথারীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সেরে নিলেন চালক। তারপর অবতরণের জন্য প্রস্তুত হ'ল আমাদের বিমান। দু'টি চাকা এবং 'ফ্ল্যাপ' নামিয়ে দেওয়া হ'ল। হঠাৎ দেখলাম নীচে 'রানওয়ে'র প্রান্তদেশ দ্রুত ছুটে আসছে আমাদের দিকে। ইঞ্জিনের গতিবেগ ক্রমশঃ কমে এলো। সামান্য একটু ঝাঁকুনি; পরক্ষণেই আর একবার নিরাপদে অবতরণ করলাম আমরা।

সে রাতটুকু লেহ্তে অতিবাহিত করে পরের দিন আমরা দিল্লী প্রত্যাবর্তন করি।

এই পরীক্ষাকার্য চালাবার বেশ কিছু দিন আগে উক্ত হেলিকপ্টারটি পালাম বিমান বন্দরে রাখা ছিল। সেই সময় একদিন নিরীহ একজন ভারতীয় জওয়ান এটিতে বিমান জ্বালানীর পরিবর্তে ভুল ক'রে কেরোসিন তেল ভরে দেয়। এই সাংঘাতিক ভুলের জন্য পরে অবশ্য যথোচিত শাস্তিও তাকে পেতে হয়। এই ঘটনার পরেই বিমানটি সম্পূর্ণরূপে খুলে পরিষ্কার তথা পরীক্ষা করা হয়; এবং নিরাপদে ওড়ানোও হয় কয়েক শ' মাইল।

পূর্বোক্ত বাধ্যতামূলক অবতরণের জন্য রাশিয়ানরা এই কেরোসিন তেলের ঘটনাকেই দায়ী করে। সেটা মেনে নিলেও কিন্তু আরেকটি ব্যাপার থেকে যায়। ওই হেলিকপ্টারটি ছাড়া একই ধরনের আরও বিমান তাদের কাছে ছিল। সেগুলির থেকে একটিই বা দেওয়া হ'ল না কেন লেহ্-তে পরীক্ষার জন্য? রাশিয়ান হেলিকপ্টারের কোন রকম দুর্নাম দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল শুধু ভালো করে সেগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে

দেখা। তাই, সামরিক সদর দফতরে ফিরেই সংশ্লিষ্ট ফাইলে মন্তব্য করি যে খরিদ করবার পূর্বে রাশিয়ান হেলিকপ্টারগুলির যোগ্যতা এবং অধিক উচ্চতায় তথা পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে তাদের কার্যকারিতা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

কয়েকদিন পরেই কৃষ্ণ মেনন ফিরে এলেন রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে। তাঁর আদেশ অমান্যপূর্বক পূর্বোক্ত পরীক্ষা-কার্য চালাবার কথা শুনেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তিরস্কার করে বললেন, বিনা প্রয়োজনে আমি ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছি, কারণ হেলিকপ্টারটি যে গণ্ডগোল করেছে সেটা আকস্মিক একটা দুর্ঘটনামাত্র, এবং তার দ্বারা বিশেষ কিছুই প্রমাণিত হয় না। অবশেষে বললেন, সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করাটা হ'ল সরকারের দায়িত্ব; এবং জেনারেলদের এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো অনুচিত।

তাঁর বক্তব্য শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলাম, কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো সৈনিকরাও সরকারের একটা অংশ কি না; এবং উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই এমন একটা যন্ত্র খরিদ করা হচ্ছে যা আমাদের বৈমানিকদের জীবন-সংশয় ঘটাতে পারে, সেটা দেখেও কি সৈনিক হিসাবে আমার মুখ বুজে থাকা উচিত?

কয়েকদিন বাদে সংসদেও ঘটনাটি নিয়ে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা হয়। লাদাকে ভারতীয় ঘাঁটিগুলির উপর দিয়ে একজন রাশিয়ান বৈমানিককে নিয়ে কেন আমি উড়ে গেছি, বিরোধী পক্ষ তার জবাব চান। আমার সমর্থনে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, লাদাক অঞ্চলে বিমানটির কার্যকারিতা পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল; কারণ বিমানগুলিকে কাজ করতে হবে ওই সমস্ত অঞ্চলেই। আমাদের বৈমানিকদের কাছে এই ধরনের হেলিকপ্টার নতুন বলেই পরিচালনা-কৌশল শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ান বৈমানিককে তাঁদের সঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার পক্ষের সমর্থন সত্ত্বেও জনসাধারণের মনে আমার সম্বন্ধে আর একবার বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হ'ল। অথচ এ ব্যাপারে আমি ছিলাম নিরুপায়।

১৯৬১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে 'আমাকে প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট সেবা-পদক'-এ ভূষিত করা হয়। উক্ত তারিখেই আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অনুরাধারও বিবাহ হয়। এই সম্মান লাভে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন, এবং আমার মর্যাদা হানির উদ্দেশ্যে প্রচার করতে

লাগলেন যে, গৃহনির্মাণের জন্যই আমাকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কারটি প্রদানের কারণ অবশ্য পদকটিতেই ক্ষোদিত করা ছিল।[২৯]

এই উপলক্ষ্যে লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল জে. এন. চৌধুরী আমাকে একখানি পত্রে জানান যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, দেশসেবার জন্য যে আরও বহু পুরস্কার আমি লাভ করব, 'প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট সেবা-পদক'টি হ'ল তারই অগ্রদূত। (কিন্তু আমার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে নেহ্‌রুর কাছে নিজের গোপন নোটে তিনি আমার সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তা ছিল এই অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত)।

এক বৎসর পর একটি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট দর্শক মণ্ডলীর সম্মুখে রাষ্ট্রপতি উক্ত পদকটি আমার পোষাকে প্রোথিত করে দেন। আমার কাছে সেটা ছিল এক মহা গৌরবের মুহূর্ত; কিন্তু ঘটনাটিকে শিরনামা দিয়ে প্রকাশ করে বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কারেণ্ট' ব্যঙ্গ ভরে প্রশ্ন তোলে, পদকটি আমাকে 'এস্‌প্রেসো' কফি প্রস্তুতের যন্ত্র তৈয়ারী করার জন্য প্রদান করা হয়েছে কি না। কটাক্ষটি ছিল ভিত্তিহীন; কারণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উৎপাদনের দিকটির সঙ্গে আমার কোন প্রকার সম্পর্ক কোনদিন ছিল না। যাই হোক, এই সময় 'কারেণ্ট' আমার বিরুদ্ধে এমন সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ আনতে থাকে যে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আবার আমি চিন্তা করতে শুরু করি। কিন্তু দু'টি কারণে নেহ্‌রু আমাকে এ কাজ থেকে বিরত করেন:

(ক) সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল যে মামলা-মকদ্দমার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন সেটা তিনি চান না;

(খ) অন্য কেউ যদি প্রকাশ্যে আমাকে সমর্থন করেন সেটাই হবে সব

২৯। পদকটিতে উৎকীর্ণ করা রয়েছে: লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল বি. এম. কলকে কমিশন প্রদান করা হয় ১৯৩৩ সালে। কর্মজীবনে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন: যথা, সশস্ত্র বাহিনী জাতীয়করণ সমিতির সচিব; আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সামরিক সহকারী; সামরিক সদর দফতরে সংঘটন অধিকর্তা; কোরিয়ায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পুনর্বাসন কমিশনের কর্মীবর্গের প্রধান; একটি পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক; (এর পূর্বে সাড়ে তিন বৎসর ধরে একটি পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করেছিলেন); কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল; (বর্তমানে চীফ অফ্‌ দি জেনারেল স্টাফ)। এই সমস্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে অপূর্ব কর্মদক্ষতা, উদ্যম এবং পরিচালনা-কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তিনি।

চাইতে ভালো। (অতীতে এবং ভবিষ্যতে একাধিকবার তিনি প্রকাশ্যে আমার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন।)

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে[৩০] থিমায়ার অবসর গ্রহণ করবার কথা ছিল। তাঁর অবর্তমানে সামরিক বাহিনীর প্রধান কে হবেন তাই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল। পদটির জন্য প্রতিযোগী ছিলেন দু'জন, থাপার এবং থোরাট। উভয়ের চাকুরীর ইতিহাস ছিল উজ্জ্বল এবং যোগ্যতা ছিল সমান। কিন্তু চাকুরীগত প্রবীণত্ব বেশী ছিল থাপারের। তাই থিমায়ার স্থানে মনোনীত হলেন তিনিই ; সঙ্গে সঙ্গে আমার আবাসে এসে জানালেন চীফ অফ্ দি জেনারেল স্টাফ রূপে আমাকে পেলে তিনি খুশী হবেন। পেশাদার প্রতিটি সৈনিকই একদিন এই পদটি লাভ করবার উচ্চাশা অন্তরে পোষণ করে। জাতির সমগ্র সামরিক শক্তির সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব থাকে এই পদটির উপর। তাই বলা বাহুল্য, থাপারের প্রস্তাবটিতে সম্মানিত বোধ করলাম নিজেকে।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে, চীফ অফ্ দি জেনারেল স্টাফের দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম আমি।[৩১] থিমায়া তখনও অবসর গ্রহণ করেন নি। (তিনি ছুটিতে গেলেই কর্মভার গ্রহণ করবার কথা ছিল থাপারের।) নতুন দায়িত্বে যখন কিছুটা ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছি, সেই সময়েই সামরিক বিভাগে আমার কিছু সংখ্যক সমসাময়িক ব্যক্তির প্ররোচনায় এই নিয়ে একটা সোরগোল পড়ে গেল। উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করা যে, 'প্রয়োজনীয় যোগ্যতা' না থাকা সত্ত্বেও আমাকে বর্তমান পদে উন্নীত করা হয়েছে, এবং যোগ্যতর ব্যক্তিদের দাবিয়ে রেখে নেহ্‌রু ও মেনন অন্যায়ভাবে আমাকে পদোন্নতি প্রদান করেছেন। বলা বাহুল্য এটি ছিল সর্বৈব মিথ্যা।

প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিতর্ক শোনবার উদ্দেশ্যে সেনাবিভাগের কয়েকজন অফিসরের সঙ্গে ১১ই এপ্রিল তারিখে আমি লোকসভায় গমন করি।

৩০। অবসর গ্রহণের পূর্বে থিমায়ার ছুটি নেবার কথা ছিল। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে একটি মিথ্যা গুজব রটনা করা হয় যে, থিমায়া এবং থোরাটকে যথাকালের পূর্বেই মেনন চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উভয়েই পূর্ণ সময় ধরে চাকুরী করবার পর স্বাভাবিক নিয়মে যথাকালে অবসর গ্রহণ করেন।

৩১। পদটিতে প্রথমে আমি অস্থায়ী বদলি হিসাবে যোগদান করি। পরে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হই।

লোকসভাকক্ষে তখন তিল ধারণের স্থান ছিল না। আবহাওয়াও ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। দর্শকদের নির্দিষ্ট স্থানে কোনরকমে দাঁড়াবার মত স্থান জোগাড় করলাম। অধিবেশনের শুরুতেই অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ভারতের প্রতিরক্ষা দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে প্রবীণ রাজনীতিক নেতা কৃপালনী তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন, নেহ্‌রু, মেনন এবং আমাকে। মেননের বিরুদ্ধে আনেন পাঁচ দফা অভিযোগ: সেনাবাহিনীর মধ্যে দলাদলির মনোভাবের সৃষ্টি, সেনাবাহিনীর মনোবল নষ্ট করা; জাতীয় অর্থের অপচয়; দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একদলীয় শাসনতান্ত্রিক দেশগুলিকে সমর্থন। উপসংহারে, সংসদীয় কোন কমিটি অথবা রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োজিত কোন কমিশন দিয়ে বিষয়গুলির তদন্ত করানোর দাবী জানান কৃপালনী।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে কৃপালনী বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর শক্তি-সামর্থ্য প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে বলে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক উজ্জ্বল চিত্র পেশ করেছেন মেনন; এবং বোধ হয় এই 'শক্তি-সামর্থ্যে'র কল্যাণেই একটিও গুলি না ছুঁড়ে আমরা নিজেদের ১২,০০০ বর্গমাইল এলাকা হারিয়েছি। তারপর লাদাকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঞ্চলে রাশিয়ানদের বিমানযোগে পরিভ্রমণকে অবিবেচনা প্রসূত আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করেন, চীনারা যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে চায় সেইগুলিই যে উক্ত রাশিয়ান বৈমানিকগণ এইভাবে সংগ্রহ করেননি তারই বা নিশ্চয়তা কী। রাশিয়ান বৈমানিক নিয়ে হেলিকপ্টারে লাদাক অঞ্চলে আমার পরিভ্রমণের বিষয়টিও উল্লেখ করে তীব্র আপত্তি জানান কৃপালনী।

দেশভক্ত হিসাবে কৃপালনীকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। আমার সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাঁর সামনে আমার বক্তব্য পেশ করে বলতাম, প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা না করে অন্য বহু ব্যক্তিকে তিনি এভাবে আক্রমণ করতে পারতেন অনায়াসে। বিখ্যাত উর্দু কবি গালিবের কবিতার দু'টি চরণ সেই সময় আমার মনে পড়ে গিয়েছিল:

হম্ আহ্‌ ভী ভরতে হঁ্যয়
তো হো জাতে হঁ্যয় বদনাম
বহ্‌ কতল ভী করতে হঁ্যয়
তো চর্চা নহী হোতা।

(দীর্ঘশ্বাস ফেললেও আমার বদনাম হয় ; অথচ অনেকে হত্যা করলেও তা' নিয়ে কেউ একটি কথাও বলে না।)

চীফ অফ্ দি জেনারেল স্টাফ পদে আমার নিযুক্তিতেও[৩২] আপত্তি প্রকাশ করে কৃপালনী বলেন, অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসরদের ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার অবহেলা করেছেন ; এবং তার ফলে আপত্তি জানিয়ে একজন অবহেলিত অফিসর কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেই অনুমতি প্রার্থনা করেছেন অবসর গ্রহণের জন্য। আসলে পরোক্ষে লেফ্টনাণ্ট্ জেনারেল ভার্মাকে ইঙ্গিত করেছিলেন কৃপালনী। ভার্মাকে ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল লেফ্টনাণ্ট্ জেনারেল দৌলত সিং এবং সেন-কে। পরিসমাপ্তিতে কৃপালনী বলেন, 'ভালোই হয়েছে যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্বয়ং এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আশাকরি যেভাবে তিনি দেশকে রক্ষা করেছেন তার চাইতে ভালোভাবে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন।'

প্রত্যুত্তরে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে মেনন বলেন, চীনা অনুপ্রবেশের ফলে আমাদের সেনাবাহিনীকে সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে আর কোন সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা সম্ভব হবে না। কিন্তু এইটুকু করতেই আমাদের সেনা বিভাগের উপর যথেষ্ট চাপ পড়েছে। কারণ, ভারতের পক্ষে চীনাদের মতো বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলা অথবা তাদের মতো অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা সম্ভব নয়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের মূলগত তফাৎ এই যে আমাদের কোন সামরিক জোট নেই। তাই নিজেদের ব্যাপারে নিজেদেরই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সীমান্ত লঙ্ঘন করে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করলে চীনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে পড়বে আমাদের চাইতে দীর্ঘতর। এবং আমাদের সুশিক্ষিত বাহিনী তাদের সম্যক মোকাবিলা করবার জন্য রয়েছে সদা জাগ্রত।

সেনাবাহিনীর মনোবল প্রসঙ্গে মেনন দৃঢ়স্বরে বলেন, তাদের মনোবল পূর্বের চাইতে এখন উন্নত হয়েছে অনেক। পদোন্নতির বিষয়ে বলেন, অনেক রকম কথাই উঠেছে এই নিয়ে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হ'ল, লেফ্টনাণ্ট্ কর্ণেলের পরবর্তী দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমেই পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

৩২। কৃপালনী আমাকে 'বর্তমান সি. জি. এস' বলে উল্লেখ করেন

উচ্চতর পদে কারও 'অগ্রাধিকার' বলে কোন কথা নেই। তাই দাবিয়ে রাখা বা অবহেলা করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। পদোন্নতির ব্যাপারে চাকুরীগত প্রবীণত্বও হ'ল অন্যতম একটি বিচার্য বিষয় মাত্র; শেষ কথা নয়।

আরও বলেন, সিদ্ধান্ত যদি পূর্ব হতেই স্থির করা থাকে তবে ইচ্ছা মতো উপসংহার টানা কিছুই নয়। 'সেনাবাহিনী সম্বন্ধে আচার্য কৃপালনীর কোন ধারণাই নেই, তাদের সংস্পর্শেও তিনি কোনদিন আসেন নি। এবং তাঁকে আসতেও দেওয়া হবে না।' মনে হয় নিয়ম-নীতি অমান্য করে কিছু সংখ্যক সামরিক অফিসরের বিশেষ কয়েকজন সংসদ সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করবার 'সুযোগ-সুবিধা' রয়েছে। এবপর তিনি লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল পদে আমার নির্বাচনকে সমর্থন করে কতগুলি তথ্য সংসদে পেশ করেন: ২২৬ জন মেজরকে লেফ্‌টনাণ্ট্‌ কর্ণেল পদে উন্নীত করা হয়েছে, ৪৮৫ জন প্রার্থীর দাবী বাতিল করে; ৮৩ জন প্রার্থীকে ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে ৭০ জন লেফ্‌টনাণ্ট্‌ কর্ণেলকে; ৫৭ জন প্রার্থীকে ডিঙ্গিয়ে ৩৯ জন কর্ণেলকে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়েছে; ৭ জন ব্রিগেডিয়াবকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়েছে ১৭ জন প্রার্থীকে বাদ দিয়ে, এবং ৫ জন প্রার্থীকে ডিঙ্গিয়ে ৪ জন মেজব জেনারেলকে লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সেনা বিভাগে ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি প্রদান করা একটি সাধারণ ব্যাপার। প্রধান সেনাপতি পদে নির্বাচিত হবার সময় জেনারেল থিমায়াও তিন-চার জনকে ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন।

মেনন আরও মন্তব্য করেন, কৃপালনীর আরও একটি অলীক কল্পনা-প্রসূত উদ্ভট অভিযোগ হ'ল সেনাবাহিনীর একাধিক ব্যক্তি না কি পদত্যাগ করেছেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু চাকুরীকাল শেষ হবার পূর্বেই অবসর গ্রহণের প্রার্থনা জানিয়েছেন মাত্র একজন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য লোকসভার বিরতি হলে স্বীয় সংসদীয় দফতরে নেহ্‌রু আমায় ডেকে পাঠান, এবং লোকসভায় পেশ করবার জন্য আমার কর্মজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখে দিতে বলেন। ছোট্ট একটি কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য সংক্ষেপে লিখে দিই; এবং আমার অনুরোধে তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যাচাই করে নেন নেহ্‌রু।

অপরাহ্ণে পুনরায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে জবাব দিতে ওঠেন নেহ্‌রু। কৃপালনীর বক্তৃতাটিকে একনায়কসুলভ বলে অভিহিত করে মন্তব্য

করেন, সিদ্ধান্ত ভুল হবার একটা যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশনের সপক্ষে কোন যুক্তিই হয় না। কৃপালনী করেছেন তাই। বিগত অধ্যায়গুলিতে একাধিকবার বলেছি, মাত্র কয়েক বৎসর স্থায়ী সেনাবাহিনীর বাইরে কাজ করা ছাড়া চাকুরী জীবনের অধিকাংশই আমার অতিবাহিত হয়েছিল পদাতিক বাহিনীতে। পদাতিক বাহিনী সম্বন্ধে আমার অনভিজ্ঞতার যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তার জবাব দিতে গিয়ে নেহ্‌রু উক্ত তথ্যের উল্লেখ করে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, আক্রমণ করবার পূর্বে মাননীয় সদস্যগণ একটু চেষ্টা করলেই আমার[৩৩] যোগ্যতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারতেন। আরও বলেন:

'লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল কল হলেন আমাদের সেনাবাহিনীর একজন উজ্জ্বলতম এবং যোগ্যতম অফিসর। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এ কথাটা আমি ঘোষণা করছি। আমার সুদৃঢ় অভিমত কৃপালনী যদি তাঁকে ভালো করে জানতেন, তা'হলে তাঁরও অভিমত হ'ত অনুরূপ। সেনাবাহিনী সম্বন্ধে লোকের এই ধরনের কথা-বার্তা শুনে অবাক লাগে আমার। যোগ্যতার বিচারে আমাদের সেনাবাহিনী এবং অফিসরগণ নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।'

ভারতীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে রাশিয়ান বৈমানিকদের পরিভ্রমণের অভিযোগের উত্তরদান প্রসঙ্গে মেনন বলেন, রাশিয়ার কাছ থেকে আমরা হেলিকপ্টারগুলি খরিদ করতে মনস্থ করেছি। বিমানগুলিকে সাধারণতঃ যে সমস্ত অঞ্চলে কাজ করতে হবে সেই অঞ্চলেই তাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ ধরনের বিমান আমাদের কাছে নতুন। তাই পরিচালনার ব্যাপারে রুশ বৈমানিকগণ আমাদের বৈমানিকদের সাহায্য করছে। যে বিশেষ বিমান-যাত্রাটি সম্বন্ধে বিরোধীপক্ষ আপত্তি তুলেছেন, তাতে কোন ক্যামেরা ছিল না। বিমানে ছিলেন একজন রুশ এবং দুইজন ভারতীয় বিমানচালক ও একজনমাত্র যাত্রী, কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল (তখন আমিই ছিলাম)। তাঁর নিউইয়র্ক থাকাকালীন ১৯৬০ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে ২০,০০০ ফিটেরও উর্ধ্বে উক্ত পরীক্ষা কার্যটি চালান হয়, এবং এই দুরূহ কাজের জন্য অন্য কেউই স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন নি।

উত্তপ্ত বিতর্কের পর মেনন এবং কৃপালনী করমর্দন করে চায়ের আসরে বসে বলেন, তাঁদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য নেই।

৩৩। 'চীফ অফ্‌ দি জেনারেল স্টাফ' কথাটি ব্যবহার করেন নেহ্‌রু।

১৯৬১ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে আমার সমর্থনে টাইম্‌স্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া লিখল ঃ

কয়েক মাস পূর্বে দারুণ শীতের মধ্যে লাদাকের সুউচ্চ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে একটি রাশিয়ান হেলিকপ্টারের উড্ডয়ন ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিমান চালনা করেন জনৈক রুশ বিশেষজ্ঞ। পরীক্ষা কার্য সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তনের পথে একমাত্র যাত্রীটিকে চালক জানান যে বিমানের জ্বালানী তেল নিঃশেষিত হয়ে গেছে এবং বাধ্য হয়ে বিপজ্জনক অবতরণের ঝুঁকি নিতে হবে। অতঃপর (লাদাকের) একটি বাটির আকারের পার্বত্য ভূভাগে হেলিকপ্টারটি নিরাপদে অবতরণ করে। সেই যাত্রীটি ছিলেন বর্তমান চীফ অফ্‌ দি জেনারেল স্টাফ, লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল বি. এম. কল। এই পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন কার্যটির জন্য কেউ তাঁকে আদেশ করেন নি। অনেকেই হয়তো এই বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে পিছিয়ে যেতেন। কিন্তু আপন নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপহীন দুর্দান্ত সাহসী কল স্বেচ্ছায় এই বিপজ্জনক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সঙ্কটময় পার্বত্য অঞ্চলে উড্ডয়নের পক্ষে রাশিয়ান হেলিকপ্টার উপযুক্ত কি না সেইটেই নিজে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন তিনি। এবং এই ব্যাপারে স্থির নিশ্চয় হবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেন ও দারুণ বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। কিন্তু এসব কোন কিছুই তাঁকে কাবু করতে পারে নি। অসীম মহাশক্তি-সম্পন্ন, অদম্য এবং সদা প্রফুল্ল এই ব্যক্তিটি নির্বুদ্ধিতা সহজে সহ্য করতে পারেন না। সর্বোপরি, কার্য সিদ্ধির ক্ষমতা তাঁর অদ্ভুত। নিজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ী বলে কোন রকম আলস্য তাঁর কাছে অসহ্য। নিজের প্রচণ্ড কর্মোদ্যমকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে বিজ্জি কলের। জীবন তাঁর কাছে উদ্দেশ্য-বিহীন নয় ; এবং সেই উদ্দেশ্য তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সীমারেখা মেনে চলে না···দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা-সম্পন্ন এবং সদা-কর্মতৎপর এই ব্যক্তিটির সঙ্গে তাল রেখে চলা দুরূহ··· ।

এই ধরনের মাঝে মাঝে প্রশংসা সত্ত্বেও, সম্ভবতঃ মেননের সঙ্গে মেলামেশার কারণেই এই সময় আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। মেনন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হওয়ায় অনেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই পদে তাঁর নির্বাচনের জন্য আমাকে নিশ্চয়ই দায়ী করা যায় না। কেউ যদি মনে করে

থাকেন, সৈন্য বিভাগের স্বার্থ বিরোধী মেননের কার্যাবলীকে আমি নীরবে সমর্থন করেছি তা' হ'লে ভুল করবেন। প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা না করে বলতে পারি, এ ধরনের কোন কাজই আমি করি নি। এই গ্রন্থটি পাঠ করবার পর আশা করি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তার উপর মেনন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হবার দরুণ আমার যে কিছু ব্যক্তিগত লাভ হয়েছিল তাও নয়। চাকুরীতে আমার যা কিছু উন্নতি, তা' হয়েছিল ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার গুণে এবং উপরওয়ালার নিয়মতান্ত্রিক সুপারিশের উপর ভিত্তি করে। মেননের সঙ্গে আমার ভূমিকা যেভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে, তা' সম্পূর্ণ ভুল। জটিল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এই মানুষটির সঙ্গে আমি অনেকের চাইতেই অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে ব্যবহার করেছি; এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সময় সর্বদাই বিভাগীয় স্বার্থকে সব চাইতে বড় করে দেখেছি।

কয়েকদিন পূর্বে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেয়েছিলাম, সেই বছরই বরফ গলবার সাথে সাথে উত্তর সীমান্ত মধ্যস্থিত বড়াহোতিতে চীনারা একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে মনঃস্থ করেছে। থিমায়াকে ব্যাপারটি জানাই, এবং চীনাদের আগেই সেখানে আমাদের একটি ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাবে থিমায়া সম্মত হন।

সেই উদ্দেশ্যে পূর্বাঞ্চলের সামরিক সদর দফতরকে (HQ Eastern Command) বড়াহোতিতে একদল সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করি। তাঁরা কিন্তু এই বলে আপত্তি করলেন যে, আমরা সৈন্য পাঠালেই চীনারা সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং এই ভাবে ক্রমশঃ তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অবস্থা মোকাবিলা করবার মতো যথেষ্ট সৈন্যবল তাঁদের নেই। এই ব্যাপারে কোনরূপ বিতর্কের সৃষ্টি করা আমার অভিপ্রেত ছিল না। তাই থিমায়ার অনুমোদন অনুসারে ব্যাপারটি নিজের হাতেই গ্রহণ করলাম। সেই সময়েই কাশ্মীরের অত্যুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক তৎপরতার প্রশিক্ষণ কার্য সমাপ্ত করে একদল সৈন্য ফিরে এসেছিল। তাদেরই উপর দিলাম এই দায়িত্বভার। প্রখ্যাত পর্বতারোহী কাপ্টেন (বর্তমানে লেফ্‌টনাণ্ট্‌ কর্ণেল) এন. কুমার, যিনি কিছুদিন পূর্বেই এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের একজন সদস্যরূপে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে নিযুক্ত করলাম এই দলটির অধিনায়করূপে।

আমার অভিপ্রায় ছিল বরফ গলবার অনেক আগে এবং চীনাদের পৌঁছুবার পূর্বেই আমাদের দলটিকে বড়াহোতিতে প্রেরণ করা। তাই কুমারকে বললাম,

এভারেস্ট অভিযানে তিনি যখন ২৮,০০০ ফিট উচ্চে আরোহণ করতে পেরেছেন, তখন এ ক্ষেত্রে মাত্র ১৫,০০০ ফিট আরোহণ করা তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। বছরের এই সময়টিতে সেখানে অবশ্য প্রচুর বরফ জমে থাকে। কিন্তু এভারেস্ট অভিযানে এর চাইতে অনেক বেশী বরফের মোকাবিলা করেছেন তিনি। পরিশেষে বললাম, মাতৃভূমির নামে এই বিপজ্জনক দায়িত্বের সম্মান তাঁকে দেওয়া হচ্ছে, এবং তিনি যে সাফল্যলাভ করবেনই সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। এই কথাগুলি বলে যাত্রাপথে তাঁর শুভকামনা করলাম।

উক্ত সুউচ্চ অঞ্চলে তখনও পূর্ণোদ্যমে বিরাজ করছিল শীতকাল। একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। বিগত বৎসরগুলিতে যে সময় লোকে বড়াহোতিতে গিয়েছে তার চাইতে আগে এবং চীনাদের পূর্বেই যদি আমাদের সেখানে পৌছুতে হয় তবে সেটা করতে হবে অবিলম্বে। কুমার ব্যাপারটি বুঝেছিলেন। 'অভিযান'টির জন্য কিছু কিছু সাহায্যও প্রার্থনা করেন তিনি; এবং সেগুলি তাঁকে প্রদানও করা হয়।

কুমার ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা নায়ক। তাঁর অধীনস্থ সৈনিকগণ ছিল তদ্রূপ। ফলে, পথমধ্যে বহুবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করে এবং একাধিক বিজ্ঞ ভবিষ্যদ্বক্তাকে নিরাশ করে বড়াহোতির মালভূমিতে তিনি ভারতের পতাকা প্রোথিত করলেন। চীনারা তখন অবধি সে অঞ্চলে পদার্পণও করতে পারে নি।

পরে অনেক চেষ্টায় আকাশপথে সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে ঘাঁটিটিকে বজায় রাখি। সৈনিকগণ সেখানে যাতে সম্বৎসর থাকতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আবাসস্থল তথা বড়াহোতি অবধি একটি সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনাও প্রস্তুত করি। সড়কের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেন লেফ্‌টনাণ্ট্‌ কর্ণেল মার্ক ভ্যালাডারেস। কাজের প্রতি তাঁর ছিল অন্ধ অনুরাগ। অতীব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও অতীতে এ ধরনের বহু দায়িত্ব তিনি অনায়াসে সুসম্পন্ন করেছেন।

এপ্রিল মাসে থাপার প্রধান সেনাপতির[৩৪] দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

থাপার ছিলেন বিবেকবান, দক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণ। পেশাগত সততা এবং বিভাগীয় স্বার্থের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসীম; আর ছিল আপন

৩৪। থিমায়া প্রাক্-অবসর ছুটিতে যাবার পর।

বিচারবুদ্ধির প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়। যতই অপ্রিয় হোক না কেন, উপরওয়ালাদের সামনে আপন মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করতেন। প্রধান সেনাপতিরূপে তাঁর নিয়োগের ঘটনা নিয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অনেক প্রচারকার্য চালায়। উদ্দেশ্য ছিল, নেহ্‌রু (এবং মেনন) 'অনুপযুক্ত' ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করেছেন, এই ধরনের একটি ধারণার সৃষ্টি করা।

দিল্লীতে আমাকে কাজ করতে হয়েছে ডেপুটি চীফ অফ্ দি আর্মি স্টাফ লেঃ জেনারেল ওয়াদালিয়া, অ্যাডজুটেণ্ট জেনারেল লেঃ জেনারেল পি. পি. কুমারমঙ্গলম এবং কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল লেঃ জেনারেল আর. কে. কোছারের সঙ্গে। আমি যখন সি. জি. এস., সে সময় পদোন্নতি এবং নিযুক্তির দায়িত্ব ছিল সামরিক সচিব মেঃ জেনারেল মোতি সাগর এবং তাঁর সহকারী ব্রিগেডিয়ার এম. এম. বাদশাহের উপর। মোতি এবং আমি কলেজে ছিলাম সহপাঠী, এবং ইস্ট সারে রেজিমেণ্টে উভয়ে একসঙ্গে কাজও করেছি। কর্মজীবনে একাধিকবার আমাদের দেখা হয়েছে। একই 'কোর'-এ লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর অধীনে আমি ছিলাম ৪নং এবং তিনি ছিলেন ২৭নং ডিভিশনের অধিনায়ক। ১৯৫৪ সালে আঞ্চলিক বাহিনীর অধিকর্তারূপে মোতির বদলি হয়, এবং তাঁর স্থানে জেনারেল থিমায়ার অধীনে দক্ষিণ কমাণ্ডের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ পদে আমাকে নিযুক্ত করা হয়। সেই সময় শিশু-পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত মোতির পুত্রের চিকিৎসা চলছিল পুনাতে। তাই তাঁকে পুনায় থাকতে দিতে (এবং নিজে আঞ্চলিক বাহিনীর অধিকর্তার পদটি গ্রহণ করতে) রাজি হই। আমার প্রয়োজনের সময়েও মোতি এই ধরনের অনেক সাহায্য করেছেন।

দেশ বিভাগের পূর্বে পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খান এবং 'মণি' বাদশাহ একই সঙ্গে কাজ করতেন ১/১৪ নং পঞ্জাব রেজিমেণ্টে। পরবর্তীকালে শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের অধিনায়ক এবং করাচিতে ভারতীয় দূতাবাসের সামরিক সহকারীরূপে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন বাদশাহ। কিন্তু পাক-ভারত সীমান্তের একটি পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়করূপে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন,[৩৫] তা তাঁর সমস্ত অতীত

৩৫। হুসেইনেওয়ালার যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে চরম পর্যুদস্ত করে তিনি বিজয়ী হন। এই পরাজয়ের ফলে পাকিস্তানী ব্রিগেডের অধিনায়ক জনৈক ব্রিগেডিয়ারকে পদচ্যুত করা হয়।

কীর্তিকে অতিক্রম করে যায়। আমি যে-সময় কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল, সে সময় তিনি আমার অধীনে অসাধারণ কর্মদক্ষতা এবং প্রগাঢ় সততার সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

ও. পুল্লা রেড্ডি ছিলেন প্রতিরক্ষা সচিব। সুদক্ষ আই. সি. এস. অফিসর এইচ. সি. সারিন ছিলেন সংযুক্ত সচিব (জি); এবং তাঁর অধীনে ছিল সামরিক অভিযান, গুপ্ত তথ্য, উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসরদের পদোন্নতি এবং সামরিক বিভাগের প্রচার দফতর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত থাকার দরুন কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সাধারণতঃ ধীর এবং স্থির প্রকৃতির এই মানুষটি কিন্তু কোন রকম অন্যায় দেখলেই রুখে দাঁড়াতেন। মেননের অধীনে আর একজন সংযুক্ত সচিব জন লাল ছিলেন সিকিম ও ভূটান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। প্রতিরক্ষা উৎপাদনের মহা-নিয়ামক (Controller General of Defence Production) পদে ছিলেন অ্যাডমিরাল ডি. শঙ্করের মত সুযোগ্য অফিসর। অনেকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় নতুন প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।[৩৬] প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন তীক্ষ্ণধী এবং মধুর-স্বভাব জয়শংকর। তাঁর মনিব ছিলেন দু'জন: অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন। ফলে প্রায়ই তাঁকে পড়তে হ'ত মহা সঙ্কটে।

আদব-কায়দায় নিখুঁত স্বরাষ্ট্র সচিব বিশ্বনাথন ছিলেন কর্মদক্ষতায় অদ্বিতীয়। সম্পূর্ণ সীমান্তের তথা দেশ-বিদেশের যাবতীয় গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গুপ্ততথ্য সংস্থার অধিকর্তা বি. এন. মল্লিকের উপর। যে কোন সময় সরাসরি প্রধান মন্ত্রীর কাছে যাবার অধিকার ছিল তাঁর। স্বদেশপ্রাণ মল্লিক ছিলেন অতীব বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। উভয়ে আমরা কাজ করেছি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত। প্রায়ই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। মল্লিকের সহকারী হুজা ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, সুযোগ্য এবং নিঃস্বার্থ কর্মী। এছাড়া বৈদেশিক, অর্থ এবং মন্ত্রীপরিষদীয় সচিব ছিলেন যথাক্রমে এম. জে. দেশাই, ভূতলিঙ্গম এবং এস. এস. খেরা।

৩৬। আজ সেগুলির সুফল ভোগ করছে সবাই; কিন্তু কেউ তাঁর নামও করে না।

আমার সহকারী ছিলেন মেজর জেনারেল জে. এস ধীলন। যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই এই পদে তাঁকে আমি মনোনীত করেছিলাম। ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স্ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ধীলন জম্মু ও কাশ্মীরে একটি পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। এ ছাড়া অতিরিক্ত একটি যোগ্যতাও তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন একজন 'স্যাপার' অফিসর।

সামরিক তৎপরতার অধিকর্তা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ডি. বি. চোপরা। স্বল্পদিন পরেই তাঁর পদোন্নতি হলে, ব্রিগেডিয়ার 'মন্টি' পালিতকে উক্ত পদে নিয়োগ করি। এই নিযুক্তির একাধিক কারণ ছিল। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল পালিতের মধ্যে। সামরিক বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন তিনি। বিদেশে সেগুলি প্রকাশিত হয় এবং যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। চতুর্থ পদাতিক ডিভিশনে আমার অধীনে একটি ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করবার সময়েই তাঁর সামরিক দক্ষতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। পেশাগত ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদা-তৎপর এবং সামরিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও ছিল গভীর। নিঃস্বার্থ এবং সুযোগ্য ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র সিং ছিলেন আমার ডিরেক্টর অফ্ স্টাফ ডিউটিজ্। ব্যক্তিগত কারণে কয়েকমাস পর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলে (পরবর্তীকালে তাঁকে এন. সি. সি.-র অধিকর্তারূপে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়) উক্ত দায়িত্বভার দেওয়া হয় ব্রিগেডিয়ার 'জংগু' সাতারাওয়ালাকে। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাতারাওয়ালা ছিলেন একজন অক্লান্ত কর্মী। সামরিক সদর দফতরের যাবতীয় অধিকর্তাদের কাজ-কর্মের সমন্বয় সাধন করাই ছিল তাঁর মুখ্য দায়িত্ব। সামরিক প্রশিক্ষণের অধিকর্তা ছিলেন মেজর জেনারেল ডি. সি. মিশ্র। অটল আনুগত্য এবং অনুরক্তির সঙ্গে তিনি স্বীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, অমায়িক এবং সুযোগ্য মেজর জেনারেল কে. এন. দুবে ছিলেন সীমান্ত সড়ক সংস্থার মহা-অধিকর্তা। আমার অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জাম বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার 'আনতিয়া'র মতো নিঃস্বার্থ কর্মী। আঞ্চলিক বাহিনীর কর্ণেল বি. এন. খান্নার মতো অদম্য সাহসী এবং অতীব বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন আমার কর্মীদের মধ্যে। এছাড়া ছিলেন লেফ্টনাণ্ট্ কর্ণেল এবং মেজর পদে একাধিক সুযোগ্য অফিসর। লেঃ কর্ণেল পদে ছিলেন ডি. এস. রাও, বি. এন. খান্না, টি. বি. কাপুর এবং উজ্জ্বল সিং। সবাই ছিলেন নিঃস্বার্থ কর্মী এবং অতীব নির্ভরযোগ্য। এঁদের মধ্যে আমার সুযোগ্য সামরিক সহকারী তিলক

মালহোত্রাও ছিলেন। আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রিগেডিয়ার 'কিম' যাদব ছিলেন আমার জঙ্গল-যুদ্ধ প্রশিক্ষণ স্কুলের অধিনায়ক। আমার ব্যক্তিগত স্টেনোগ্রাফার স্বামী এবং বাওয়েজা-এর নামও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। দু'জনেই ছিলেন চমৎকার মানুষ। আর ছিল জিউনু ও হাজারা সিং, অক্লান্ত পরিশ্রমী আমার দু'জন পিওন। মোট কথা, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ্য একদল কর্মী পেয়েছিলাম আমার সঙ্গে।

এই প্রসঙ্গে আশা করি আমার তৎকালীন দৈনন্দিন কর্মতালিকা সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মানুষের জীবনে কঠিন পরিশ্রমের গুরুত্ব সম্বন্ধে ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে টি. ডবলু. রীস আমাকে যে শিক্ষাদান করেছিলেন, তাকে আন্তরিক সততার সঙ্গে অনুসরণ করে এসেছি। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠতাম খুব ভোরে, এবং গভীর রাতে শয্যা গ্রহণের পূর্ব অবধি কাজ করতাম এক নাগাড়ে। কোন রকম অভ্যাসের দাসত্ব আমার ছিল না। বিছানায় শুয়ে চা পান করবার বিলাস আমার জীবনে হয়েছে কদাচিৎ। প্রাতরাশ করেছি সামান্য দুধ আর ফল দিয়ে। সন্ধ্যা অবধি কাজ করেছি বিরামহীন। সময় সময় দ্বিপ্রাহরিক আহার পর্যন্ত বাদ পড়ে গেছে। এ সমস্ত সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা করি নি কোনদিন। এরই মধ্যে সময় করে পড়েছি ইতিহাস, সাহিত্য, কাব্য এবং নাটক; দেখেছি অভিনয় এবং শখ হিসাবে পর্বতারোহণ করেছি। গড়পড়তা দৈনিক কাজ করতাম আঠারো ঘণ্টা এবং শয্যা গ্রহণ করতাম মধ্যরাতের পর। কাজের চাপ যতই হোক না কেন, প্রতিদিনেরটি প্রতিদিন শেষ করবার একটা অভ্যাস করে নিয়েছিলাম। পর দিবসের জন্য পারতপক্ষে কোন কাজই ফেলে রাখতাম না। চিঠিপত্রের জবাব দিতাম ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিতভাবে; সংখ্যা সেগুলির যতই হোক না কেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু দুস্থ ব্যক্তির অভাব-অভিযোগের মর্মস্পর্শী কাহিনী আমার গোচরে এসেছে; এবং এর মধ্যেই প্রতিটি ক্ষেত্রে সহানুভূতি সহকারে যথাসত্বর সাধ্যমত সেগুলির প্রতিকার করেছি। এই কর্মব্যস্ততার ভিতরেই প্রতি রাতে সামান্য একটু সময় ঘুমিয়ে নিতাম। আমার নীতিই ছিল, প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করা। কারণ, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল প্রতিটি ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে আপন আপন কর্তব্য পালন করে যাওয়া; এবং সেই কর্তব্য ধীরে সুস্থে করতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন, তা' আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুর্লভ। এই নীতি

অনুসরণ করেই প্রতিটি পদক্ষেপে এবং কর্মতৎপরতার যথাসম্ভব দ্রুততা মেনে চলেছি আমি। দফতরে যাবার সময় কদাচিৎ 'লিফট্' ব্যবহার করতাম। বস্তুতঃ একরকম দৌড়েই উঠতাম উপরে। সৌভগ্যবশতঃ আমার দৈহিক গঠন ছিল শক্ত-সমর্থ এবং স্বাস্থ্যও ছিল চমৎকার। তাই বিরামহীন শারীরিক তথা মানসিক পরিশ্রম সহজে আমাকে কাবু করতে পারত না। আগেই বলেছি, কঠিন বিপজ্জনক সমস্ত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমার। সেই সমস্ত অবসরে অথবা সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করবার কালেও সেই একই দৈনন্দিন কর্মতালিকা অনুসরণ করে চলতাম। অনেকে নিয়ম-রক্ষার খাতিরে অফিসের সময়টুকু মাত্র কাজ করেন। কঠিন এবং শ্রমসাধ্য কাজগুলোকে সযত্নে এড়িয়ে চলেন তাঁরা। অথচ, গল্‌ফ্‌, পোলো ইত্যাদি খেলাধুলা, অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ এবং গাল-গল্পের জন্য সময়টুকু ঠিক বার করে নেন। এই ধরনের অফিসরেরা যখন কঠিন পরিশ্রমের অনুযোগ করতেন তখন আমার হাসি পেত। নির্বুদ্ধিতা অসহ্য মনে হ'ত আমার, এবং কাজের মধ্যে জোর করে এগিয়ে চলাই হয়ে দাড়িয়েছিল একটা অভ্যাস। বিলম্বের জন্য কোন অছিলা-অজুহাত সহ্য করতে পারতাম না; এবং শুধুমাত্র পদাধিকারের কারণে কখন কোন উপরওয়ালাকে ভয় পাই নি। তৎকালীন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অনেক রাজনীতিক নেতাদের আমি জানতাম। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল; আমাব সহকর্মীদের অধিকাংশই তখন ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হবার ভয়ে তাঁদের ধারে-কাছেও ঘেঁষতেন না।

চীফ অফ্ দি জেনারেল স্টাফের দায়িত্বভার গ্রহণ করে লক্ষ্য করলাম লাদাক থেকে নিফা পর্যন্ত আমাদের বিশাল সীমান্তে চীন, পাকিস্তান এবং নাগাদের কাছ থেকে গুরুতর আশঙ্কার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। গোয়ায় পর্তুগীজ সমস্যা তো ছিলই। পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে দুরভিসন্ধিমূলক মৈত্রী স্থাপিত হওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সর্বাধিক। উভয়ের ঘন ঘন সৈন্য চলাচল এবং প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ দেখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল যে সীমান্ত বরাবর তারা নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনা জীইয়ে রাখতে তথা আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে চায়। কখন যে তারা কোথা দিয়ে আক্রমণ করে বসবে অথবা কতদিন এই ধরনের মানসিক উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তার মধ্যে আমাদের দোলায়িত করে রাখবে তা' বুঝতে পারছিলাম

না। তাই আমাদের পক্ষে যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল সর্বাধিক। নেহ্‌রু এবং তাঁর সহকর্মীগণ তবুও চীন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশা ত্যাগ করেন নি।

ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সামরিক তৎপরতা তথা অস্ত্র-শস্ত্র এবং সমর-সম্ভারেব ব্যাপারে সরাসরি ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়া এই ছিল আমার প্রথম। কিছুদিন পূর্ব অবধিও এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিল পরোক্ষ, এবং তাও অপেক্ষাকৃত নিম্ন পদাধিকার থেকে। তাই সি. জি. এস. হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় বাহিনী এই সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করবার মত উপযুক্ত অবস্থায় রয়েছে কি না, তা' যাচাই করে দেখতে হবে। যদি না থাকে, সে ক্ষেত্রে ক্রটিগুলি সংশোধনের জন্য কী কী করা উচিত তাও দেখা দরকার। তা'ছাড়া যে সমস্ত অঞ্চলে আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে সংগঠিত করতে হবে, সেগুলিব সঙ্গেও ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। সেই উদ্দেশ্যে লাদাক থেকে নিফা এবং নাগাভূমি অবধি বিস্তৃত আমাদের ২,৫০০ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত এবং অন্যান্য অঞ্চলের অগ্রবর্তী ঘাঁটি-গুলিকে পবিদর্শন করলাম ভালোভাবে। অনেক স্থানে একাধিকবার যেতে হ'ল। দফতবে বসে মানচিত্র অথবা ফাইল দেখে কোন স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করাব চাইতে অনেক বেশী কার্যকরী হয় সেই স্থানটিকে ব্যক্তিগত-ভাবে পরিদর্শন করলে। দুর্গম অঞ্চলে নিজেদের ভিতরে উচ্চপদস্থ অফিসরদের দেখে সৈনিকগণও খুশী হয়। যাই হোক, পরিদর্শনের কাজটি সম্পন্ন করতে বেশ কয়েকমাস লেগে গেল।

সেনাবাহিনীতে অতিরিক্ত লোকবলের[৩৭] প্রয়োজন যে অত্যাবশ্যক সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হলাম উপযুক্ত অঞ্চলগুলি বিস্তারিত পরিভ্রমণের পর। কিন্তু বিষয়টির সুরাহা করতে গিয়ে যেন আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির একটি সমুদ্র বিশেষের সম্মুখীন হলাম। তার উপর এসে জুটলো একাধিক হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি।

৩৭। সাধারণ সৈনিক ছাড়াও, যোগ্যতা এবং সংখ্যার দিক থেকে অফিসরেরও নিদারুণ ঘাটতি ছিল আমাদের।

বৈদেশিক সেনাবাহিনী সম্বন্ধে সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ গুপ্ততথ্য সংগ্রহ সংস্থার উপর। এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গতি ছিল সীমিত এবং সরেজমিনে তথ্য সংগ্রাহক বিক্ষিপ্ত উপ-সংস্থাগুলির তৎপরতাও ছিল শ্লথ। ফলে, তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হ'তাম সেগুলি আশানুরূপ সঠিক হ'ত না।

[তথ্যাদি সংগ্রহ তথা প্রাপ্ত তথ্যের যথোচিত মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গুপ্ততথ্য সংগ্রহ সংস্থা এবং সামরিক বিভাগ অধিক সংখ্যক যোগ্য কর্মচারী এবং উপযুক্ত সরঞ্জামাদির দাবী বার বার পেশ করেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়া গেছে কদাচিৎ।]

সৈনিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও কম জরুরী ছিল না। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহড়ার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও, ফল বিশেষ কিছুই হয় নি। কারণ, আমাদের সমর সম্ভারের অধিকাংশই ছিল অকেজো এবং পুরনো ধরনের। পর্যাপ্ত সংখ্যায় আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম আমাদের সরবরাহ করা হয় নি। তা'ছাড়া প্রশিক্ষণের 'স্থানের'ও অভাব ছিল। বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, শিল্প এবং কৃষি উন্নয়নের অজুহাতে আমাদের প্রার্থিত এলাকায় উপযুক্ত পরিমাণ স্থান সঙ্কুলান করতে সরকার অপারগ হয়েছেন। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির যে ভাবেই হোক সমাধান করা উচিত ছিল।

সমর কৌশলের ব্যাপারেও আমাদের ত্রুটি উপেক্ষণীয় ছিল না। চীনাদের প্রত্যাঘাত অথবা উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদানের জন্য তাদের যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের সুদক্ষ করে তোলার প্রয়োজনীয়তা আমাদের ছিল সর্বাধিক। সরকারকে এ ব্যাপারে দোষী করা যায় না। কারণ, এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব; এবং বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের বিরাট একটি ত্রুটি। সামগ্রিকভাবে, জেনারেল স্টাফ তথা সেনাবিভাগের বিভিন্ন 'কোর' এবং 'ডিভিশনের' অধিনায়কদের কর্তব্য ছিল এই ব্যাপারটির প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা। এর জন্য জেনারেলদের কারও কাছ থেকে অনুমতি নেবারও প্রয়োজন ছিল না। কেউ বাধাও দিত না তাঁদের। এবং, কোন রকম অসুবিধা হলে অনায়াসেই তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

করতে পারতেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমরা সবাই উপেক্ষা করেছিলাম। অন্ততঃপক্ষে গেরিলা যুদ্ধ-কৌশল কিংবা কাজ চালাবার মত কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেও, লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জামের ঘাটতি-জনিত অসুবিধাগুলিকে খানিকটা দূর করা যেত। এ কর্তব্যচ্যুতির দায়িত্ব ভারতীয় বাহিনীর সমস্ত জেনারেলদের। ১৯৬১-৬২ সালে চীফ অফ্ দি জেনারেল স্টাফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম আমি। অতএব, বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে উক্ত বিচ্যুতির আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত।[৩৮]

যাই হোক, অত্যুচ্চ পার্বত্য এলাকায় ঘাঁটিস্থাপনের অসুবিধা ছিল অনেক। সেখানকার জলবায়ুতে সৈনিকদের অভ্যস্ত করানো, সাজ-সরঞ্জাম এবং যান-বাহনাদির ব্যবহারে তাদের রপ্ত করা, বিমানবন্দর নির্মাণ এবং সৈনিক তথা রসদাদির জন্য উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ছিল দুরূহ ব্যাপার। এই জটিল সমস্যাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করলাম।

আমাদের সীমান্তের সামরিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল ভূটান এবং নেপালের সূক্ষ্ম অনুভবনশীল অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ব্রিটিশ রাজত্বের সময় নেপাল ছিল নামে মাত্র স্বাধীন; এবং এই দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা আমাদের পক্ষে যে কত প্রয়োজনীয়, তা' জানতাম। ব্রিটিশশক্তি এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর নেপালের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে ভারত স্বীকৃতি প্রদান করে। সেই সঙ্গে নেপালী কংগ্রেসের মত গণতান্ত্রিক শক্তিকেও সহানুভূতি জানাতে থাকে। (রাণাদের গদীচ্যুত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল নেপালী কংগ্রেস।) রাণারা ছিলেন নেপালের পুরুষানুক্রমিক শাসক সম্প্রদায়; এবং নেপালের প্রধান মন্ত্রীর পদ সর্বদা তাঁদেরই অধিকারে থাকত। সঙ্কটকালে নেপালের রাজাকে আশ্রয় প্রদান করে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হই। নেপালী কংগ্রেস এবং তথাকার জনসাধারণও আমাদের সুনজরে দেখতে থাকে (কারণ তাদের সংগ্রামের প্রতি আমরা সমর্থন জানিয়েছিলাম)।

৩৮। এ ত্রুটির দায়িত্ব থেকে কোন জেনারেলকে যেমন অব্যাহতি দেওয়া যায় না, তেমনি এককভাবে দায়ীও করা যায় না কাউকে।

কিছুদিন আগেও নেপালের অবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় কোন রাজ্যের মত। উল্লেখযোগ্য কোন পথ-ঘাট কিংবা রেলপথ কিছুই ছিল না। বিমানবন্দর ছিল মাত্র একটি। নেপালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ রাতারাতি কঠোর হস্তে সব কিছুর পরিবর্তন করতে চাইলেন। ফলে, নতুন রাজা হয়ে ওঠেন তাঁদের বিরোধী। সেই সঙ্গে নেপালী কংগ্রেসের প্রতি ভারতের সহানুভূতির জন্য আমাদের প্রতিও তিনি বিরক্ত হন। (ফলস্বরূপ নেপাল-ভারত সম্পর্কের অবনতি দেখা দেয়। পরে অবশ্য সম্পর্কের উন্নতি হয় আবার।) ভারত এবং নেপাল উভয় দেশের পক্ষেই চীন হ'ল বিপজ্জনক। নিজের ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই চীন আমাদের দুই দেশের মধ্যে একটা ভুল বোঝা-বুঝি সৃষ্টি করবার সমস্তরকম সুযোগ গ্রহণ করছে।

কিছুদিন থেকেই ভারত এবং চীনের সম্পর্ক দ্রুত অবনতির দিকে চলেছিল। চীনা অনুপ্রবেশের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল দিনের পর দিন। ভারতের তরফ থেকে বারংবার প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল হয় নি। যে সমস্ত অঞ্চলে আমাদের বাহিনী নেই, সেই সমস্ত অঞ্চলে প্রথমে ঢুকে পড়ে তারপর ঘাঁটি গেড়ে বসাই ছিল চীনাদের কৌশল। ব্যাপারটি বেশী করে ঘটতে থাকে লাদাক অঞ্চলে। সম্প্রতি তাদের যুদ্ধং দেহি মনোভাব যেন আরও বেড়ে উঠেছিল। এই সময় কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী জনসাধারণের মনোভাবের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করতে সোৎসাহে লেগে পড়েন যে, ভারতীয় অঞ্চলে চীনা অনুপ্রবেশ রোধ করতে তাঁরা প্রস্তুত; কিন্তু কিছু করতে পারছেন না কেবলমাত্র নেহ্রু এবং মেননের বাধাদানের জন্য। অসাড় বাগাড়ম্বর ছাড়া এগুলি আর কিছুই ছিল না। বস্তুতঃ বহু বৎসর পূর্বেই বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের জনৈক বিশেষজ্ঞ প্রস্তাব করেছিলেন, চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে লাদাক থেকে নিফা অবধি ভারত সীমান্ত বরাবর সঙ্কেত চিহ্ন স্বরূপ খুঁটি পুঁতে আপন অঞ্চলে আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। কিন্তু উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ সে সময় সঙ্গতির অপর্যাপ্ততার অজুহাত তুলে সে প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকৃত হন। এমন কি একথাও তাঁরা বলেন যে, সীমান্ত বরাবর ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপন করা সামরিক দিক থেকে অনুপযুক্ত হবে। ইতিমধ্যে সামরিক বিভাগের বিভিন্ন ঘাটতিগুলি পূরণের ব্যাপারেও সরকার অবহেলা করলেন।

ফলে, ইচ্ছামত আমাদের অঞ্চলগুলি দখল করতে শুরু করল চীন। এবং, পুনঃ পুনঃ এ ধরনের ঘটনার কথা শুনে জনসাধারণের বিভিন্ন মহলেও শুরু হয়ে গেল তুমুল উত্তেজনা। চীনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠতে আরম্ভ করল চারদিক থেকে।

সীমান্ত রক্ষা সমস্যার আলোচনার জন্য নেহ্‌রু এই সময় প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন। যতবার আলোচনা হয়েছে ততবারই বলেছি, সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য বহু বৎসর ধরে সামরিক কর্তৃপক্ষের বারংবার অনুরোধ সরকার উপেক্ষা করেছেন; এবং তারই ফলে চীনাদের উপযুক্ত মোকাবিলা করবার মতো অবস্থা এখন আর আমাদের নেই। বলা বাহুল্য, কথাগুলি নেহ্‌রু খুশী মনে গ্রহণ করতেন না।

এই সময়, সংসদের বিরোধীপক্ষের কয়েকজন নেতা একদিন বহির্বিষয়ক মন্ত্রকে নেহ্‌রুর সঙ্গে একটি গোপন আলোচনা-সভায় মিলিত হন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নেহ্‌রু সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের সীমান্ত পরিস্থিতির বর্ণনা দেন; কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি। জনৈক বিরোধী পক্ষের নেতা বলেন: 'মানুষের কাছে সব চাইতে প্রিয় হ'ল দুটি জিনিস: জমি এবং স্ত্রীলোক। ১২,০০০ বর্গ মাইল জমি ইতিমধ্যে আপনি চীনকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেছেন। এবার কি আমাদের স্ত্রীলোকদেরও তাদের উপহার দিতে চান?'[৩৯] শুনে মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছিল নেহ্‌রুর; কিন্তু একটি কথাও বলতে পারেন নি।

এই ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং সমালোচনার কথা যে নেহ্‌রু জানতেন না তা' নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সেনাবাহিনীর অসুবিধাগুলির কথাও তাঁর জানা ছিল। তাই এমন একটি মধ্যপন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা তিনি করছিলেন যাতে যুদ্ধ না করেও জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে   শরৎকালে একদিন তিনি নিজের অফিস কক্ষে একটি আলোচনা-সভা আহ্বান করেন।[৪০] সে সভায় কৃষ্ণ মেনন এবং

৩৯। কথাটি হিন্দীতে ছিল: 'ইন্‌সান্ কো দো চীজ প্যারী হ্যাঁয়: জমিন ঔর ইস্ত্রি। আপ নে চীনিওঁ কো ১২০০০ স্কোয়ার মীল জমিন তো দে দী, ক্যা অব হমারী ইস্ত্রিয়াঁ ভী উনকো দেনে কা ইরাদা হৃয়?'

৪০। চীন কিংবা অন্য কোন দেশ কর্তৃক আমাদের সীমানা লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে নেহ্‌রুকে ওয়াকিবহাল রাখা হ'ত। এই ব্যাপারে মাঝে মাঝে তিনি আমার সঙ্গে

জেনারেল থাপারের সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সামরিক মানচিত্রে সাম্প্রতিক চীনা অনুপ্রবেশের স্থানগুলি লক্ষ্য করে নেহ্‌রু মন্তব্য করেন, স্থানগুলিতে যেপক্ষ কোন রকমে একবার (অন্ততঃপক্ষে সঙ্কেত স্বরূপও) ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবে, দাবীও প্রতিষ্ঠিত হবে তারই। কারণ, আইনে দখলের গুরুত্বই বেশী, এবং চীনারা যদি ঘাঁটি স্থাপন করতে পারে, তাহ'লে আমরাই বা পারব না কেন ?

জবাবে তাঁকে জানান হয়, সৈন্য সংখ্যা এবং চলাচল তথা সরবরাহ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে চীনাদের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় আমরা পেরে উঠছি না। প্রতিশোধস্বরূপ আরও ঘাঁটি হয়তো স্থাপন করা যেতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তা' ছাড়া চীনাদের অধিকতর সামবিক সামর্থ্যেব সামনে আমাদেব ছোট ছোট ঘাঁটিগুলির পক্ষে টিকে থাকাও অসম্ভব হবে। অবশ্য, কিছু সংখ্যক নগন্য ঘাঁটি আমরা স্থাপন করেছি এবং অতি কষ্টে সেগুলিকে টিকিয়েও রেখেছি।

পরবর্তী আলোচনার শাবমর্ম যা বুঝলাম তা' হ'ল (যেহেতু চীনের দিক থেকে ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা নেই) ঘাঁটি স্থাপনের ব্যাপারে চীনের সঙ্গে দাবার চালেব মত বুদ্ধির লড়াই চালিয়ে যেতে কোন ক্ষতি নেই। তারা এক স্থানে এগিয়ে এলে, আমরা এগিয়ে যাবো অন্য স্থান দিয়ে। অন্য কথায়, যতদূর সম্ভব তাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে হবে; এবং যে স্থানগুলি আমাদের বলে নিঃসন্দেহে জানি, সেগুলির যেখানে পারা যায় কয়েকটি করে প্রতীক ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে। এই ধবনের আমাদের আত্মরক্ষামূলক আচরণে বড় জোর অসন্তুষ্ট হতে পারে চীন। তার বেশী কিছু হবে না। আমার ধারণায়, সীমান্ত সম্বন্ধে আমাদের যে নতুন নীতি স্থিরীকৃত হয়েছিল, তা' ছিল এই। (এটাকেই অনেকে 'অগ্রসর' নীতি বলে অভিহিত করেন।)

বছরের শেষ নাগাদ লাদাক এবং নিফা অঞ্চলে এই ধরনের প্রায় পঞ্চাশটির উপর ঘাঁটি স্থাপন কবে ভারতীয় এলাকার প্রায় ২০০০ বর্গমাইল স্থানে আমরা দখলীসত্ত্ব স্থাপন করি। প্রশাসনের উদ্দেশ্যে ঘাঁটিগুলি স্থাপন করা হয় নি;

বেসরকারীভাবে পরামর্শও করতেন। ১৯৬১ সালের শরৎকাল নাগাদ চীনা অনুপ্রবেশের ঘটনা অনেক বৃদ্ধি পায়, এবং তার জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বোধ করলেও, কার্যতঃ কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেব কথা তিনি চিন্তাও করেন নি। একাধিকবার চীনকে নিয়মমাফিক সতর্ক করে দিয়েছেন মাত্র।

কারণ সে সব জায়গায় কোন মনুষ্য-বসবাস নেই ; আসল উদ্দেশ্য ছিল চীনারা যাতে নিফা অথবা লাদাকে আকসাই-চীন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করতে পারে। মনে হয় প্রধানতঃ সংসদ এবং জনসাধারণের সন্তুষ্টিবিধায় তথা সম্ভবতঃ চীনাদের তাদের নিজেদের কৌশল দিয়েই জব্দ করবার উদ্দেশ্যে নেহ্রু এই নীতি নির্ধারিত করেন ; এবং এটিকে উদ্ভাবন করেন এমন এক সময়ে যখন ভারত-চীন সম্পর্ক দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছিল আর সমালোচকেরাও হয়ে উঠেছিল মুখর। এবং, এই একটি মাত্র নীতি অনুসরণ করেই তাদের নিরস্ত করবার পথ দেখতে পেয়েছিলেন নেহ্রু। যেভাবে তিনি সীমান্ত পরিস্থিতি পরিচালনা করছিলেন, তার বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের সংসদ সদস্যদের ক্রমাগত অবাস্তব সমালোচনার কারণেই তিনি এই অবস্থার মধ্যে পতিত হন। (ঘটনাস্রোত এমন ভাবে এগিয়ে যেতে থাকে যে, ১৯৬২ সালে ভারতের আপামর জনসাধারণকে হতবাক করে দিয়ে চীন এবং আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে ওঠে।)

আর. কে. নেহ্রু একদিন জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং আমাকে নৈশ আহারে নিমন্ত্রণ করেন। অনেক বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়। তার মধ্যে সীমান্তে চীনা বিপদের প্রসঙ্গও ছিল। জয়প্রকাশের বয়স তখন ৬৪ বৎসর। (সাধারণতঃ জে. পি. নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।)

সদাশয় এবং অনাড়ম্বর জয়প্রকাশ কোনদিন নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করেন নি। খ্যাতির আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না। ইংরেজদের কাছে তিনি ছিলেন ত্রাস স্বরূপ। ব্রিটিশ বিরোধীতার জন্য এক কালে তাঁর মাথার উপর মোটা পুরস্কার ধার্য করা হয়েছিল। সরকারী কোন দফতরে তিনি কখনও চাকরী করেন নি। তথাপি গুপ্ত আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের জন্য তিনি যে আত্মত্যাগ করেছেন, তার তুলনা হয় না। জীবনের অনেকগুলি বৎসর তাঁকে কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়েছে ; সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক অত্যাচার। ১৯৪২-এর বিপ্লবে তাঁর দুঃসাহসিক এবং শৌর্যপূর্ণ ভূমিকা আজও রূপকথা বলে মনে হয়। একবার পুলিশ তাঁকে একাদিক্রমে পঞ্চাশটি দিন ও রাত ধরে অবিরাম জেরা করে, এবং ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বার অপরাধে তাঁর মুখের উপর চপেটাঘাত করে। আর একবার পুলিশের হেফাজত থেকে পলায়নের অপরাধে ষোল মাস ধরে ছোট্ট একটি নির্জন কারাকক্ষে তাঁকে

আটক রাখা হয়। এত সব অত্যাচার সত্ত্বেও জয়প্রকাশের বিদ্রোহী সত্তা কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে নি।

উচ্চশিক্ষিত, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অতি ভদ্র এই ব্যক্তিটির জন্য চিরদিনই আমার হৃদয়ে খানিকটা কোমল স্থান রয়েছে। তাঁর সততা এবং দেশভক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি। যেখানেই ন্যায়-নীতি হয়েছে পদদলিত, সেখানেই রুখে দাঁড়িয়েছেন জে. পি.। পরমসহিষ্ণু, কৌশলী এবং ধীর-স্থির এই ব্যক্তিটিকে একদা নেহ্‌রুর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী বলেও আমার মনে হয়েছিল। আমাদের সমস্যাগুলিকে স্বদেশে এবং বিদেশে একাধিকবার তিনি সার্থকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

জীবনের বহু স্বপ্নই তাঁর সফল হয়নি। স্বাধীন ভারত সম্বন্ধে যে স্বপ্ন সযত্নে হৃদয়ে পুষে রেখেছিলেন তা' টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। তবু বলবো, মোহ ভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যদি রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে না দাঁড়াতেন, তা'হলে দেশের পক্ষে তা' হ'ত অশেষ মঙ্গলজনক।

১৯৪৬ সালে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে জে. পি. দিল্লীতে আসেন। তখন দিল্লীতে ছিলেন আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রখ্যাত 'জেনারেল' শাহ্‌ন্‌ওয়াজ খান। দু' জনের সঙ্গেই প্রায়ই আমি দেখা সাক্ষাৎ করতাম। ১৯৪৯-৫০ সালে জলন্ধরে এক জনসভায় জে. পি.-র সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়। সস্ত্রীক গিয়েছিলাম তাঁর বক্তৃতা শুনতে।

ভাগ্যের পরিহাস, যখনই জে. পি. ভারত, কাশ্মীর, নাগা অথবা পাকিস্তান সম্বন্ধে কোন কথা বলেছেন, অমনি তাঁর দেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে সবাই। আরও দুর্ভাগ্য, সন্দেহ তাঁরাই প্রকাশ করেছেন যাঁদের জে. পি. সেবা করেছেন অনেকের চাইতেই অধিক আন্তরিকতার সঙ্গে। আরও মজার কথা, সেই একই কথা যখন বেরিয়েছে অন্য লোকের মুখ থেকে তখন চারদিকে পড়ে গেছে ধন্য ধন্য রব। অথচ আমরা ভুলে যাই জয়প্রকাশ নারায়ণ হলেন সকল সন্দেহের অতীত।

মেজর জেনারেল হরি চাঁদ বাধওয়ার-এর সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৪৬ সালে। তখন থেকেই আমরা পরস্পরকে জানি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী হন। অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর প্রতি তাঁর আনুগত্য এতটুকু টলে নি। অকুতোভয়, দৃঢ়চরিত্র হরি

চাঁদের এই অটল আনুগত্যের জন্য তাঁকে এম. বি. ই. সম্মানে ভূষিত করা হয়। জীবন তাঁর ছিল অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল।

১৯৩০ সালে বোম্বাইতে কর্মরত অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারী পরীক্ষায় তাঁর ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে বলে ধরা পড়ে। চিকিৎসকগণ তাঁর আয়ুর মেয়াদ ঘোষণা করেন মাত্র আর কয়েক মাস। খবর পেয়েই আমি বোম্বাই চলে যাই এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করি। নিজের সম্বন্ধে মোটেই চিন্তিত ছিলেন না হরি চাঁদ। দুশ্চিন্তা ছিল শুধু নিজের পরিবার-বর্গের জন্য। ভালমন্দ কিছু একটা হলে তাদের কী হবে। আমেরিকার বিখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ পেক-কে দিয়ে চিকিৎসা করালে জীবনের মেয়াদ তাঁর হয়ত আরও কিছুদিন বৃদ্ধি পেত। সেই আশায় হরি চাঁদ আমার কাছে আমেরিকা যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

কিন্তু আমেরিকা যাবার ভাড়া এবং সেখানে থেকে চিকিৎসা করানোর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দিল্লীতে ফিরেই বেসরকারীভাবে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলাম। নিজের কাছ থেকে যথাসাধ্য দিয়ে একটা তহবিল গঠন করলাম প্রথমে। তারপর সাঁজোয়া 'কোর'-এর (এই বিভাগেই হরি সে সময় কাজ করতেন) আর্থিক সঙ্গতিপন্ন কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসরের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালাম। কিন্তু কেউ কোন সাড়া-শব্দ করলেন না। সাধারণতঃ এঁরা নিজেদের 'কোর' সম্বন্ধে খুব বেশী বড়াই করে থাকেন। কিন্তু এই দুঃসময়ে নানা 'অজুহাতে' কেউ একটি পয়সা দিয়েও হরিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। ইতিমধ্যে, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ-এর কাছে হরি যে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন, তার অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন গলব্রেথ।

এই অবস্থায় বিদেশী সরকারের চাইতে নিজেদের সরকার হরি চাঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলে তা' হ'ত অধিকতর সঙ্গত এবং সম্মানজনক। জেনারেল থাপার এ ব্যাপারে রাজী ছিলেন। তাই বেসরকারীভাবে মেনন এবং নেহ্‌রুর কাছে কথাটা তুললাম। কিন্তু জবাবে নিরাশ হতে হ'ল। উভয়েই বললেন, পরামর্শদাতারা না কি জানিয়েছেন আর্থিক সাহায্য প্রদান করলে বিশ্রী একটা নজির সৃষ্টি হবে। তাই সরকারের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব নয়। একটি ভাল লোক মারা যেতে বসেছেন। অথচ তাঁর জীবন রক্ষার পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভাব্য নজির! যেন আমাদের

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সব কিছুকেই কেবলমাত্র 'নজির' দিয়ে বিচার করা হয়ে থাকে। যাই হোক, আমেরিকার দূতাবাসে হরি চাঁদ নিজের থেকেই সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনুরোধ জানাবার জন্য নেহ্রুর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। অনিচ্ছাভাবে রাজী হলেন নেহ্রু। ঘটনাচক্রে পরের দিনই চেষ্টার বোলজ্ এলেন দিল্লীতে। সাহায্যের জন্য গলব্রেথকে অনুরোধ করে তাঁরই বাসভবনে সাক্ষাৎ করলাম চেস্টার বোলজের সঙ্গে। বললাম, যাবার ভাড়া দেবার সামর্থ্য হরির নেই; সুতরাং দিন তিনেক বাদে তিনি যখন দিল্লী থেকে ফিরে যাবেন তখন যদি হরি এবং তাঁর স্ত্রীকে নিজের বিমানে আমেরিকা নিয়ে যান তবে খুব উপকার হয়। হরির দেখা-শুনা করবার জন্য তাঁর স্ত্রীরও সঙ্গে যাবার প্রয়োজন ছিল। এতটুকুও ইতস্ততঃ না করে সানন্দে সম্মত হলেন বোলজ্। তারপর সংবাদ দিতেই অবিলম্বে সস্ত্রীক দিল্লী চলে এলেন হরি চাঁদ।

বিমান বন্দরে তাঁদের বিদায় দিতে গিয়ে সাশ্চর্যে লক্ষ্য করি ভারতীয় বাহিনী কিংবা সাঁজোয়া 'কোরে'র সহকর্মীদের একজনও হরিকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন নি। অথচ, কোনদিন তিনি ফিরবেন কিনা বলা যায় না। (কেউ কি তাঁর যাত্রার কথা জানতেন না?) হরি চাঁদও ব্যাপারটি লক্ষ্য করে অত্যন্ত দুঃখিত হন।

দিল্লীর আমেরিকান দূতাবাসের সামরিক সহকারী কর্ণেল সি. এ. কার্টিস্ পরে আমাকে জানান যে, আমেরিকার সেনাবাহিনীর সচিব এল্‌ভিস্ জে. স্টার (জুনিয়র) হাসপাতালে হরি চাঁদের বিনা খরচায় চিকিৎসার জন্য আমেরিকা সরকারের অনুমোদন আদায় করেছিলেন। এত বড় একটা সাহায্য সম্ভবপর হয়েছিল বোলজের সহৃদয়তার কারণেই। মনে হয়, প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে দেখা করে নিখরচায় চিকিৎসা এবং আরও অনেক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছিলেন হরিকে। বোলজের এই উপকার কোনদিন ভোলবার নয়।

ব্যবস্থা মত নিউ ইয়র্কে হরির চিকিৎসা করেন ডাঃ পেক। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে হরি যে রকম নির্ভীকতার পরিচয় প্রদান করেন তা'তে সকলেই অবাক হয়ে যান। হরির স্ত্রীর পক্ষেও সেটা ছিল এক কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা; এবং সর্বস্বপণ করে তিনিও স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

কয়েকমাস চিকিৎসার পর খানিকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা দিলে,

নভেম্বর মাসে হরি চাঁদ ভারত অভিমুখে রওনা হন। এখানে পৌঁছুবার পর সামরিক বিভাগের চিকিৎসা-বিস্থার মহা-অধিকর্তা (Director General of the Armed Forces Medical Sciences) লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল শিব ভাটিয়া এবং আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর জীবন রক্ষার জন্য আমরা আপ্রাণ লড়াই করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে কেউ কোনদিন পেরে ওঠে নি। অত সাবধানতা সত্ত্বেও কয়েকদিন পরে তাঁর হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়; এবং ভাগ্যের পরিহাস, ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মারা গেলেন ব্রঙ্কাইটিসে।

আমার কন্যা অনুরাধা স্বামীর সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে। সপ্তাহখানেকও কাটে নি, নাগাভূমিতে বেধে উঠল সংঘর্ষ। অজয় সপ্রুর বিমানবহর তখন ছিল নিফায়। দেশের এই জরুরী অবস্থায় স্থির থাকতে পারল না অজয়। স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেল কর্তব্য পালন করতে। পরের দিনই তাকে প্রেরণ করা হ'ল পূর্ব সীমান্তের কোন এক স্থানে।

যে কোন নববধূর পক্ষেই এ ধরনের আকস্মিক আঘাত সহ্য করা কঠিন। ভগ্নহৃদয় অনু কয়েকদিন পর ফিরে এল আমাদের কাছে। দেখে কেমন যেন অসুস্থ মনে হ'ল তাকে। ডাক্তার দেখিয়ে যা শুনলাম, তাতে শরীরের রক্ত যেন হিম হ'য়ে গেল। শরীরের দু'টি পূযকোষের (cyst) বৃদ্ধি ঘটেছে তার, এবং অবিলম্বে সে দু'টিকে কেটে বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

অস্ত্রপ্রচারটি গুরুতর ধরনের। বিন্দুমাত্র দেরী না করে তাকে নিয়ে বোম্বাই ছুটলাম। দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে আমি এবং আমার স্ত্রী ধান্নো দু'জনেই আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন অনু সেরে ওঠে।

অস্ত্রোপচার হ'ল সাফল্যজনক ভাবে। একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে, এমন সময় এল আর একটা দারুণ আঘাত। খবর এল অজয়ের ডান দিকের ফুসফুস চুপসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে ছুটলাম আউন্ধের বিখ্যাত ফুসফুসরোগ সংক্রান্ত হাসপাতালে। প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক কর্ণেল চাক গুরুতর ধরনের একটি অস্ত্রোপচার করে আক্রান্ত ফুসফুসের খানিকটা অংশ কেটে বাদ দিলেন।

এ আঘাতটি কিন্তু অনু আর সহ্য করতে পারল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অবিরাম চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকত। দেখতে দেখতে চেহারা

হয়ে পড়ল যেন পূর্বেকার ছায়ামাত্র। তারপর একদিন ভেঙে পড়ল একেবারে। ডাক্তারেরা দেখে বললেন, প্রচণ্ড স্নায়বিক দৌর্বল্যের কারণেই এটা হয়েছে। আমাদের সহ্যশক্তির উপর সেটা ছিল শেষ আঘাত। অমুকে ওই অবস্থায় দেখে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যেত আমাদের।

সমস্ত দুর্ভাগ্য যেন এক সঙ্গে চক্রান্ত শুরু করেছিল আমার বিরুদ্ধে। নিজেকে মনে হ'ত বড় অসহায়; একাকী। ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর বিচারের কোন কারণ খুঁজে পেতাম না। এরই মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পেতাম ওয়াশিংটন গ্ল্যাডেনের কবিতার এই পংক্তি ক'টি থেকে :

'দানব যতই উঠুক হিংস্র হয়ে
আত্ম-গোপন যতই করুন দেব-দূতেরা,
জানি তবু আমি সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষ লয়ে,
বিশ্ব রয়েছে অতন্দ্র প্রহরায়।'

এই সময়ে আরও একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। আমাকে নেহ্‌রুর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী বলে কানাঘুষা চলতে থাকে কোন কোন মহলে। যেমন, ১৯৬১ সালের ৭ই অক্টোবরের সংস্করণে কারেণ্ট পত্রিকার সম্পাদক ডি. এফ. করাকা লিখলেন :

জেনারেল কলের উপর নেহ্‌রুর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর ধারণা, সেনা-বাহিনীর সম্ভাব্য কোন বিদ্রোহ তথা গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধনকারী শক্তিকে বাধাদান করবার মতো একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন কল।…নিজের কোন উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ইচ্ছা যদি কোনদিন নেহ্‌রুর মনে জাগে, তা'হলে প্রবীণ এবং সুপরিচিত সমস্ত কংগ্রেসসেবীদের বাদ দিয়ে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে জেনারেল কলের নাম করতেও তিনি হয়ত দ্বিধাবোধ করবেন না।

প্রবন্ধটিতে আরও বলা হয় :

একমাত্র আদেশ করা ছাড়া সাধারণতঃ মুখ খোলেন না কল; এবং যতক্ষণ আদেশ করবার মত ক্ষমতা আয়ত্ত্বে না আসে, ততক্ষণ মুখ বন্ধ রাখাই শ্রেয় মনে করেন…। কল হলেন সেই ধরনের লোক যাঁরা সদা সতর্ক।

সেনাবাহিনীর প্রধান তিনি যে হবেন সেটা সুনিশ্চিত; হয়তো একদিন ভারতের প্রধান মন্ত্রীও হতে পারেন।

সুতরাং কয়েকজন রাজনীতিক এবং সৈনিক ব্যক্তি ঈর্ষাপরবশ হয়ে উক্ত সম্ভাবনাটিকে নির্মূল করতে এবং যেন-তেন-প্রকারেন সর্বসমক্ষে আমাকে মসীলিপ্ত করতে উঠে-পড়ে লেগে যান।

ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা-প্রধান, নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরাল, লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন আগস্ট মাসে একটি মহড়ার আয়োজন করেন। সেই মহড়ায় যোগদানের জন্য থাপারের সঙ্গে আমাকে ইংলণ্ডে যেতে হ'ল।

অনুর অসুস্থতার কারণে প্রথমে ঠিক করেছিলাম যাবো না। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা না করতে পরামর্শ দিয়ে ধান্নো জানালেন, কন্যার সেবা-শুশ্রূষার ভার তিনিই নিতে পারবেন। তবু, এই অবস্থায় অনুকে ছেড়ে যাওয়া সহজ ছিল না। অনেক ইতস্ততঃ করবার পর অবশেষে ইংলণ্ড রওনা হলাম। পথে গাজা এবং বেইরুটে অল্প কয়েকদিন অবস্থান করে, লণ্ডন পৌঁছে খবর পেলাম অনুব অবস্থা আগের মতই। তারা যে কী অবস্থার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে সেটা বেশ অনুমান করতে পারছিলাম। নিজের সন্তানকে ওই অবস্থায় দেখে কোন মায়ের পক্ষেই অবিচলিত থাকা সম্ভব নয়।

আঠাশ বছর পর আবার এলাম ইংলণ্ডে। অনেক কিছু ঘটে গেছে এই সুদীর্ঘ সময়ের ভিতরে। ভারত হাতছাড়া হয়ে গেছে ইংরেজদের। বিশ্বশক্তির সারিতেও ইংলণ্ডের আর প্রথম স্থান নেই।

আতিথ্যের কোন ত্রুটি ছিল না লণ্ডনে। মাউণ্টব্যাটেনের সুদক্ষ পরিচালনায় ক্যাম্বারলে-র মহড়াটিও অতীব সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হ'ল। মহড়ায় থাপারকে অভিনন্দন জানালেন মাউণ্টব্যাটেন।

যে কয়দিন ধরে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই কয়দিনই আমার পাশে আসন গ্রহণ করেছিলেন, পাকিস্তান বাহিনীতে আমার সমপদস্থ এবং বর্তমানে তথাকার প্রধান সেনাপতি, মেজর জেনারেল য়্যাহিয়াহ্ খান। সেই সময় বেশ খানিকটা চিত্তাকর্ষক আলোচনা আমাদের মধ্যে হয়।

মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধে একটি বক্তৃতাও প্রদান করি আমি। সমর

দফতরে অনুষ্ঠিত সেই বক্তৃতা-সভায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট অফিসরগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমাদের বিবিধ সমস্যা। এছাড়া সাক্ষাৎ করি সমর দফতরের গুপ্ত-তথ্য বিভাগের প্রধান, মেজর জেনারেল ষ্ট্রং, চীফ অফ্ দি ইম্পিরিয়াল স্টাফ এবং তাঁর সহকারী জেনারেল স্যার জন এণ্ডারসন-এর (?) সঙ্গে।

ব্রিটিশ অফিসরদের ভাব-ভঙ্গীতে একটা জিনিস বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের সাহায্য ছাড়াই থাপার এবং আমি যে কী করে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে 'বহাল' রয়েছি, তা' ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। অনেক ব্রিটিশ অফিসর আমাদের উত্তরোত্তর উন্নতি করতে দেখে আন্তরিক-ভাবে সন্তুষ্ট হলেও, মাত্র কয়েক বছর পূর্বেই, ভারতীয়দের দিয়ে সেনাবাহিনী চালানো যাবে না বলে অনেকে আবার ভবিষ্যদ্‌বাণীও করেছিলেন।

ক্যাম্বারলে থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, ইংলণ্ডে বসবাসকারী জাঠ রেজিমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত অফিসরগণ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি পুনর্মিলন সমাবেশে আমাকে আমন্ত্রণ করেন। পুরনো বন্ধুদের দেখে বড় আনন্দ হ'ল। আমি যে সময় সাবঅলটার্ণ, সেই সময় আমার ব্রিগেড অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ম্যাক্‌ফারসন। বহুদিন পর দেখা হ'ল তাঁর সঙ্গে।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বিনীত হাকসর সে সময় ছিল অক্‌স্‌ফোর্ডের শিক্ষক। তার সঙ্গেও দেখা করতে গেলাম একদিন। বিশ্ববিদ্যালয়টি ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল বিনীত। কিছুদিন পূর্বে তাদের জনৈক সহকারী বলেছিলেন :

'ব্যাল্লিওল কলেজের আমি মাস্টার,
আমি যা' জানি না তা' কভু নহে জ্ঞান।'

বিনীত সে ঘটনাটিও বলল আমাকে।

দু'টি রবিবার অতিবাহিত করলাম ব্রাইটন এবং কেমব্রিজে। ফার্ণবরোতে গিয়ে সেখানকার বিমান প্রদর্শনী এবং আমাদের 'ভাইকারস্' ট্যাঙ্ক নির্মাণের কারখানাটিও দেখলাম।

লণ্ডনে, বার্মা শেলের বড় কর্তা সিনক্লেয়ার সহ আরও অনেকে আমায় ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। এছাড়া সাক্ষাৎ হয় টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়ার সুযোগ্য সংবাদদাতা জি. কে. রেড্ডি ও তাঁর সুগৃহিণী কান্তার সঙ্গে। অমায়িক স্বভাব, মেজর জেনারেল পি. এস. চৌধুরী ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ত্রিপত-

এর সঙ্গেও দেখা হ'ল। চৌধুরী সস্ত্রীক ইংলণ্ডে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। অতঃপর কর্মোপলক্ষ্যে একদিনের জন্য প্যারিসে গিয়ে, সেখান থেকে দু' দিনের ছুটি নিয়ে ১৯৬১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিমান-যোগে বার্লিনে উপস্থিত হলাম।

উইলী ব্রাণ্ড্ট্ ছিলেন বার্লিন শহরের জনপ্রিয় মেয়র। তাঁর একজন প্রতিনিধি একটি ফুলের তোড়া এবং চিঠি নিয়ে বিমান বন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। সেই দিনই বার্লিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই কারণে ব্যক্তিগতভাবে আমায় অভ্যর্থনা করতে না পারায় চিঠিখানিতে দুঃখ প্রকাশ করে হের্ ব্রাণ্ড্ট্ লিখেছিলেন:

আপনি এখানে এসেছেন জেনে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।...আমি সুনিশ্চিত যে, স্বচক্ষে এই শহরের অবস্থা দেখে এমন একটি ধারণা আপনি গঠন করতে পারবেন, যা' আপনার সরকারের কাছেও বোধ হয় মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির স্মৃতি বার্লিনবাসীর হৃদয়ে আজও রয়েছে অম্লান; এবং শান্তির জন্য এই শহরের যতখানি আকুলতা, ততখানি বোধ হয় আর কোন শহরের নেই। নিজেদের মনোমত পন্থায় যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজও আমরা সাগ্রহে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, তা' হ'ল মানবিক অধিকার। তার বেশীও নয়, কমও নয় ...।

পরে, সেই সন্ধ্যাতেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হের্ ব্রাণ্ড্ট্‌কে দেখে মনে হ'ল একজন খাঁটি, তেজস্বী এবং বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ নেতা বলে।

শেষ যেবার বার্লিনে এসেছিলাম, তখন ছিল হিটলারের শাসনকাল। তারপর এই শহরের উপর দিয়ে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে, কিন্তু অদম্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনাই বাঁচিয়ে রেখেছে বার্লিনকে। দেশের পুনর্গঠনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে জর্মন জনগণ; এবং তাদের দ্রুত উন্নতি সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিশ্ববাসীর।

মাত্র এক মাস আগে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে একটি প্রাচীর তুলে জর্মন-রাজধানীকে রুশ, মার্কিণ, ব্রিটিশ ও ফরাসী এই চারটি অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল। সে সম্বন্ধে বহু জর্মনের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি সকলেই প্রাচীরটিকে অপছন্দ করে। অনেকে কোন মতামত খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত না করলেও, অধিকাংশ লোকই এই

প্রাচীর এবং বিদেশী শক্তি কর্তৃক বার্লিন অধিকার করে রাখাটাকে তাদের জাতির প্রতি প্রকাশ্য অপমান বলে মনে করে; এবং নিজেদের মনোভাব অবাধে ব্যক্ত করে।

সে রাতে হোটেলে নিজের কামরায় একাকী বসে থাকতে থাকতে অসুস্থ অনুর জন্য মনটা হঠাৎ বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ল। জানি না দিল্লীতে কী অবস্থায় সে এখন রয়েছে। মনে হ'ল, এভাবে বিদেশে না এসে, তার এই প্রয়োজনের সময় পাশে থেকে দেখাশুনা কবাই উচিত ছিল আমার। অথচ, অসুস্থ প্রিয় কন্যাকে ছেড়ে এতদূরে আজ বসে বয়েছি অসহায়ভাবে।

আর একটি চিন্তাও সেই সঙ্গে আক্রমণ করল। আমাকে জীবনে উন্নতি করতে দেখে বিক্ষুব্ধ কয়েকজন সমসাময়িক এবং শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি বিগত কয়েক বৎসব ধরে কীভাবে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন; এবং আমার বিভিন্ন সৎ প্রচেষ্টাকে খর্ব তথা আমার সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করতে কোন কিছুই বাদ বাখেন নি। সব চাইতে বেশী আহত হয়েছিলাম আমাব পেশাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখে। আমার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বিদ্বেষ-প্রসূত অসত্য প্রচারেব কোন আদি-অন্ত ছিল না। গভীরভাবে আহত হয়েছিল আমাব দেশাত্ম তথা আত্মসম্মান বোধ। স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম কুৎসা-রটনাকারীদেব বিবেকহীনতাব পবিচয় পেয়ে। আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও ন্যায়বিচার কবেন নি তাঁবা। আত্মপক্ষ সমর্থন অথবা প্রকৃত ঘটনাকে সর্বসমক্ষে উদঘাটন কববার কোন সুযোগ আমাব ছিল না। একে, মাথার উপব ছিল গুরুদায়িত্ব ভার। তার উপর এই ধরনেব কুৎসা রটনা আমার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে, এবং পৃথিবীটা দুর্বৃত্ত লোকে পরিপূর্ণ বলে মনে হ'তে থাকে। সর্বক্ষণ সহ্য করেছি অকথ্য যন্ত্রণা। কিন্তু আমি অতি-মানব নই। সহ্যশক্তিব একটা সীমা রয়েছে আমার। জানি, সাহসভরে বিপদের মোকাবিলা করাই হ'ল মানুষের মত কাজ। ভেঙে পড়া উচিত নয় কখনও। কিন্তু, এমন কোন মানুষ কি রয়েছে, যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে জীবনে কখনও কোন আঘাতে অথবা কোন অবস্থাতেই সে ভেঙে পড়ার মত পর্যায়ে উপস্থিত হয় নি? আসলে, যত শক্ত মানুষই হোক না কেন, কোন না কোন সময়ে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেই; শুধু স্বীকার করে না এই যা।

আমার ক্ষেত্রেও, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। তাই কোন কিছুর প্রতিই আর ভ্রূক্ষেপ ছিল না আমার।

সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। নিস্তব্ধ, নির্জন ঘর। তার মধ্যে আমি একাকী, সঙ্গীহীন। মনে হ'ল যেন বহুদূর হতে ভেসে আসা কোন সকরুণ সঙ্গীতের মূর্ছনা শুনতে পাচ্ছি। আকণ্ঠ পিপাসায় গলার ভিতরটা যেন শুকিয়ে উঠল। কপালেব দু'টি পাশ দপ্ দপ্ করছে। প্রতি ধমনীতে রক্ত-স্রোত হয়ে উঠছে উত্তাল। বুকের মধ্যে যেন শুরু হয়ে গেছে আজানা আলোড়ন।

অদ্ভুত একটা বিক্ষোভ এবং বিষণ্ণতা আমাকে চারদিক থেকে চেপে ধরল। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পডলাম। ভাবতে লাগলাম, এই অভিশপ্ত, ব্যর্থ জীবনে দুভাগ্যেব কী অন্ত হবে না কোন দিন?

চিন্তাটিব সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথা মনে পড়ল। যত বড় বিপর্যয়ই আসুক না কেন লডাই আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে। দুর্ভাগ্যেব সম্মুখীন হতেই হবে অটল ভাবে। কথাটা মনে হতেই এক ঝাঁকুনিতে যেন আত্ম-বিশ্বাস ফিবে এল।

এই মানসিক চাপে বেশ কয়েকদিন ধবে দুর্বল এবং অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তারপর একটু সামলে নিয়েই বিমানযোগে ফিবে এলাম দিল্লী। দেখলাম, অনু আব অজয় এখনও সুস্থ হয় নি। ববং, ইদানীংকালে তাদের রোগ-ভোগেব মাত্রাটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। ওদেব অবস্থা দেখে হৃদয় আমাব গুম্‌বে গুম্‌বে কাঁদতে লাগল।

'গোয়া'-র ঘটনাটিকে আমাদের একটা বিরাট সামরিক সাফল্যরূপে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য আমার নেই। বস্তুতঃ, এটির গুরুত্ব যে কত সামান্য সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতভূমির এই অঞ্চলটিকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে দেশবাসীর কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি কী ভাবে পালন করা হয়েছিল, তা' দেখাবার উদ্দেশ্যেই গোয়া-র ঘটনাটি এখানে বিবৃত করছি।

চারশ বছরেরও আগে পর্তুগীজরা দিউ, দমন এবং গোয়া অধিকার করে। যতদিন ইংরেজদের অধীনে ছিলাম, ততদিন এ ব্যাপারে কিছু করবার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর,

ফরাসী এবং পর্তুগীজ ছিটমহলগুলিকেও মুক্ত করতে অধীর হয়ে উঠলাম আমরা। ব্রিটিশদের মত ফরাসীরাও শান্তিপূর্ণভাবে ভারত ত্যাগ করে। কিন্তু পর্তুগীজরা এখানে রয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটির একটি ফয়সালা করতে আমরা বারংবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রতিবারই অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করে পর্তুগাল। আইন অথবা সংবিধানগত অবস্থা যাই হোক না কেন, কোন দেশই নিজ এলাকায় বিদেশী ছিটমহল বরদাস্ত করে না। আমরাও তা' করতে প্রস্তুত ছিলাম না।

দিউ, দমন এবং গোয়াতে সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা ছিল ক্রীতদাসের মত। তাদের বসবাসের জন্য পৃথক অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল; এবং শ্বেতকায়দের জন্য সংরক্ষিত কিছু কিছু অঞ্চলে তাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। অধিকার প্রতিষ্ঠা অথবা স্বাধীনতার জন্য কোন রকম আন্দোলন করলেই তাদের কারারুদ্ধ করে অকথ্য নির্যাতন চালান হ'ত। ব্যাপারটি নিয়ে ভারতের জনগণ এবং নেহ্‌রু ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই প্রতিশ্রুত দায়িত্বটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল; এবং একদিন না একদিন সে দায়িত্ব পালন না করে কোন উপায় ছিল না। কতকগুলি দেশের আবার কায়েমী স্বার্থ জড়িত ছিল এর সঙ্গে; এবং সমস্যাটি জীইয়ে রাখাতেই তাদের আগ্রহ ছিল বেশী। কারণ, আমাদের অনুকূলে গোয়া সমস্যার মীমাংসা হওয়ার অর্থই ছিল অন্যান্য স্থানে তার প্রভাব পড়া, এবং সেই প্রভাবের ফল হ'ত উক্ত দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী। আফ্রিকায় পর্তুগীজদের দু'টি উপনিবেশ আঙ্গোলা এবং মোজাম্বিক বিদ্রোহ করে ১৯৬০ সালে; এবং ভারতের কাছে তারা ব্যাকুল আবেদন জানায় যে, ভারতভূমি থেকে পর্তুগীজদের উচ্ছেদ করতে পারলে, আফ্রিকা থেকেও তাদের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত হয়ে পড়বে।

সমাধানের পন্থা নিয়ে আমাদের নেতাদের ভিতরেও মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। নেহ্‌রু সহ[৪১] কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মত ছিল, বৈদেশিক দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করবার আমাদের জন্মগত অধিকার রয়েছে।

৪১। ১৯৫৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীর লালকেল্লা থেকে পাঁচলক্ষ জনতার সমাবেশে নেহ্‌রুর প্রদীপ্ত ঘোষণা আজও আমার মনে পড়ে। (গোয়ার মুক্তি আন্দোলন উপলক্ষ্যে তারা সেখানে সমবেত হয়েছিল।)

সুতরাং, পর্তুগীজ শাসন থেকে আমাদের অঞ্চল মুক্ত করা উচিত। পক্ষান্তরে অনেকে আবার শান্তিপূর্ণ উপায়ে' সমস্যাটি সমাধানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই শেষোক্ত মতের অন্যতম সমর্থক ছিলেন মোরারজী দেশাই। ১৯৫৬ সালে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে, নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ যাতে গোয়ায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য তিনি সীমান্তে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯৬০ সালে গোড়ার দিকে গোয়ার জাতীয় নেতৃবর্গ এই ব্যাপারে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন।

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে 'গোপী' হান্ডুকে নেহ্রু সীমান্ত আরক্ষী বাহিনীর মহাপরিদর্শক পদে নিযুক্ত করেন (Inspector General of Police, Border Forces); এবং এই সংস্থার কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ে। প্রায় বছর দশেক ধরে হান্ডু ছিলেন আমাদের নিরপত্তা বিভাগের প্রধান কর্তা। তাই যোগ্য ব্যক্তির হাতেই এই নতুন দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন হান্ডু। বস্তুতঃ কিছুদিনের ভিতরেই গোয়ার ঘটনাবলী সম্বন্ধে তিনি হয়ে ওঠেন একজন বিশেষজ্ঞ।

গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃবর্গ তখন মরিয়া হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মাঝামাঝি তাঁদের প্রতি পর্তুগীজদের অমানুষিক অত্যাচারের নানা কাহিনী আমাদের কাছে আসতে থাকে।

২৩শে অক্টোবর নাগাদ ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাবার পথে বোম্বাইয়ে এক জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে নেহ্রু বলেন:

(ক) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোয়া সমস্যাটির সমাধান করতে বারংবার আমরা পর্তুগীজদের আহ্বান জানিয়েছি; কিন্তু প্রতিবারই তারা আমাদের অপমানিত করেছে।

(খ) সুতরাং গোয়ার জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি পর্তুগীজদের অকথ্য নির্যাতন যদি বন্ধ করা না হয়, এবং শান্তিপূর্ণভাবে তারা ভারতভূমি পরিত্যাগ না করে,

তবে গোয়াতে যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার অধিকার আমাদের রয়েছে, সেটা এখন আর আমরা অস্বীকার করি না।

(গ) তিনি বিদেশ সফরে চলেছেন, এবং এই অবসরে পর্তুগীজদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার একটা শেষ প্রচেষ্টা তিনি করবেন।

(ঘ) বিশ্বের কাছে আমরা নানাভাবে প্রমাণ করেছি যে, গোয়াবাসী এবং ভারতবাসী উভয়েই হ'ল সম-অধিকার সম্পন্ন ভারতীয় নাগরিক, এবং তাদের মধ্যে আমরা কোনরকম পক্ষপাতিত্ব করি না। এর অন্যতম প্রমাণ হ'ল এই বোম্বাইতেই একজন রোমান ক্যাথলিক কার্ডিনাল রয়েছেন, এবং ভারতের সাতজন বিশপের মধ্যে পাচজনই হলেন গোয়াবাসী। পক্ষান্তরে পর্তুগীজরা একজন গোয়াবাসীকেও গোয়াতে বিশপ হিসাবে নিযুক্ত করে নি।

আহ্‌মদনগরে সাঁজোয়া 'কোর' সম্মেলনের শেষে, ১৯৬১ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল জে. এন. চৌধুরী এবং আমি একই সঙ্গে পুনা প্রত্যাবর্তন করছিলাম। সেই সময় তিনি অনুরোধ করেন, গোয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান যদি চালানো হয়, তা' হ'লে দায়িত্বটি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই দেবার জন্য যেন আমি উপযুক্ত স্থানে একটু ভাল করে তদ্বির করি। (দায়িত্বটি অন্য কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে তাঁর আপত্তি ছিল)। দিল্লী ফিরে এসে প্রধান সেনাপতি থাপারের কাছে আমি চৌধুরীর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলে, থাপার বেশ কৌতুক বোধ করেন।

২৪শে নভেম্বর তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বাহিনীত্রয়ের প্রধান এবং হান্‌ডুর সঙ্গে আমাকেও তলব করা হয়। নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পেয়েছেন বলে মেনন আমাদের জানান :[৪২]

(ক) ১৮ই থেকে ২৫শে নভেম্বর অবধি আরব সাগরে অবস্থিত মার্মাগোয়া পোতাশ্রয়ের আনুমানিক ১৫০ মাইল দূরে 'সিআটো' চুক্তি সংস্থার বার্ষিক নৌ-মহড়া অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পাকিস্তানী, ব্রিটিশ, আমেরিকান, তুর্কী এবং ইরানী জাহাজগুলি এই মহড়ায় অংশ গ্রহণ করবে। গোয়ার অনতিদূরে এই মহড়া চলাকালীন সময়ে ভারতের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করাই হ'ল সালাজারের

৪২। তথ্যগুলি তিনি গুপ্ততথ্য সংগ্রহ সংস্থা, হান্‌ডু এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

উদ্দেশ্য। ১৮ই নভেম্বর তারিখে সবরমতী নামে আমাদের একটি বাণিজ্য-জাহাজ উপকূল বরাবর বোম্বাই থেকে কোচিন যাবার পথে অঞ্জদিভ দ্বীপের কাছে পৌঁছুতেই, বিনা প্ররোচনায় জাহাজটি লক্ষ্য করে পর্তুগীজরা গুলিবর্ষণ করে। ফলে জাহাজের জনৈক ইঞ্জিনীয়ারের চোখে গুলি লাগে। ঘটনাটি ঘটেছে আমাদের পোতাশ্রয় কারওয়ার এবং পর্তুগীজ দ্বীপ অঞ্জদিভের মধ্যে ৮০০ গজ চওড়া যে খালটি রয়েছে তারই ভিতরে। খালটি হ'ল ভারতের আঞ্চলিক দরিয়ার মধ্যে এবং বরাবরই আমাদের জাহাজ এই খালটি দিয়ে চলাচল করে থাকে।

(খ) ঘটনাটি সম্বন্ধে ভারতের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পর্তুগীজরা আরও সাহসী হয়ে উঠেছে, এবং উক্ত খালেই মৎস্য শিকাররত রাজা রাম নামে জনৈক ধীবরকে ১৯৬১ সালের ২১ নভেম্বর (?) তারিখে স্থির মস্তিষ্কে হত্যা করে। সংবাদটি প্রথমে বোম্বাই, তারপর ক্রমে দিল্লী পৌঁছয় ২৪ তারিখে।

ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমেরিকা এবং ইংলণ্ড পর্তুগালের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে কি না সে সম্বন্ধে পর্তুগীজ প্রধান মন্ত্রী সালাজারেব মনে সন্দেহ ছিল। অবশ্য তিনি (বৃথাই) আশা কবেছিলেন, রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী কেনেডির নেতৃত্বে আমেবিকা, এবং রক্ষণশীল ম্যাকমিলানের নেতৃত্বে বিশ্বস্ত মিত্র ইংলণ্ড তাঁকে সাহায্য করবে।

পর্তুগীজরা ধারণা করেছিল, সামরিক অভিযানের কোন উদ্দেশ্য ভারতের থাকলে, প্রস্তুত হয়ে আক্রমণ শুরু করতে করতেই বেশ কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে যাবে, এবং সেই সুযোগে 'সিআটো' নৌ-মহড়ায় অংশ গ্রহণকারী জাহাজগুলির কয়েকটি তাদের সাহায্যে অথবা মধ্যস্থতা করতে এসে পড়বে। উভয় ক্ষেত্রেই, গোয়ার উপর ভারতের সশস্ত্র আক্রমণ নিয়ে একটা সোরগোল তুলে বিষয়টিকে তারা রাষ্ট্রপুঞ্জে নিয়ে গিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করবে। ফলে তাদের ভারত সাম্রাজ্যের উপর আমরা আর কোন রকম সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব না।

আমাদের পরামর্শ-সভায় প্রতিশোধ হিসাবে অঞ্জদিভ দ্বীপটি[৪৩] দখল করে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। হান্‌ডু অবশ্য সাবধান করে দিলেন যে,

৪৩। আয়তনে মাত্র ১½ × ½ মাইল।

পর্তুগীজরা আমাদের এই কর্মপন্থা আগেই অনুমান করে রেখেছে ; এবং তার পরেই তারা রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে হাজির হবে। সুতরাং অঞ্জদিভ দখল করার সাথে সাথে ভারতে পর্তুগীজদের অন্যান্য উপনিবেশগুলিকেও অধিকার করে নিতে পরামর্শ দিলেন তিনি।

খানিকটা আলোচনার পর অবশেষে স্থির হ'ল, আপাততঃ কিছু না করে পরিস্থিতির প্রতি শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হবে, এবং ভারতীয় নৌবহরকে বোম্বাই থেকে কারওয়ার হয়ে কোচিন পর্যন্ত আমাদের আঞ্চলিক দরিয়ায় টহল দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে। টহল দেবার সময় তারা শুধু আমাদের পতাকা প্রদর্শন করবে। এতে ভারতীয় জনসাধারণের, বিশেষ করে কারওয়ারের আশ-পাশের ধীবরদের মনে বিশ্বাস ফিরে আসবে। এই দরিদ্র লোকগুলিব একমাত্র জীবিকা হ'ল মৎস্য-শিকার। অথচ ভয়ে তারা সে কাজে যেতে পাবছিল না।

বিমান বহরের প্রধান, এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ার সংবাদ দিলেন, ক্যানাবেরা জাতীয় আমাদেব একটি বিমান ভারতীয় সীমানার ভিতরেই বিশেষ একটি কাজে ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে যখন উড়ে যাচ্ছিল, তখন পাইলট রাডার পর্দায় দেখতে পায়, শব্দের চাইতেও দ্রুতগামী একটি জেট বিমান ক্যানাবেরাটির প্রায় দ্বিগুণ গতিতে তাড়া করে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বিমান নিয়ে ফিরে আসে আমাদের পাইলট। ঘটনাটি শুনে আমরা বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ম্যাচ—২ গতিসম্পন্ন (ঘণ্টায় প্রায় ১,৫০০ মাইল) এই বিমানটি কাদের হতে পারে? দাবোলিম অথবা গোয়াতে পর্তুগীজরাই কি এই ধরনের বিমান এনে রেখেছে? না তাদের মিত্রদের মধ্যে কেউ এই বিমান দিয়ে সাহায্য করছে। তাই যদি হয়, তবে কে সেই মিত্র রাষ্ট্র? প্রশ্নগুলির কোন সদুত্তর অবশ্য আমরা পাই নি।

এরপর হান্ডুর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, ভারতীয় সীমান্তবর্তী তেরেখোল দ্বীপ, সাওয়ান্তওয়াদি এবং দান্দেলীর নিকটস্থ বনভূমিতে আমাদের অনেকগুলি টহলদারী দলের উপর গত কয়েকদিন ধরে পর্তুগীজরা গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। এই সমস্ত স্থানে পর্তুগীজদের গুলি-গোলাও পাওয়া গেছে এবং পুলিশ সেগুলি সংগ্রহ করেছে। গোয়ার জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের উপর পর্তুগীজদের অত্যাচারও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। এই সংক্রান্ত কতগুলি ছবিও হান্ডু আমাদের প্রেরণ করেন।

পাকিস্তান যে এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের মতলব আঁটছে, সে সংবাদও

আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের পঞ্জাব সীমান্ত বরাবর আশঙ্কাজনকভাবে পাক সেনাবাহিনীকে মোতায়েন রাখা হয়েছিল। সেই সময়েই সুবৃহৎ একটি সামরিক মহড়াও অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তাদের ; এবং মহড়াটির স্থায়ীত্ব এই বিশেষ সময়টি পর্যন্ত বর্ধিত করার অর্থও ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোন কোন অঞ্চল থেকে তাদের অফিসর ও সৈনিকদের পরিবারবর্গকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। ছুটী বাতিল করে দেওয়া হয় পাক বাহিনীর সমস্ত সৈনিকদের। পর্তুগাল এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে একটি ষড়যন্ত্র চলছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম এই সংবাদগুলি পেয়ে। ঘটনাগুলির কথা মেনন নেহ্রুকে জানান। শান্তিপূর্ণভাবে গোয়া সমস্যার মীমাংসা করবার আন্তরিক অভিপ্রায় নেহ্রু এবং মেনন দু'জনেরই ছিল। কিন্তু পর্তুগীজরাই তাঁদের শেষপর্যন্ত বাধ্য করল কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠল ক্রমশঃ। তাই, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিচার করে এবং নেহ্রুর সম্মতিক্রমে, ২৮শে নভেম্বর তারিখের একটি সভায়, ভারতে অবস্থিত পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বাহিনীত্রয়ের প্রধানদের আদেশ দিলেন মেনন। বাহিনীত্রয়ের প্রধানগণও এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতির সামগ্রিক পর্যালোচনায় অবিলম্বে রত হলেন।

এ ব্যাপারে আমাদের দ্রুত কর্মতৎপর হতে পরামর্শ দিলেন হানুড়ু। কারণ, সামান্যতম বিলম্ব হলেই রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেবার সুযোগ পর্তুগাল পেয়ে যাবে। হানুড়ুর সংবাদ অনুসারে পর্তুগীজদের সৈন্য সংখ্যা ছিল গোয়ায় প্রায় ৪,৫০০ (৩,০০০ পর্তুগীজ এবং ১,৫০০ গোয়াবাসী) এবং দিউ ও দমনে প্রায় ১,৫০০ ; এই মোট ৬,০০০। অস্ত্রশস্ত্রের ভিতরে ছিল সাঁজোয়া গাড়ী, স্বয়ংক্রিয় বন্দুক এবং কিছু কামান। (অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করবার পর দেখা যায়, হানুড়ুর অনুমান প্রায় নির্ভুল ছিল।) এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্থির করা হ'ল, এই সামরিক অভিযানে পদাতিক ডিভিশনের দু'টি ব্রিগেড, একটি ছত্রী ব্রিগেড এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক পদাতিক, সাঁজোয়া, গোলন্দাজ এবং 'ইঞ্জিনীয়ার ইউনিটকে বেলগাঁওয়ের সন্নিহিত অঞ্চলে এবং রণাঙ্গনের অন্যান্য স্থানে সমবেত করা হবে। আমাদের সাঁজোয়া ডিভিশনটি সেই সময় ছিল মধ্যভারতের কোন এক জায়গায়। কয়েকদিন পর সেটিকেও একই সঙ্গে আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে

মোতায়েন করা স্থির হ'ল। পাকিস্তানের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

একমাত্র গুরুতর প্ররোচনার ক্ষেত্রেই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গোয়ার উপর ভারতের আঞ্চলিক দাবীতে আমরা যে অটল এবং কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসায় রাজী নই, পর্তুগীজদের এই সাদা কথাটি জানানোই উদ্দেশ্য ছিল আমাদের। আমাদের এলাকা দখল করে রাখতে যদি তারা কোন যুদ্ধবাজ মনোভাব পোষণ করে থাকে এবং আমাদের আর একটুও প্ররোচিত করে, তা'হলে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতভূমি থেকে তাদের বহিষ্কৃত করতে আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম।

কোন্ তারিখ নাগাদ আমাদের সেনাবাহিনীকে সমবেত করতে হবে তা' কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করলাম। পনের দিনের ভিতরেই সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন থাপার। তাতেই সম্মত হলাম আমি। কিন্তু লেফ্‌টনাণ্ট্ জেনারেল চৌধুরী জানালেন, ওই সময়ের মধ্যে একাজ সম্পূর্ণ করা কখনই সম্ভবপর হবে না।

হৃদয়ে সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ফিরে এলাম সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভা থেকে। অবশেষে আর একটি অঙ্গীকাব পালন করতে চলেছি আমরা। মাতৃভূমির শেষ অধিকৃত অঞ্চলটুকুকেও চলেছি বিদেশী দখল থেকে মুক্ত করতে।

আমার সামরিক তৎপরতা বিভাগের অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার পালিতের সঙ্গে পরামর্শ করে অভিযানটির নাম দিলাম 'বিজয়', প্রধান সেনাপতি এবং সরকার এই সাঙ্কেতিক নামটি অনুমোদন করবার পর, চৌধুরীকে জানানো হ'ল।

ডিভিশনের অধিনায়করূপে নিযুক্ত করা হ'ল মেজর জেনারেল 'উন্নি' ক্যান্‌ডেথ্-কে। অধিনায়কত্বের পারম্পর্য অনুসারে তিনি রইলেন চৌধুরীর অধীনে; কারণ সৈন্য সংগঠন অনুযায়ী চৌধুরী ছিলেন পরবর্তী ঊর্ধ্বতন অধিনায়ক। তাঁর উপরে আবাব ছিলেন প্রধান সেনাপতি থাপার। কোন ব্যক্তি বিশেষই এককভাবে এই অভিযানের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। বস্তুতঃ এটা ছিল সেনাধ্যক্ষ এবং সৈনিকদের একটি যৌথ প্রচেষ্টা; ছিল পর্তুগালের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম। এবং সরকারকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান, যাঁরা আসলে ছিলেন এই অভিযানের নায়ক।

আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী অভিযানটির একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন চৌধুরী। পালিত তার উপর বেশ কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেন। যাই হোক, ২রা ডিসেম্বরের পর হতে পাকিস্তান এবং পর্তুগাল উভয় দেশের তরফ থেকেই যে-কোন রকম বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য সেনাবাহিনী এবং সাজ-সরঞ্জাম একত্রিত করতে শুরু করলাম। সুদীর্ঘ এবং ভিন্নমুখী এই চলাচল ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা সহজ ছিল না। দীর্ঘপথ অতিক্রমের প্রশ্ন ছাড়াও আরও বহু সমস্যা জড়িত ছিল এর সঙ্গে। সুতরাং, অতি সতর্কতার সাথে আমার আদেশগুলি যাতে প্রতিপালিত হয় তার জন্য আমার সহকারী মেজর জেনারেল জে. এস. ধীলনকে মোতায়েন করলাম। একান্ত নিষ্ঠা এবং সার্থকতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।

হান্‌ডু পূর্বাহ্নেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, আমাদের বাধা দেবার অভিপ্রায়ে পর্তুগীজরা গোয়ার সড়ক তথা সেতুগুলি ধ্বংস করে রাখবে। তাই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে যাতে বাধাগুলি অপসারণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইঞ্জিনীয়ারদের বেলগাঁওয়ে একত্রিত করলাম।

সমর-সম্ভার চলাচল যখন শুরু হয়ে গেছে, সেই সময় চৌধুরী একদিন হান্‌ডুর উপস্থিতিতেই আমার দফতরে এসে বললেন, দায়িত্বটুকু পালন করতে তিনি নিজেই যখন সম্পূর্ণরূপে সক্ষম, তখন একজন ডিভিশনাল কমাণ্ডার[৪৪] নিযুক্ত করার কী প্রয়োজন ছিল। রহস্যভরে জবাব দিলাম, সত্যিই যুদ্ধ করবে এমন একজন ডিভিশনাল কমাণ্ডার আমাদের দরকার। অতঃপর, পূর্বে আমাকে যা বলেছিলেন, সেই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করলেন চৌধুরী; তাঁর আশঙ্কা, সমর-সম্ভার চলাচল আমার প্রতিশ্রুতি মত ১১ই ডিসেম্বরের ভিতরে কখনই সম্পূর্ণ করা যাবে না; 'অনেক যুদ্ধ' দেখেছেন তিনি, তাই জানেন এ ধরনের ব্যবস্থায় অনেক সময় লাগে। বক্তৃতাটি হজম করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। বললাম, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর যদি থাকে, তা' হ'লে আরও অনেকেরই তা' রয়েছে। সুতরাং কর্তব্য শিক্ষা দেবার কোন

৪৪। ১৭নং ডিভিশনের অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করতে ক্যান্‌ডেথ্ ৫ই ডিসেম্বর তারিখে চৌধুরীর কাছে হাজির হন।

প্রয়োজন তাঁর নেই। (তাঁর বিচক্ষণ ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্ত্বেও) ১১ই ডিসেম্বরের ভিতরে বেলগাঁওয়ের সন্নিহিত অঞ্চলে সমস্ত প্রয়োজনীয় সমর-সম্ভার প্রস্তুত রাখবো বলে তাঁকে এবং সরকারকেও কথা দিয়েছিলাম। অতএব তাঁকে আবার বললাম, এ কাজে আমাকে কোন কিছু বাধা দিতে পারে, এ সন্দেহ যেন তিনি অন্তরে পোষণ না করেন। কথাগুলি শুনেই চৌধুরী দ্রুত আমার কক্ষ ত্যাগ করলেন এবং হান্‌ড্ডু করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে।

শত্রুপক্ষকে সামান্যতম আভাসও না দিয়ে যথাসত্বর সমর-সম্ভার চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। তাই, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান করনৈল সিং-কে অনুরোধ করলাম যাতে সমর-সম্ভার চলাচল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, গতি বৃদ্ধি, দ্রুত ইঞ্জিন পালটাবার ব্যবস্থা তথা বিরতির সময় সংক্ষিপ্ত করে এবং অন্যান্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা বেলগাঁও অভিমুখী সামরিক স্পেশাল গাড়ীগুলির প্রতিবন্ধহীন যাত্রার বন্দোবস্ত করা হয়। করনৈল সিং ছিলেন করিৎকর্মা ব্যক্তি। অকুণ্ঠ সাহায্য করলেন তিনি। ফলে, সামরিক স্পেশাল গাড়ীগুলি বিনা বাধায় দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থল অভিমুখে[৪৫] চলাচল করতে থাকে এবং যথা সময়ের[৪৬] ভিতরেই সম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনী এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম তথা ১০,০০০ টনেরও বেশী রসদ নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করবার কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হই। (অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অনেক পরেও এসে পৌছুতে থাকে।)

৪৫। জরুরী অবস্থা বিধায় একমাত্র মেল ট্রেন ছাড়া, বেলগাঁওয়ের মেইন লাইনে সমস্ত অসামরিক ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সামরিক স্পেশাল ট্রেনগুলির প্রয়োজনের জন্য সময় সময় মেল ট্রেনগুলিকেও থামিয়ে রাখা হ'ত। ফলে, কয়েকজন বিশিষ্ট অসামরিক ব্যক্তি পথে আটক পড়ে যান, এবং নেহ্‌রুর কাছে তীব্র প্রতিবাদ করেন। এর জন্য আমাকে বিশেষ অসুবিধাতেও পড়তে হয়। নেহ্‌রু আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে স্বীকার করি আমার নির্দেশ মতই এটা করা হয়েছে; এও বলি যে, দেশের স্বার্থ বিবেচনা করেই দ্রুত সমর-সম্ভার চলাচলের জন্য এটা করতে আমি বাধ্য হয়েছি। এ বিষয়ে সরকারী আদেশ নেওয়া হয়েছিল কি না নেহ্‌রু জানতে চান। আদেশ আমি নিই নি; এবং সেকথাও স্বীকার করি। কয়েক মুহূর্ত রাগে গজরাতে থাকেন নেহ্‌রু। পরক্ষণেই শান্ত হয়ে যান।

৪৬। মুহূর্তের দুর্বলতায় চৌধুরী বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন (অন্য আরেকজন অফিসারের সামনে) যে, এই অভিযানে সমর-সম্ভার চলাচলের ব্যাপারে আমি অসাধ্য সাধন করেছি।

সমর-সম্ভার চলাচলের এই ব্যাপারে প্রশংসনীয় কাজ করেন কোয়ার্টার-মাস্টার জেনারেল, লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল কোছার; আমার ডাইরেক্টর অফ্‌ স্টাফ ডিউটিজ, ব্রিগেডিয়ার সাতারাওয়ালা; চলাচল বিভাগের অধিকর্তা, ব্রিগেডিয়ার পছ্‌নন্দা এবং রেলের যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসর শিব কিশোর।

লোকবল এবং সাজসরঞ্জামের দিক থেকে আমাদের ঘাটতি ছিল অনেক। (পরের বছর চীনাদের বিরুদ্ধে লড়বার সময়েও আর একবার এই ঘাটতির খপ্পরে আমরা পড়েছিলাম।) যে সমস্ত ইউনিট এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করে নি, তাদের কাছ থেকে নিয়ে এবং কিছুটা স্থানীয় ভাবে খরিদ করে কোন কোন জিনিসের ঘাটতি পূরণ করা হয়। বাকীগুলি রয়েই যায়। (সৌভাগ্যবশতঃ এবার আমাদের শত্রুপক্ষ ছিল দুর্বল।) ঘাটতি যেগুলি রয়ে গেল, তা হ'ল এক ডিভিশনের কম: দুই হাজারের মত গোলন্দাজ, রণাঙ্গনে ব্যবহার্য পোষাক-পরিচ্ছদ চৌদ্দ হাজার, প্রায় ৯০টি বেতারযন্ত্র, একশ' মাইলেরও বেশী যোগাযোগ রক্ষাকারী কেবল্‌, ৪৯০টি রাইফেল, ২৪০টি স্টেনগান এবং কিছু সংখ্যক কামান। মাইন আবিষ্কারক এবং মাইন চিহ্নিতকারীর গুরুতর ঘাটতি তো ছিলই। একটি ব্যাটেলিয়নে বুটের ঘাটতি ছিল চারশ' জোড়া। ব্যাটেলিয়নটির সৈনিকগণ পি. টি. সু পায়ে দিয়েই যুদ্ধ যাত্রা করে।

পরবর্তী কয়েকটি দিন প্রারম্ভিক উদ্যোগ-আয়োজনেই কেটে গেল। দেশসেবার মহৎ কাজে যোগদান করতে এসেছে একথাটা সবাই জানত। মনোবলও তাই প্রতিটি লোকের ছিল চমৎকার। এদিকে গোয়ায় ভারতীয়দের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে, সামরিক প্রস্তুতি বজায় রেখে এবং আমাদের শত্রুস্থানীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মাখামাখি করে পর্তুগীজরা ক্রমাগত আমাদের প্ররোচিত করতে থাকে। পাকিস্তানের কতগুলি কার্যকলাপেও স্পষ্ট বোঝা যায় পর্তুগীজদের সঙ্গে যোগ-সাজসেই সেগুলি করা হয়েছে।

আমাদের সরকারের ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু কিছু স্বদেশদ্রোহী আত্মগোপন করে ছিল। তারা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় সমস্ত সংবাদ পর্তুগীজদের জানাতে থাকে। এই ভাবেই 'চরম' দিনটির কথা সালাজারের কাছে পৌঁছে যায়; এবং গোয়ার গভর্ণর জেনারেল ডি'সিলভাকে তাঁর ১৩ তারিখের সর্বশেষ টেলিগ্রামে সালাজার সাবধান করে দেন যে, ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে

ভারত গোয়া আক্রমণ করবে। (১৩ তারিখ পর্যন্ত তাই স্থির ছিল।) এতবড় গোপনীয় সংবাদটি নিশ্চয়ই আমাদের দিল্লীর উচ্চপদস্থ কোন সরকারী মহল থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। পরে 'চরম' দিনটি পরিবর্তন করে ১৮ই ডিসেম্বর স্থির করা হয়। ধন্য আমাদের নিরপত্তা ব্যবস্থা। কয়েকজন অফিসর এবং জওয়ানও নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠি-পত্রে 'চরম' দিবসের কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। সামরিক সদর দফতরের সেন্সর বিভাগ এ ধরনের কয়েকখানি চিঠি আটক করে।

দক্ষিণ আমেরিকার জনৈক রাষ্ট্রদূত পর্তুগালের পক্ষ থেকে আমাদের বৈদেশিক দফতরে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। আমেরিকা ও ব্রিটিশ সরকারের উদ্বেগ জ্ঞাপন করে উভয় দেশের রাষ্ট্রদূতের মারফৎ প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বার্তাও এসে পৌছুল নেহ্‌রুর কাছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্টের কাছ থেকেও অনুরূপ বার্তা পেলেন নেহ্‌রু। বার্তাগুলির সারমর্ম ছিল, বিশ্ববাসী নেহ্‌রুকে শান্তির দূত হিসাবে শ্রদ্ধা করে। সুতরাং গোয়ার বিরুদ্ধে ভারতের কোনপ্রকার সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ, শান্তির জন্য তাঁর প্রকাশ্য ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে অসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে। সকলেই, শক্তিপ্রয়োগের পন্থা অবলম্বন না করে, সংযম ধারণপূর্বক সমস্যাটির মীমাংসা করবার চেষ্টা করতে অনুরোধ জানান নেহ্‌রুকে। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটির সম্মানজনক কোন সমাধানের কিছুমাত্র চেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে এতদিন তাঁরা কেউ করেন নি। এবং, অনুরূপ অবস্থায় নিজেরা পড়লে, এঁদের কেউই আমাদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত তাঁদের উপদেশ অনুসারে কখনই চলতেন না। তথাপি, বার্তাগুলিতে সুস্পষ্টভাবে নেহ্‌রু প্রভাবিত হলেন। কারণ, বিদেশী রাষ্ট্রের যে কোন মন্তব্যের ব্যাপারেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। উ থাণ্টের পত্রটিই তাঁর উপর সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করল। পত্রটি রাষ্ট্রপুঞ্জের মত একটি বিশ্বজনীন সংস্থার প্রধানের বার্তাই শুধু বহন করে আনে নি ; এনেছিল একজন বিশিষ্ট এশিয়বাসী সহকর্মীর বার্তাও। তাই সম্পূর্ণ বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য নেহ্‌রু অভিযানের 'চরম' দিবস দুই দুই বার স্থগিত রাখেন।

এই উভয় সঙ্কটে পড়ে নেহ্‌রু কতবার যে কৃষ্ণ মেনন, জেনারেল থাপার অথবা অন্য কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তা' জানি না ; কিন্তু আমাকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে বললেন, পুনরায় চিন্তা করে গোয়ার বিরুদ্ধে সামরিক

অভিযানের নিজ পূর্ব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি একেবারেই খুশী বোধ করতে পারছেন না। এই সম্বন্ধে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধগুলির উল্লেখ করে বললেন, তীব্র বিশ্বজনমত উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। অভিযানটি বাতিল করে দিলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে সম্বন্ধেও আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে বললাম, এই উদ্দেশ্যেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বহু বৎসর ধরে প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে; জাগিয়ে তোলা হয়েছে তাদের দেশাত্মবোধ; বিভিন্ন জনসভায় একাধিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জাতির কাছে যে অঙ্গীকার করেছেন, আজ ভারতবাসী সেই অঙ্গীকার প্রতিপালিত হবে বলে আশা করে রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি রূপায়নের জন্য নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে সাগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী। ইতিমধ্যে দু' দু'বার আমরা 'চরম' দিবস স্থগিত রেখেছি। পুনরায় যদি স্থগিত রাখি অথবা সৈন্য বাহিনীর প্রতি প্রদত্ত আদেশ বাতিল করি, তা'হলে তাদের মনোবলের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবেই। পরিবর্তিত সিদ্ধান্তটিকে তারা উপহাস করবে; এবং সরকার ও তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততার কারণে আমাদের সামরিক বাহিনী তথা রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিও তাদের শ্রদ্ধা যাবে নষ্ট হয়ে। সব চাইতে বড় কথা হ'ল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করা হয়েছে বলে ধারণা হবে দেশবাসীর মনে। তা' ছাড়া, এটা হ'ল আমাদের ঘরোয়া সমস্যা। কারও দেশ আমরা আক্রমণ করছি না। বাইরের কোন রাষ্ট্রেরও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার নেই। আজ যারা আমাদের উপদেশ দিচ্ছে, তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে অনুরূপ কোন উপদেশ দিলেই তারা প্রচণ্ড আপত্তি তুলেছে। যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করেই এই দৃঢ় সংকল্প আমরা গ্রহণ করেছি; এবং আমার মতে বিদেশী রাষ্ট্রের মতামত উপেক্ষা করাই হবে সমীচীন।

সব শুনে নেহ্রু কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। সিগারেটে টান দিলেন কয়েকটা। মনে হ'ল, বেশ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। গোয়ার ব্যাপারে যখন তিনি একটা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে দেশবাসী আশা করছে, সেই মুহূর্তে বিশিষ্ট কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র আপত্তি প্রকাশ করায় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তা' ছাড়া, ব্যক্তিগত ভাবেও সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না।

তাই তাঁর অবস্থা হয়ে পড়েছিল বিব্রতজনক। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই হয়। কারণ তাঁদের উপর থাকে গুরু দায়িত্ব-ভার। খানিকক্ষণ চিন্তার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেহ্রু মন স্থির করলেন। বর্তমান আদেশ মতই অগ্রসর হতে বললেন আমায়। নিশ্চিতভাবে বুঝে-ছিলেন, জনগণ গোয়াকে মুক্ত করতে চায়। সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর শেষ পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ার কারণও বোধ হয় ছিল তাই। ভেবে-ছিলেন, এ ব্যাপারে পিছিয়ে গেলে জনগণ এবং সামরিক বাহিনী উভয়েই আস্থা হারিয়ে ফেলবে তাঁর উপর।

১৮ তারিখে আমার বাসায় এক মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমেরিকার রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনার গোরেবুথকে। কিন্তু উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের কারণে আগের দিনই তাড়াতাড়ি সে নিমন্ত্রণ বাতিল করে দিলাম। মনে হয় রাষ্ট্রদূতদ্বয় নিমন্ত্রণ বাতিলের কারণ নিশ্চয়ই অনুমান করেছিলেন।

চাপা একটা উত্তেজনায় ছেয়ে গেল দেশের চারদিক। ছড়িয়ে পড়তে লাগল নানা ধরনের সমস্ত কাল্পনিক গুজব। এদিকে সেনাবাহিনী সর্বাংশে প্রস্তুত হয়ে শত্রুপক্ষকে ১৮ তারিখে আঘাত হানবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

আমার কাছে বিষয়টির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবার ব্যাপারে দিল্লীতে অন্যান্যদের সঙ্গে সৌভাগ্যবশতঃ আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তাই সম্ভব হ'লে অভিযানটিতেও অংশ গ্রহণ করতে আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। থাপারকে বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। ১৭ তারিখে বিমানযোগে বেলগাঁও উপস্থিত হয়ে লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে অগ্রগামী সৈন্যদলের সঙ্গে গোয়া অভিমুখে মার্চ করে যাবার সঙ্কল্প প্রকাশ করলাম। কিন্তু চৌধুরীর তাতে আপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন সেখানকার স্থানীয় অধিনায়ক; এবং সেই হিসাবে আমার যাবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করেন না বললেন। অগ্রগামী সৈন্যদলের সঙ্গে প্রবীণ সেনাধ্যক্ষদের মার্চ করে যাওয়াটা নতুন কিছু নয়। এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাঁকেও আমার সঙ্গে মার্চ করে যেতে আমন্ত্রণ জানালাম। কিন্তু চৌধুরী বললেন, লক্ষ্যস্থলগুলি অধিকার করে নেবার পর যখন হেলিকপ্টারে করে

অনায়াসেই সেখানে যাওয়া যেতে পারে, তখন বৃথা কষ্ট করে পদব্রজে যাবার কোন যুক্তিই হয় না (এই সামান্য দূরত্ব?)। যেখানে আমাদের এই কথা-বার্তাগুলি হচ্ছিল, তার অনতিদূরেই বসেছিলেন হান্‌ডু। একটু আগেই কিছু দূরে একটি 'অটার' এসে অবতরণ করেছিল। অহেতুক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই দেখে চৌধুরীর বক্তব্য উপেক্ষা করে দ্রুত পদে যেয়ে সেই 'অটারে' চেপে বসলাম। অনতিবিলম্বে পৌঁছে গেলাম কয়েক মাইল দূরবর্তী ডিভিশনাল সদর কার্যালয়ে।

উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক থেকে গোয়ার উপর একটি ত্রিমুখী অভিযানের আয়োজন করা হ'ল। পশ্চিমদিকের ভার গ্রহণ করল আমাদের নৌ-বাহিনী। পূর্বদিক থেকে যে প্রধান বাহিনীটির অগ্রসর হবার কথা তাদের সঙ্গেই যেতে মনস্থ করলাম। ক্যান্‌ডেথের মতো ধীর, স্থির এবং সুদক্ষ অফিসর সচরাচর দুর্লভ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার পর একটি জীপে করে ব্রিগেড সদর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে আমার সুপরিচিত ব্রিগেডিয়ার কলবন্ত সিং-এর[৪৭] সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর সময় নষ্ট না করে কলবন্ত সিং এবং আমি উপস্থিত হলাম পুরোভাগ রক্ষণ-কার্যে রত একটি শিখ ব্যাটেলিয়নের সদর দফতরে।

মধ্য রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। আক্রমণ আরম্ভ করবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হ'ল সবাই। নিথর শেষ রাতের অন্ধকারে বিরাজ করতে লাগল প্রতীক্ষার তীব্র উত্তেজনা এবং পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পাছে কেউ শুনতে পায় তাই কথা-বার্তা বলা হচ্ছিল চাপা ফিস্ ফিস্ শব্দে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে। টর্চগুলির মুখ দেওয়া হয়েছিল ঢেকে। সেনাধ্যক্ষদের বাহুতে ছিল পরিচয়-জ্ঞাপক সাদা ফিতা। নির্দিষ্ট ক্ষণটির জন্য বারংবার ঘড়ির দিকে দেখছিলাম আমরা। চিন্তা হচ্ছিল, নির্বিবাদে কার্যোদ্ধার হবে, না লড়াই হবে।

সৈন্য বাহিনীর পুরোভাগের প্রথম তরঙ্গ যে মুহূর্তে এগিয়ে গেল, আমরাও এগিয়ে গেলাম তাদের সঙ্গে: আমি, ব্রিগেডিয়ার কলবন্ত সিং এবং দিল্লীস্থ আমার বিশ্বস্ত সহচর লেফ্‌টনান্ট্ কর্ণেল সঞ্জীব রাও ও মেজর মালহোত্রা।

৪৭। এই অভিযানে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করলেও, কিছুদিন পরই তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য লোককে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

বাতাসে ঈষৎ শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছিল। চারপাশের ওৎ পেতে থাকা মৃত্যুর সম্ভাবনাটুকু বাদ দিলে, ব্যাপারটি মনে হতে লাগল যেন দ্রুত খানিকটা প্রাতর্ভ্রমণের মত।

ব্যাটেলিয়নটি বলতে গেলে প্রায় দৌড়েই এগিয়ে গেল। পথে দেখতে পেলাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মাইন এবং বিধ্বস্ত সেতু। বাধাগুলি অপসারণ এবং সেতু ও সড়কগুলি মেরামত না করা অবধি যান-বাহন এবং কামান সঙ্গে নেওয়া সম্ভব ছিল না আমাদের। বাধাগুলি অতিক্রম করলাম বিপজ্জনক ভাবে। প্রতিটি সৈনিকের কাছেই ছিল যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় গোলা-গুলি এবং রসদ। তাই নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় এগিয়ে চলল সবাই। মাইনকে ভ্রূক্ষেপ না করে যথাসাধ্য দ্রুত অগ্রসর হয়ে চললাম আমরা। বেলা ১০টা নাগাদ উপস্থিত হলাম মোলেম নামক একটি জনমানব শূন্য শহরে। দেখেই বোঝা গেল অধিবাসী এবং সেনাবাহিনী ভীত, ত্রস্তভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছে। উনুনের উপর চাপানো ফুটন্ত কড়াই, আধখোলা স্যুটকেশ, দোমড়ানো-মোচড়ানো রাতের পোষাক এবং বিক্ষিপ্ত অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসপত্রই সে সাক্ষ্য বহন করছিল। মোলেমে বিস্ফোরক পদার্থের বিশাল একটি গাদাও আমরা অক্ষত অবস্থায় অধিকার করলাম।

কিছুক্ষণ পরেই অধিকার করলাম কোলেম নামে আর একটি শহর। পর্তুগীজ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার আনন্দে জনগণের মধ্যে দেখা গেল বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। এখানে ফারনান্‌ডেজ্‌ নামে জনৈক বন্ধুস্থানীয় ধনী গোয়াবাসীর সাক্ষাৎ পেলাম। নিজের জীপ এবং তিনটি ট্রাক তিনি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিলেন। সাগ্রহে সেগুলি আমরা গ্রহণ করলাম। তারপর সেই ট্রাকগুলিতেই সৈনিকদের নিয়ে পলায়নপর শত্রুর পিছু ধাওয়া করে চললাম আমি আর ব্রিগেডিয়ার কলবন্ত সিং। অসাধারণ সেই পরিস্থিতিতে গতির প্রশ্নই ছিল সব চাইতে বড়। ঝুঁকিটুকু তাই ইচ্ছা করেই নিতে হ'ল।

পর্তুগীজরা আত্মসমর্পণ করলে সেটা কে গ্রহণ করবে তা' পূর্বাহ্নেই চৌধুরী সামরিক সদর দফতরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। সরকারের সম্মতিক্রমে থাপার তখন তাঁকে জানান, এই অভিযানের আসল যা কিছু ধাক্কা মেজর জেনারেল ক্যান্‌ডেথের উপর দিয়েই যাচ্ছে বলে তাঁরই সে সম্মান পাওয়া উচিত।

যাই হোক, আমাদের ছত্রী ব্রিগেডটি ১৮ তারিখের সন্ধ্যাতেই বেনাসতারিম এবং বেতিমে পৌঁছে গিয়েছিল (আশানুরূপ অগ্রগতি !)। সংবাদটি বেতার মারফত চৌধুরীর কাছে প্রেরণ করে ছত্রী ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার সাগৎ সিং জানান, পানজিমে তখন অবধি এলোমেলো কিছুটা গুলিবর্ষণ চললেও, শীঘ্রই সেখানে পৌঁছবার আশা তাঁরা করছেন। সংবাদটুকু পেয়েই চৌধুরীর ধারণা হ'ল প্রকৃতপক্ষে লড়াই বুঝি শেষ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বি. এন. মল্লিক এবং নিজের প্রধান স্টাফ অফিসর মেজর জেনারেল ডান্-কে নিয়ে একখানি হেলিকপ্টার যোগে বেনাসতারিম অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। দুঃখের কথা, হান্ডু সেখানে উপস্থিত থাকতেও তাঁকে সঙ্গে নিলেন না। অথচ অবস্থা বিচারে এই গুরুত্বপূর্ণ সফরে তাঁকে সঙ্গে নেওয়াটাই শোভনীয় হ'ত। কারণ গোয়া-র ব্যাপারে প্রথমাবধি দু'জনে একই সঙ্গে কাজ করেছেন ; এবং তখনও করছিলেন।

অগ্রবর্তী সেনাবাহিনীর কর্মতৎপরতা পরিদর্শনের ভান করে বেনাসতারিম রওনা হলেন চৌধুরী ; কিন্তু, দিল্লীর আদেশের বিরুদ্ধেই পর্তুগীজদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করাই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত পানজিমের চারপাশে এলোপাথারি গুলিবর্ষণ চলল, ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করে রইলেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন শহরের পতন হবার পর।[৪৮] কিন্তু এত করেও অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। আত্মসমর্পণ করবার মালিক, পর্তুগীজ গভর্ণর জেনারেল ডি'সিলভা পূর্বরাত্রেই ভাস্কো-ডা-গামায় পলায়ন করেছিলেন। ছিলেন কেবল পর্তুগীজ সেক্রেটারি জেনারেল কোলাস্সো। খবর পেয়েই সোজা তাঁর বাংলোতে গিয়ে চৌধুরী আত্মসমর্পণ দাবী করলেন। কিন্তু সঙ্গতভাবেই কোলাস্সো জানালেন, সামরিক আত্মসমর্পণ প্রদান করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এরজন্য চৌধুরীকে যেতে হবে ভাস্কো-ডা-গামায়, কারণ গভর্ণর জেনারেল সেইখানেই রয়েছেন। তখন অবধি ভাস্কো-ডা-গামায় ছোট-খাটো লড়াই চলছিল। তাই আত্মসমর্পণ আর গ্রহণ করা হ'ল না চৌধুরীর। ফিরে গেলেন বেলগাঁও-এ।

ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই ৬৩নং ব্রিগেডের

৪৮। থাপার এবং মেননকে ডিঙ্গিয়ে পানজিম থেকে একখানি স্মারকলিপি সোজা তিনি পাঠিয়ে দেন নেহরুর কাছে। থাপার ও মেনন উভয়েই সেজন্য ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন।

অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কলবন্ত সিং চৌধুরীর কাছে একটি বেতারবার্তায় জানালেন ভাস্কো-ডা-গামায় পর্তুগীজ গভর্ণর জেনারেল ডি'সিলভা[৪৯] শ্বেত পতাকাসহ একখানি জীপে করে তাঁর কাছে এসে রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন। হান্ডু পরামর্শ দিলেন নিঃসর্ত এবং সমগ্রভাবে (সীমিত নয়) আত্মসমর্পণ গ্রহণ করাই আমাদের উচিত হবে। কলবন্ত সিং-কে সেই কথাই জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

কয়েকদিন পর পর্তুগীজ গভর্ণর জেনারেল নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রদান করেন হান্ডুর কাছে :

(ক) ভারত যে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেটা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

(খ) সামরিক আক্রমণ শুরু হয়ে গেলেও, ভারতীয় বাহিনী যে এত দ্রুত সব কিছু শেষ করে ফেলবে সেটাও ছিল তাঁর চিন্তার অতীত। বিশেষ করে, তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সেতুগুলি ধ্বংস করে ফেলা সত্ত্বেও (ডি'সিলভা নিজে ছিলেন একজন 'স্যাপার') ভারতীয় সৈন্যেরা যে পাঁচ-পাঁচটি নদী এত শীঘ্র পার হবে তা' তিনি একেবারেই অনুমান করতে পারেন নি।

(গ) তিনি কল্পনাও করেন নি যে তাঁর সৈন্যেরা এমন দুর্বল প্রতিরোধ উপস্থাপিত করবে, এবং তাঁর 'প্রজাদের' মধ্যে এত বিশ্বাসঘাতক রয়েছে।

(ঘ) ভারতীয় বাহিনী 'স্বাভাবিক' গতিতে অগ্রসর হলে, সীমান্তে পৌছতে তাদের লাগত দিন তিনেকের মত, এবং নদীর বাধাগুলি অতিক্রম করতে লাগত দশ থেকে চৌদ্দ দিন। সেই অবসরে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন করে যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে ভারতীয় সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করবার সুযোগ তিনি পেতেন।

এই অভিযানে নৌ এবং বিমান বাহিনী আগাগোড়া আমাদের চমৎকার সহায়তা করে। একটি মাত্র ক্ষেত্রে হিসাবে ভুল করে বিমান বাহিনী। মাপুকাতে ২নং শিখ লাইট ইন্‌ফ্যানট্রির অগ্রগমনে সহায়তা করতে বিমান আক্রমণের আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু লক্ষ্যস্থল ভুল করে আমাদেরই

৪৯। পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজ 'আলবুকার্কে' চেপে পর্তুগালে পলায়নের উদ্দেশ্যে তিনি এবং আরও বহু পর্তুগীজ কর্মচারী ভাস্কো-ডা-গামায় একত্রিত হয়েছিলেন। কেউ ভাবতে পারেন নি যে ভারতীয় নৌবাহিনী উক্ত জাহাজটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে।

কামান সমাবেশের উপর বোমা বর্ষণ করে তারা। সৌভাগ্যবশতঃ ক্ষতি বিশেষ কিছু হয় নি।

সরকারী আদেশে আমাদের অগ্রগামী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাংবাদিকদের যেতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু ভুল হয়েছিল এটা। গোপন করবার মতো আমাদের কিছুই ছিল না। এই বাধা-নিষেধের জন্য বেলগাঁও-এ বসেই সাংবাদিকগণ খবরা-খবর পাঠাতে থাকেন; এবং বহু ক্ষেত্রেই সঠিক সংবাদ পরিবেশিত হয় না।[৫০] অথচ খবর পেয়েছি, কয়েকজন দুঃসাহসী বিদেশী সাংবাদিক আমাদের অভিযান আরম্ভ হবার পূর্বেই গোয়ায় প্রবেশ করেছিলেন (কোন দিক দিয়ে?)।

এই অভিযানের সময় আমাদের সামরিক এবং অন্যান্য বিভাগে কর্মরত গোয়াবাসীগণ সাহসের সঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ এয়ার ভাইস মার্শাল পিণ্টোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কাকা, ডাক্তার রোস্‌সারিও ডি'পিণ্টো ছিলেন মাপুকার মেয়র। তথাপি এয়ার ভাইস মার্শাল পিণ্টো অসীম বিক্রমে গোয়ার উপর প্রথম বিমান আক্রমণ পরিচালনা করে দাম্বোলিমের বেতার যন্ত্রটিকে বিনষ্ট করে দেন। (হয়তো তাঁর আত্মীয়-স্বজনও এই আক্রমণে নিহত হন।)

যুদ্ধ করবার কোন রকম আগ্রহই পর্তুগীজরা দেখায় নি। দিউ এবং দমনে কিছুটা বাধা দিলেও সমগ্রভাবে বিচার করে দেখলে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই তারা করেছে। প্রথমে যত দ্রুত আমরা সেনাবাহিনী এবং সমরসম্ভার একত্রিত করেছিলাম এবং পরে যে গতিতে আমাদেব বাহিনী পদব্রজে এগিয়ে যায়, তা' ছিল ধারণাতীত। স্থানীয় অধিবাসীগণও আমাদের সৈনিকদের দেখে খুশী হয়ে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। ৪৫১ বৎসর পর, মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সৈনিকগণ পর্তুগীজ দখল থেকে নিজেদের এলাকা ছিনিয়ে নেয়।

সমস্ত পর্তুগীজ বন্দীদের (রাজনৈতিক বন্দী বলেই আমরা তাদের অভিহিত করতাম) প্রতি আমরা সদয় ব্যবহার করেছি। সস্ত্রীক তাদের

৫০। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযানে আদৌ কামান ব্যবহার করা হয় নি। অথচ জনৈক সাংবাদিক নিছক কল্পনার উপর ভিত্তি করে লেখেন, 'কামান মুহুর্মুহুঃ গর্জন করে চলেছে এবং দিগন্ত হয়ে উঠেছে আলোকিত…।'

গভর্ণর জেনারেলের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান থেকে নিয়ে তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনেরও অনুমতি দেওয়া হয়। গভর্ণর জেনারেলের স্ত্রী অসুস্থ থাকায়, তাঁকে ফিরিয়েও দেওয়া হয়েছিল। বন্দী পর্তুগীজদের প্রতি সদয় ব্যবহারে 'শিভাল্‌রী' র চূড়ান্ত করেছিলাম আমরা। আমাদের নিজেদের সৈনিকদের চাইতেও বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছিলাম তাদের জন্য। ভাল খাবার, বাসস্থান ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছাড়াও অনেককেই শুতে দেওয়া হয়েছে ঘরের ভিতরে। অথচ আমাদের লোকজন বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও রাত্রি যাপন করেছে উন্মুক্ত-আকাশের নীচে। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সংস্থা এই সমস্ত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিল। পর্তুগীজ বন্দীদের বিরাট একটি সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাদের আর কিছুর প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সামান্য যে কয়েকটি আবেদন পাই তার মধ্যে চিঠি-পত্র সংক্রান্ত কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার প্রার্থনা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিব যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতি প্রদান কবি।

দিল্লীতে ফিরে এসে দেখলাম হৈ-হৈ ব্যাপাব। সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করাব জন্য এবং নির্বিবাদে সব কিছু মিটে যাওয়ায় সৈন্যবাহিনী, পুলিশ এবং সরকারের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ।

কয়েকদিন পর, উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি সরকারী দলের সঙ্গে সমুদ্রপথে আবার গোয়ায় ফিরে গেলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে গোয়াতে সামরিক শাসন প্রবর্তন করতে সরকার মনস্থ করেছিলেন; এবং সামরিক গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল মেজব জেনারেল ক্যান্‌ডেথকে। তাঁর বিশেষ পরামর্শদাতা-রূপে নিযুক্ত হন হান্‌ড়ু। অতীব দক্ষতা সহকাবে ক্যানডেথ এই দায়িত্ব পালন করেন।

যে বিশাল ভবনটি থেকে পর্তুগীজ গভর্ণর জেনারেল একদিন এই দেশ শাসন করতেন সেই 'প্রাসাদ'ই হ'ল এখন ক্যান্‌ডেথের আবাস স্থান। ভবনটির শীর্ষে পর্তুগীজ পতাকার পরিবর্তে এখন উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ভারতীয় পতাকা। বিশালায়তন সেই ভবনটিতে আমরা পদার্পণ করতেই সুপরিচিত জনৈক গোয়া জাতীয়তাবাদী নেতা হান্‌ড়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দীর্ঘদিন তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল গোয়াতে। ভাবাবেগে প্রথমেই তিনি সেই প্রাসাদের গৃহতল চুম্বন করলেন; কারণ সেটি তখন হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় অঞ্চল। তারপর, শেষ কয়েক বছর ধরে গোয়াতে

তাঁর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল; সে সবের চাঞ্চল্যকর বিবরণ প্রদান করলেন হান্‌ডু এবং আমার কাছে। পরিশেষে বললেন, গোয়ার মুক্তির সঙ্গেই সফল হয়েছে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন। আর কোন ভূমিকা তাঁর নেই। তাই গোয়া ত্যাগ করে তিনি চলে যাচ্ছেন চিরজীবনের মত। কোনদিন আর ফিরবেন না।

অসামরিক দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের প্রশাসক এবং পুলিশ বাহিনী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দ্রুত উন্নতি হয় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং সর্বশেষে, প্রশংসনীয়ভাবে দায়িত্বপালন করে সামরিক বাহিনী।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিছু ছিল আমাদের অনুকূলে; কিছু আবার ছিল বিরুদ্ধে। কোন কোন মহল থেকে প্রচার করা হয়, গোয়ায় নিজেদের সশস্ত্র আক্রমণের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে ভারতই নানাভাবে পর্তুগালকে প্ররোচিত করেছে। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সময় অনুষ্ঠিত এসিআটো নৌ মহড়ার সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, ১৯৬১ সালের ১৮ই এবং ২১শে নভেম্বর তারিখের ঘটনা দু'টিতে একজন ভারতীয় নাগরিককে আহত এবং অন্যজনকে নিহত করে গভীর প্ররোচনা প্রদান করে পর্তুগাল নিজেই। আমাদের যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, বিদেশী দখল থেকেই নিজেদের অঞ্চল আমরা উদ্ধার করেছিলাম; এবং সেই বিদেশী শক্তির ভারতীয় অঞ্চল দখল করে থাকার কোন অধিকার নেই।

অনেকে বলেছেন, বোম্বাইয়ের আসন্ন নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখেই মেনন এই সামরিক অভিযানটির ব্যবস্থা করেছিলেন। উক্ত নির্বাচনে মেনন দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, এ ধারণা সত্য নয়। নেহ্‌রুর পূর্ণ অবগতি এবং সম্মতিতেই এবং ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মেনন।

গোয়া সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত সরকারী নীতিতেও দৃঢ়তার অভাব ছিল। নিতান্ত চাপে পড়েই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্রভাবে আমাদের সীমান্ত সমস্যাগুলি মোকাবিলা করবার ব্যাপারেও তাঁদের মধ্যে এই দৃঢ়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ কাশ্মীরের কথাই ধরা যাক। ১৯৪৭ সাল থেকে কাশ্মীর সমস্যা আমাদের রাতের নিদ্রা হরণ করেছে।

এমনিতেই সীমান্ত রাজ্যের সমস্যা হয় জটিল ; কাশ্মীরের তো সেটা রয়েছে আরও বেশী।

'কাশ্মীর নিয়ে কোন আলোচনা চলতে পারে না ; কাশ্মীর হ'ল মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ কিংবা রাজস্থানের মতো ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ; অথবা, কাশ্মীর সমস্যা বলে কিছু নেই'—একমাত্র এই উক্তিগুলিই এ সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আসলে, কাশ্মীরের প্রকৃত সমস্যাই আমরা এড়িয়ে গেছি। বছরের পর বছর ধরে রাজ্যের মধ্যে অবিরাম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। অথচ, স্থানীয় উদার আতিথেয়তার শিকার না হয়ে যারা উপযুক্ত সংস্কার সাধন করতে সক্ষম, এমন বাছা বাছা একনিষ্ঠ, সুদক্ষ এবং সৎ প্রশাসকদের ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কাশ্মীরে আমরা পাঠাই নি। প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সেখানকার বহু ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত মুলতুবী রেখেছি দিনের পর দিন। যে ক্ষেত্রে শক্ত হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে আগাগোড়া স্রোতের শ্যাওলার মতন এই নীতি কারুরই কোন উপকারে আসে না। ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মূল কারণ হ'ল কাশ্মীর। তথাপি আমরা আশা করে রয়েছি, কালক্রমে সেখানকার ঘটনাগুলি আপনা থেকেই মোটামুটিভাবে থিতিয়ে যাবে।

শেখ আবদুল্লার অতীত রাজনৈতিক পটভূমি আমাদের অজ্ঞাত নয়। তবু প্রথমে তাঁকে খ্যাতির চূড়ায় তুলে ধবি আমরা। তারপর ১৯৫৩ সালে কয়েদ করে অন্তরীণ অবস্থায় রাখি। ১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রদান করে কয়েক মাস পরেই পুনরায় কারারুদ্ধ কবি তাঁকে। বিচারের ব্যাপারটিকে টেনে নিয়ে চলেছি বছরের পব বছর ধরে।[৫১] এ সমস্তই হ'ল দ্বিধাগ্রস্ত, অনিশ্চয়তাপূর্ণ নীতির লক্ষণ।

বস্তুতঃ আমাদের নীতিগুলিকে বলিষ্ঠভাবে কোনদিনই কাশ্মীরে রূপায়িত করা হয় নি। যতদিন সেটা না করা হবে, ততদিন মিটবে না এই সমস্যা।

নেহ্রুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল আমার। এই অবসরে তাই আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং গণতান্ত্রিক ভারতের রূপকারের মূল্যায়ন করা কতব্য বলে মনে করি।

৫১। ১৯৬৪ সালে তাঁকে মুক্তি দিয়ে আবার কারারুদ্ধ করা হয় ১৯৬৫ সালে। তারপর থেকে আজ অবধি তাঁকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে।

বহু অসাধারণ গুণরাজির সমাবেশ ঘটেছিল নেহ্রুর চরিত্রে। এমন নির্ভীক এবং ঘৃণামুক্ত মানুষ দেখা যায় কদাচিৎ। অতুলনীয় দেশপ্রেমের জন্য তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে সারা বিশ্বের বহু রাজনীতিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি তথা সাংবাদিকগণ বহু কথা আগেই লিখে গেছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমি তাই সংক্ষেপে কেবলমাত্র তাঁর দুর্বলতাগুলির উল্লেখ করে, সেগুলির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করব। এই দুর্বলতাগুলি তাঁর চরিত্রে বিশেষভাবে দেখা দেয় ভারতের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন হবার পর।

সময় সময় নেহ্রুকে অহংকারী এবং দাম্ভিক বলে মনে হ'ত। কৈশোর থেকেই একাধিক ঘটনা তাঁর মধ্যে এই অহংকারী মনোভাব গড়ে তোলে। মতিলাল নেহ্রুর মতো তীক্ষ্ণধী, ধনবান, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং প্রশ্রয়দাতা পুরুষশ্রেষ্ঠের একমাত্র পুত্র ছিলেন জওহরলাল। পুত্রের দোষ-ত্রুটির প্রতি মতিলাল ছিলেন অন্ধ। সে যে কোন অন্যায় করতে পারে এটা তিনি চিন্তাও করতেন না কখনও। এই অত্যধিক প্রশ্রয়ই জওহরলালের মনে নিজের সম্বন্ধে একটি বিরাট ধারণার সৃষ্টি করে। পিতা মতিলাল (যাঁর চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য বহু দিক থেকে জওহরলালকে ছাপিয়ে গিয়েছিল) যে তাঁর সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাইতেই জওহরলাল গর্বিত বোধ করতেন।

কংগ্রেসে যোগদানের পর গান্ধীর সম্মোহনী প্রভাব পড়ে তাঁর উপর। দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন জওহরলাল। পুত্রের একনিষ্ঠ দেশপ্রেমে মুগ্ধ মতিলালও (এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণ[৫২]) যোগদান করেন কংগ্রেসে। জওহরলালের কাছে এই ঘটনা নিজের ব্যক্তিগত সাফল্যরূপে প্রতিভাত হয়। অভিজাত এবং স্বনামধন্য পিতাকে 'সমধর্মিতায়' নিয়ে আসার এই সাফল্য এবং পরবর্তীকালে গান্ধী কর্তৃক কংগ্রেস 'সিংহাসনে' নিজ উত্তরাধিকারী বলে তিনি অভিহিত হওয়ায়, নেহ্রুর অহংভাব আরও বেড়ে যায়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নেহ্রুর প্রতিষ্ঠা, গান্ধীর পরেই অদ্বিতীয় এবং অবিসংবাদী জননেতারূপে গগনচুম্বী হয়ে ওঠে। জনগণের প্রীতি অর্জন করেছিলেন তিনি; জনগণও তাঁকে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের

৫২। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের প্রতি জওহরলালের যথেষ্ট প্রীতি থাকলেও, সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি ছিল তাঁর কন্যা ইন্দিরার প্রতি।

প্রতিনিধি তথা আত্মত্যাগের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করে নিজেদের রোমান্টিক হিরো বলে মনে করত। এই জনপ্রিয়তাই তাঁকে জোগায় অসীম শক্তি, যার ফলে এই বিশ্বে নিজেকে অজেয় বলে ধারণা হয় তাঁর।

একবার কংগ্রেসের এক অধিবেশনে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবর্গের সামনেই তিনি উচ্ছৃঙ্খল জনতার প্রতি মাইক্রোফোন যোগে চীৎকার করে বলেন: 'ভদ্রমহিলা এবং মহোদয়গণ! যা বলছি তাই করুন। মঞ্চ থেকে শুরু করে আপনারা যেখানে বসে রয়েছেন তার শেষ অবধি আপনাদের ভিতর দিয়ে আমি হেঁটে যাবো, এবং আবার মঞ্চে ফিরে আসবো। আমার যাবার পথ করে দিন, নড়াচড়া করবেন না, এবং চুপচাপ থাকবেন। একটা লোক'ও নড়া-চড়া করলে অথবা কথা বললে, আমি এখান থেকে চলে যাবো।' কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থল একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারপর কথা মতই কাজ করেন নেহ্রু। একটি লোক'ও নড়াচড়া করে নি কিংবা কেউ কথা বলে নি। অধিবেশনে উপস্থিত কংগ্রেসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঘটনাটিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। জনতার উপর নিজের আধিপত্যের জন্য অসীম আত্মবিশ্বাস অনুভব করতেন নেহ্রু। ইচ্ছামতো জনতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন করতে পারেন বলে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁর। এবং এগুলি দেখে তাঁর বন্ধুরা যেমন হতেন খুশী, বিপক্ষীয়েরা তেমনি হতেন বিক্ষুব্ধ।

আরেকটি কংগ্রেস অধিবেশনের ঘটনা। প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট একটি পথ দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নেহ্রু মোটরে করে যেতেন। পথের দুধারে তাঁকে দেখবার জন্য সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো বিশাল জনতা। একদিন কোন কারণে সেই পথটিতে অপ্রত্যাশিতভাবে যানবাহন চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। পুলিশ তাই অন্য একটি নির্জন পথ দিয়ে নেহ্রুর গাড়ীটিকে ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সেই গাড়ীতে গোপী হান্ডু[৫৩] ছিলেন। ভীড় থেকে গাড়ীটিকে দূরে সরে যেতে দেখে গোপীর উদ্দেশ্যে চীৎকার করে অবিলম্বে গাড়ী থামাতে নির্দেশ দেন নেহ্রু। তারপর সারাটা পথ তাঁর জন্য অপেক্ষারত সেই হাজার হাজার নরনারীর ভিতর দিয়ে পদব্রজে গমন করেন। জনতাও আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে তাঁকে দেখে। সেই রাতেই স্নান সেরে নিয়ে আহারের পূর্বে কথা প্রসঙ্গে গোপীকে তিনি বলেন, অন্ততঃপক্ষে তাঁর ব্যাপারে আর কখনও যেন জনতাকে উপেক্ষা করা না হয়। জনতা যে

৫৩। তাঁর নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান।

অবশ্যই খুব ভালো সে কথা সবিনয়ে স্বীকার করে নিয়ে গোপী তাঁকে জানান, সকালে যখন সেই ভীড়ের মধ্যে তিনি গিয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় কেউ তাঁর পকেট মেরে দিয়েছে; এবং যাবতীয় টাকা-কড়ি, এমন কি ফিরে যাবার বিমানের টিকিটখানাও খোয়া গেছে! ঘটনাটি শুনে নেহ্রু প্রাণ খুলে হাসতে থাকেন।

জনগণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে নেহ্রু কখনও উপেক্ষা করতেন না। একবার কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত বক্তৃতা-মঞ্চটি পরীক্ষা করে সেটির উচ্চতা, আলোগুলির অবস্থান এবং অন্যান্য কতগুলি ছোট-খাটো জিনিসের পরিবর্তন করতে আশে-পাশের লোকদের নির্দেশ দেন তিনি। সেই সময় একজন[৫৪] মন্তব্য করেন, মঞ্চটি একটি অভিনয় মঞ্চের মত হয়ে দাঁড়াবে। সেই মঞ্চ থেকেই নেহ্রুর বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। মন্তব্যটি কানে যেতেই তীব্র স্বরে তিনি জবাব দিলেনঃ 'ঠিক কথা। অভিনয়-মঞ্চের মতোই হবে এটা। আমি হব প্রধানা গায়িকা এবং আগামীকাল সারাদিন ধরে এই মঞ্চে আমাকে নাচতে হবে···।'

অন্ধকার দিকও ছিল তাঁর চরিত্রে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এবং ক্রীড়াবিদ্ ইত্যাদি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের যেমন তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তেমনি তাঁর কর্মীবৃন্দের মধ্যে ছিল অতি সাধারণ এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তি। এদের না ছিল ব্যক্তিত্ব কিংবা চরিত্র; না ছিল যোগ্যতা। সহকর্মীদের অযোগ্যতা দেখেও তাদের সরাতে[৫৫] চাইতেন না তিনি। কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উপস্থাপিত হলে, নেহ্রুর প্রথম প্রতিক্রিয়াই হ'ত এমন, যেন তিনি সেটা অবিশ্বাস করেছেন, এবং কাউকে যে অভিযুক্ত করা যায় এটা তাঁর কাছে একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। (আসলে বিশ্রী পরিস্থিতিকে তিনি এড়িয়ে যেতে চাইতেন।) তারপর, সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে

৫৪। গোপী হান্ডু।

৫৫। কেন তিনি এ সমস্ত ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না সে কথা একবার নেহ্রুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, মাঝে মাঝে দেখবে ছোট্ট একটি পোকা তোমার পা' বেয়ে উঠে আসছে। সেটাকে ঝেড়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে এক, কি দুই বার তুমি পা' ঝাড়া দাও। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যদি দেখো আবার সেটা উঠে আসছে তখন বার বার পা' ঝাড়া দেবার ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে উপেক্ষাভরে সেটাকে ছেড়ে দাও···।

কঠোর কোন ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করতে চাইতেন না। বিশেষ একটি ঘটনা প্রসঙ্গে একবার তাঁকে আমি প্রশ্ন করি, কী করে তিনি অযোগ্য এবং অসৎ ব্যক্তিদের তথা বস্তি অঞ্চল ও ভিক্ষুকদের সমস্যাগুলিকে সহ্য করেন? কেনই বা কঠিন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না তাদের বিরুদ্ধে? জবাবে তিনি যা' বলেছিলেন, বিস্তারিতভাবে তা' নীচে উল্লেখ করা হ'ল।

বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহকারে নেহ্রু বলেন, প্রধানমন্ত্রী হবার পূর্বে তাঁরও ধারণা ছিল, উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারবেন তিনি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়ে যখন সেগুলির বিরাটত্ব লক্ষ্য করলেন, তখন থেকেই পরিবর্তন করেছেন আপন দৃষ্টিভঙ্গীর। অধিকাংশ ত্রুটি-বিচ্যুতিই আমাদের জনগণ অর্জন করেছে বিদেশী অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকার সময়ে। দুর্বলতাগুলি আমাদের সঙ্গী হয়ে রয়েছে বহুদিন ধরে। সত্যিই যে জিনিসের আমাদের প্রয়োজন ছিল, তা' হ'ল জাগরণ, দায়িত্ববোধ, লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং সংহতি। এগুলি পেতে হলে সময়ের প্রয়োজন। সহজতম কোন পন্থায় পাওয়া যায় না। দুর্বলতাগুলি দূর করবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হবে অনুচিত। কারণ, কঠোর ব্যবস্থাটি হ'ল দু'মুখী অস্ত্রের মতো। প্রথম দিকে হয়তো ভালো ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃই দেখা যায়, তাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়ে সংহতি বিনষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে এ জিনিসটা ঘটে উন্নতিশীল জাতির মধ্যে। তার উপর, এটার মধ্যে এমন একটি সর্বগ্রাসী শাসনতন্ত্রের আভাস রয়েছে, যা' আমাদের মতো সরল এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনগণের পক্ষে কখনই সাফল্যজনক হ'তে পারে না। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে এমন একটি অত্যুচ্চ আদর্শ আমাদের স্থাপন করা কর্তব্য যা' জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবে। যাই করি না কেন, জনগণের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের হতে হবে অতি ভদ্র এবং অমায়িক, এবং ঠিক ছোট্ট শিশুদের মতোই মানুষ করে তুলতে হবে তাদের। ঔপনিবেশিক শাসনে যে দীর্ঘ-নিদ্রা আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার থেকে সবে জেগে উঠতে শুরু করেছি আমরা। সুতরাং এগুতেও হবে অত্যন্ত সতর্কভাবে। (তত্ত্বগত বিচারে নেহ্রুর বক্তব্য অভ্রান্ত হলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সময় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল তাঁর।)

কঠিন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে নেহ্রুর অনিচ্ছাকে অবশ্য আর এক

ভাবেও বিশ্লেষণ করা যায়। ১৯৪৬ সালে তিনি যখন অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করেন, তখন তাঁর খ্যাতি মধ্যাহ্নগগনে দীপ্তিমান। নতুন সহকর্মীদল তথা অন্যান্যদের সুদৃঢ় সমর্থনও ছিল তাঁর পিছনে। তাই, আপন ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে মূল নীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক তথা আভ্যন্তরিক বিষয়াবলীর প্রতি প্রধানতঃ মনোনিবেশ করেন নেহ্রু। এই সময়ে সর্দার প্যাটেল ছিলেন তাঁর শক্তির প্রধান উৎস; যদিও কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মত-পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। সহকারী প্রধানমন্ত্রীরূপে অতীব দক্ষতার সঙ্গে প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি তথা অন্যান্য আভ্যন্তরিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু ছিল নেহ্রুর কাছে একটি প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ। এর পরও অবশ্য সহকর্মীদের যথেচ্ছ কাজ-কর্মের স্বাধীনতা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু লক্ষ্য করেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকাংশই হলেন হীনচেতা, অযোগ্য, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাদুষ্ট এবং দুর্নীতিপরায়ণ। নবলব্ধ শক্তির অপপ্রয়োগও তাঁরা শুরু করেছিলেন; এবং এটাও তাঁর লক্ষ্যে পড়ে। ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্যই দুর্নামের বোঝা চাপতে থাকে নেহ্রুর উপর। এবং, যে মুহূর্তে তিনি অবস্থা সংশোধনের তথা কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতা নিজের হাতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁরা শুরু করে দেন নেহ্রুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত। সেই সঙ্গে আনুগত্যের অভাবও পরিলক্ষিত হয় তাঁদের। এই সহকর্মীদের উপরেই অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তিনি। সে মোহ তাঁর ভঙ্গ হ'ল। বুঝতে পারলেন, তথাকথিত বন্ধুরাই তাঁর সর্বনাশ সাধনে তৎপর। ফলে তিনি হয়ে ওঠেন সংশয়পরায়ণ। প্রতিটি ব্যাপারেই একের পর এক বাধা আসতে থাকে; এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার মতামতকে গ্রহণ করে সেগুলির সঙ্গে আপন মতাদর্শের একটি সামঞ্জস্য বিধান করতে তিনি বাধ্য হন। (উদ্দেশ্যটি অবশ্য কখনই সফল হয় নি।)

আজাদ, কিদোয়াই, বি. সি. রায়, পন্থ প্রভৃতি আস্থাভাজন সহকর্মীদের মৃত্যুর পর, নেহ্রুকে সুপরামর্শ দেবার মতো আর কেউ রইল না। বিশ্বাস করবার মতো একটি মানুষকেও না পেয়ে, ক্রমশঃ নিজের উপরেই আস্থা হারাতে শুরু করেন নেহ্রু। সেই সঙ্গে দেখা দেয় তাঁর মধ্যে দৃঢ়তার অভাব। ফলে, পার্শ্বচরদের তুষ্টিবিধান করাও তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কোন

কাজ পাছে দল এবং গোষ্ঠী বিশেষের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেজন্য অযথা তিনি আশঙ্কিত হতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ, কংগ্রেস দল, বিরোধীপক্ষ অথবা অন্য কারও ধ্যান-ধারণা পাছে আহত হয়, সেই ভয়ে সর্বদা তিনি তটস্থ হয়ে থাকতেন। এইভাবে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মানবিক সমস্যাগুলি মোকাবিলার ব্যাপারে বাহ্যিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন তিনি; হয়ে পড়েন সংশয়-চিত্ত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে, ভুলের পর ভুল করে চলেন।

নেহ্‌রু যেমন ছিলেন বদরাগী, তেমনি শান্তও হয়ে যেতেন চট করে। সূক্ষ্ম রসবোধও তাঁর ছিল।[৫৬] আলাপ-আলোচনার মধ্যে অধৈর্য হয়ে পড়া অথবা বিপরীত যুক্তির আশ্রয় নেওয়া, এগুলি বেশীর ভাগই তিনি করতেন সুপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে। জেদ ধরলে, খানিকটা অবশ্য শুনতেন; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের বক্তব্যকে আমল দিতেন না। সুপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করবার স্বাধীনতা তিনি নিশ্চিন্ত মনেই গ্রহণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস ছিল তাঁর।

ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে নেহ্‌রু এক সুমহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। লোকে তাঁকে ভয়ও যেমন করত, ভক্তিও করত তেমনি। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও, কদাচিৎ তিনি সেই ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। সহকর্মীগণ নিজেরা কিছু করবার পূর্বে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন নেতৃত্বের আশায়। নেহ্‌রুর সম্মুখে সবাই পরম উৎসাহে উদ্যম, আনুগত্য এবং দলগত ঐক্য প্রদর্শন করতেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, অধিকাংশের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতা, নিষ্ঠার অভাব এবং অসম্বদ্ধতা ছিল প্রকট। আসলে তাঁরা ছিলেন একাধিক সমস্যাপীড়িত এবং জটিল মতাদর্শ কণ্টকিত দেশ ও দলের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সঙ্কটকালে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হলেও, স্বভাবতই তাঁরা ছিলেন একতাবিহীন। দেশের প্রতিচ্ছবিমাত্র না হয়ে থেকে, দেশকে নেতৃত্ব দেবার উপযোগী করে তাঁদের গড়ে তুলতে নেহ্‌রু ব্যর্থ হন। সুযোগ্য ব্যক্তিদের তিনি উপযুক্তভাবে তৈরীও করেন নি, যাদের ভিতর থেকে দেশ তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে নিতে পারবে। অন্য কথায়, দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব গঠনেও তিনি হন ব্যর্থ। একটা কথা প্রায়ই তিনি বলতেন: 'আগের থেকে

৫৬। জনৈক ব্যক্তি একবার তাঁকে প্রশ্ন করেন, কেন প্রায়ই তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন মাথার উপর ভর দিয়ে। নেহ্‌রু জবাব দেন: পৃথিবীটা যেহেতু উল্টোভাবে রয়েছে, তাই তার প্রকৃত অবস্থান নিরূপণের জন্যই ওইভাবে দাঁড়ান তিনি।

কখন নেতা নির্বাচিত হয় না; সঙ্কটকালে আপনা থেকেই নেতার আবির্ভাব হয়'। কথাটা অবশ্য সত্য। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত-পদের মতো রাষ্ট্রনেতার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা গণতান্ত্রিক দেশে অসম্ভব। তবু, এ ব্যাপারে কোনরকম অনিশ্চয়তাকেও, মনে হয়, মেনে নেওয়া অনুচিত।

অধিকাংশ সমস্যারই তত্ত্বগত সমাধান তাঁর জানা ছিল। কিন্তু সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার মতো দৃঢ়তার তাঁর ছিল অভাব। বহু বিষয়েই তিনি সুচিন্তিত নীতি নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু সেগুলিকে কঠোরভাবে সম্পাদিত করতে অপারগ হন। একাধিক সহকর্মীই তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, অনেক ব্যাপারেই তাঁর আদেশ সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করেন নি। ধরা পড়লে, দায়ী ব্যক্তিগণ আত্মপক্ষ সমর্থনে উপস্থাপন করতেন বাজে অজুহাত। কোন রকম সাজাও হ'ত না তাঁদের। সুতরাং, আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক, এমন কি কখনও কখনও সুনাম-হানিকর হলেও, এই ধরনের মনোবৃত্তি রয়েই যায়। ব্যক্তি হিসাবে নেহ্রু ছিলেন মহৎ, কিন্তু প্রশাসক হিসাবে তিনি ছিলেন অসার্থক।[৫৭]

বেশীর ভাগ গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরিক অথবা আন্তর্জাতিক বিষয় সম্বন্ধেই প্রকাশ্যে আপন মতামত প্রকাশ করবার একটা অভ্যাস তাঁর ছিল। অনেকেই এতে উত্যক্ত হতেন এবং এই কারণে একাধিক মহলে তিনি অপ্রিয়ও হয়ে পড়েন। ঘন ঘন এই ধরনের মতামত প্রকাশ করার জন্য তাঁর নিজেরই বহু কার্যকলাপ এবং মতবাদে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিউবা ও সুয়েজের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অথবা কঙ্গোর ঘটনাবলী কিংবা ভিয়েৎনাম এবং আলজিয়ার্সে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন প্রসঙ্গে তথা এশিয়ায় মার্কিন ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতি বিষয়ে যখনই তিনি বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তখনই বিভিন্ন মহলে তাঁর বিরুদ্ধে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ প্রকাশ্য কোন মন্তব্য না করে কিংবা সুকৌশলে এই ধরনের পরিস্থিতিকে সহজেই এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। সমালোচনাগুলি হয়তো সঙ্গতভাবেই করেছিলেন তিনি; কিন্তু এই কারণেই কাশ্মীর প্রশ্নে, চীনের সঙ্গে আমাদের অতীত সম্পর্কের প্রসঙ্গে এবং নাগা-সমস্যায় তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ

৫৭। অনেকে যেমন যথার্থই নেহ্রুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, অনেকে আবার তেমনি ক্ষতিও করেছেন তাঁর। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন এস. পি. খান্না, শেশান এবং কাপুর। এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কর্মীদলের সদস্য। বছরের পর বছর ধরে এঁরা নেহরু তথা তাঁর গৃহস্থালির অক্লান্ত এবং অমূল্য সেবা করেছেন।

করে। (যে কোন প্রসঙ্গ বিতর্কমূলক হয়ে উঠলেই সেটা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিশোধের ব্যাপার)।

বাইরের বিবিধ কার্যকলাপে আপন কর্মশক্তির ক্ষয় করতেন নেহ্‌রু। গভীর কর্মব্যস্ততার ভিতরেও অপ্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেন বহু লোকের সঙ্গে; অকিঞ্চিৎকর যে ব্যাপারগুলিকে অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে, সেগুলি নিয়েও মাথা ঘামাতেন। ফলে, নৈশ আহারের সময় আসতে আসতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন গভীর ক্লান্তিতে। প্রাতরাশের সময় যদিও প্রায়ই বলতেন: 'নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছি এখন। সারাদিন ধরে এই শক্তিতেই চলব'; তবু, আহারের পর গুরুত্বপূর্ণ কোন আলোচনার মধ্যে প্রায়শই তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখা যেত। এ ধরনের একাধিক ঘটনা আমার মনে রয়েছে। ১৯৪৬ সালে সরকারে যোগদানের অব্যবহতি পরেই, একদিন রাত দশটা নাগাদ নিজগৃহে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কোন একটি (অসামরিক) ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফাইলও পড়তে দেন। ফাইলটি যখন দেখছি, নেহ্‌রু তখন নিজের চেয়ারে বেশ আরাম করে বসে অনতিবিলম্বেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েন। অত্যধিক পরিশ্রমের কারণেই এটা হ'ত। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে বহুবার তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈশ আহারের পর) এই ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে দেখেছি। প্রধানমন্ত্রী হবার দশ বৎসর পূর্বে, ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় 'চাণক্য' ছদ্মনামে 'রাষ্ট্রপতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আত্মবিশ্লেষণ করেন নেহ্‌রু। প্রবন্ধটির অংশ-বিশেষ নীচে উদ্ধৃত করলাম:

আবার তাঁকে লক্ষ্য করুন। বিরাট একটি শোভাযাত্রা চলেছে। হাজার হাজার মানুষ ঘিরে রয়েছে তাঁর গাড়ীটিকে। অবারিত উচ্ছ্বাসে জয়ধ্বনি দিচ্ছে তাঁর। আর তিনি, কেমন সুন্দরভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে মোটরের আসনের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন; ঋজু, দীর্ঘকায়, দেবতার মতো। জনতার উত্তাল উচ্ছ্বাসও তাঁকে এতটুকু চঞ্চল অথবা বিচলিত করতে পারে নি। সহসা তাঁর মুখে আবার সেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল; হয়তো বা এটা হ'ল একটা আনন্দের হাসি…থমথমে ভাবটা কেটে গেছে; জনতাও হাসছে তাঁর সঙ্গে। কেন হাসছে কেউ জানে না। এখন আর দেবতার মতো লাগছে না তাঁকে;

লাগছে একজন মানুষের মতো; যে মানুষ, পরিবেষ্টনকারী সহস্র সহস্র জনতার সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা এবং অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেছে। আনন্দিত জনতাও বন্ধুর মতো আপন হৃদয়ে আসন দিয়েছে তাঁকে…। সুদূর উত্তর থেকে কন্যাকুমারিকা অবধি তিনি পরিভ্রমণ করেছেন বিজয়ী সীজারের মত, পশ্চাতে রেখে গেছেন বিজয় গৌরব এবং রূপকথার মতো কাহিনী। আত্ম-জীবনীতেও তিনি নিজের এই শক্তি-লিপ্সার কথাই বলেছেন, যা তাঁকে ক্রমশঃ জনতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে; বাধ্য করছে তাঁকে নিজের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে:

'জনতার এই উত্তাল জোয়ার আমি নিজের হাতে গ্রহণ করলাম; এবং তারার অক্ষরে আকাশের গায়ে আপন ইচ্ছা লিখে দিলাম।' বিশ্বাস অথবা প্রকৃতির দিক থেকে জওহরলাল কখনই ফ্যাসিস্ট নন। ফ্যাসিবাদের স্থূলতা এবং ইতরতার পক্ষে তিনি অনেক বেশী অভিজাত। (১৯৩৭ সালে যখন এই কথাটি তিনি বলেন, হিটলার তখন শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছেন।) তাঁর মুখের ভাব এবং ভাষাই আমাদের বলে দেয় যে:

'বহিঃসত্তার অন্তঃপ্রকাশ অপেক্ষা অন্তঃসত্তার বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশী সুন্দর ও শোভন।'…তাঁর ভালো করে জানা উচিত, যে পথ তিনি বরণ করে নিয়েছেন, সে পথ-পার্শ্বে বিশ্রামের অবকাশ নেই; এবং বিজয়ের অর্থই হ'ল অধিকতর দায়িত্ব। লরেন্স যেমন আরবদের বলেছিলেন: 'বিদ্রোহের পথে বিশ্রামস্থল নেই কোন; যে আনন্দ উপভোগ করে ফেলা হয়েছে, তার কোন সুদ নেই।'

আনন্দ হয়তো তাঁর জন্যে না হতে পারে, কিন্তু নিয়তি ও সৌভাগ্য সহায় হলে আনন্দের চাইতেও মহৎ কিছু তিনি লাভ করতে পারেন—সেটা হ'ল জীবন-স্বপ্নের সাফল্য…। এই বিদ্রোহী নবযুগের সূচনায় সীজার-সুলভ একনায়কত্বের প্রলোভন সর্বদাই দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত রয়েছে; এবং জওহরলালের পক্ষে নিজেকে 'সীজার' বলে কল্পনা করা কী একেবারেই অসম্ভব? এইখানেই জওহরলালের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে; এবং ভারতের পক্ষেও। 'সীজরীয়' পন্থায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে না…। যতই বীরত্ব-ব্যঞ্জক উক্তি করুন না কেন, সুস্পষ্ট ভাবেই জওহরলাল হয়ে পড়েছেন ক্লান্ত এবং অবসন্ন, এবং (কংগ্রেসের) সভাপতিপদে বহাল থাকলে ক্রমশঃ তাঁর অবনতি ঘটবে। বিশ্রাম তিনি করতে পারেন না; কারণ

একবার বাঘের পিঠে চাপলে, আর নামতে পারে না কেউ। কিন্তু বিপথগামী হওয়া এবং অত্যধিক পরিশ্রম ও দায়িত্ব জনিত মানসিক অবনতির কবল থেকে অন্ততঃ আমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারি। ভবিষ্যতে তাঁর কাছে আশা আমাদের অনেক। সেই সম্ভাবনাকে নষ্ট করা উচিত হবে না; অনুচিত হবে অত্যধিক প্রশ্রয় এবং প্রশংসায় তাঁকে বিনষ্ট করে ফেলা। অহংভাব ইতিমধ্যেই তাঁর ভিতরে হয়ে উঠেছে প্রবল। সেটাকে বাধা দিতেই হবে। সীজারের প্রয়োজন আমাদের নেই।

প্রবন্ধটির সারমর্ম হ'ল, ভারতে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা রয়েছে নেহ্রুর; গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত রয়েছে তাঁর উপর; ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি; দ্রুত অবনতি তাঁর অবশ্যম্ভাবী; অত্যধিক প্রশ্রয় এবং প্রশংসায় তাঁকে বিনষ্ট করা উচিত নয়; অহংভাব তাঁর ভিতরে ইতিমধ্যেই প্রবল হয়ে উঠেছে এবং, সম্ভবতঃ 'সীজার' হবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, অক্ষুণ্ণ কর্মশক্তি, এবং যৌবনের সীজার-সুলভ মনোভাব গান্ধীর প্রভাবে ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়া—এই দু'টি ব্যতিক্রম ছাড়া, উল্লিখিত বক্তব্যগুলি বহু বৎসর পরেও যথাযথ বলেই প্রমাণিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হবার পর প্রথম দিকে তিনি এই মহৎ সম্মানে বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু কালপ্রবাহে এবং সংখ্যা ও জটিলতার দিক থেকে সমস্যাগুলি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভিতরে জেগে ওঠে একটা আপোসকারী এবং দ্বিধাগ্রস্ত মনোবৃত্তি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দৃঢ়তার প্রতি অনিচ্ছা অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর মহত্ত্বকে খর্ব করে নি। সুবিচার করে তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা অন্ততঃ বলা যায় যে, প্রধান-মন্ত্রীর পদ তিনি চান নি। জোর করে সেটা তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর মহৎ অবদানের কথা স্মরণ করে সঙ্গতভাবেই আমরা তাঁকে মুখ্য নেতারূপে বরণ করে নিয়েছিলাম। তথাপি তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব, প্রশাসনিক দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে, নিখুঁত একটি সাফল্যরূপে চিহ্নিত হতে পারে না। (ভাবগত দিক থেকে যদিও এর একটা বিরাট সফলতা ছিল।) আদর্শবাদী নেহ্রুর মহত্ত্ব ছিল

অসীম। ভারতকে তিনি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু সরকারের অধিনায়কত্ব না করে, রাষ্ট্রনায়ক হওয়াই উচিত ছিল তাঁর। প্রথমোক্ত ভূমিকায় তাঁকে এগিয়ে যেতে হয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে; কিন্তু শেষোক্ত ভূমিকায় তাঁর সাফল্য সব কিছুকে অতিক্রম করে যেত। আদর্শগত বিচারে আমাদের প্রথম নাগরিক হবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন তিনি; এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিশ্বের সম্মুখে ভারতের এমন একটি সুমহান ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারতেন, যা' আমাদের দেশের সর্বোত্তম সৃষ্টির প্রতিচ্ছবি রূপে প্রতিভাত হ'ত। (পরবর্তীকালে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও গুরুদায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান নি নেহ্‌রু, কারণ তাঁর ধারণা ছিল, জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তখনও পালিত হয় নি। দেশমাতৃকার সেবার জন্য নিজের সারাটি জীবনকে এই ভাবে তিনি দাসত্বে আবদ্ধ করেছিলেন। এই অসীম আত্মত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞ এবং সহানুভূতিশীল হবার পরিবর্তে, অনেকে নিষ্ঠুরভাবে তাঁর পদত্যাগ দাবী করতে থাকেন। লেলিন, রুজভেল্ট্ এবং আইসেনহাওয়ারের মত ব্যক্তিগণও অসুস্থতায় ভুগেছিলেন; কিন্তু দেশবাসী তাঁদের পরিত্যাগ করে নি। অথচ, অশোক অথবা আকবরের পর থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশসেবক, যাঁর জীবন-পথ একদা পুষ্পসম্ভারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই নেহ্‌রুকেই স্বদেশবাসীরা তাঁর শেষ জীবনে অপমানিত করল।)

জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অদূরদর্শী এবং আপত্তিকর মন্তব্য এবং অতীতের ব্রিটিশ শাসকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবার অদ্ভুত একটা মনোবৃত্তি ছিল আমাদের কিছুসংখ্যক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর। এমন কথাও তাঁরা বলতেন যে, কোন না কোন প্রকারের একনায়কতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থাই হ'ল আমাদের বর্তমান দুরবস্থা প্রতিকারের একমাত্র উপায়। (তাঁরা ভুলে যেতেন, ন্যায়পরায়ণ, যোগ্য এবং সবল নেতৃত্ব ব্যতীত কোন রকম শাসন-ব্যবস্থাই সুষ্ঠুরূপে কাজ করতে পারে না; এবং এ ধরনের নেতৃত্ব আমাদের মধ্যে ছিল দুর্লভ।) স্থূলভ জনপ্রিয়তার মোহে বিভিন্ন ককটেলের আসরে এবং অন্যান্য স্থানে তাঁরা বিদেশীদের সামনেই ভারতকে উপহাস করে অসংযত উক্তি করতেন। সম্মানিত বিদেশী ব্যক্তিটি আমাদের কোন 'বিশেষ দুর্বলতা' সম্বন্ধে একবার উল্লেখ করলেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে বাধিত করা হ'ত। এই ভাবে, এবং আরও অন্যান্য উপায়ে

আমাদের বহু গোপনীয় তথ্য অবাঞ্ছিত দল অথবা ব্যক্তির হাতে পৌঁছে যায়।[৫৮]

একবার এই ধরনের ঘটনার বিশেষ কয়েকটি নজির আমার গোচরে আসে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সেগুলি আবার করা হয়েছিল বিদেশীদের সামনেই। ঘটনাগুলির প্রতি আমি লিখিতভাবে প্রধান সেনাপতি জেনারেল পি. এন. থাপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। থাপাব সে কথা জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মেননকে; মেনন আবার জানান প্রধানমন্ত্রীকে। আরও কিছুটা অনুসন্ধানের পর নেহ্‌রু সংশ্লিষ্ট একজন অফিসর সম্বন্ধে লিখিতভাবে কঠোর মন্তব্য করেন। অন্যজনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি অনুসন্ধানের জন্য গঠিত হয় একটি তদন্তকারী আদালত। তদন্তে অভিযুক্ত অফিসরটির কোন কোন আচরণ আদালত কর্তৃক আপত্তিকর বলে বিবেচিত হলেও, অভিযোগ থেকে মুক্তি প্রদান করা হয় তাঁকে। সবকার অবশ্য নেহ্‌রুর অবগতিতেই উক্ত অফিসরকে আপন অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এই তিরস্কারের কথা অনতিবিলম্বেই বিস্মৃত হয়ে একই সরকার কিছু পর অফিসরটিকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রদান করেন।

আমাদের উত্তর সীমান্ত নীতিকে 'অগ্রবর্তী নীতি' বলেই অভিহিত করা হ'ত। এ বিষয়ে আগেই বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। উক্ত নীতি অনুসারে লাদাক ও নিফায় অনেকগুলি ঘাঁটি স্থাপনের আদেশ প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দফতরেব বি. এন. মল্লিক এবং হুজা বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন

নিফায় ঘাঁটি স্থাপনের প্রশ্নে ৩৩নং কোরের জি. ও. সি. কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে গৌহাটি যেতে হয়। সেখানে ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ অসামরিক এবং সামরিক কর্মচারীগণের এক আলোচনা-চক্রে `ম্পূর্ণ সীমান্ত বরাবব আমাদের ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে উ্প

ন৽১ ৮। উদাহরণ স্বরূপ, জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিক কয়েক বৎসর পূর্বে আমাকে জানান যে, র দফতর থেকে একটি গোপনীয় দলিল একটি বৈদেশিক দূতাবাসে পাচার হয়ে গেছে। ৬২ ক কথাটা বলতে, প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করেন নি। কিন্তু পরে অনুসন্ধান করে মন্তব্য করে লটি সত্যিই খোয়া গেছে।
করতেই হয়।

অবশেষে বলি, এ ব্যাপারে আমরা ব্যর্থ হলে, চীনারাই ওই সমস্ত জায়গায় নিজেদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু নীতিটির সার্বিক রূপায়ণ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে ৩৩নং কোরের কমাণ্ডার লেফ্টনান্ট্ জেনারেল কে. উমরাও সিং বলেন, লোকবল, শ্রমিক এবং বিমানযোগে নিক্ষেপ-সরবরাহ বজায় রাখার সরঞ্জামের দারুণ ঘাটতি ছাড়াও, এমন অনেক স্থান নিফায় রয়েছে যেগুলিকে চিহ্নিত করা সহজ নয় এবং নির্ভরযোগ্য কোন মানচিত্রও আমাদের নেই। কিছুটা আলোচনার পর অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন, শত অসুবিধা সত্ত্বেও জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে নিফায় আমাদের সীমান্ত বরাবর সর্বাধিক সংখ্যক ঘাঁটি স্থাপন করা কর্তব্য।

৩৬০ X ৯০ মাইল আয়তন-বিশিষ্ট নিফার সারাটা অঞ্চল জুড়ে ছেয়ে রয়েছে বিশাল বিশাল পর্বতশ্রেণী ; বিশেষ করে ভারত-তিব্বত সীমান্তের নিকটে। তাই গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলে যায়, একমাত্র সেই সময় ছাড়া উক্ত অঞ্চলে তৎপরতা চালানো সম্ভব নয়। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে চতুর্থ ইন্ফ্যানট্রি ডিভিশনের অধিনায়ক, আসাম রাইফেলের একাধিক দলকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ঘাঁটিগুলি যাতে ঠিকমত স্থাপিত হয়, তা' লক্ষ্য করবার জন্য প্রতিটি দলের সঙ্গে একজন করে নিয়মিত সামরিক বাহিনীর অফিসরকেও দেওয়া হয়। এই রকম একটি দলের নেতৃত্ব করেন ১নং শিখ বাহিনীর ক্যাপ্টেন মহাবীর পেরসাদ, এম. সি.। দলটি গিয়ে নিফার ত্রি-সংযোগ স্থলের[৫৯] নিকটবর্তী ঢোলায় একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ধরনের বহু ঘাঁটিই আমরা ভারত-তিব্বত সীমান্ত বরাবর নিজেদের অঞ্চলে স্থাপন করি। চীনারা নিশ্চয়ই এর জন্য অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কারণ, তাদের আগেই আমাদের জওয়ানেরা ঘাঁটিগুলি স্থাপন করছিল। ব্যর্থতার আক্রোশে চীনারা তাই ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে প্ররোচনা দিয়ে গভীর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সে কথা পরে বলছি।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ অবধি আমেরিকায় আমাদের যে কয়েকজন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন, বি. কে. নেহ্রু তাঁদের মধ্যে সার্থকতম ব্যক্তি। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তীক্ষ্ণধী এবং কুশলী[৬০] এই মানুষটির মর্যাদের

করে

বিশেষ

৫৯। ভারত, ভুটান ও তিব্বত সীমান্তের সংযোগস্থল।

৬০। প্রয়োজনের সময় অবশ্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবার দক্ষতাও তাঁর রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে

ন্য উপায়ে

তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আদর্শস্থানীয়। প্রভাতে শয্যাত্যাগের পূর্বে আরাম করে এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে সংবাদপত্র পাঠ করতে করতে সারাদিনের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হন। গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যেও থাকেন ধীর এবং স্থির। সরকারী কাজকর্মগুলি করেন অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে; এবং কখনও কারও ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করার অভ্যাস তাঁর নেই। জওহরলাল নেহ্‌রুর জ্ঞাতিভ্রাতা হয়েও, কোনদিন সেই সুবাদে কোন সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন নি। জীবনে উন্নতি করেছেন একমাত্র আপন যোগ্যতায়।

১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে যখন প্রধানমন্ত্রী নেহ্‌রুর কাছে আমেরিকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ আসে, তার কয়েকদিন পূর্বেই ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শের উদ্দেশ্যে তিনি ওয়াশিংটন থেকে দিল্লীতে এসেছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। কথা প্রসঙ্গে অনুযোগ করেন, আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য যে সময় তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করছেন, (এটা ছিল তাঁর চরিত্রগত গুণ) মেনন সেই সময় উঠে-পড়ে লেগেছেন সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে। আরও বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আপন ইচ্ছামত চলবাব পূর্ণ অধিকার তাঁর অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু নিজের 'মানসিক মল্লক্রীড়া এবং ক্ষতিকারক তথা নিন্দনীয় আচরণের' দ্বারা ভারতের একটি বিকৃত চিত্র সেখানে তুলে ধববার কোন অধিকার তাঁর নেই। ভারতের সপক্ষে সার্থকভাবে সামান্য কিছু বক্তব্য হয়তো রাষ্ট্রপুঞ্জে তিনি রেখে থাকতে পারেন, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে বহু দেশেব বন্ধুত্বও হারিয়েছেন। এটা তাঁর কাজও নয়, এবং আমাদের তরফ থেকে এটা তাঁকে কেউ করতেও বলে নি।

অতঃপব বি. কে. নেহ্‌রু এবং আমার মধ্যে সাম্প্রতিক, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা হয়। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাদির শোচনীয় ঘাটতির কথা উল্লেখ করে তাঁকে বলি, সরকার যদিও সংসদে এবং প্রকাশ্যে বারংবার ঘোষণা করছেন যে, ভারতীয় অঞ্চলের উপর যে-কোন হামলা রুখতে আমাদের সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণরূপে সক্ষম, তবু অবস্থা কিন্তু অত্যন্ত জটিল। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র একে সেকেলে ধরনের, তার উপর অপ্রচুর। চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার অবস্থাও শোচনীয়। এমত অবস্থায় ধরনের দাবী করা সত্যের অপলাপই শুধু নয়, এটা হ'ল কল্পনা রাজ্যে নার সামিল।

মন্তব্য কা সাধারণভাবে বিদেশ থেকে কোন অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর পক্ষপাতী করতেই হয়

ছিলেন না। সামরিক প্রয়োজনে নিতান্ত অনিবার্য হয়ে পড়লে, তাঁর অভিমত ছিল, অন্যান্য সব দেশকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ থেকে এগুলো আমদানী করা যেতে পারে। (বাদ দেওয়া দেশগুলির মধ্যে অবশ্য একটি দেশ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন কড়াকড়ি ছিল না।) আমার মতে, এই সিদ্ধান্তে ছিল দূরদর্শীতার অভাব। দেশ যখন গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন, তখন সাহায্য যে দেশ থেকেই আসুক না কেন, তা' গ্রহণ করে সাধ্যমত সমস্ত রকম উপায়ে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলাই হ'ল আমাদের একমাত্র কর্তব্য। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা করতে গিয়ে জাতীয় স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। কারণ, বাঁচতে হবে আমাদের ; মরতে নয়। আমার এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বি. কে. নেহ্‌রু যখন জানালেন, আমেরিকা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে, তখন মনে হ'ল এ বন্ধুত্ব আমাদের সানন্দে স্বীকার করে নেওয়াই উচিত।

এই বিষয়ে বি. কে. নেহ্‌রু এবং আমি পৃথক পৃথক ভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলি। মেননের যুক্তিগুলিকেই প্রধানমন্ত্রী প্রায় হুবহু আমার কাছে পুনরাবৃত্তি করেন। (বি. কে. নেহ্‌রুকেও এই ধরনের কথাই বলেছিলেন।) মোটামুটিভাবে যুক্তিগুলি ছিলঃ সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানী করলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হবে, এবং বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার দারুণ অনটন চলছে আমাদের ; এবং প্রতিরক্ষাখাতে এই বিরাট ব্যয়[৬১] দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানবে, যেটা তিনি মেনে নিতে পারেন না ; তার উপর কতগুলি রাজনৈতিক বিষয়ও বিবেচনা করে দেখতে হবে। এমত অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি সম্বন্ধে আমাদের মুখ্যতঃ নির্ভর করতে হবে দেশজ উৎপাদনের উপরে। সমস্যাটির সুদূরপ্রসারী সমাধানের এই একটিমাত্র পথই সামনে রয়েছে। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকা হবে ভুল। কারণ, সে সাহায্য তারা বন্ধ করে দিতে পারে যে কোন সময়। আবার, আমাদের প্রতি তাদের সমর্থনও পরিমিত করে দিতে পারে।

উত্তরে নেহ্‌রুকে বলি, সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধানের পথ হিসাবে তাঁর যুক্তির সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু এই মুহূর্তে চীন এবং পাকিস্তানের কা' করে থেকে আমাদের সহমৃ বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত। তাই, দেশজ উৎপন্ন 'বিশেষ

৬১। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য সরঞ্জামাদি খরিদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল।

অন্যান্য উপায়ে

যতদিন অবধি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম না হয়, ততদিন অবধি যে সমস্ত জিনিস আমাদের অবিলম্বে না হলেই নয়, সেগুলি আমদানীর জন্যই বলছি আমি। আক্রমণকারীর হাতে যদি ভারতের কোন সামরিক বিপর্যয় ঘটে, তা'হলে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো দুই-ই ভেঙে পড়বে। সুতরাং, অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক পন্থাটিকে অবলম্বন করলে আমাদের সম্মান যদি রক্ষা পায়, তবে সেটিকে আমরা গ্রহণ করবো কি না সেইটাই হ'ল বিচার্য বিষয়। আমার মতে এই সাহায্য গ্রহণ করাই উচিত।

সমস্ত শুনেও কিন্তু নেহ্রু আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। বলেছিলেন, আমি এবং অন্যান্য জেনারেলরা নাকি অবস্থাটি ঠিকমত অনুধাবন করতে পারি নি। আসলে নেহ্রুর দৃঢ় ধারণা ছিল আভ্যন্তরিক সমস্যায় কণ্টকিত চীন অথবা পাকিস্তান কেউই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। একমাত্র উত্তেজনা সৃষ্টি করা ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

বি. কে. নেহ্রু আমেরিকা ফিরে যাবার পর, এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, মার্কিন দেশে মেনন যে জনপ্রিয় নন, সেটা তিনি অবগত আছেন কি না। ব্যাপারটি তাঁর অজানা থাকার কথা নয়; এবং সেটা তিনি স্বীকারও করেন। তাঁর এই উত্তরটি নিয়ে ভারতের বিভিন্ন মহলে সোরগোল পড়ে যায়। অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন, মন্ত্রীপরিষদের একজন সদস্য সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তি করা তাঁর পক্ষে অনুচিত হয়েছে। সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রদূত উত্তরটিকে অন্যভাবেও দিতে পারতেন।[৬২] বি. কে. নেহ্রুর নিজস্ব মত ছিল, যা' সত্য তাই তিনি স্বীকার করেছেন মাত্র। কয়েক সপ্তাহ পর তাঁর সঙ্গে মেননের দেখা হলে তীব্র বাদানুবাদ হয় দু'জনের ভিতরে। মেননের ধারণা ছিল, আমেরিকার জনগণের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই ধারণার সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণও উল্লেখ করেন তিনি। এর উত্তরে বি. কে. নেহ্রু বলেন, আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তাঁর জানা কর্তব্য; এবং তিনি যদি বধির ও অন্ধ না হয়ে থাকেন, তবে মেনন যে মার্কিন দেশে জনপ্রিয় নন সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত।

৬২। ঘটনাটিতে বি. কে. নেহ্রুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি মন্তব্য করেন, নীতিগত দিক থেকে সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে নিজের সহকর্মীদের সমর্থন করতেই হয়। সংসদে নেহ্রু তাই করেছিলেন।

এই সময়েই 'এস্‌কঅ্যার' পত্রিকায় মেনন সম্বন্ধে 'দি মোস্ট্‌ হেটেড্‌ ডিপ্লোম্যাট্' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; এবং তাতে মেননের প্রশংসাসূচক ক্যাবট্‌ লজের কয়েকটি উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়। প্রবন্ধটি নেহ্‌রুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মেননও আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে ওঠেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রদত্ত একটি ভাষণ সম্বন্ধে মেনন যখন তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, প্রেসিডেন্ট সেই সময় তাঁকে সুবিধামত একবার দেখা করতে বলেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমেই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মেনন তার পরিবর্তে সরাসরি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে কিন্তু নিয়মমাফিক ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু জানতে চাওয়া হ'ল। এ ব্যাপারে কিছুই জানা ছিল না বি. কে. নেহ্‌রুর; তাই মেননকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে মেনন বলেন, বিশেষ কিছু বক্তব্য তাঁর নেই। (আসলে রাষ্ট্রদূতকে বিশ্বাস করে কিছু বলতে চান নি তিনি।) এই জবাবটি হোয়াইট হাউসকে জ্ঞাপন করতেই, প্রেসিডেন্টের আদেশ মত সাক্ষাৎকারটি তাঁরা বাতিল করে দিলেন। কেনেডি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, মেননের বিশেষ কিছু বক্তব্য না থাকলে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এই সাক্ষাৎকারে সময় নষ্ট করা তাঁর পক্ষে অর্থহীন হবে; বিশেষতঃ এমন একজনের সঙ্গে যিনি আমেরিকার বন্ধুস্থানীয় নন। যাই হোক, বাতিলের খবরটিতে মেনন ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই করবার ছিল না তাঁর।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সফরের জন্য ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে নেহ্‌রু আমেরিকায় উপস্থিত হলে মেনন তাঁর কাছে অভিযোগ করেন যে, আমাদের রাষ্ট্রদূত ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে অপদস্থ করেছেন। এই অভিযোগ অস্বীকার করে বি. কে. নেহ্‌রু প্রধানমন্ত্রীকে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন করেন।

উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই কেনেডির সঙ্গে নেহ্‌রুর সাক্ষাৎকার ঘটে। সেই সময়, অবসর মত প্রেসিডেন্ট যাতে মেননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সে বিষয়ে কেনেডির কাছে ইঙ্গিত করেন নেহ্‌রু। মেননের অভিপ্রায় ছিল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি একাকী দেখা করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন (বি. কে. নেহ্‌রুও এইটাই অনুমান করেছিলেন), পররাষ্ট্র

দফতরের আদব-কায়দা অনুসারে রাষ্ট্রদূত হিসাবে বি. কে. নেহ্‌রুও প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকবেন। অনিচ্ছা সহকারে এই ব্যবস্থায় মেনন রাজী হ'লেন।

সাক্ষাৎকার অবশ্য হ'ল; কিন্তু তাতে মেনন সম্বন্ধে কেনেডির ধারণা কিংবা আমেরিকার প্রতি মেননের মনোভাব কোনটিরই কিছু উন্নতি হ'ল না। কারণ, শোনা যায়. এমন সমস্ত কথা মেনন বলেছিলেন যার জন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন প্রেসিডেণ্ট। এই ঘটনা নিয়ে ওয়াশিংটনের তৎকালীন কূটনৈতিক মহলে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।

বিগত কয়েক বৎসর ধরে, বিশেষতঃ ১৯৫৯ সালে সামরিক সদর দফতরে আসবার পর থেকে, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করে সৈনিকদের সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করতে থাকি। এই উদ্দেশ্যে একবার লাদাকে চুসুলের নিকটবর্তী পানগঙ হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত কতগুলি ঘাঁটি পরিদর্শন করছিলাম। নৌকাযোগে হ্রদটি অতিক্রম করা ছিল দুরূহ। তাই একখানি হেলিকপ্টার নিয়ে অঞ্চলটির অবস্থান সম্বন্ধে যথাসম্ভব সম্যক ধারণা গঠন করবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করি; এবং যুলার কাছাকাছি আমাদের একটি ঘাঁটি খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পড়ি খুরনাক ফোর্ট এবং সিরিজাপের দিকে। ফেরত পথে একটি চীনা ঘাঁটির অনতিদূরে অন্য একটি ঘাঁটি দেখে আমাদের বলে মনে হওয়ায় বিমান-চালক সেইখানেই হেলিকপ্টারটিকে নামাবার উদ্যোগ করে। বিমানটি প্রায় ভূমি স্পর্শ করেছে, এমন সময় মঙ্গোলীয় ছাঁদের কতগুলি মানুষকে আশপাশে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেই বিমানচালক চীৎকার করে উঠল, 'হায় ভগবান! আমরা যে চীনা ঘাঁটিতেই নেমে পড়েছি।' প্রকৃতপক্ষে সেটি কিন্তু ছিল আমাদেরই গোর্খা বাহিনীর একটি ঘাঁটি। ভালো করে লক্ষ্য করবার পর ব্যাপারটি বোঝা গেল। দূর থেকে লোকগুলির উচ্চ কপোলাস্থি এবং ছোট ছোট চোখ দেখেই তাদের চীনা বলে ভ্রম করেছিলাম আমরা।

১৯৬২ সালের গ্রীষ্মকালে বিনয় বকসীর সঙ্গে আমার কনিষ্ঠা কন্যা চিত্রলেখার বিবাহ সম্পন্ন হবার অব্যবহিত পরেই সংবাদ পাওয়া গেল, লাদাকের দৌলত 'বেগ ওলদির উত্তরে প্রায় ১৫,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত আমাদের একটি ঘাঁটিকে চীনারা প্রায় ঘিরে ফেলেছে। প্রকৃত ঘটনা নিরূপণের উদ্দেশ্যে

অবিলম্বে থোইসে-এর পথে উক্ত ঘাঁটি অভিমুখে বিমানযোগে রওনা হলাম। থোইসে-তে একটি রাত অতিবাহিত করে পরের দিন খুব ভোরে দৌলত বেগ ওলদি যাত্রা করার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের। স্থির হয়েছিল, এয়ার ভাইস মার্শাল পিণ্টো আমার হেলিকপ্টারটি পরিচালনা করবেন। পরের দিন ভোর প্রায় চারটে নাগাদ পিণ্টো আমার কাছে উপস্থিত হয়ে জানালেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এবং সম্ভবতঃ আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে। যাই হোক, ঘণ্টা খানেকের বেশী অপেক্ষা করবার পর মেঘ কিছুটা কেটে গেল। বাতাসও কমে এল অনেকটা। সেই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই ভগবানের নাম স্মরণ করে আমরা থোইসে ত্যাগ করলাম।

পানামিক পর্যন্ত কাটল বেশ ভালো ভাবেই। কিন্তু সাসের ব্রাঙ্গসা-র ফাটলের মধ্য দিয়ে উড়ে যাবার সময়েই পড়ে গেলাম প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে। হেলিকপ্টারটিকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেলতে শুরু করে দিল উন্মত্ত বাতাস; আয়ত্তে রাখতে হিমসিম খেয়ে গেলেন বিমানচালক। হিংস্র তুফানের ধাক্কায় অসহায় বিমানটি যে কতবার পাহাড়ের চূড়াগুলিতে আছড়ে পড়ে অনন্ত তুষার রাশির মধ্যে চির-সমাহিত হতে হতে রক্ষা পেল তা' বলবার নয়। সে চূড়াগুলির কোন কোনটির উচ্চতা আবার ২৩,০০০ ফিটেরও উপরে। চির-তুষারের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সেখানে। যাই হোক, শেষ অবধি নিরাপদে উপস্থিত হলাম দৌলত বেগ ওলদি-তে।[৬৩]

দৌলত বেগ ওলদি-তে কিছু সময়ে অতিবাহিত করে আবার রওনা হলাম। তারপর বিপজ্জনক ভাবে অবতরণ করলাম গন্তব্যস্থানে (কারাকোরম গিরিপথের কাছেই)। ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় পরিবেষ্টিত, প্রায় ১৭,০০০ ফিট উচ্চতায় এই ক্ষুদ্র ঘাঁটিটি সভ্যজগৎ থেকে ছিল বহু দূরে। জম্মু ও কাশ্মীর মিলিশিয়ার জনৈক জে. সি. ও. ছিলেন এখানকার অধিনায়ক। চীনারা কী ভাবে এখানে উপস্থিত হয়েছিল এবং কেনই বা আগের দিন এখান থেকে চলে গেল সে কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি সরল মনে বীরত্ব প্রকাশ করে জানালেন, চীনাদের খুব কাছাকাছি চলে আসতে দেখে তাদের প্রতি তিনি একখানি লাল রং-এর রুমাল উড়িয়ে দেখিয়েছিলেন। তাই দেখেই তারা এখান থেকে চলে যায়।

৬৩। কয়েক সপ্তাহ পর প্যারাচুটের সাহায্যে সেই প্রথম দৌলত বেগ ওলদিতে আমাদের জওয়ানদের জন্ত কয়েকখানি জীপ গাড়ী এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলাম।

দৌলত বেগ ওলদি থেকে হেলিকপ্টারে আবার আকাশে ওঠা হ'ল। এবারও বিমান চালনার ভার গ্রহণ করলেন এয়ার ভাইস মার্শাল পিণ্টো। দেপসাঙ্ সমতল ভূমির কাছে আমাদের আরেকটি ঘাঁটি ছিল। তাঁকে বললাম ফেরত পথে সেখানে হয়ে যেতে। পিণ্টো সম্মত হলেন; কিন্তু সাবধান করে দিয়ে বললেন: 'আবহাওয়া খারাপ হবার দরুন বিমানের জ্বালানী কমে যেতে পারে। তা' ছাড়া, এই উচ্চতায় এবং এই ধরনের বিপদসঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বেড়ান কিংবা অনির্দিষ্টকাল ধরে ঘাঁটি পরিদর্শন করা, কোনটাই নিরাপদ নয়। অনেকবারই আজ আমরা অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। তাই অনুরোধ করবো, মৃত্যুকে খুব বেশী প্রলোভন দেখাবেন না।'

আক্ষরিক অর্থে না হলেও, তাঁর পরামর্শ মেনে নিয়ে উক্ত ঘাঁটিটি, উষ্ণ প্রস্রবণগুলি এবং আরও দু'একটি পর্বতশীর্ষস্থ চৌকি পরিদর্শন করে মূল ঘাঁটিতে ফিরে এলাম আমরা।

১৯৬২ সালের ১০ই জুলাই তারিখে সামরিক সদর দফতরে আমাদের কাছে খবর এলো, লাদাকের গালোয়ান-এ অবস্থিত আমাদের ১/৮নং গোর্খা বাহিনীর ঘাঁটিটিকে চীনারা অবরোধ করেছে। পরামর্শের জন্য প্রধান সেনাপতি নিজ বাসভবনে আমায় ডেকে পাঠালেন। চীনাদের এই ব্যবহার ছিল 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবের মত। এতদিন অবধি চুপিসারে আমাদের অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করা পর্যন্তই তাদের অগ্রসর ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইদানীং তারা শুরু করেছিল প্ররোচনামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ব্যবহারও তাদের হয়ে উঠেছিল আক্রমণাত্মক। এবং, এবার তারা সত্য-সত্যই আমাদের একটি ঘাঁটিকে অবরোধ করেছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম আমরা। বিনা বাধায় এগুলি চলতে দিলে, চীনারা আরও উৎসাহিত হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে, কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই দেখা দেবে তার প্রতিক্রিয়া; এবং সে অবস্থার মোকাবিলা করার মতো উপযুক্ত সামর্থ্য আমাদের নেই। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল একটা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। সেই অনুসারে আমাদের বৈদেশিক দফতর থেকে দিল্লীস্থ চীনা রাষ্ট্রদূতকে সাবধান করে দেওয়া হ'ল, চীন যদি লাদাকে (অথবা অন্য কোন অঞ্চলে) এই ধরনের আচরণ করতে থাকে, তবে বাধ্য হয়ে গুলিবর্ষণ করে পথ পরিষ্কার করে নিতে হবে আমাদের। দ্বিতীয়তঃ, গালোয়ান-এর উক্ত ঘাঁটিটিকে বহাল রাখবার জন্য, বিমানযোগে রসদ এবং গোলাগুলি

সরবরাহ অব্যাহত রাখবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। বাস্তব অসুবিধা বিবেচনায়, ঘাঁটিটির আর শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না।

গালোয়ান-এর এই ঘাঁটিতে আমাদের প্রায় চল্লিশজন গোর্খা জওয়ানকে ছলে-বলে-কৌশলে বশে আনতে সমস্ত রকম চেষ্টা করে চীনারা। নিজেদের নেপালী দোভাষীদের দিয়ে লাউড্‌স্পীকারে তারা জোর প্রচারকার্য চালাতে থাকে। প্রচারগুলির মূল বক্তব্য হ'ল ভারতীয়রা নেপালের বন্ধু নয় (সাম্প্রতিক নেপাল-ভারত সম্পর্কের অবনতির কথা উল্লেখ করা হ'ত) ; পক্ষান্তরে, চীনারা হ'ল নেপালের বন্ধু। অতএব তারা কেন ভারতের পক্ষ অবলম্বন করে চীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে ?

সময় সময় চীনাদের চলা-ফেরাও হ'ত আশঙ্কাজনক। আমাদের চাইতে তাদের শক্তি ছিল সবদিক থেকেই বেশী। তা' দেখে যদি আমাদের জওয়ানেরা আত্মসমর্পণ করে, এই আশায় তারা চলে আসত ঘাঁটির একেবারে কাছে। কিন্তু কোন কৌশলই তাদের ফলপ্রসূ হয় নি। অধিনায়ক জে. সি. ও. অটলভাবে ঘাঁটিটিকে আগলে রাখেন।

বেশ কিছুদিন ধরে এই অতীব কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করছিল গালোয়ান-এর এই ১/৮ নং গোর্খা বাহিনীটি। বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাদের। তাই বদলী হিসাবে জাট বাহিনীকে প্রেরণ করা হ'ল গালোয়ান-এ। (১৯৬২ সালের অক্টোবর/নভেম্বর মাসে লাদাক এবং নিফার অন্যান্য বহু ঘাঁটির সঙ্গে গালোয়ান-এর ঘাঁটিটিকেও দখল না করা অবধি চীনারা সেখানকার অবরোধ প্রত্যাহার করে নি।)

এই সময়েই লাদাক, নিফা এবং অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলে আমি আরও বহু সফর করি। হিমালয়ের দুর্গম উচ্চতায় অবস্থিত ঘাঁটিগুলির কোনটিতে হেলিকপ্টার যোগে, কোনটিতে আবার স্রেফ পায়ে হেঁটে যাই। নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের জওয়ানেরা যে কত অসুবিধার মধ্যে সীমান্ত রক্ষা করছে স্বচক্ষে দেখে তা' অবগত হই।

নাগাভূমি, নিফা এবং অন্যান্য অরণ্যময় অঞ্চলে প্রচুর সামরিক দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত ছিল। চিন্তা করে দেখলাম, এ বিষয়ে সৈনিকদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে গেলে, জঙ্গল-যুদ্ধ শিক্ষণের জন্য একটি বিদ্যালয়ের আশু প্রয়োজন আমাদের। তাই অনেক চেষ্টায় দেরাদুনে এই ধরনের একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলাম ; এবং তার অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করলাম

গ্রেনেডিয়ার বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার এইচ. এস. 'কিম্' যাদবকে। অতীব কষ্টসহিষ্ণু এবং মানসিক দিক থেকে সদা তৎপর সুদক্ষ অফিসর যাদব আমাদের ইন্‌ফ্যানট্রি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন কিছুদিন। আমার অধীনে চতুর্থ ডিভিশনে একটি ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কত্বও করেছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে আমার সঙ্গে কাশ্মীর যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। জঙ্গল ও গেরিলা রণ-কৌশল শিক্ষার জন্য একবার তাঁকে আমি বিদেশেও প্রেরণ করেছিলাম। যাই হোক, সুযোগ্য এবং সুশিক্ষিত একদল কর্মীসহ নিষ্ঠাবান একজন অফিসর, মেজর (বর্তমানে লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল) টি. এস. ওবেরয়কে দিলাম তাঁর সঙ্গে। নাগাভূমিতে প্রেরণ করবার পূর্বে ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নের সৈনিকদের এই স্কুলে[৬৪] কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত, এবং সেই শিক্ষা বাস্তবক্ষেত্রে বহুমূল্য বলেও পরিগণিত হয়।

জাঠ বাহিনীর তৎকালীন কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার হরভজন সিং আমাকে বলেন, সমস্ত জাঠ কমাণ্ডিং অফিসরদের সর্বসম্মত অনুরোধক্রমে আমাকে জাঠ রেজিমেণ্টের সম্মানিত কর্ণেলের পদ (Colonelcy) গ্রহণ করতে হবে। অনুরোধটি এড়াতে পারলাম না। এরপর থেকে জাঠ বাহিনীর উন্নতিই হ'ল আমার একমাত্র প্রচেষ্টা। তাদের সামরিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলাম, অন্যান্য রেজিমেণ্টের তুলনায় তাদের সক্রিয় ব্যাটেলিয়নের সংখ্যা অনেক কম। তাই, অতিরিক্ত কতগুলি জাঠ ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ন গঠনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করলাম। উপস্থিত ব্যাটেলিয়ন থেকে অনেকগুলিকে প্রেরণ করলাম দুর্গম বিপজ্জনক সমস্ত অঞ্চলে। উদ্দেশ্য ছিল, উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে ভালো কাজ দেখিয়ে তারা যাতে প্রশংসা অর্জন করতে পারে।

৫নং জাঠ বাহিনীকে লাদাকে প্রেরণ করবার পূর্বে শ্রীনগরে তাদের কাছে ভাষণ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করি। প্রথমতঃ, জাঠ রেজিমেণ্টের সম্মানিত কর্ণেল তথা সি. জি. এস. হিসাবে তাদের আমি লাদাকের মতো কঠিন একটি অঞ্চলে কাজ করবার জন্য মনোনীত করেছি। সুতরাং আশা করি উপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে তারা নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে; এবং দ্বিতীয়তঃ, গত মহাযুদ্ধে জর্মান এবং জাপানীদের

৬৪। আমি সেনাবিভাগ ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর আদেশে স্কুলটি ভেঙে দেওয়া হয়, এবং এর কাজটিকে যুক্ত করা হয় ইন্‌ফ্যানট্রি স্কুলের সঙ্গে।

বিরুদ্ধে তারা যে ভাবে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল, অনুরূপ কৃতিত্ব তারা লাদাকেও চীনাদের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করবে।

জাঠ বাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করবার উদ্দেশ্যে সর্বাধিক সংখ্যক জাঠ ইউনিট এই সময়ে আমি পরিদর্শন করি। উৎসব উপলক্ষ্যে তাদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরনের সুন্দর উর্দি এবং অন্যান্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্তও করি। এ ছাড়া, বৈদেশিক দূতাবাসের সামরিক সহকারীর পদে, প্রশিক্ষণ স্কুলে শিক্ষকতার কাজে এবং অন্যান্য স্টাফ পদে জাঠ অফিসরদের নিয়োগের জন্য সরকারী অনুমোদনও আনাই। ভারতীয় সামরিক অ্যাকাডেমির ক্যাডেটদের সম্মুখে এক ভাষণ প্রসঙ্গে সেনাবিভাগে জাঠদের বিশিষ্ট ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করে এই আশা প্রকাশ করি যে, সর্বাধিক সংখ্যক ক্যাডেট এই বিখ্যাত বাহিনীটিতে যোগদান করতে উৎসাহিত হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেনাবাহিনীতে সামগ্রিকভাবে জাঠদের উন্নতি বিধানে সর্বশক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালাই। তাদের কর্ণেল হিসাবে এটা আমার প্রাথমিক কর্তব্য ছিল বলেই মনে করি আমি।

এই অবসরে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে, কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করব। সম্ভাব্য শত্রু সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে সেনাবিভাগকে পূর্বাহ্নেই জ্ঞাত করা সরকারের কর্তব্য। গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে, বিশেষতঃ সীমান্ত বরাবর সামরিক বাহিনীর দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নীতি নির্দেশ করা প্রয়োজন। এই কার্যগুলি সব ক্ষেত্রে করা হয় নি। সেনাবিভাগ এই বিষয়ে সরকারকে যথাবিহিত স্মরণও করিয়ে দিয়েছে, এবং সাধ্যমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে কী কী সমরোপকরণের প্রয়োজন হতে পারে, তা' আমার সামরিক তৎপরতা বিভাগের অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার পালিত বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। তাইতেই দেখেছিলাম সৈন্য-সংখ্যা আমাদের কত কম। সুতরাং অবিলম্বে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত সংগঠনগুলির কিছুটা অদল-বদলের। তা'ছাড়া, আধুনিক ধরনের আরও অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম, গাড়ী এবং যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রয়োজন ছিল। তাই, এই বিষয়ে বিস্তারিত একটি পরিকল্পনা পেশ করি প্রধান সেনাপতি জেনারেল পি. এন. থাপারের কাছে। বেশ কিছু

দিন ধরে পরিকল্পনাটি নিয়ে চিন্তা করবার পর, একটু একটু করে তিনি সেটি মেননের কাছে উপস্থাপিত করতে থাকেন। এদিকে, অতিরিক্ত কয়েকটি ডিভিশন গঠন না করলে আমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্যকরূপে পালন করা সম্ভব হচ্ছিল না। সে বিষয়েও আমাদের দাবী পেশ করেছিলাম।

(এই পরিকল্পনাটিকেই কাট-ছাঁট করে সৈন্যবাহিনী সম্প্রসারণের একটি প্রস্তাব দাখিল করেন জেনারেল জে. এন. চৌধুরী ; এবং সেই প্রস্তাব-কেই আকস্মিক বিপদের মোকাবিলার জন্য নতুন সরকারের 'সবল' প্রস্তুতিরূপে সংসদে ঘোষণা করেন চ্যবন।) সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ঘাটতির বিষয়ে আমি, মাস্টার জেনারেল অফ অরড্‌ন্যান্স্‌, সামরিক তৎপরতা বিভাগের অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার পালিত এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ বিভাগের অধিকর্তা ব্রিগেডিয়াব আন্তিয়া[৬৫] নিজেদের মধ্যে এবং প্রধান সেনাপতির সঙ্গে একাধিকবার আলাপ-আলোচনা করেছি। সীমান্ত পরিস্থিতি ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করছিল, অথচ আমাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সরকার ছিলেন নীরব। অগত্যা পরিস্থিতিব গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকারকে লিখিত-ভাবে জানাতে থাপার সম্মত হন।

সেনাবাহিনীর শোচনীয় ঘাটতির বিষয় উল্লেখ করে মাস্টার জেনারেল অফ অরড্‌ন্যান্স্‌

জুন মাস অবধি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মেননের নামে আটখানি চিঠি প্রধান সেনাপতি থাপারের দস্তখতে প্রেরণ কবি। আমাদের প্রয়োজনমত সমস্ত রকমের অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম এবং গুলি-বারুদ ভারতে প্রস্তুত হয় না। অথচ, অতিরিক্ত বাহিনী গঠন, অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি পূবণ ও আধুনিকীকবণ তথা সামরিক তৎপরতার জন্য সেগুলি ছিল অত্যাবশ্যক, এবং বিদেশ থেকে আমদানী না করে উপায় ছিল না। সুতরাং প্রয়োজনীয় অর্থ তথা বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরেব গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়ে চিঠিগুলিতে উল্লেখ করা হয়। এ কথাও জানানো হয় যে, সংঘর্ষের ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষেব তুলনায় এই অসুবিধাগুলির জন্য বেশী দিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

উপযুক্ত সমরোপকরণগুলির জন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল আনুমানিক ৪৫৯ কোটি টাকার মতো। চিঠিগুলিতে সে কথার উল্লেখ করে এও জানানো হয়.

৬৫। সি. জি. এস্ এবং এম্. জি. ও. উভয়েরই অধীনে ছিলেন তিনি

যে উল্লিখিত হিসাবের মধ্যে বহু জিনিসই ধরা হয় নি। ইঞ্জিনীয়ার ও সিগ্ন্যাল শাখার সরঞ্জাম, গাড়ী, হিমাঞ্চলে প্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ, বিমানযোগে-নিক্ষেপ সরবরাহের সরঞ্জাম ইত্যাদি ঘাটতিগুলির বিস্তৃত তালিকা দাখিল করে জোর দিয়ে বলা হয় যে, এই ঘাটতিগুলির কারণে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গুরুতররূপে ব্যাহত হচ্ছে। সামরিক কারখানাগুলি সময় মতো পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করতে পারছিল না। অতএব কাজগুলিকে অসামরিক ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেবার সুপারিশও একখানি চিঠিতে করা হয়। একথাও জানানো হয় যে, ১৯৫৯ সাল থেকে সেনাবাহিনীর যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটলেও, অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হয় নি।

বস্তুতঃ একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে যেন পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। একদিকে, সম্ভাব্য শত্রু কর্তৃক আমাদের এলাকা যাতে অধিকৃত না হয় তার জন্য যথাসত্বর গঠন করতে হচ্ছিল অতিরিক্ত সেনাবাহিনী। অন্য দিকে, অস্ত্রশস্ত্র, সমর-সম্ভার এবং গুলি-গোলার নিদারুণ ঘাটতির কারণে এই অতিরিক্ত বাহিনীগুলিকে যথাযথভাবে সজ্জিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। দেশজ সমরোপকরণের জন্য অপেক্ষা করতে হলে, অতিরিক্ত বাহিনী গঠনের কাজও বিলম্বিত করতে হয়। সামরিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা ছিল অচিন্ত্যনীয়। এদিকে পরিস্থিতি যা' দেখা যাচ্ছিল তাতে যে কোনও মুহূর্তে পরিণতি হয়ে উঠতে পারত ভয়াবহ।

গুরুতর প্রশ্ন বিজড়িত বিশেষ কতগুলি বিষয় একাধিক পত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর গোচরে এনে, যথাপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সেগুলিকে মন্ত্রীপরিষদের প্রতিরক্ষা কমিটিতে উপস্থাপিত করতে আমরা অনুরোধ জানাই। কিন্তু আটখানি পত্রের একটিরও কোন উত্তর মেনন কিংবা সরকারের কাছ থেকে আসে নি। মেননের সঙ্গে আমাদের বহু বৈঠক হয়েছে, কিন্তু উক্ত চিঠিগুলিতে আমরা যা' চেয়েছিলাম, তার অধিকাংশই অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে।

এই সময়ে দিল্লীর চিত্রও ছিল শোচনীয়। একাধিক জটিল সমস্যায় সরকার ছিলেন বিব্রত; অথচ সেগুলির ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো ব্যক্তি মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন খুব কম। ব্যাপারটি যেন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল দিনগত পাপক্ষয়ের মতো। সুসম্বদ্ধ কোন উপায়ে সমস্যাগুলি

সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে, তাঁরা চেষ্টা করছিলেন অ্যাড্ হক্ ভিত্তিতে এগুলির সমাধান করতে। কোন প্রকার পূর্ববর্তিতাও তাঁরা বিন্যস্ত করেন নি, এবং অগ্রাধিকারযোগ্য সমস্যাগুলিকে সমাধানের চেষ্টা কখনই আগে করা হ'ত না। তা' ছাড়া, কূটনৈতিক, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক বিষয়গুলির মধ্যেও কোনরকম সমন্বয় ছিল না।

প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও নেহ্রু কিংবা মন্ত্রীপরিষদের অন্য কেউ ব্যাপক কোন নীতি নির্ধারণ করেন নি; যেমন, আমাদের সম্ভাব্য শত্রু কারা, তুলনামূলক বিচারে তাদের শক্তিই বা কতখানি, এবং আমরা যাতে বেকায়দায় না পড়ি সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য কোন্ কোন্ সামরিক তথা কূটনৈতিক পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ইত্যাদি। এক কথায়, মন্ত্রীপরিষদের কাজ-কর্ম ছিল দায়সারা গোছের। যুদ্ধের প্রশ্নটি আমাদের সম্মুখে বিরাটাকারে উপস্থিত হলেও, সেটার মোকাবিলার চেষ্টা করা হয় এলোমেলো ভাবে। বিশিষ্ট কয়েকজন ছাড়া, অধিকাংশ সরকারী ব্যক্তিগণের মধ্যেই সমস্যার প্রকৃত গুরুত্ব সম্বন্ধে চেতনার ছিল অভাব। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা তো দূরের কথা, যতখানি চিন্তা এবং মনোযোগ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে দেওয়া দরকার তাও তাঁরা দেন নি।

জরুরী কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুতও থাকতেন না কেউ। নতুন কোন সমস্যার উদ্ভব হলে, দিল্লীর ছোট-বড় সরকারী কর্মচারীরা বিভিন্ন মহলে ছুটোছুটি করে শেষ মুহূর্তে একটা সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতেন। এই ভাবে, জরুরী অবস্থার জন্য সরকারী সমর-যন্ত্রকে সম্যকরূপে সক্রিয় করে তুলতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম।

কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন না, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। জ্ঞাত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলির সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন অজ্ঞ। এমন কয়েকজন জেনারেল এবং অন্যান্য ব্যক্তির কথা আমার জানা আছে, যাঁরা প্রায়ই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজনীতিকদের সঙ্গে বেসরকারীভাবে সাক্ষাৎ করতেন, এবং সেনাবাহিনী অথবা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদের মনে একটা হীন ধারণা উৎপাদনের চেষ্টা করতেন। সরকার যখন এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, তখন সামরিক বিভাগের হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজনীতিক ব্যক্তিদের কর্তব্য ছিল, জোর

করে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করা। ছোট-বড় সকলেই বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করা হয় নি। এই ব্যাপারে অর্থ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মধ্যে যা' যা' ঘটে, সেগুলি এইবার আমি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব।

যত জরুরী প্রস্তাবই আমরা অনুমোদনের জন্য পেশ করতাম না কেন, অর্থমন্ত্রক বিভিন্ন পর্যায়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে তবেই সেগুলির সামান্য মাত্র অংশ মঞ্জুর করত। এর ব্যতিক্রম হয়েছে কদাচিৎ। দীর্ঘস্থায়ী নিষ্পত্তিহীন বৈঠকে পুঁথিগত নিষ্ফল বিতর্ক এবং ফাইলে মন্তব্য—এই করে বৃথা সময় নষ্ট হয়েছে অনেক। অবাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হ'ত আমাদের প্রস্তাবগুলিকে। ফাইলগুলি যতবার অর্থমন্ত্রকে পাঠানো হ'ত, ততবারই ফেরত আসত নতুন কোন না কোন অজুহাতসহ। এই কারণে হ'ত অসম্ভব বিলম্ব (যার কুফল পড়ে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর)। বিশেষজ্ঞ না হয়েও এই অর্থনীতির পণ্ডিতগণ যন্ত্রকৌশল সংক্রান্ত ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বারংবার একই বিষয়ের অবতারণা করতেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না কেউ। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির অজুহাতে অতিপ্রয়োজনীয় সমরোপকরণগুলির আমদানীর প্রস্তাব নামঞ্জুর করা হয়েছে বহুবার। যে সমস্ত প্রস্তাবে বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন নেই, বহুক্ষেত্রে সেগুলিকেও নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। কতবার যে এই বিশেষজ্ঞদের কাছে বাস্তব যুক্তি তুলে ধরেও তাঁদের প্রত্যয় উৎপাদন করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। শোচনীয় উদাসীনতায় আমাদের প্রস্তাবগুলিকে বারংবার তাঁরা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

দেয়ালের লিখন পাঠ করেও কিন্তু তাঁদের চৈতন্য হয় নি। ভাবটা দেখিয়েছেন যেন: 'যাই হোক, এটা আমরা বিশ্বাস করি না।' দেখেশুনে লণ্ডনের সেই মহিলার গল্পটি মনে পড়ে গেছে আমার। জিরাফের বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক বন্ধু একবার তাঁকে বলেন, জন্তুগুলির গলা বিরাট লম্বা; প্রায় এক একটা গাছের মতো। মহিলাটি কিন্তু অবিশ্বাসভরে বলতে থাকেন, কোন গলা এতখানি লম্বা হতেই পারে না। খানিকটা তর্ক-বিতর্কের পর, শেষপর্যন্ত চিড়িয়াখানায় নিয়ে জলজ্যান্ত একটি জিরাফ মহিলাটিকে দেখালেন তাঁর বন্ধু। সত্যি সত্যিই জীবিত একটি জিরাফ দেখে মহিলা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কোন

প্রাণীর গলা যে এতখানি লম্বা হতে পারে এটা তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একগুঁয়ের মতো চীৎকার করে উঠলেন : 'যা' দেখছি, তা' আমি বিশ্বাস করি না।'

অর্থমন্ত্রকের আচরণে মনে হ'ত, তাঁরা যেন বাধা দিয়ে এবং বিলম্বিত করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে তৎপর, যাতে অধিকাংশ প্রস্তাবই শেস-পর্যন্ত ধামা-চাপা পড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমাদের পুরনো ধরনের '৩০৩ রাইফেলের পরিবর্তে আংশিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল প্রবর্তন করার একটা প্রস্তাব ছিল। এবং তাতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল দশ কোটি টাকার মতো। অন্তহীন বিতর্কের পর অর্থমন্ত্রক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটিকেও নাকচ করে দেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাব যে কী সাংঘাতিক পরিণতি হতে পারে সেটা একবারের জন্যও বিবেচনা করে দেখলেন না কেউ। অর্থমন্ত্রকের কর্তৃপক্ষের দীর্ঘকালব্যাপী এই ধবনেব অপবিণামদর্শী আচরণের ফলেই, ১৯৬২ সালে লাদাক এবং নিকায় নিকৃষ্টতব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং অন্যান্য নিদারুণ অসুবিধার মধ্যে ভারতীয় বাহিনীকে চীনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়।

প্রতিবক্ষা মন্ত্রী মেনন এবং অর্থমন্ত্রী মোবাবজী দেশাইয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধের কথা কারও অজানা ছিল না। বিভিন্ন জরুরী ব্যাপারে প্রায়ই যে প্রতিরক্ষা এবং অর্থমন্ত্রকেব মধ্যে এই ধরনের অচল অবস্থার সৃষ্টি হ'ত, তা ছিল এই সঙ্কটমুহূর্তে দুই মন্ত্রীর ব্যি নগত বিবোধের প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং লড়াইয়ের জন্যে সেনাবাহিনীর প্রস্তুত না থাকার দায়িত্ব অর্থমন্ত্রককেও অবশ্যই নিতে হবে।

আরও একটা কথা বয়েছে। অ.মাদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অধিকাংশ প্রস্তাব এই ভাবে ধামাচাপা পডতে দেখে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণ মেননেরও কর্তব্য ছিল অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে ব্যাপারটির একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা। কিন্তু সেটা যে কেন করেন নি তা' তিনিই ভালো করে জানেন। (উপরে যা' বললাম, সেই মতো কাজ করলে নেহ্‌রু অথবা অন্যান্য সহকর্মীগণ বিভিন্ন কারণে অসন্তুষ্ট হবেন বলে কি কৃষ্ণ মেননের মনে ভয় ছিল?)। ব্যাপার যাই হোক, অবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বিচিত্র।

এই সময়েই একটি সুরাহার কথা আমার মনে জাগে। সমরোপকরণের নিদারুণ ঘাটতি, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজসরঞ্জাম সংক্রান্ত প্রশ্নটি মনে হয় সরাষ্ট্র সচিব বিশ্বনাথন, বৈদেশিক সচিব এম. জে. দেশাই, অর্থ সচিব

ভূতলিঙ্গম এবং গুপ্ততথ্য সংস্থার অধিকর্তা মল্লিকের গোচরে আনলে হয়তো কাজ হতে পারে। চার জনই ছিলেন উচ্চপদস্থ এবং প্রভাবশালী সরকারী ব্যক্তি। নিজেদের পদাধিকারের গুরুত্ব বলে যথাযোগ্য মহলে প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করে সেনাবাহিনী তথা দেশের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান-কল্পে আমাদের সাহায্য করা হয়তো তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হবে। সেই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সচিবের কক্ষে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হই। বিভিন্ন সমরোপকরণের ঘাটতির ফলে যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এবং অর্থের অভাবে সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যা' শোচনীয় হাল হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করি। বর্তমান আকারে সেনাবাহিনীর পক্ষে ভারতের সীমান্তগুলিতে আশঙ্কিত বিপদের সম্যক মোকাবিলা করা যে সম্ভব নয়, সে কথাও উল্লেখ করে, প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ এবং অতিরিক্ত সেনাবাহিনী গঠনের জন্য যে পরিমাণ খরচ হতে পারে তার একটা আনুমানিক হিসাবও তাঁদের কাছে দাখিল করি।

প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাটির বিরাট আকারের কথা উল্লেখ করে ভূতলিঙ্গম বলেন, এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করতে গেলে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটাকে কাট-ছাঁট করতে হবে, এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার চলতি আয় বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে তিনি অবশ্য পরামর্শ দেন যে, আর্থিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ সামরিক পর্যায়ে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যা' প্রয়োজন তার মূল্য নির্ধারণ করে এবং যে সময়ের মধ্যে উক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে তার উল্লেখ করে, লিখিতভাবে সরকারের কাছে পেশ করতে।

ভূতলিঙ্গমের পরামর্শ মতো বিস্তারিতভাবে একটি লিখিত বিবরণ প্রস্তুত করে প্রধান সেনাপতির স্বাক্ষর সহ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেননের নামে অবিলম্বে প্রেরণ করি। উক্ত বিবরণে সমরোপকরণ, গুলি-গোলা এবং অন্যান্য ঘাটতির যথোচিত বিশ্লেষণ করে সেগুলির আধুনিকীকরণ এবং ঘাটতিপূরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করবার জন্য আনুমানিক ব্যয়ের উল্লেখ করে সেটিকে মন্ত্রীপরিষদের প্রতিরক্ষা কমিটিতে উপস্থাপিত করবার অনুরোধ জানান হয়। চিঠিখানি মেনন পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের প্রতিরক্ষা কমিটিতে সেটি পেশ করেছিলেন কি না তিনিই

জানেন। আমরা কিন্তু তিনি কিংবা তাঁর অন্য কোনো সহকর্মীর কাছ থেকে কোন জবাব পাই নি। চিঠিখানির যে কী গতি হ'ল তাও আমি জানি না।

পরিস্থিতির কথা কৃষ্ণ মেনন ছাড়া, মোরারজী দেশাইকেও অন্ততঃপক্ষে দু'টি সূত্র থেকে জানান হয়েছিল। প্রথমতঃ, তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (প্রতিরক্ষা) নিশ্চয়ই তাঁকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রেখেছিলেন, এবং দ্বিতীয়তঃ, অর্থসচিব ভূতলিঙ্গম বৈদেশিক সচিবের কক্ষে আমার কাছ থেকে যা শুনেছিলেন, তা' নিশ্চয়ই জানিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রীকে। কৃষ্ণ মেনন তাঁকে যথোচিত ওয়াকিবহাল যদি নাও করে থাকেন, তবু অর্থমন্ত্রী হিসাবে, এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে উত্থাপিত করে, সামগ্রিকভাবে সরকার যাতে একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেটা দেখা তাঁর কর্তব্য ছিল। মন্ত্রী পরিষদের এক বা একাধিক[৬৬] সদস্যের নিষ্ক্রিয়তা অথবা উপযুক্ত সক্রিয়তার অভাবের কারণ যাই থাকুক না কেন, বহুবিধ বিপর্যয়ের আশঙ্কার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের অতীব প্রয়োজনীয় দাবী-গুলির কিছুই আমাদের মহাশক্তিধর সরকারের মাধ্যমে পায় নি। দিল্লীতে এই অবস্থা চলেছিল অনেকদিন ধরে!

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। একাধিক জেনারেল প্রায়ই গর্ব করে বলেছেন (অথবা অন্য লোকে তাঁদের সেই সম্মান দিয়েছে) যে, সেনাবিভাগের বিভিন্ন ঘাটতি, অন্যান্য প্রয়োজন এবং সেগুলির গুরুত্বের বিষয় তাঁরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে সরকারের নজরে এনেছিলেন। তা' যদি হয়, তবে কেউ একজন এগিয়ে এসে জনসাধারণের কাছে নির্দিষ্ট করে বলুন, সেই সব জেনারেল (অথবা সংশ্লিষ্ট পদস্থ সরকারী ব্যক্তি) কারা; কখন্, কী কথা এবং কোন্ পর্যায়ে তাঁরা তা' বলেছিলেন; সেটা লিখিতভাবে জানান হয়েছিল কি না, ও ব্যাপার এবং আমি যে রকম দৃঢ়, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারংবার সমস্যাটি সরকারের কাছে পেশ করেছিলাম, তাঁরাও অনুরূপভাবেই বিষয়টি সরকারের কাছে তুলে ধরেছিলেন কি না। যদি তা' করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য প্রমাণ-ই বা কী?

৬৬। মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর আভ্যন্তরিক ব্যাপার সম্বন্ধে নিজেদের যথেষ্ট ওয়াকিবহাল বলে দাবী করতেন। ব্যাপারটি নিয়ে তাঁরাই বা কেন মন্ত্রী পরিষদে সোরগোল তোলেন নি? মনে হয়, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য এগিয়ে যেতে সম্মত হন নি কেউ।

দু'টি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি।

(পর ঘটনা দু'টি আমি শুনি।) ১৯৫৯ সালে অ্যাডমিরাল ডি. শঙ্কর জাপানে গিয়ে জনৈক জাপানী সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই ভদ্রলোক রাজনৈতিক বিষয়ে ছিলেন উত্তমরূপে ওয়াকিবহাল। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে শঙ্করের কাছে তিনি মন্তব্য করেন, জাপান এবং ভারত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশতঃ পরস্পরের সঙ্গে মন খুলে মত বিনিময় করে না। ফলে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিনিময় করতে প্রায়ই তারা ব্যর্থ হয়। নির্দিষ্ট বিষয়টি উল্লেখ করবার পূর্বে তিনি বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তিনটি মাত্র দেশ রয়েছে যাদের গুরুত্ব সর্বাধিক : চীন, ভারত এবং জাপান ; এবং, ফরমোজাবাসী জনৈক চীনা ভদ্রলোকের কাছে তিনি জানতে পেরেছেন (এবং, অন্যান্য বিশ্বস্ত সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে তাঁর নিজেরও দৃঢ় ধারণা) যে, রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতানৈক্যের কারণে, অনতিবিলম্বে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল পাওয়া চীনের বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব, এই অতীব প্রয়োজনীয় বস্তুটির জন্য চীন অন্য দিকে নজর দেবেই ; এবং, অনতি ভবিষ্যতে লাদাক এবং নিফা এই দু'টি অঞ্চলে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করবে। সে ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি হবেই। বিশাল তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ এই দুই অঞ্চলে প্রথমে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করবে চীন।[৬৭] শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধাতেও তারা পশ্চাৎপদ হবে না। শুধু তাই নয়, আসামের তৈল সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গোপসাগর অবধি যাতায়াতের পথও তারা চায়। কিন্তু এই দু'টি ব্যাপার নিয়ে এই মুহূর্তে কোন গণ্ডগোল করলে সংঘর্ষের পরিধি বিস্তৃত হয়ে পড়বে, এবং সেই সঙ্গে দেখা দেবে অন্যান্য গুরুতর সমস্যা। চীনারা হ'ল ধৈর্যশীল জাতি। অতএব শেষোক্ত দু'টি ব্যাপারে 'ভবিষ্যৎ' সুযোগের জন্য তারা অপেক্ষা করবে।

উপর্যুক্ত তথ্যটি রিয়ার অ্যাডমিরাল শঙ্কর নিজেই সরাসরি উপরওয়ালা, প্রতিরক্ষা উৎপাদনের মহা-নিয়ামক মেজর জেনারেল পি. নারায়ণকে জানান। প্রতিরক্ষা উৎপাদন সম্বন্ধে বিস্তারিত একটি রিপোর্টও দাখিল

৬৭। লাদাক এবং নিফা অঞ্চল যে তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ, সে কথা ১৮৮১ সালেই জনৈক ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ার বলেছিলেন। শঙ্করের সে লেখাটি পড়া ছিল।

করেন শঙ্কর। তাঁর অভিমত হ'ল, প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজন, বিশেষ করে জরুরী অবস্থায়, মেটাবার কোন চেষ্টাই করা হয় নি। রিপোর্টটিতে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেন ঃ

(ক) সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে কোন দেশেরই শুধুমাত্র নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের কারখানার উপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। অথচ আমরা করছিলাম তাই। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মোট প্রয়োজনের মাত্র ১৫ শতাংশের মতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রক উৎপাদন করছিল। স্থতরাং ভারতে সম্পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতাকে এই দিকে নিয়োজিত করা দরকার।

(খ) শিল্পের প্রসারের জন্য একাধিক বৎসরের প্রয়োজন। স্থতরাং (বর্তমান পরিস্থিতি বিচারে) এই বিষয়ে আমাদের অবিলম্বে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্য।

(গ) কোন্ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জাম আমরা চাই সেটা অবিলম্বে স্থির করে নেওয়া উচিত। কারণ, চাহিদা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা থেকে নিয়ে উৎপাদন পর্যন্ত ব্যাপারটিতে পাঁচ বৎসর কিংবা ততোধিক সময়ের দরকার হয়।

(ঘ) উৎপন্ন অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামের অতিরিক্তও যথেষ্ট পরিমাণ (আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য) সংরক্ষণ করে রাখা প্রয়োজন।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে বেসরকারী শিল্প-সংস্থাকে কাজে লাগাবার মূল পরিকল্পনাটিরই বিরোধী ছিলেন মেনন। ব্যাপারটির প্রতি অদ্ভুত একটা বিরাগ ছিল তাঁর।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ, সরকারের কাছে নিজের নিজের সমরোপকরণের প্রয়োজনের তালিকা দাখিল করেন। প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণ ছাড়া, এই প্রয়োজনগুলি মেটানো সম্ভব ছিল না। সেই উদ্দেশ্যে একটি রাইফেল কারখানার আধুনিকীকরণের জন্য প্রায় এক কোটি টাকার মতো প্রয়োজন হয়। মোরারজী দেশাই-এর কাছে এই সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাঠান মেনন। কিন্তু আর্থিক অনটনের অজুহাতে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন অর্থমন্ত্রী। অথচ সামরিক বিপর্যয়ের পর, একটি রাইফেল কারখানার আধুনিকীকরণের জন্য চ্যবন বৈদেশিক মুদ্রায় দুই কোটি টাকা দাবী করলে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মোরারজী একটি নয়, দু'টি

রাইফেল কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করতে স্বীকৃত হন। এই ব্যাপারে তিনি সংযুক্ত সচিব সারিন, মেজর জেনারেল আইআপ্পা এবং রিয়ার অ্যাডমিরাল শঙ্করকে ডেকে পাঠান। আলোচনার মধ্যে শঙ্করকে[৬৮] লক্ষ্য করে বিদ্রূপভরে প্রশ্ন করেন: 'আপনার (মেননকে ইঙ্গিত করে) বহুঘোষিত প্রতিরক্ষা উৎপাদনের কী হ'ল ?'

'সব কিছু স্যার রাজনীতির সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে', শঙ্কর হঠাৎ জবাব দিয়ে বসেন।

'কী বললেন ?' মোরারজী দেশাই গর্জন করে ওঠেন কথাটা শুনে।

'কিচ্ছু নয় স্যার', ফিস ফিস করে উত্তর দেন শঙ্কর, 'কিছুই বলি নি।'

দেশাই আবার চীৎকার করে ওঠেন, 'যা' বলেছেন, তা' আর একবার বলুন অ্যাডমিরাল।'

অনিচ্ছাভরে এবং নিরাসক্ত কণ্ঠে শঙ্কর এবার বলেন, 'বলছিলাম, প্রতিরক্ষা উৎপাদন নিয়ে স্যার ভয়ানক রাজনীতির খেলা চলছে।'

(ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে অর্থ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক যেন সর্বদা পরস্পরের গলা টিপে ধরবার জন্য উদ্যত হয়ে থাকতো ; এবং, এই বিরোধের কারণেই প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যাহত হয়।)

মেননের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তথাপি পরিতাপের বিষয় যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীকে উপযুক্ত সমরোপকরণ দিয়ে সুসজ্জিত করবার জন্য তথা ঘাটতিপূরণ সম্বন্ধে বাহিনী-প্রধানদের সুপারিশ-গুলির উপর উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেন নি। তা' ছাড়া, সেনা-বাহিনীর সামরিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে লিখিত বাহিনী-প্রধানদের গুরুত্বপূর্ণ চিঠি-গুলিকেও তিনি অবহেলা করেন। অথচ, সামরিক বাহিনীকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত না করে রাখার বিপদ সম্বন্ধে একাধিকবার ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে সজাগ করে দিয়েছিলাম। তাতেও কোন ফল হয় নি।

বিভিন্ন ধরনের সমরোপকরণের জটিলতা মেনন যে বুঝতেন না তা' নয়। কিন্তু দেশজ উৎপাদনের সপক্ষে তাঁর মনোভাব ছিল অনমনীয়। অদূর ভবিষ্যতে

৬৮। প্রতিরক্ষা উৎপাদনের মহা-নিয়ামক অ্যাডমিরাল শঙ্কর ছিলেন অতীব যোগ্য এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কিন্তু মেনন এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছ থেকে বিভিন্ন কারণে যা' কিছু বিরূপ সমালোচনা হয়, সব তাঁকেই সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, কী অসুবিধার মধ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে শঙ্কর নিজ কর্তব্য পালন করে গেছেন।

যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন না বলেই, সহজ উপায়ে এবং সস্তায় দেশের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম উৎপাদনের প্রতি তাঁর এত আগ্রহ ছিল। তাঁর অভিমত ছিল, প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দেশকেই স্ব-নির্ভর হতে হবে। সুদূর-প্রসারী নীতি হিসাবে, এই ব্যাপারে বিদেশী কোন শক্তির উপর নির্ভর করে থাকা হবে ভুল ; কারণ, যুদ্ধের সময় এ ধরনের চুক্তি তারা যে কোন সময়ে বাতিল করে দিতে পারে। সুতরাং, স্বদেশে উৎপাদনের কাজটি একদিন না একদিন শুরু যখন করতেই হবে, তখন সেটি এই মুহূর্তে শুরু করাই হবে দূরদর্শীতার পরিচায়ক

এই নীতি নিয়ে মেনন এবং সেনাবাহিনীর একাধিক অফিসরসহ আমার মধ্যে গভীর ও বিরাট মতানৈক্য তথা বিরোধ দেখা দেয়। স্বদেশে উৎপাদনের প্রয়াসকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে আমরা ছিলাম একমত। নিজের দেশে প্রস্তুত জিনিসপত্র যে সস্তায় হয়, এবং আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে, তা' আমরাও স্বীকার করতাম। কিন্তু সীমান্তে গুরুতর বিপদের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকতেও অবশ্য প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ অবিলম্বে বিদেশ থেকে আমদানী না করার যে নীতি, তারই বিরাধী ছিলাম আমরা। এই অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যাপারে সেনাবাহিনীকে ঘাটতিতে ফেলে রাখা আমাদের মতে ছিল অসমীচীন। তাই, আর্থিক জটিলতা যাই থাকুক না কেন, সামরিক দিক থেকে যে সমস্ত সমরোপকরণের প্রয়োজন এড়ান সম্ভব নয়, এবং দেশের মধ্যেও যেগুলি সময় মতো উৎপাদন করা অসম্ভব, সেগুলিকে বিদেশ থেকে অবিলম্বে আমদানী করার ব্যাপারে অ বা ছিলাম দৃঢ় একমত।

বছরের পর বছর ধরে মেনন সংসদকে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সন্তোষজনক, এবং সীমান্তে যে-কোন আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য আমরা সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। প্রকৃত তথ্য কিন্তু ছিল এব বিপরীত। সেনাবিভাগ বারংবার তাঁকে লিখিতভাবে সাবধান করে দিয়েছে যে, লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র এবং সমরোপকরণের নিদারুণ ঘাটতির জন্য যথোপযুক্তভাবে দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, আমাদের সামরিক প্রস্তুতি, কূটনীতি এবং জাতীয় মনোভাব— এই তিনটি বিষয়ের উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তাই ছিল সর্বাধিক।

হালচাল দেখে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন জেনারেল থাপার। মেননের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই গুরুতর পরিস্থিতির কথা নেহরুর

গোচরে আনা তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে কিনা সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। জবাবে বলেছিলাম, অতীতে কখনও তিনি (থাপার) নেহ্‌রুর সঙ্গে এই ধরনের ব্যাপারে বিধিবহির্ভূতভাবে আলোচনা করেন নি। মেননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ভালো নয়। এমত ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ডিঙ্গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলে সবাই তাঁকে ভুল বুঝবে এবং বিশ্রী একটা পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হবে।

আরেকটি বিষয়ও ভাববার ছিল। কৃষ্ণ মেননের বিরুদ্ধে কোন কথাই শুনতে চাইতেন না নেহ্‌রু। মেনন-প্রীতি ইদানীং যেন আরও বেশী হয়েছিল তাঁর।[৬৯]

সুতরাং, ঘটনাটির সারমর্ম প্রধান মন্ত্রীর গোচরে আনবার দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করি। (বহুদিন থেকেই বিধিবহির্ভূতভাবে তাঁর সঙ্গে জরুরী সামরিক বিষয় আলোচনা করবার অনুমতি আমায় প্রদান করেছিলেন নেহ্‌রু)।

প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দু'টি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিই: বিভিন্ন ধরনের সমরোপকরণ দেশের মধ্যে দ্রুত উৎপাদনের বিরাট দায়িত্বটিতে অংশ গ্রহণের জন্য, সরকারী সংস্থার সঙ্গে বেসরকারী সংস্থাগুলিকেও অনুমতি দিতে হবে; এবং যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সমারোপকরণের প্রয়োজনীয়তা এড়ান সম্ভব নয়, সেগুলিকে যথাসত্বর বিদেশ থেকে আমদানী করে ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে (১৯৬৩ সালে এই জিনিসটাই আরও বিরাট আকারে করেছিলাম)। মেননের মারফৎ সামরিক সদর দফতর যে সমস্ত চিঠি সরকারকে লিখেছিল, এবং যেগুলির কোন উত্তর আসে নি, সেগুলির কথাও নেহ্‌রুকে জানাই।

সেনাবিভাগের অতীব প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বলতে গেলে কোন ব্যবস্থাই নেহ্‌রু গ্রহণ করেন নি। মেনন অবশ্য এ ব্যাপারে আপন

৬৯। বোম্বাইয়ে আপন নির্বাচনকেন্দ্র থেকে সম্প্রতি অনেক ভোটে জয়লাভ করে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন মেনন। তীব্র প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর এই বিপুল ভোটে জয়লাভ নেহ্‌রুর মনে গভীর রেখাপাত করে। জনতার 'রায়'ই মেননের আসন প্রকৃতভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে বলে তাঁর ধারণা জন্মে। এরপর থেকেই অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে পড়েন মেনন, এবং অধিকাংশ ব্যাপারে নেহ্‌রুও তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। এই সময়েই মেনন যেমন একাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তেমনি মারাত্মক ভুলও করেছিলেন অনেক।

মতামত আগেই নেহ্রুকে জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সেনাবিভাগের মতামতের সঙ্গে সেগুলির মিল ছিল না। এবং, প্রকৃতপক্ষে মেননের অভিমতই নেহ্রু গ্রহণ করেন। (অথবা নেহ্রুর মতামত গ্রহণ করেন মেনন ?) আমার ধারণা, সেনাবিভাগের আধুনিকীকরণ তথা বিভিন্ন ঘাটতি পূরণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ আর্থিক মঞ্জুরী চেয়ে আমরা যে একাধিক অনুরোধ পেশ করেছিলাম, সেগুলির প্রতি নেহ্রুর সন্দিগ্ধ মনোভাব গড়ে ওঠার জন্য মেননই প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন।

উপরে যা উল্লেখ করলাম তার বিপরীত কোন আদেশ যদি মেননের প্রতি নেহ্রু দিয়ে থাকেন, তবে সেনাবিভাগ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ অথবা মেনন সে আদেশ অমান্য করেছিলেন!

আসলে কয়েকজন রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট, নিজের বৈদেশিক দফতরের অভিমত এবং বিশ্বাসভাজন কিছু সংখ্যক রাজনীতিক ও অন্যান্য ব্যক্তির পরামর্শে নেহ্রুর মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে, চীনাদের সম্বন্ধে যতখানি বলা হয়ে থাকে ততখানি শক্তিশালী তারা নয়, এবং নিজেদের বহুবিধ সমস্যা নিয়েই তারা বিব্রত; খাদ্য ঘাটতি, বন্যা এবং অপ্রিয় একনায়ক শাসনের কারণে দেশের অভ্যন্তরেই তাদের গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে; তিব্বতে শুরু হয়েছে বিদ্রোহ; সামগ্রিকভাবে চীনা জনসাধারণ তথা সেনাদলের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে; এবং এই অবস্থায় তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে আমরাই লাভবান হব বেশী। পরিস্থিতির এই মূল্যায়ন ছিল একেবারে ভুল। এই মূল্যায়নের উপর নির্ভর করেই নেহ্রুর ধারণা হয়েছিল, উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে নিজেদের আভ্যন্তরিক ব্যাপার সামলানো ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবার অবসর চীনের নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী-পরিষদে তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, চীনের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ হবে না, এবং সামরিক হাইকমাণ্ড হিসাবে ভুল করে অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অন্য কথায়, তাঁরা মনে করছিলেন, অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করে সেনাবিভাগ অসঙ্গত এবং অপ্রয়োজনীয় দাবী পেশ করছে। তাই দাবীগুলির প্রতি তাঁরা এতখানি উদাসীনতা প্রদর্শন করেছিলেন।[৭০] আমাদের

৭০। সাধারণভাবে বলতে গেলে বেশ কিছুদিন ধরে সর্বোচ্চ মহলে একটা আত্মতৃপ্তির মনোভাব বিরাজ করছিল। ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকায় এফ. এস. টুকার লেখেন: আমরা এদেশ ত্যাগ করে যাবার পর, ভারতের হতাশাপূর্ণ নীতিতে

প্রয়োজন যে সত্যিই জরুরী ছিল, এবং তার সঙ্গে জড়িত ছিল গুরুতর পরিণতির প্রশ্ন, সেটা তাঁরা উপলব্ধিই করতে পারেন নি। মেননেরও ধারণা ছিল তাই। এই কারণেই, অতিপ্রয়োজনীয় কতগুলি সমরোপকরণ আমদানীর জন্য প্রতিরক্ষা প্রধানগণ বারংবার যে পরামর্শ দেন, সেগুলিকে মেনন অবহেলা করেছিলেন। উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাগণও একই অভিমত এবং মনোভাব পোষণ করতেন।

তবু একটা কথা রয়ে যায়। সামরিক প্রয়োজনীয়তার দাবীগুলিকে যখন মেনন, মোরারজী দেশাই এবং নেহ্‌রু উপেক্ষা করেছিলেন, প্রতিরক্ষা হাই-কমাণ্ডের তখন কর্তব্য ছিল জোর করে বিষয়টির একটি ফয়সালা করে ফেলা।

১৯৬২ সালের গোড়ার দিকের কথা। নেহ্‌রুর বাসভবন থেকে একদিন সংবাদ এলো, সেই দিনই রাত দশটার সময় আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সময় সম্বন্ধে নেহ্‌রু চিরদিনই ছিলেন অত্যন্ত কড়া। তাই ঘড়িতে ঠিক রাত দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করলাম।

চেস্টার বোলজের সঙ্গে আমার কী ধরনের পরিচয় রয়েছে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন নেহ্‌রু। বললাম, তাঁকে আমি বেশ ভালো করেই জানি। আমার ব্যক্তিগত অনুরোধে মেজর জেনারেল হরি বাধওয়ার-কে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি যে সঙ্গে করে আমেরিকায় নিয়ে অমূল্য সাহায্য করেছিলেন, সে ঘটনাটিও যোগ করে দিলাম জবাবের সঙ্গে। শুনে নেহ্‌রু বললেন, প্রেসিডেণ্ট কেনেডির বিশেষ প্রতিনিধিরূপে বোলজ্ ভারতে আসছেন, এবং দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান এই মর্মে একটি বার্তাও এসেছে। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে, এই ব্যাপারে আমাকে মেননের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বললেন নেহ্‌রু।

পরের দিন সকালে দেখা করলাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে। শুরুতেই বিদ্রূপ ভরে মেনন বললেন: 'আমেরিকার নাগরিকত্ব কেন গ্রহণ করছেন না জেনারেল। তা'হলে সকলের পক্ষেই ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়ে যায়।' (এক বা একাধিক দেশকে প্রীতির চক্ষে দেখে এমন হাজার হাজার ব্যক্তি ভারতবর্ষ

বিক্ষুব্ধ উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে (সম্ভাব্য) চীনা আক্রমণের আশঙ্কার কথা ১৯৪৭ সালে ভারত অবস্থানকালেই আমি লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতির জন্য 'সামান্য কয়েক বৎসর সময় হয়তো ভারত পেতে পারে—মাত্র সামান্য কয়েকটি বৎসর···।'

এবং অন্যান্য স্থানে রয়েছে। কিন্তু সেই কারণে কেউ বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রার্থনা করবে এমন কথা কখনও শুনি নি।)

নিরুত্তরে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালাম তাঁর দিকে। মেনন আবার মন্তব্য করলেন, আমাদের জেনারেলদের সঙ্গে দেখা করবার কোন প্রয়োজন চেস্টার বোলজের নেই; এবং সে কথাটি আমি যেন তাঁকে জানিয়ে দিই।

এবার জবাব দিলাম, 'দেখাটা আমি করতে চাই নি, চেয়েছেন বোলজ্ নিজেই; এবং সরাসরি সে প্রস্তাবটা আমাকে করেনও নি তিনি। (বোলজ্-ই একমাত্র বিদেশী কূটনীতিবিদ অথবা রাজনীতিক নন যিনি ভারতীয় জেনারেলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন।) সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবটি যখন আমাদের সরকারের মাধ্যমে এসেছে, তখন সরকার থেকেই বা কেন উপযুক্ত একটা অজুহাত খাড়া করে চেস্টার বোলজ্-কে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে না?'

'কথাটা বলা যত সহজ, করাটা তত সহজ নয়,' কৃষ্ণ মেনন জবাব দিলেন, 'প্রেসিডেণ্ট কেনেডির বিশেষ প্রতিনিধিরূপে তিনি এখানে আসছেন, এবং আকারে-ইঙ্গিতেও তাঁর কোন অনুরোধ রক্ষা না করার অভিপ্রায় প্রকাশ করাটা আমাদের পক্ষে সহজ কিংবা বিচক্ষণতার পরিচায়ক হবে না।'

'সে ক্ষেত্রে, মিঃ ডিফেন্স মিনিস্টার, আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই দেওয়া হোক।'

কৃষ্ণ মেনন চাপা ক্রোধে যেন ফেটে পড়লেন, 'অসহ্য মানুষ আপনি।'

'কিন্তু স্যার, চেস্টার বোলজের সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি কি না সে কথাটা আপনি এখনও বলেন নি।'

মেননের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। একটি মাত্র কথায় জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

সাক্ষাৎকারটি এরপর শেষ হয়ে গেল হঠাৎ।

কয়েকদিন পরেই সাক্ষাৎ করতে এলেন চেষ্টার বোলজ্। প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দিলেন, পুরনো বন্ধু হিসাবেই কথাবার্তা বলবেন তিনি। তারপর, চীনের দিক থেকে ভারতের বিপদাশঙ্কা প্রসঙ্গে উভয় দেশের এই বিরোধটির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন।

চীন কর্তৃক ভারতীয় সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনাগুলির কেবলমাত্র রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে বলেই প্রথমে আমি অনুমান করেছিলাম। তাই

বিশ্বাস ছিল, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পর্ক কালক্রমে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন, বিশেষতঃ লাদাক অঞ্চলে তাদের ব্যবহার দেখে আমার দৃঢ় ধারণা, ভারতের কোন কোন অঞ্চলে, প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেও তারা নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমার আশঙ্কার কথা বোলজ্-কে জানালাম।

ব্যাপারটি চরমে পৌছবার কোন আশঙ্কা রয়েছে কি না, এবং সে ক্ষেত্রে কবে নাগাদ সেটা আমরা অনুমান করছি ও সেই অবস্থা মোকাবিলার জন্য কি করতে মনস্থ করেছি, তাও বোলজ্ জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, সম্ভবতঃ গ্রীষ্ম কিংবা শরৎকাল নাগাদ চীনারা আমাদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করবে। সে ক্ষেত্রে একাধিক সমস্যার উদ্ভব হবে আমাদের। তবে আশা করি কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আগে থেকে এ ধরনের কোন (সাংঘাতিক) আকস্মিক বিপর্যয়কে অন্ততঃপক্ষে বাধা দেবার জন্যও, কোন বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটা সমাধানের ব্যবস্থায় তৎপর হবেন। বিপর্যয়টুকু ঘটে যাওয়া অবধি মনে হয় অপেক্ষা করবেন না তাঁরা, কিংবা খুব বেশী দেরীও করে ফেলবেন না। কারণ দেয়ালের লিখন স্পষ্ট পাঠ করা যাচ্ছে। তা'ছাড়া যুদ্ধের আশঙ্কায় যে সমস্ত দেশ ব্যতিব্যস্ত, তারা প্রায় সবাই এ ধরনের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে; বিশেষতঃ শত্রুপক্ষ যদি প্রবল হয়। অতঃপর পরস্পরের দেশ সম্বন্ধে খানিকটা সৌজন্যমূলক আলাপ-আলোচনার পর বোলজ্ বিদায় গ্রহণ করেন।

কয়েকদিন পরেই চেস্টার বোলজ্ একখানি পত্রে আমাকে জানান, ভারতের সমস্যাগুলির যথার্থ গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে সম্যকরূপে অবহিত করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। দুঃখের বিষয়, আমাদের সেনাবাহিনীকে উপযুক্ত শক্তিশালী করে তোলার জন্য তবু কেউ কোন চেষ্টাই করেন নি। আরেকখানি পত্রে চেস্টার বোলজ্ আমাকে লেখেন: মার্চমাসে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেগুলি আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে। আপনি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সেই বছরেই গ্রীষ্ম অথবা শরৎকালে চীনারা ভারত আক্রমণ করবে। আপনার পরামর্শমত আমরা যদি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে

৭১। প্রকৃত পক্ষে, ঘটনাটি ঘটে যাবার পর আমেরিকার কাছে ভারত সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং সমরোপকরণও পায়।

পরিস্থিতিটি মোকাবিলার একটা ব্যবস্থা আগেই করে ফেলতে পারতাম, তা'হলে অক্টোবর এবং নভেম্বর (১৯৬২) মাসের ঘটনাবলী হয়তো হ'ত অন্যরকম।

নতুন ধরনের যে সমস্ত সমরোপকরণ আমরা সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম, সি. জি. এস. হিসাবে সেগুলি সম্বন্ধে মেননের সঙ্গে আমি বহুবার আলোচনা করেছি। বিমান বহরের জন্য তিনি শব্দাতিক্রমী মিগ-২১ বিমান নির্বাচিত করেন। এ ব্যাপারে পেশাগত ভাবে আমার এবং সেনাবিভাগের স্বার্থ গভীর ভাবে জড়িত ছিল। কারণ, সামরিক তৎপরতার সময় স্থল বাহিনীকে সাহায্য করে বিমান বহর। তাই আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে মিগ-২১ বিমানগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ কি না, সে কথা মেননকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

প্রশ্নটি উত্থাপন করবার আরও একটি কারণ ছিল। বিমান বাহিনীর বিশেষজ্ঞগণ আমায় জানিয়েছিলেন যে, অনুরূপ ধরনের বিমান একাধিক দেশই নির্মাণ করে। যেমন, আমেরিকার 'এফ/১০৪', সুইডনের 'সাব ড্রাকেন্', ফ্রান্সের 'মিরেজ-III' এবং ইংলণ্ডের 'লাইট্নিং' বিমানও যে রয়েছে সে কথা আর গোপন ছিল না। কিন্তু মেনন আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিজ্ঞান বিষয়ক পরামর্শদাতার[৭২] অভিমত অনুসারে মিগ-২১ বিমানই হ'ল আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আমি কিন্তু অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কাছে অন্যরকম অভিমত শুনেছিলাম। সেগুলি মেননকে জানাই। কিন্তু তাঁর অভিমত ছিল, অন্য কোন দেশ অপেক্ষা রাশিয়ার কাছ থেকে বিমান খরিদ করাই সুবিধাজনক। (কারণ, এ ব্যাপারে রাশি 'নদের সহযোগিতামূলক মনোভাব অধিক ছিল বলেই তাঁর ধারণা। তা'ছাড়া ভারতীয় মুদ্রায় বিমানগুলির মূল্য পরিশোধের প্রস্তাবে এবং ভারতে মিগ বিমান উৎপাদনে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তারা সম্মত হয়েছিল)। রাশিয়ার কাছ থেকে সমর-সম্ভার খরিদ করায় আমার কোন আপত্তি ছিল না। আমার শুধু সন্দেহ

৭২। আধুনিক শব্দাতিক্রমী জেট বিমানের জটিলতা অথবা দক্ষতা সম্বন্ধে দায়িত্ব নিয়ে কোন মতামত প্রকাশ করবার মতো যোগ্যতা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা উক্ত পরামর্শদাতার ছিল কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ, এ ব্যাপারে প্রকৃত মূল্যায়ন করবার একমাত্র যোগ্যতা রয়েছে বিমান বাহিনীর বিশেষজ্ঞদের। কারণ, তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর। অথচ তাঁদের কোন মতামতই গ্রহণ করা হয় নি।

ছিল, যেগুলি আমরা খরিদ করতে চলেছি, সেগুলি আমাদের প্রয়োজনীয়তা বিচারে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কি না।

বিমান শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সামরিক প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই ভারতীয় বিমান বাহিনীতে মিগ-২১ বিমান প্রবর্তন করার প্রশ্নটি উঠেছিল। [প্রতিবেশী একটি দেশের বিমানশক্তি আমাদের চাইতে অধিক বলে মনে করা হ'ত। কারণ, তাদের বিমান বহরে ছিল ম্যাচ-২ গতিসম্পন্ন (ঘণ্টায় ১,৫০০ মাইল) বিমান।] এফ-১০৪ বিমান আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বিক্রি করতে আমেরিকা ছিল নারাজ। এমত ক্ষেত্রে, মিগ-২১ বিমান ক্রয়ের সিদ্ধান্তটি বাস্তব বিবেচনায় যে অতি সঙ্গত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঊর্ধাকাশে ক্ষেপণাস্ত্রসহ সম্পূর্ণ অস্ত্র-ব্যবস্থা সম্বলিত ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণের মিগ-২১ বিমান সরবরাহ করতে সোভিয়েত সরকার সম্মত হয়েছিলেন ; এবং তাঁদের সদুদ্দেশ্যের পরিচয় হিসাবে সোভিয়েত বিমান বহরের স্কোয়াড্রন অনুযায়ী উক্ত ধরনের কয়েকখানি বিমান ভারতীয় বিমান বহরকে সরবরাহও করেছিলেন। এ ছাড়া, লাইসেন্স-যোগে ভারতে মিগ বিমান নির্মাণের একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তও নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, এবং কিছু সময় পর এ সম্বন্ধে মস্কোতে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ব্যাপক সোভিয়েত সহযোগিতায় ভারতে মিগ বিমান নির্মাণের একাধিক কারখানা স্থাপন এবং উৎপাদন ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থাও করা হয়। চীন-ভারত উত্তেজনা যখন চরমে উঠেছে, সেই সময় এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় সোভিয়েত সহযোগিতা লাভ করাটা ছিল আমাদের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরই পরিচায়ক। তা'ছাড়া, অর্থনৈতিক দিক যাই হোক না কেন, উন্নত ধরনের বিমান-যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি ছিল আমাদের একটি সুদৃঢ় এবং বাস্তবোচিত পদক্ষেপ। ভারত-চীন সম্পর্কের ক্রমাগত অবনতি সত্ত্বেও, পরিকল্পনাটির প্রতি সোভিয়েত আনুকূল্য আমাদের আর একটি নীতিরও অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচয় প্রদান করে। নীতিটি ছিল, সোভিয়েত সহযোগিতায় শব্দাতিক্রমী বিমান সংগ্রহের ; এবং, সম্ভাব্য রাজনৈতিক তথা আর্থিক পরিণতি উপেক্ষা করে এই ব্যাপারে ভারত সরকারকেও পূর্ণসম্মতিসহ আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল।

শব্দাতিক্রমী বিমানের অভাবে বিমান ঘাঁটি, জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ও শিল্পকেন্দ্রগুলিকে রক্ষার ব্যাপারে তথা ভূমির উপর সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে

অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হবে না বলে নিজেদের অসহায় বোধ করতে থাকে ভারতীয় বিমান বাহিনী, এবং এই গুরুতর অসুবিধাটি অবিলম্বে দূর করার জন্য চাপ দিতে থাকে ক্রমাগত। দেশজ ভিত্তিতে মিগ বিমান নির্মাণের এই পরিকল্পনাটির কর্মসূচী ছিল উচ্চাশাপূর্ণ; এবং, এর পরিপূর্ণ রূপায়ণে নিদারুণ বিলম্ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ, আমলাতান্ত্রিক বাধা-নিষেধ এবং হস্তক্ষেপ (যা' আমাদের সমস্ত রকম সরকারী পরিকল্পনা, বিশেষতঃ প্রকল্পগুলির রূপায়ণের ব্যাপারে অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে) মিগ বিমান উৎপাদনে যে নিদারুণ বিলম্বের সৃষ্টি করবে, সেটা ছিল সুনিশ্চিত। এমত অবস্থায় আমাদের সরকারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সঙ্গত কার্য হ'ত, যতদিন পর্যন্ত ভারতে উৎপাদন শুরু না হয়, ততদিনের জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাজ চালাবার মত কিছু সংখ্যক রাশিয়ায় নির্মিত মিগ বিমানের ফরমাশ করা। কিন্তু এই কাজটিও করা হয় নি। ভারতীয় বায়ুসেনাদের মিগ বিমান সম্বন্ধে নিরাসক্তি [৭৩] এবং সমসাময়িক অন্য ধরনের বিমানের প্রতি পক্ষপাতও এই অবহেলার কারণ হতে পারে।

বস্তুতঃ, বিমান বাহিনীর বহু উচ্চপদস্থ অফিসর এবং বিশেষজ্ঞ মিগ-২১ বিমানের কার্যকারিতা সম্বন্ধে মনে মনে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। মিগ বিমান সম্বন্ধে মেনন প্রতিরক্ষা উৎপাদনের মহা-নিয়ামক, অ্যাডমিরাল ভি. শঙ্করের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে শঙ্কর বলেন, 'ভারতীয় বিমান বহরে মিগ বিমানের প্রচলন করলে আমাদের সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা রাশিয়ার অনুকরণে পরিবর্তন করতে হবে। এতে বহুবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব তো হবেই, উপরন্তু যা' খরচ পড়বে, তা' আমাদের পক্ষে সামলানো হবে মুস্কিল। জবাবটি শুনে, শঙ্কর বাড়াবাড়ি করছেন বলে মেনন মন্তব্য করেন। এরপর বিমান বাহিনীর প্রধান, এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ার-এর মতামত জিজ্ঞাসা করেন মেনন। তিনিও মিগ-২১ বিমানের কিছু কিছু খুঁত ধরলে ক্রুদ্ধ মেনন নিম্নলিখিত মন্তব্যটি করে আলোচনা বন্ধ করে দেন: 'এয়ার মার্শাল! আপনার

৭৩। আই. এ. এফ.-এর সুচিন্তিত মতামতের বিরুদ্ধে সরকার মিগ বিমান তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছেন বলে একটি সাধারণ মনোভাব ভারতীয় বিমান বাহিনীতে গড়ে ওঠে। তাদের মতে, ঘণ্টায় প্রায় ১,৫০০ মাইল গতিবেগ-সম্পন্ন আমেরিকার এফ-১০৪ জঙ্গী বিমান কর্মক্ষমতা এবং রণদক্ষতার দিক থেকে মিগ বিমানের চাইতে ছিল অনেক শ্রেষ্ঠ।

নামের পিছনে ইঞ্জিনীয়ার শব্দটি যুক্ত থাকলেও, পেশাগতভাবে আপনি কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার নন। অতএব যন্ত্র-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে অযথা মাথা ঘামিয়ে মতামত প্রকাশ করবেন না।'

মিগ-২১ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে আমাদের বিমান বাহিনীতে যে সমস্ত সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছি, সেগুলির উল্লেখ করে মেননকে জানাই যে, আধুনিক বিমান বহর হিসাবে আই. এ. এফ.-কে চার-পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করতে হয়; এবং এই কাজগুলির জন্য তাদের স্কোয়াড্রন-গুলিতে ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং কানাডা থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন কুড়ি রকমের বিমান রয়েছে। সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এখানেই। কারণ, এক ধরনের বিমানের সঙ্গে অন্য ধরনের বিমানের কোন মিল নেই, এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিমান বাহিনী হয়েও আই. এ. এফ.-এর সরঞ্জামগুলি সমস্তই হ'ল বিভিন্ন প্রকারের। যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে গঠন করবার যোগ্যতাই হ'ল বিমান শক্তির মূল বিশেষত্ব। অথচ, এই পাঁচ-মেশাল ব্যাপারের জন্য সেই সুবিধাটিই বিনষ্ট হয়ে গেছে। বিমান বাহিনীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, যুদ্ধের সময় নির্ভরযোগ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হ'ল স্কোয়াড্রনগুলির দ্রুত চলাচল যোগ্যতা, যে জিনিসটি উল্লিখিত অসুবিধার জন্য কমাণ্ডারদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। বিমান কর্মী, বিশেষ করে, বিমানপোতের কারিগরদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এইরূপ বিচিত্র এবং বিভিন্নমুখী হবার দরুণ বিশেষ কোন ক্ষেত্রেই তারা উপযুক্ত দক্ষতা অথবা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না। বিমান এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামগুলির কর্ম-ক্ষমতা এইভাবে ক্রমশঃ অধোগামী হয়ে চলেছে; এবং ফলস্বরূপ, সামরিক প্রশিক্ষণের মানও হয়ে পড়েছে নিম্নমুখী।

বিমানগুলির কর্মক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণের মান নিম্নগামী হবার আরও দু'টি কারণ অবশ্য ছিল। প্রথমতঃ, বিমান বাহিনীর বিরাট সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ারদের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন কাজে অযথা নিযুক্ত করা হয়েছিল; এবং এই ব্যাপারটি সরকারের পূর্ণ অবগতি এবং সম্মতিক্রমেই করা হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে একটি ব্রিটিশ শিল্পসংস্থার কাছ থেকে লাইসেন্স খরিদ করে এক ধরনের প্রপেলর-জেট মাঝারি রকমের পরিবহণ বিমান নির্মাণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে আই. এ. এফ.। অথচ, বিমান বাহিনীর এ ধরনের কোন ব্যবসায় নামা উচিত কি না সেটা একেবারেই বিবেচনা করা

হয় নি। তার উপর, আই. এ. এফ.-এর কারিগরী দক্ষতা তাদের নিজেদেরই অত্যাবশ্যকীয় এবং ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব তথা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ একটি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের জনৈক অত্যুৎসাহী কমাণ্ডারকে উক্ত প্রকল্পটির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপর থেকেই তাদের কতগুলি প্রথম শ্রেণীর তৎপরতা বিভাগ, প্রশিক্ষণ সংস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রে কারিগরী অবেক্ষণ-মূলক (Supervisory) এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। কয়েকজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞকেও এই প্রকল্পে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁদের সযত্ন নির্দেশে, প্রচুর সময় নষ্ট করে, আধ ডজনেরও কম বিমানের কাঠামো একত্র করা হয়। কিছু কিছু অংশ অবশ্য নির্মিতও হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটি ছিল একটি বিরাট ব্যর্থতা, এবং এই ব্যর্থতার কোন সদুত্তর আজও মেলে নি।

এই ভাবে চলতে গিয়ে আই. এ. এফ.-কে এমন মূল্য দিতে হয়েছিল, যার পরিমাপ করা হয়তো শুধুমাত্র টাকার অঙ্কে সম্ভব নয়। আমাদের আশঙ্কা অনুযায়ী স্কোয়াড্রন এবং ডিপোগুলিতে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার মান অনেক নেমে গিয়েছিল। এবং একাধিক দুর্ঘটনার জন্য যান্ত্রিক ব্যর্থতাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করলেও, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার নিম্নমানের ফল।

উল্লিখিত বিশ্লেষণের সঙ্গে মেনন একমত না হওয়ায়, আমার বক্তব্যের সমর্থনে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম। কানপুরের বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে দু'টি নতুন 'তুফানি' বিমান সারাবার জন্য রাখা ছিল। ১৯৬১ সালের ২৫শে মে তারিখে দু'জন বৈমানিক উক্ত বিমান দু'টিকে চালিয়ে নিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে কানপুর যান। স্কোয়াড্রনের জন্য বরাদ্দ করা নতুন বিমান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফেরী বিমানচালক পৌঁছবার আগেই, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিমানটিকে সম্পূর্ণ কর্মক্ষম এবং উড্ডয়নযোগ্য করে রাখার নিয়ম রয়েছে। পরীক্ষক বৈমানিকও উক্তরূপে পরীক্ষা করে কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে সেগুলিকে সংশোধন করে রাখেন। আবার, সংশ্লিষ্ট স্কোয়াড্রনের ফেরী বিমান চালককেও বিমানখানি আকাশে নিয়ে পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হতে হয়। যে ঘটনার কথা বলছি, তাতে অন্যতম ফেরী বৈমানিক, তিনটি বিমানকে পাঁচবার আকাশে পরীক্ষা করবার পর মাত্র দু'টিকে কর্মক্ষম অবস্থায় পান। পরীক্ষা চালাবার সময় একটি ক্ষেত্রে 'হাইড্রলিক' এবং 'ব্রেক' ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ অকেজো বলে প্রমাণিত হয়, এবং অন্য একটি ক্ষেত্রে 'ককপিটে'র চাপ ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করছে না দেখা যায়। ফলে, বিমান চালকটি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, কানপুরের বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোর কাজকর্ম মোটেই সন্তোষজনক ছিল না; এবং দারুণ একটি দুর্ঘটনা সেদিন ঘটতে ঘটতে বেঁচে গিয়েছিল। আমাদের বিমান বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের অতি-সীমিত সঙ্গতিকে অনুচিত ভাবে নিয়োজিত করবার দরুনই উক্ত ব্যাপারটি ঘটে।

দীর্ঘদিন ধরে কারিগরী উদ্যমকে অন্য দিকে নিয়োজিত করবার ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা অথবা 'ঘটনা' (যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোন জীবনহানি অথবা ক্ষয়-ক্ষতি হয় না, সেইগুলিকে বোঝাবার জন্যই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে) কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সংবাদটি গোপন রাখা হয়েছিল সুকৌশলে। বিমানকর্মীদের মনোবল হ'ল অতি সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর একটি জিনিস। সংবাদগুলি প্রকাশ্যে প্রচারিত করলে সেই মনোবল যত না ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত, তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই ধরনের দুর্ঘটনায় এবং তাদের বিমানগুলির যান্ত্রিক কর্মক্ষমতার অভাবে। দায়িত্বশীল ডিপো কমাণ্ডারেরা সরকারী যোগ-সাজসে বেসরকারী প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাতে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, বিগত মহাযুদ্ধকালীন বিধ্বস্ত বিমানগুলির ভাঙ্গাচোরা অংশগুলি একত্রিত করে তাঁরা উৎপাদন করেন হাল্কা ধরনের একখানি বিমান এবং বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে ক্যারাভান জাতীয় একখানি ট্রেলার। ভবিষ্যতের ফলাফল অনুধাবন না করেই এই ধরনের নিরর্থক উদ্যমগুলিকে সরকার 'বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ' আখ্যা প্রদান করেন। প্রয়োজন হলে এ ধরনের 'পরামর্শ' সব সময়েই প্রচুর পাওয়া যায়। সর্বোচ্চ প্রশাসনিক এবং কর্মী পর্যায়ের এই ধরনের পরামর্শদাতাগণ সময় সময় পদবৃদ্ধির মোহের কাছে বিক্রী করে বসেন আপন আপন বুদ্ধি-বৃত্তির সততা এবং অকৃত্রিম বিভাগীয় স্বার্থ। আশা করেন উপযুক্ত সময়ে অবশ্যই তাঁরা পুরস্কৃত হবেন।

বিমানের কর্মক্ষমতা যে দু'টি কারণের উপর নির্ভর করে, তার প্রথমটির কথা উপরে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয়টি হ'ল আরও গভীর; এবং মেননকে সেটির কথাও বলেছিলাম। তা' হ'ল, অতিরিক্ত যন্ত্রাংশগুলিকে ঠিক সময় ঠিক স্থানে পাবার নিশ্চয়তার উপরেই বিমানের কর্মক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর

করে। অথচ আমাদের 'সর্বোচ্চ পর্যায়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্মচারীদের এ সম্বন্ধে কোন কার্যকরী পন্থা নিরূপণে দক্ষতার অভাব ছিল দীর্ঘকাল ধরে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধিকাংশ গঠনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মত সরবরাহ, চাহিদা এবং বণ্টনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটিও ধার করা হয়েছিল আর. এ. এফ. থেকে। কিন্তু আধুনিক বিমানের ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং সমর-কৌশলের সঙ্গে তাল রেখে এ ব্যবস্থা এগিয়ে যেতে পারে নি। এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছিল একাধিক সমস্যা, যার অধিকাংশই ছিল যান্ত্রিক। এক কথায় সমস্যাগুলি ছিল: ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের সঙ্গে আবশ্যকীয় অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের সাযুজ্য আরও সঠিকভাবে নির্ণয়ের নির্দিষ্ট মানযুক্ত ফরমুলার অভাব; বিভিন্ন উৎপাদনকারী দেশ থেকে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য তথাকথিত 'পাইপ লাইনে'র দৈর্ঘ্য তথা তার সঙ্গে জড়িত উৎপাদকদের বিলম্ব ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মধ্যবর্তী নিয়ন্ত্রণ প্রণালী; প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ ও যান্ত্রিক-করণের অভাব এবং সর্বশেষে, সম্পূর্ণ অযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা। সমস্যাগুলি বিরাট হলেও সমাধানের অসাধ্য ছিল না। বিমান বাহিনীর তরুণ অফিসর ও প্রবীণ এন. সি. ও.-দের উদ্যম, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং একাগ্রতার অনুরূপ সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল মহলের চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী দক্ষতার সঙ্গে সাহস ও নিছক যোগ্যতার প্রায়োজন ছিল শুধু।

প্রতিরক্ষার যে বিভাগটি আমার নিজের নয়, এবং যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সংশ্রব আমার ছিল না, সেটির সম্বন্ধেও এই ধরনের বিস্তারিত আলোচনা মেননের সঙ্গে করেছিলাম দু'টি কারণে: প্রথমতঃ, যে সমস্ত নতুন ধরনের বিমান সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলির, এবং বর্তমান বিমানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার ভালো-মন্দের সঙ্গে পদাতিক বাহিনী (যাদের বিমান বাহিনী সহায়তা করে থাকে) তথা জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রশ্ন গুরুতররূপে জড়িত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিমান বাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসর (দেশের এবং বাহিনীর প্রতি যাঁদের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত) আমাকে এইগুলি এবং আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, তাঁরা যে ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন, আমি হয়তো সেক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারি।

কিন্তু অরণ্যে রোদনই সার হয়েছিল আমার। প্রতিরক্ষা বিভাগের উন্নতির আশায় একাধিকবার যে সমস্ত পরামর্শ মেননকে দিয়েছি, তার কোনটিতেই

তিনি কর্ণপাত করেন নি ; তা' সে সেনাবাহিনী সম্বন্ধেই হোক, কি বিমান বাহিনী সম্বন্ধেই হোক। দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন যে সমস্ত ঘরোয়া সত্য কথা আমি বলতাম, সেগুলি তাঁর পছন্দ হ'ত না। কারণ মেননের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার অতিরিক্ত আর কিছুই করবার প্রয়োজন নেই। (মঙ্গলের জন্য বললেও, আমরা বেশীর ভাগ লোকই যেমন অধীনস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজেদের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসি না, তেমনি আবার অধীনস্থ ব্যক্তিরাও সাধারণতঃ দোষ ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিতে সাহস করে না। কিরাতার্জুনীয়-তে ভারবি যেমন বলেছেন : প্রভুর মঙ্গলের জন্য যা' বলা দরকার, তা' প্রভুকে যে ব্যক্তি না বলে, সে যেমন সঙ্গী নয়, তেমনি মঙ্গলার্থে যা' বলা হচ্ছে তাতে যে ব্যক্তি কর্ণপাত না করেন, তিনি প্রকৃত প্রভুও নন। প্রভু এবং কর্মচারীর মধ্যে যে দেশে মধুর সমন্বয় বিদ্যমান, সেই দেশেরই উন্নতি হয়ে থাকে···।')

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমাদের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দেরই ধারণা জন্মায় যে অহিংসার মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অতএব, অস্ত্রের ব্যবহার না করে, অহিংসার পথে যদি ব্রিটিশের মত একটি শক্তিকে বহিষ্কার করা যায়, তবে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে বিরাট অঙ্কের অর্থব্যয় করবার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই নেই। এই ধারনাটিই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তাঁদের পরিচালিত করতে থাকে। সুতরাং প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব অনেক কমে যায়, এবং তাদের অধিকাংশ প্রয়োজনের দাবীকেই বিলাস বলে মনে করা হয়। ১৯৫৮ সাল থেকেই আমাদের সীমান্ত বরাবর চীন নিজের সামরিক সংগঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। সেটা আবিষ্কৃত হবার পর যখন তাদের দুরভিসন্ধি বিরাট একটি বিপদের আকারে দেখা দিল, এবং সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রগুলি ও আচার্য কৃপালনী তথা রামসুভগ সিং এর মত বিচক্ষণ রাজনীতিকগণ সে সম্বন্ধে বারংবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন, তখনও আমাদের সরকার দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে ওঠার পরিবর্তে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতে থাকেন এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেন না। ফলে, আকার ও আয়তনের দিক থেকে ভারতীয় বাহিনী রয়ে যায় অপর্যাপ্ত এবং সেই সীমিত শক্তি নিয়ে ভারতের নিরপত্তারক্ষা ও বিপদের সম্যক

মোকাবিলা করবার সামর্থ্যও তাদের থাকে না। সংঘর্ষের জন্য আমাদের সেনাবাহিনী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তার কারণ হ'ল এই : প্রধান কারণ অবশ্য ছিল সমস্যাটির প্রতি সরকারের নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক আচরণ। সামরিক তৎপরতার দায়িত্ব অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার উপযুক্ত কোন প্রচেষ্টাই সরকার করেন নি। দুর্বল সেনাবাহিনীর অর্থই হ'ল দুর্বল দেশ; যে দেশকে সর্বদা নির্ভর করে থাকতে হয় আক্রমণকারীর দয়ার উপর। সন্দেহ হয়, এই তথ্যটি আমাদের সরকার আদৌ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি না। বস্তুতঃ, একদিকে যেমন স্থিরভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব নির্ণয় করতে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা উচিত ছিল সরকারের, অন্যদিকে তেমনই কর্তব্য ছিল সামরিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে তোলা। এ দু'টির কোনটিই তাঁরা করেন নি। যা' করছিলেন তা' ছিল শুধু বক্তৃতা এবং বিবৃতি প্রদান। শুধুমাত্র বক্তৃতা আর বিবৃতিই সমস্যা সমাধানের পথ নয়।

সম্পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে, এবং কারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ না করেই আমি বলব, এই অধ্যায়ের শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায় যে পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছি, তার জন্য দায়ী হলেন তিনটি ব্যক্তি : নেহ্রু, কৃষ্ণ মেনন এবং মোরারজী দেশাই। নেহ্রু, কারণ তিনি নেতা থাকতেও এই ব্যাপারগুলি ঘটতে দিয়েছিলেন; কৃষ্ণ মেনন, কারণ দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কতগুলি গুরুতর ব্যাপার এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি তিনি; এবং মোরারজী দেশাই, কারণ প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ তিনি মঞ্জুর করেন নি।

নিয়তির লিখন!

৫

'সম্মানই জীবন মোর,
একই দেহে জন্ম দু'জনার ;
সম্মান কাড়িয়া লও, জীবনের হবে অবসান।'

সেকস্‌পীয়র
রিচার্ড দি সেকেণ্ড

●

বেশ কয়েক বছর ধরে টানা ছুটি একেবারেই পাই নি। তাই অবকাশের প্রয়োজন বোধ করছিলাম তীব্র ভাবে। তা' ছাড়া, কন্যা অনুরাধাও অল্প কিছুদিন আগেই স্নায়বিক অবসন্নতায় ভুগে উঠেছিল। ডাক্তারেরাও তাকে পরিবেশ পরিবর্তন করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই সমস্ত কারণে ১৯৬২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে দু'মাসের ছুটির দরখাস্ত করলাম। থাপার রাজী হলেন, কিন্তু তিক্ত মন্তব্যসহ কৃষ্ণ মেনন আপত্তি করে বললেন, চীন ও পাকিস্তানের দিক থেকে যখন সমূহ বিপদের আশঙ্কা বর্তমান, সেই সময় আমি দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যেতে চাইছি দেখে তিনি অবাক হয়ে গেছেন।

মন্তব্যটি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে মনে হ'ল আমার। উপরোক্ত কারণ দু'টির জন্যই ছুটি চেয়েছিলাম। লিখিত জবাবে সে কথাটা জানিয়ে দিয়ে, সময়ের প্রসঙ্গে লিখলাম : 'খবর পেয়েছি তথাকথিত ওই একই গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে মেনন নিজে, এমন কি নেহ্‌রু এবং মোরারজী দেশাইও কয়েক সপ্তাহের জন্য ভারতের বাইরে যাবার কথা ভাবছেন। আরও স্মরণ করিয়ে দিলাম, আমি যাচ্ছি কাশ্মীর অবধিই। তাই আমার অনুপস্থিতিতে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। প্রয়োজন হলে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে কাজে যোগদানের জন্য ডেকে পাঠানো যেতে পারে।'

এরপর অবশ্য ছুটি মঞ্জুর করলেন মেনন। স্থির হ'ল, আমার সহকারী মেজর জেনারেল জে. এস. ধীলন অস্থায়ীভাবে আমার কার্যভার গ্রহণ করবেন।

৩রা সেপ্টেম্বর দিল্লী থেকে কাশ্মীর অভিমুখে রওনা হলাম। তখন কি জানতাম, মাত্র একদিনের জন্য ছাড়া আর কোনদিনই আমার বর্তমান

কাজে ফিরে আসতে পরবো না, এবং নিফায় এত শীঘ্র গোলযোগের সূত্রপাত হবে।

সপরিবারে গুলমার্গ, পহেলগাঁও, কুকারনাগ এবং অহরবাল-এ কিছুদিন কাটালাম। এত উপভোগ্য ছুটি কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অর্ধেক ছুটি কাটাবার পর স্থির করলাম, দু'এক দিনের জন্য দিল্লী যাব; তারপর অবশিষ্ট ছুটিটা কাটাব কুলুতে। ১লা অক্টোবর সেই মত আমরা বিমানযোগে দিল্লী ফিরে এলাম।

মেনন ও নেহ্‌রু ততদিনে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন, এবং নিফার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে অবিলম্বে ছুটি থেকে ডেকে পাঠাবার কথা চিন্তা করছিলেন। ২রা তারিখের সন্ধ্যাতেই থাপারের টেলিফোন পেয়ে জানলাম, পরের দিন সকালেই আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে।

তদনুসারে ৩রা তারিখে কাজে যোগদান করলাম। আমার কয়েক সপ্তাহের অনুপস্থিতিতে যা' যা' ঘটেছে তা' শুনলাম মেজর জেনারেল ধীলনের কাছ থেকে। পরে, নানা সরকারী সূত্র থেকে ঘটনাগুলিকে আমি পুনর্গঠিত করি। সেগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিস্তারিতভাবে এখানে বিবৃত করবো। (নিফা যুদ্ধের সমালোচকদের এই অংশটি মনোযোগের সঙ্গে পড়া প্রয়োজন।)

৮ই সেপ্টেম্বর

অবহেলিত সীমান্ত অঞ্চলে চীনা বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিফার নামকাচু নদীর দক্ষিণে (ভারত, ভূটান এবং তিব্বত সীমান্তের ত্রি-সংযোগ স্থলের অনতিদূরে) ঢোলা-য় [১] জুন মাসে আমরা একটি ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলাম। ঢোলা হ'ল থাগ্‌লার দক্ষিণে এবং আমাদের নিকটতম প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত তাওয়াং-এর ষাট মাইল পশ্চিমে। পক্ষান্তরে, চীনাদের সড়ক-পরিবহন গাড়ীগুলি থাগ্‌লার উত্তরে দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত লে পর্যন্ত আসতে পারত। এটা ছিল চীনাদের পক্ষে একটি বিশেষ সুবিধার ব্যাপার।

১। প্রধান সেনাপতির অধীনে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলীয় কমাণ্ডের ভার ছিল তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষের উপর। ঢোলা হ'ল নিফায়, এবং ১৯৬১ সাল থেকে নিফা পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যাধ্যক্ষ লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল সেনের অধীনে ছিল। তাঁর অধীনে আবার ছিলেন ৩৩নং কোরের কমাণ্ডার হিসাবে লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল উমরাও সিং এবং ৪নং ডিভিশনের কমাণ্ডার হিসাবে মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদ।

থাগ্‌লা-র উত্তরাঞ্চলের ভূখণ্ড ঢোলা-র দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় অধিকতর সমতল। সুতরাং, আমাদের ঢোলা পৌঁছবার চাইতে চীনাদের পক্ষে থাগ্‌লা অঞ্চলে প্রবেশ করা ছিল অনেক সহজ। থাগ্‌লা-র অনতিদূরে তারা প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছিল। পক্ষান্তরে, আমাদের সৈন্য সমাবেশ করতে হয় ঢোলা থেকে বেশ দূরে।

৯নং পঞ্জাব বাহিনীর অধিনায়ক লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল মিশ্র তাওয়াং-এর পশ্চিমে লুম্‌পু-তে বিকেল চারটের সময় আমাদের ঢোলা ঘাঁটির অধিনায়কের কাছ থেকে একটি সংবাদ পান। সংবাদে বলা হয়, কিছু সংখ্যক চীনা তাঁর ঘাঁটিটিকে ঘিরে ফেলেছে। যেভাবেই হোক ঘাঁটিটিকে রক্ষা করতে আদেশ দেওয়া হয় তাঁকে এবং বলা হয় শীঘ্রই সাহায্য পাঠানো হচ্ছে।

৯ই সেপ্টেম্বর

৯নং পঞ্জাব থেকে একটি টহলদারী দলকে ঢোলা-র আশে-পাশে চীনা-উপস্থিতির সঠিক স্থান এবং সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য পাঠানো হয়। পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতর থেকে আদেশ দেওয়া হয় 'ঢোলা-য় সন্নিবেশিত চীনাদের মোকাবিলা করবার জন্য ৭নং ব্রিগেড যেন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অগ্রসর হবার অবিলম্ব প্রস্তুতি করতে থাকে।'

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১/৯নং গোরখা রাইফেল্‌স্‌-এর সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কি না সে কথা পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতরের কাছে জানতে চায় ৩৩নং কোর। সদর দফতর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এই বলে যে, গোরখা রাইফেল্‌স্‌কে সেই দিন ওখান থেকে সরালে, তাদের দশহারা উৎসব (একটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান) পালনে হস্তক্ষেপ করা হবে।

১০ই সেপ্টেম্বর

দিল্লীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কক্ষে কৃষ্ণ মেননের সভাপতিত্বে একটি বৈঠকে থাগ্‌লা-র দক্ষিণে এবং ঢোলা-র আশে-পাশে ৮ই সেপ্টেম্বরের চীনা অনুপ্রবেশের আলোচনা হয়। প্রধান সেনাপতি জানান, একটি ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নকে ঢোলা ঘাঁটিতে পৌঁছবার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১১ই সেপ্টেম্বর

ঢোলা-র অনতিদূরে নামকাচু নদীর উপর অবস্থিত ১নং [২] সেতু থেকে ৯নং পঞ্জাব একটি সংবাদ পাঠিয়ে জানায়, ২নং সেতুর কাছে চীনারা উক্ত নদী পার হয়ে আমাদের দিকে চলে এসেছে, এবং ২ ও ৩নং সেতুর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ঢোলা-র দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেই দিনই নামকাচু নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত কারপোলা-২ এবং সাঙধর নামক দু'টি স্থান ঘুরে ঢোলা পরিদর্শনের জন্য ৯নং পঞ্জাবকে আরেকটি টহলদারী দল পাঠাতে আদেশ করে ৭নং ব্রিগেড।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ঘরে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে পূর্বাঞ্চলীয় জি. ও. সি. ইন্. সি. লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল সেন জানান, বর্তমান সংবাদ অনুসারে ঢোলা অঞ্চলে চীনারা প্রায় ৬০০ সৈন্য সমাবেশ করেছে, এবং তাদের সম্যক মোকাবিলা করতে আমাদের এক ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেড (প্রায় ৩,০০০ সৈন্য) সৈন্য চালনা করতে হবে। এই সৈন্য সমাবেশ করতে প্রায় দশ দিন লাগবে। আরও জানান, ব্রিগেডকে এই অভিযানের আদেশ তিনি ইতিমধ্যে প্রদান করেছেন।

আর কোন বাড়তি সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে কি না সে কথা সামরিক সদর দফতর জিজ্ঞাসা করে পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কাছে। পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সেই সময় একাধিক বিষয়ে গুরুতর ঘাটতি থাকলেও, এরকম কোন সাহায্য চাওয়া হয়েছিল কি না আমার জানা নেই।

১২ই সেপ্টেম্বর

লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল সেন ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে তেজপুরে লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল উমরাও সিং ও মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান, সরকার থাগ্‌লা শৈলশিরার দক্ষিণে ঢোলা-য় আমাদের এলাকা থেকে চীনাদের বিতাড়িত করবার আদেশ দিয়েছেন।

চতুর্থ ডিভিশন তদনুসারে ৭নং ব্রিগেডকে আদেশ দেয়, ৯নং পঞ্জাব রেজিমেণ্ট যেন লুম্‌পু-তে সমাবিষ্ট হয়ে ঢোলা-ঘাঁটি শত্রুমুক্ত করবার জন্য 'প্রস্তুত হয়ে থাকে'।

২। থাগ্‌লা-সাঙলে অঞ্চলে নামকাচু নদীর উপর অনেকগুলি সেতু রয়েছে। ১, ২, ৩, ৪নং কাঠের সেতু, এবং ৫নং সেতু। ঢোলা হ'ল ৩নং সেতুর কাছে।

৩৩নং কোরের অধিনায়ক লেফ্‌টনাণ্ট্ জেনারেল উমরাও সিং এবং চতুর্থ ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদ অবশ্য পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের জি. ও. সি. ইন্-সি. লেফ্‌টনাণ্ট্ জেনারেল সেনকে জানিয়ে দেন যে, থাগ্‌লা শৈলশিরার দক্ষিণাঞ্চল থেকে চীনাদের বিতাড়িত করা তাঁদের সৈন্যবাহিনীব সাধ্যাতীত। ঢোলা অঞ্চলে আমাদের রণসজ্জা চীনাদের তুলনায় ছিল অনেক প্রতিকূল। রাস্তা ও সৈন্য-সংখ্যার স্বল্পতার কারণে সরবরাহ দ্বাবা আমাদের শক্তিবৃদ্ধির ক্ষমতা ছিল সীমিত। অত্যধিক শীতের পক্ষে পোশাক-পরিচ্ছদও পর্যাপ্ত ছিল না। গোলা-বারুদের ঘাটতি ছাড়াও, মজুদ কোন রকমের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ছিল না বললেই চলে; এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যাও ছিল অপ্রচুর। (নিফায় কার্যভার গ্রহণের এক সপ্তাহ পরে ১১ই অক্টোবর তারিখে দিল্লীতে নেহ্‌রু, মেনন ও থাপারের কাছে আমি যখন এই অসুবিধাগুলির কথা পুনরুল্লেখ করি, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর মাত্র নয় দিন পবই চীনাদের আক্রমণ শুরু হয়।)

লেফ্‌টনাণ্ট্ জেনারেল উমরাও সিং পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডকে জানিয়ে দেন যে, থাগ্‌লা শৈলশিরার দক্ষিণের এলাকা থেকে চীনাদের বিতাড়িত করবার কোন বকম প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষে হঠকারিতার সামিল হবে। এই কাজের জন্য যে সঙ্গতির প্রয়োজন, তার শুধু বাহ্যিক কাঠামোটুকু বজায় রাখতে হলেও তাওয়াঙ ও নাগাভূমি থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে আমাদের। আরও বলেন, তাওয়াঙ হ'ল আমাদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান, এবং চীনাদের হাতে এটির পতন ঢোলা-র পতনের তুলনায় হবে অনেক বেশী সাংঘাতিক ফলাফলের কারণ। পবে ঠিক তাই হয়েছিল।

১৩ই সেপ্টেম্বর

জেনারেল থাপার একটি বৈঠকে মেননকে জানান যে ঢোলা ঘাঁটির কাছে (প্রায় ১,০০০ গজ দূরে) চীনাদের সৈন্য সংখ্যা, দুই দিন আগে লেফ্‌টনাণ্ট্ জেনারেল সেন বর্ণিত ৬০০ না হয়ে এখন মাত্র ৫০ অথবা ৬০ বলে জানা গেছে। সুতরাং তিনি সৈন্যাধ্যক্ষকে গোটা ব্রিগেডের সমাবেশের জন্য অপেক্ষা না করে, উপযুক্তবোধ করা মাত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঢোলা ঘাঁটিকে শত্রু-মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে ৯নং পঞ্জাব বাহিনী লুম্‌পু-তে সন্নিবিষ্ট হয়। ঢোলা-র দিকে অগ্রসর হবার সময় পথে চীনাদের সম্মুখীন হলে

কি করবেন সে কথা লেফ্‌টনাণ্ট্‌ কর্ণেল মিশ্র ব্রিগেডকে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁকে বলা হয়, সরকারের আদেশ অনুসারে সে ক্ষেত্রে চীনাদের 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে' (!) চলে যেতে রাজী করাতে হবে, ও আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া যেন গুলি ছোঁড়া না হয় এবং তাও মাত্র চীনারা যখন ৫০ গজের মধ্যে এসে পড়বে তখনই। রণাঙ্গনে আমার উপস্থিত হবার বহু পূর্বেকার ব্যাপার এটা, এবং এই আদেশের সঙ্গে আমার কিংবা থাপারের কোনপ্রকার সম্পর্ক ছিল না।

১৪ই সেপ্টেম্বর

সরকারকে প্রধান সেনাপতি স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমাদের সেনাবাহিনীর বহু দুর্বলতা রয়েছে, এবং এমত অবস্থায় নিফায় সশস্ত্র কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে লাদাকে তার এমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে যার মোকাবিলা করতে হয়তো ভারতীয় বাহিনী সমর্থ হবে না। বস্তুতঃ; মেনন ও থাপারের উপস্থিতিতেই একটি বৈঠকে লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল দৌলত সিং বলেন, লাদাকে চীনারা আক্রমণ করলে আমাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে (১৯৬২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তারা তাই করেছিল)। লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল সেন উক্ত বৈঠকে সাহস করে এমন কথাও বলেছিলেন যে, চীনারা সদলবলে নিফায় এলে তাদের সঙ্গে তিনি এঁটে উঠতে পারবেন না। (হাম-বড়াইয়ের জন্য সুবিদিত আমাদের দু'একজন জেনারেল, দৌলত আর সেনের এই অস্বস্তিকর কথাগুলি শুনলে, উভয়কেই পরাজিত মনোভাবাপন্ন বলে আখ্যা দিতেন।) সরকার অবশ্য ভেবেছিলেন, পরিণাম যাই হোক না কেন, এক জায়গায় চীনাদের অন্ততঃ শিক্ষা দেবার অথবা শিক্ষা দেবার মত ব্যবস্থা করবার (জনমত শান্ত করার জন্য ?) সময় এসে গেছে। কারণ, সীমান্ত অতিক্রমণ আর সহ্য করা যাচ্ছিল না, এবং কোন এক জায়গায় এর ছেদ টানা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতরের আদেশ অনুসারে ভোর চারটের সময় ৯নং পঞ্জাব বাহিনী লুম্‌পু ছেড়ে ঢোলা-র দিকে অগ্রসর হয়। পথে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, এবং প্রায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চ হাথুং লা-র ঠিক অপর পারে একটি বাঁশের কুটিরে ব্যাটেলিয়নটি রাতের পূর্বে গিয়ে পৌছয়।

[৮ই থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর অবধি ঢোলা ঘাঁটি থেকে ক্রমাগত খবর আসতে থাকে যে শত্রুরা ঘাঁটিটিকে ঘিরে ফেলেছে।]

১৫ই সেপ্টেম্বর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ঘরে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে থাগ্‌লা-র কাছে চীনাদের ঠেকিয়ে রাখার, এবং সম্ভব হলে, কারপো লা ও য়াম্‌লা-য় একটি করে ঘাঁটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৫ তারিখের সকাল সাড়ে আটটায় ৯নং পঞ্জাব বাহিনী ২নং সেতুতে উপস্থিত হয়ে দেখে নদীর দু' ধারে অবস্থিত চীনারা হিন্দীতে চীৎকার করে তাদের বলছে, 'তুম্ চলে যাও, ইয়ে জমিন্ হমারী হ্যয়, হিন্দী-চীনি ভাই ভাই' (তোমরা চলে যাও, এই জমি আমাদের; হিন্দী-চীনি ভাই ভাই)। আত্মরক্ষার্থ ছাড়া গুলি চালনার নির্দেশ ছিল না মিশ্রের। চীনারা পথ আটকে থাকলেও আসলে তাঁর সৈন্যরা চীনা-সৈন্যদের প্রতি গুলি চালায় নি। মিশ্র তাই কোন রকম যুদ্ধের প্ররোচনা না দিয়ে, একটি কোম্পানীকে ২নং সেতুর কাছে রেখে, একটি ঘোরা পথে ঢোলা-র দিকে এগিয়ে যান। পিছু নেবার কোন চেষ্টাই চীনারা করে নি। যাই হোক, ১৫ তারিখে বেলা একটায় ঢোলা (৩নং সেতু) পৌঁছে প্রায় পঞ্চাশজন চীনাকে নদীর অপর তীরে দেখতে পান। আমাদের ঘাঁটি কমাণ্ডারের ৮ই সেপ্টেম্বরের রিপোর্ট[৩] অনুযায়ী এই চীনারাই সেতুটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। (থাগ্‌লা-র দক্ষিণে আমাদের এলাকায় অবশ্য চীনারা এসেছিল।) লেফ্‌টনাণ্ট্‌ কর্ণেল মিশ্র উক্ত মর্মে ৭নং ব্রিগেডকে একটি বার্তা প্রেরণ করেন।

৯নং পঞ্জাব বাহিনী যাতে ঢোলা-র ১,০০০ গজ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত চীনা ঘাঁটিটি দখল করে এবং থাগ্‌লা-র দক্ষিণে তাদের ঠেকিয়ে রাখে, সেই মর্মে সামরিক সদর দফতর পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডকে আদেশ প্রদান করে। ৪নং ডিভিশন ৩৩নং কোরকে ১৫ই তারিখে একখানি চিঠি দিয়ে জানায়, ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের রিপোর্টে চীনাদের যে সংখ্যাকে পঞ্চাশ অথবা ষাট বলে বর্ণনা করে হয়েছিল, তা' বৃদ্ধি পেয়ে দু'টি কোম্পানীতে দাঁড়িয়েছে, এবং সেজন্য একটিমাত্র ব্যাটেলিয়ন নিয়ে তাদের উপর কোন আক্রমণ চালানো এখন আর সম্ভব নয়। চিঠিখানির একটি প্রতিলিপি সামরিক দফতরকেও প্রেরণ করা হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যাধ্যক্ষ

৩। ৮ই সেপ্টেম্বরের মন্তব্যও দ্রষ্টব্য।

লেফ্‌টনান্ট্‌ জেনারেল সেন জানান, ব্রিগেডটি সন্নিবেশ করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে (আগে তিনি যে দশ দিনের কথা বলেছিলেন, তা' ভুল প্রতিপন্ন হয়েছিল)। স্থির হয়, আত্মরক্ষামূলক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এবং চীনাদের ছোটখাট ঘাঁটিগুলি দখল করে নিয়ে অঞ্চলটিতে (থাগ্‌লা-র দক্ষিণস্থ) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৯ তারিখের মধ্যে থাগ্‌লা, য়াম্‌লা এবং কারপো লা-২ দখলকরে নেবার একটি আদেশ লেফ্‌টনান্ট্‌ কর্ণেল মিশ্র সরাসরি পান সামরিক সদর দফতর থেকে। মিশ্র-র ব্যাটেলিয়নটি ছিল মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদ-এর অধীনে, অথচ দিল্লীয় কর্তৃপক্ষ সরাসরি সেই ব্যাটেলিয়নের উপর আদেশ জারী করেছিলেন। নিরঞ্জন পেরসাদ তাই দিল্লীর এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ৩৩নং কোরের কাছে আপত্তি প্রকাশ করেন। ওই অত্যুচ্চ এলাকায় মিশ্র-র জওয়ানেরা ছ'দিন ধরে পেটপুরে খাবার পায়নি এবং গোলা-বারুদ, শ্রমিক এবং খচ্চরেরও ঘাটতি ছিল তাদের। সেই রাতেই সামরিক সদর দফতরের আদেশ অনুসারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার নির্দেশ মিশ্র পান ব্রিগেডের কাছ থেকে। ওই সময় এই সমস্ত আদেশ এবং প্রত্যাদেশ যথেষ্ট গোলমালের সৃষ্টি করে।

১৮ই সেপ্টেম্বর

এই সময় নাগাদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করেন। দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করেন, নিফায় আমাদের এলাকা থেকে চীনাদের বিতাড়িত[৪] করবার জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হয়েছে (এই কাজের উপযুক্ত সামর্থ্য এবং সঙ্গতি তাদের রয়েছে কিনা, সেটা বিবেচনা না করেই।) বস্তুতঃ তিনি কি বলতে চাইছিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির দায়িত্ব সরকারের নয়, সেনাবাহিনীর? (নতুবা, এই গোপনীয় ব্যাপারে প্রকাশ্য কোন বিবৃতি প্রদান করা তাঁর উচিত হয় নি।) ইতিমধ্যে থাগ্‌লা-র দক্ষিণে চীনারা এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য সমাবেশ করে ফেলেছিল।

৪। প্রায় চার সপ্তাহ পরে নেহরুও অনুরূপ একটি বিবৃতি প্রদান করেন। (৪১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিবৃতিগুলি কি জনসাধারণের সন্তুষ্টির জন্যই প্রদান করা হয়েছিল?

২০শে সেপ্টেম্বর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে প্রধান সেনাপতি বলেন, ২৪ তারিখে দ্বিতীয় ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ন এবং ২৯ তারিখে তৃতীয় ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ন যথাক্রমে ঢোলা অঞ্চলে পৌছবে। তার ফলে উল্লিখিত অঞ্চলে ব্রিগেড সমাবেশের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

ব্রিগেডিয়ার দল্‌ভি ঢোলা-য় পৌছে, সেই দিনই সকাল দশটায় ২নং সেতুতে ফিরে এসে থাগ্‌লা অঞ্চলটি দখল করার সম্ভাবনা নিয়ে মিশ্রের সঙ্গে আলোচনা করেন। অস্ত্রশস্ত্র, গুলি-গোলা, সরঞ্জাম এবং রসদের গুরুতর ঘাটতি নিয়ে এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের সাহায্যে কাজটি করা যে সম্ভব নয় সে বিষয়ে দল্‌ভি এবং মিশ্র উভয়েই সুনিশ্চিত হন।

সেই দিনই রাত ১০-৪০ মিনিটে জনৈক চীনা সান্ত্রী আমাদের একটি বাঙ্কারে হাতবোমা নিক্ষেপ করে তিন জনকে আহত করে। আহতদের একজন নিজের হাল্‌কা মেশিনগান থেকে শত্রুঘাঁটি লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষেপ করায় সেখান থেকে তার প্রত্যুত্তর আসে। এই পর্বের প্রথম গুলিচালনা তার পরেই উভয় পক্ষ থেকে শুরু হয়ে যায়। শত্রুপক্ষের দু'জন সান্ত্রী নিহত এবং দু'জন আহত হয়। ব্রিগেড মারফৎ ডিভিশনের আদেশ পেয়ে ৯নং পঞ্জাব বাহিনী এপার থেকে হিন্দীতে চীৎকার করে নিজেদের হতাহতদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বলে চীনাদের; এবং আশ্বাস দেয়, এই অপসারণের সময় আমাদের দিক থেকে কোন রকম গুলি নিক্ষেপ করা হবে না। সারাদিনের ভিতর তাদের তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না; কিন্তু ২১।২২ তারিখের রাতে চীনারা চীৎকার করে জানায় যে মৃতদেহগুলি সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা আসছে। ৯নং পঞ্জাব বাহিনী সেই অনুসারে অস্ত্র সংবরণের আদেশ দেয়। আসবার আগে আমাদের জওয়ানদের উদ্দেশ্য করে চীনারা আবার চীৎকার করে বলে: 'আমরা আসছি, গুলি চালিও না।' আমাদের সৈন্যেরা গুলি চালনা বন্ধ রাখে। এই সংঘর্ষের পূর্বে, ১৬ থেকে ২০ তারিখ অবাধ চীনারা আমাদের লক্ষ্য করে নিয়মিতভাবে চীৎকার করে বলেছে: 'হিন্দী চীনি ভাই ভাই। ইয়ে জমিন্ হমারী হয়। তুম্ ওয়াপস্ জাও।' (ভারতীয় এবং চীনারা ভাই ভাই। এ জমি আমাদের। তোমরা চলে যাও।)

২১ তারিখে দল্‌ভি তাঁর ব্রিগেডের সদর দফতর লুম্‌পুতেই স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত করেন। ঢোলা-র পথে দু'দিন হাঁটলে সেখানে পৌছান যায়।

২১শে সেপ্টেম্বর

৯নং পঞ্জাব বাহিনী ছিল ২নং সেতুর নিকট। তাদের জন্য লুম্‌পু থেকে চল্লিশ জন ভারবাহী মজদুরকে প্রত্যেকের সঙ্গে ৪০ পাউণ্ড করে খাদ্য-রসদ দিয়ে প্রেরণ করে ব্রিগেড। পথটুকু অতিক্রম করতে সাধারণতঃ দেড় দিন সময় লাগে। ভারবাহী দলটি সে জায়গায় সময় নেয় দ্বিগুণ। উপরন্তু ২নং সেতুতে যখন তারা পৌছয় তখন তাদের সঙ্গে কোন রসদ ছিল না বললেই চলে। হয় তারা পথেই সেগুলি খেয়ে ফেলেছিল, নয় তো ভারবহনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পথেই ফেলে দিয়েছিল।

২২শে সেপ্টেম্বর

মেনন সে সময় রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমেরিকায় ছিলেন। অস্থায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রঘুরামিয়ার কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে ঢোলা-য় প্রস্তাবিত সামরিক তৎপরতার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধান সেনাপতি জানান, আমাদের অনুমান অনুসারে চীনাদের সৈন্যসংখ্যা সাঙলে-তে (ঢোলা-র কাছে) রয়েছে এক কোম্পানী ; ঢোলা-র উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে এক কোম্পানী, এবং একটি কোম্পানী রয়েছে থাগ্‌লা গিরিপথে। ফলে, ঢোলা-য় তারা নিজেদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে, নিফার অন্য কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে, কিংবা লাদাকেও আমাদের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করতে পারে। খানিকটা আলোচনার পর সরকার স্থির করেন, নীতিগতভাবে ঢোলা অঞ্চল থেকে চীনাদের বহিষ্কৃত করা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। প্রধান সেনাপতি অতঃপর উক্ত অঞ্চল থেকে চীনাদের বহিষ্কৃত করবার সরকারী নির্দেশ লিখিতভাবে প্রার্থনা করেন। লিখিত নির্দেশ তাঁকে প্রদান করা হয়। (ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও বারংবার তাঁকে চীনাদের বিতাড়িত করবার কথা বলাতেই প্রধান সেনাপতি উক্ত মর্মে লিখিত নির্দেশটি প্রার্থনা করেন।)

২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর[৫]

এই সময়টিতে চীনা এবং ভারতীয় উভয় তরফ থেকেই মাঝে মাঝে

৫। ৭নং ব্রিগেডের অধিনায়ক (ব্রিগেডিয়ার দলভি) ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে চতুর্থ ডিভিশনের সদর দফতরকে জানান : (ক) ৫নং সেতু পার হয়ে সাঙলে অবধি একটি প্রধান

গুলিবর্ষণ চলে। ২৮ তারিখের সন্ধ্যায় আমাদের ২নং সেতুর নিকটস্থ ঘাঁটির উপর চীনারা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায় ও আমাদের তিন জন জওয়ানকে আহত করে। ২৯শে সেপ্টেম্বর রাত দুটোয় সেই প্রথম আমরা তিন ইঞ্চি মর্টার থেকে চার রাউণ্ড গোলা বর্ষণ করি। এর ফলে চীনাদের গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। পরের দিন চৌদ্দটি মৃতদেহ এবং কয়েকজন আহত সৈনিককে চীনাদের নিয়ে যেতে দেখা যায়।

চতুর্থ ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদ ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে লুম্‌পু পৌছান। ২৬ তারিখে তাঁর ঢোলা-র দিকে রওনা হবার কথা ছিল। কিন্তু 'কোর'-অধিনায়ক লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল উমরাও সিং-এর জন্য তাঁকে লুম্‌পুতে অপেক্ষা করতে বলা হয়। 'কোর'-অধিনায়ক ২৭ তারিখে এসে পৌছান লুম্‌পুতে এবং মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদকে (পুনরায়) জানান, সরকার স্থির করেছেন আমাদের এলাকা থেকে চীনাদের যথাশীঘ্র সম্ভব হঠাতেই হবে। কয়েকদিন পরেই তেজপুরে 'কোর' এবং 'ডিভিশন' অধিনায়কগণ পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বহুবিধ অসুবিধার কথা তুললে, সৈন্যাধ্যক্ষ (লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল সেন) সে সব কথায় কোন কর্ণপাতই করেন না।

২৯ তারিখে ২নং রাজপুত বাহিনীর একটি কোম্পানী ১নং সেতু এলাকায় উপস্থিত হয়, এবং তাদের ৯নং পঞ্জাব বাহিনীর অধীনে রাখা হয়। ২নং রাজপুত এবং ১/৯ গোর্খা বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ তখনও ঢোলা থেকে প্রায় দুই ধাপ পশ্চাতে লুম্‌পুতেই ছিল।

২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে নামকাচু নদীর উত্তরে সাঙলে-তে একটি টহলদারী দল পাঠানো হয়। ২রা অক্টোবর তারিখে ফিরে এসে তারা জানায় যে, নামকাচু নদীর অপর পারে ৫নং সেতুর কাছাকাছি শত্রুপক্ষের চিহ্নমাত্র নেই।

৩০শে সেপ্টেম্বর

লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল সেনের সংবাদ অনুযায়ী প্রধান সেনাপতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে জানান, থাগ্‌লা এলাকার ঢোলা ঘাঁটিতে

সেতুকেন্দ্র স্থাপন করে নামকাচু নদীর উত্তরস্থিত মুকসর এবং সিংজাং অধিকার করবার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর ; এবং (খ) অধিক উচ্চতায় সমাবেশ স্থাপন করার পূর্বে আমাদের সৈনিকদের অবশ্যই সেখানকার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হতে হবে।

চীনা সৈন্যের শক্তি হ'ল এক ব্যাটেলিয়ন। তিনি আরও জানান যে, 'অগ্রবর্তী এলাকায়' আমাদের তিনটি ব্যাটেলিয়ন সন্নিবিষ্ট হয়েছে (প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনটির ভিতরে দুইটিই তখনও ঢোলা-র অনেক পশ্চাতে ছিল।)

সরকারী নীতি ঘোষণা করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, শীতের আগে চীনারা নিফায় পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসবার আগেই তাদের প্রতি আঘাত হানতে হবে আমাদের। (যে দিক থেকেই আক্রমণ আসুক না কেন ভারত আত্মরক্ষায় সমর্থ বলে যেমন অতীতে বহুবার প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টাতেই কী উপরোক্ত 'অনমনীয় মনোভাব' দেখানো হয়েছিল? না, এটি ছিল জনমত শান্ত করবার প্রচেষ্টায় দ্ব্যর্থবোধক এবং বৈশিষ্ট্যসূচক একটি রাজনৈতিক বিবৃতি? অথবা, নিছক বাহাদুরি?)

ওই তারিখেই লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল উমরাও সিং, লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল সেনকে লেখেন:

(ক) আক্রমণ শুরু করার পূর্বে ৫৮০ টন গোলা-গুলি এবং রসদ সাঙধর-এ মজুদ করতে হবে। আক্রমণাত্মক কার্যচালনার পক্ষে বিমান থেকে নিক্ষেপ সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে এই স্থানটিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

(খ) অত্যন্ত বন্ধুর এবং সঙ্কীর্ণ নামকাচু উপত্যকাটি ঘন জঙ্গল এবং খাড়াইয়ে পরিপূর্ণ। নদীটিও একটি বিরাট বাধাস্বরূপ। আক্রমণ রচনার ক্ষেত্রও অত্যন্ত সীমিত। সেইজন্য, থাগ্‌লা গিরিপথের উপর সরাসরি কোন আক্রমণ করা আত্মঘাতী হবে।

(গ) আমাদের অসামরিক ভারবাহকেরা অপদার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(ঘ) এই অঞ্চলে (ঢোলা-র বহু পশ্চাতে) বে-সামরিক কুলী যা পাওয়া যাবে তা' তিনশ' থেকে পাঁচশ'র বেশী হবে না; এবং আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা' অত্যন্ত কম। স্থলপথে লুম্‌পু থেকে সাঙ্‌ধর-এ রসদ পাঠানো নিতান্তই অসম্ভব।

(ঙ) হতাহতদের সরানোর কাজটি হবে একটি প্রধান সমস্যা।

১লা অক্টোবর

(আমি ৪নং 'কোরে'র ভার গ্রহণ করবার তিন দিন পূর্বে) ৪ এবং ৫নং সেতুর মাঝামাঝি জায়গায় পারাপারের একটি সম্ভবপর স্থান খুঁজে বার করবার জন্য ৭নং ব্রিগেড ৯নং পঞ্জাব বাহিনীকে আদেশ দেয়। ৯নং পঞ্জাবের মেজর্

চৌধুরীর উপর এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ভার পড়ে। চৌধুরী সংবাদ দেন, ৪নং সেতুর অপর পারে কোন চীনা সৈন্য নেই। আরও জানান, কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় নদীর জল অনেক নেমে গেছে, এবং স্রোতও খুব কম। তা' ছাড়া অকুস্থলে রয়েছে প্রচুর গাছ। অতএব কাজ চালাবার মতো একটা কাঠের সেতু যেকোন স্থানে তৈরী করে নেওয়া কিছু কঠিন হবে না।

২রা অক্টোবর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে লেঃ জেনারেল সেন বলেন, খাগ্‌লা-র দক্ষিণে মোটামুটি এক ব্যাটেলিয়ন চীনা সৈন্য রয়েছে; এবং (চারটি) পার্বত্য কামান ও সংশ্লিষ্ট সৈন্যগণ ছাড়া (অগ্রবর্তী এলাকায়) আমাদের ৭নং ব্রিগেডের সমাবেশের কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আরও বলেন, ১০ই অক্টোবরের মধ্যেও তাঁর সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে না। (কাজটি ২১শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে পারবেন বলে প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন; পরে তারিখটি গিয়ে দাঁড়ায় ২৯শে সেপ্টেম্বর; আর এখন বললেন ১০ই অক্টেবেরের মধ্যেও সম্ভব হবে না।) সেনাবাহিনীর পূর্ব রিপোর্ট অনুযায়ী সাঙলে-তে যখন কোন চীনা সৈন্য নেই, তখন জায়গাটি এখনও কেন দখল করা হয় নি সে কথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে লেঃ জেনারেল সেন বলেন, কয়েকদিন পূর্বে তিনি 'কোর'-অধিনায়ক লেঃ জেনারেল উমরাও সিংকে এই বিষয়ে একটি লিখিত আদেশনামা পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু উমরাও সিং জানিয়েছেন যে রণকৌশলের দিক থেকে দখল করে রাখার মত একটা স্থান সাঙলে নয়। তা' ছাড়া সেটা করলে, চীনাদের কাছে আমাদের পরিকল্পনাও ফাঁস হয়ে যাবে। লেঃ জেনারেল সেনের কাছে একটি লিখিত বার্তায় লেঃ জেনারেল উমরাও সিং মন্তব্য করেন যে, বিশেষ কোন অঞ্চলে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা সম্বন্ধে লেঃ জেনারেল সেন অবশ্যই তাঁকে আদেশ করতে পারেন, কিন্তু বাহিনীর শক্তি নির্ধারণ করাটা তাঁর পক্ষে ঠিক হয় নি (সেন যা' করেছিলেন)। বার্তাটির একটি প্রতিলিপি উমরাও সিং সামরিক সদর দফতরেও প্রেরণ করেন। লেঃ জেনারেল সেন তাঁর কর্তৃত্বে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছেন এইটাই ছিল তাঁর প্রকৃত বক্তব্য। এই বৈঠকেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে লেঃ জেনারেল সেন বলেন, 'কোর'-কমাণ্ডকে অগ্রাহ্য করেই তিনি তাঁকে অবিলম্বে সাঙলে

অধিকার করতে আদেশ দিয়েছেন। (জেনারেল থাপার এবং লেঃ জেনারেল সেন উভয়েই লেঃ জেনারেল উমরাও সিংকে বদলী করার সিদ্ধান্ত নেন; কারণ, শেষোক্ত ব্যক্তিটির সঙ্গে লেঃ জেনারেল সেনের বনিবনা হচ্ছিল না।)

সেইদিনই লেঃ জেনারেল সেনকে সঙ্গে নিয়ে জেনারেল থাপার প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, এই প্রথম আমরা অতি সঙ্গত কারণেই চীনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছি; (এতদিন আমরা শুধু ফাঁকা জায়গাগুলিতে বিনা প্রতিরোধে অধিকার স্থাপন করে আসছিলাম) এবং এর একটা গুরুতর প্রতিক্রিয়া হবেই। নেহ্‌রু কিন্তু বলেন, নানা কারণেই তাঁর দৃঢ় ধারণা, চীনারা আমাদের বিরুদ্ধে কঠিন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।

২রা অক্টোবর তারিখ অবধি এইটাই ছিল নেহ্‌রুর (এবং মেননেরও) বিশ্বাস।

৩রা অক্টোবর

ছুটি থেকে ডেকে পাঠানোর পর পুনরায় চীফ্ অফ্ জেনারেল ষ্টাফ-রূপেই কাজে যোগদান করলাম। সেইদিন সন্ধ্যার পর সরকার এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল পি. এন. থাপার মিলে স্থির করেন, নতুন একটি (৪নং) 'কোর' গঠন করে আমাকে[৬] তার অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হবে। প্রধান সেনাপতি আমার আবাসে রাত প্রায় ন'টার সময় উক্ত সিদ্ধান্তের কথা আমায় জানান। তিনি আরও যে সমস্ত কথা বলেন, তা' মোটামুটি হ'ল, চীনের দিক থেকে বিপদাশঙ্কার মোকাবিলা করার জন্য একটি বিশেষ 'কোর' গঠন করে তোলা হচ্ছে। লেঃ জেনারেল উমরাও সিং-এর অধীনে ৩৩নং 'কোর' কেবলমাত্র পাকিস্তান এবং বৈরী নাগাদের ব্যাপারটিকেই সামলাবে। সাধারণতঃ 'কোর'-এর অধীনে যেখানে ছয় থেকে বারোটি ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেড থাকে সেখানে আপাততঃ আমার অধীনে এই 'কোর'-এ থাকবে মাত্র ৬,০০০ সৈন্য অথবা দু'টি (৫ এবং ৭নং) ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেড (পরে তৃতীয় আরেকটি

৬। ১৯শে অক্টোবর তারিখের "দি টাইম্‌' সংবাদপত্রে বলা হয় : 'সীমান্ত লঙ্ঘনকারী চীনাদের বিরুদ্ধে আমাদের তৎপরতা তীব্রতর করবার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি বিশেষ বাহিনীর অধিনায়করূপে পক্ষকাল পূর্বে নেহ্‌রু লেঃ জেনারেল কলকে নিযুক্ত করেছেন। স্যাণ্ডহার্স্টের দুর্ধর্ষ (স্নাতক)…কল-এর উপর নিফার ভারতীয় অঞ্চল শত্রুমুক্ত করবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।'

ব্রিগেড আমাকে দেবার সম্ভাবনা রয়েছে)। যে দু'টি ব্রিগেড আমাকে দেবার কথা ছিল, সে দু'টি তখন ছিল ৪নং ডিভিশনের অধীনে। অন্যান্য সংযোজনের সঙ্গে পরে আরেকটি ডিভিশন গঠন করে আমাকে দেবার কথা ছিল। তা' দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বড্ড দেরীতে।

নিফার প্রায় ৩৬০ মাইল দীর্ঘ একটি সীমান্তের দায়িত্ব এইভাবে দেওয়া হ'ল আমাকে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি পর্বে চতুর্দশ বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড্ মার্শাল স্লিম্ বর্মায় ৭০০ মাইল দীর্ঘ এক রণাঙ্গনের জন্য পেয়েছিলেন আঠারোটি ডিভিশন।) থাপার আরও বলেন, লাদাক থেকে নিফা অবধি সীমান্তে আমাদের উপর বিরাট দায়িত্বভার থাকা সত্ত্বেও আমার 'কোর'টি যথাসম্ভব শীঘ্র গঠন করে দেওয়া হবে। মেনন এবং থাপার উভয়েই আমাকে বলেন যে, ঢোলা-থাগ্লা অঞ্চল থেকে চীনাদের বিতাড়িত করাই হ'ল আমার কাজ।

নিয়মমাফিক সমস্ত সামরিক উপাদান ছাড়াও একটি 'কোর'-এ উপযুক্ত গোলন্দাজ বাহিনী, ইঞ্জিনীয়ার, পরিবহন এবং সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও থাকা দরকার। এ সমস্ত কিছুই আমার ছিল না; ছিল শুধু 'কালক্রমে সব কিছু গঠন করার' আশ্বাস। উল্লিখিত সংগঠনগুলি একত্রিত হলে তবেই একটি 'কোর' কাজ শুরু করতে পারে (রাতারাতি পারে না)। একটি কোর-হেডকোয়ার্টারকে গঠন করে এবং সামরিক তৎপরতা ও প্রশাসনিক কাজে উপযুক্ত করে তুলতে সাধারণতঃ সময় লাগে ছয় মাস থেকে এক বৎসর। প্রয়োজনীয় দল এবং সংগঠনগুলি পাবার পরও 'কোর'-কে রণদক্ষ করে তুলতে লাগে আরও ছ'মাস থেকে এক বছর (কিংবা আরও অধিক) সময়। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে যে 'কোর' দু'টি যুদ্ধ করেছিল, সে দু'টিকে গঠন করা হয় বহু বৎসর পূর্বে, এবং সামরিক তৎপরতায় উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হবার তারা প্রভূত সুযোগ পায়।) পক্ষান্তরে, এমন একটি 'কোরে'র অধিনায়কত্ব আমাকে দেওয়া হ'ল, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্বই বলতে গেলে ছিল না, এবং যার সদর দফতর তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভারতের এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্তে এই সমস্ত সুস্পষ্ট প্রতিবন্ধক নিয়ে কোন রকম বাদ-প্রতিবাদও করতে পারলাম না। তাই ভগবানের নাম স্মরণ করে স্থির

করলাম, ক্ষীণ সম্বলটুকুর সাহায্য নিয়ে আমার সাধ্যমত পরিস্থিতির সম্মুখীন হব।

থাপার অবশ্য বলেন, কোন কারণে এই পদ গ্রহণে আমার অনিচ্ছা থাকলে, সে কথাটা জানালেই তিনি আমাকে সি. জি. এস. পদে বহাল রাখবার ব্যবস্থা করবেন। উত্তরে বলি, রণাঙ্গনে অধিনায়কত্বের পদ, বিশেষতঃ এই সঙ্কটকালে, প্রত্যাখ্যান করবার কোন প্রশ্ন কোন কারণেই ওঠে না; এবং এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় আমি গর্বিত। শুনে, আমার করমর্দন করে শুভ-কামনা জানালেন থাপার। অতঃপর খানিকটা মিষ্ট কথা আদান-প্রদানের পর, আমার নতুন পদ প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে আমাকে দেখা করতে বললেন।

মেননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আসন্ন সামরিক অভিযানের ব্যাপারে আমার প্রতি নিজের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আশা প্রকাশ করলেন যে, আমাকে নিশ্চয়ই তিনি এমন একটি দায়িত্বভার দিচ্ছেন না যাতে সুনাম নেই। তারপর যথাশীঘ্র প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন আমায়। সেই রাতেই প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ নেহ্‌রুর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। অমায়িকভাবে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন নেহ্‌রু। নিফায় যাবার ব্যাপারটি আমার কেমন লাগছে তা'ও জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, এই কাজটির জন্য মনোনীত হওয়ায় আমি সুখী, কিন্তু একটি ব্যাপারে আমার আশঙ্কা রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে আমাদের বহুবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও, চীনাদের প্ররোচনায় পড়ে ঢোলা-র মত অস্বাভাবিক একটা জায়গায় ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়ে আমরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছি। শুনে নেহ্‌রু বললেন, ভারত চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে এবং বিরোধগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিল; কিন্তু কোন ফল হয় নি। আরও বললেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কয়েকজন উপদেষ্টার অভিমত তিনি সমর্থন করেন যে, ভারতীয় এলাকায় চীনা অনুপ্রবেশ আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনেক বেশী সহ্য করেছি, এবং এমন একটা সময় আজ এসে গেছে যখন, ফলাফলের[৭] কথা চিন্তা না করে দৃঢ় একটা নীতি আমাদের অবলম্বন করা, অথবা অবলম্বন করবার

৭। নেহ্‌রু আমার কাছে আগে যে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন, এটি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

হাবভাব দেখান দরকার। চীনারা ঢোলা-য় প্রবেশ করে নিফার উপর নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়; এবং সেটাকে আমাদের সর্ব সামর্থ্য প্রয়োগ করে বাধা দিতেই হবে। আশা করা যায়, ব্যাপারটির যুক্তিযুক্ততা অনুধাবন করে ঢোলা ত্যাগ করে চীনারা চলে যাবে। তা' যদি না যায়, তবে আমাদেব এলাকা থেকে তাদের বিতাড়িত করা, অথবা বিতাড়িত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা ব্যর্থ হলে সরকারের প্রতি জনসাধাণের বিন্দুমাত্র আস্থাও আর থাকবে না। অতঃপর আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নেহ্‌রু বললেন, গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাঁকে যেন আমি জানাই।

এই সময়ে জনমতও জেগে উঠেছিল, এবং নেহ্‌রু ও তাঁর সরকার সেজন্য গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। নইলে সীমান্ত অনুপ্রবেশের একাধিক ঘটনা অন্যত্র ঘটলেও, একমাত্র ঢোলা-য় চীনা অনুপ্রবেশের ঘটনাটির উপর এতখানি গুরুত্ব আমাদেব সরকার আবোপ করতেন না। এই ব্যাপারে নেহ্‌রু এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সামর্থ্য আমাদেব ছিল না, এবং নেহ্‌রুকে এই মনোভাব গ্রহণে প্রণোদিত করেছিলেন তাঁবই পররাষ্ট্র দফতরের এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ। এর জন্য তাঁদেরও অবশ্যই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

[আমি জানতাম, শান্তিব জন্যই নেহ্‌রু চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা কবছিলেন। এই শান্তির উদ্দেশ্য নিয়েই জানুয়ারী মাসে শাস্ত্রী পাকিস্তানের সঙ্গে তাসখন্দ্ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এই ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকেই নিজের নিজের প্রকাশ্য ঘোষণার বিরুদ্ধে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তবুও, শান্তির মহান্ স্রষ্টা হিসাবে শাস্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে সবাই, এবং নেহ্‌রুব সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে সারা দেশ। প্রকৃত ব্যাপার হ'ল, কংগ্রেস সিণ্ডিকেট এবং বিরোধীদল উভয় পক্ষেরই সহানুভূতি নেহ্‌রু হারিয়েছিলেন; ব চ, বিচক্ষণতা ও বিনয়বনতার জন্য ওই দুই পক্ষেরই সমর্থন লাভ কবেছিলেন শাস্ত্রী।

উদাহরণস্বরূপ, নিফাতে যখন থাগ্‌লা পার হয়ে চীনারা আমাদের এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে, সারা দেশ তখন নেহ্‌রুর (এবং মেননের) বিরুদ্ধে অসতর্কতার অভিযোগে হয়ে ওঠে সোচ্চার। অথচ আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও চীনারা যখন সেই

থাগ্‌লা পার হয়ে আগের বারের চাইতেও তিন মাইল বেশী ভিতরে ঢুকে হাথুং লা অবধি চলে আসে, তখন শাস্ত্রীর (অথবা চ্যবনের) বিরুদ্ধে একটি ক্ষীণ প্রতিবাদও শোনা যায় নি ; কারণ লোকসভা ও সংবাদপত্রের সম্ভাব্য বিরোধী কণ্ঠস্বরগুলিকে সুসম্বদ্ধ ভাবে শান্ত করা হয়েছিল।]

১৯৫৯ সাল থেকে যদি কয়েকজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নেহ্‌রুর বৈরিতা শুরু না করতেন, অর্থাৎ আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপযুক্ত শক্তিশালী হয়েছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে নেহ্‌রুকে চীনাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক[৮] ব্যবস্থা গ্রহণে প্ররোচিত না করতেন, এবং নেহ্‌রু যদি নিজের ইচ্ছা মত কাজ করতে পারতেন, তা'হলে আমার ধারণা, চীন ও ভারতের এই সংঘর্ষ আসত ১৯৬২ সালের পর। সে ক্ষেত্রে তার সম্যক মোকাবিলার জন্য ভারত আরও ভাল করে প্রস্তুত হতে পারত। আমার মনে হয়, অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের ওই ধরনের 'দৃঢ়তার' সমুচিত শাস্তি যে অত শীঘ্র এবং কত মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে সেটা কেউ-ই অনুমান করতে পারেন নি।

বাড়ী যখন ফিরে এলাম তখন প্রায় মাঝরাত। নতুন কমাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য পরের দিন সকালেই নিফা অভিমুখে আমাকে রওনা হতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে করণীয় অনেক টুকিটাকি কাজ তখনও বাকী। শেষ মুহূর্তের বাঁধা-ছাঁদাও করতে হবে। অথচ হাতে ছিল রাতের অবশিষ্ট মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়।

কোন কর্মীবর্গ আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি ; লোকজনও দেওয়া হয় নি কোন। তেজপুরেও কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। সুতরাং ভেবে দেখলাম, আন্‌কোরা নতুন একটি 'কোরে'র ভার নেবার আগে অন্ততঃ এখনকার মতো—এবং পরে যতদিন স্থায়ী কর্মীবর্গ আমাকে না দেওয়া হয় ততদিনের জন্য, বিশ্বস্ত কয়েকজন স্টাফ অফিসর সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হবে। (৩৩নং কোরের কাছ থেকে অবশ্য লোক নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তারা হবে আমার অপরিচিত।) প্রধান সেনাপতির সম্মতি নিয়ে এবং সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোতি সাগরের সঙ্গে পরামর্শ করে সেইটাই স্থির করলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার সঙ্গে নিফা অভিমুখে রওনা হবার

৮। মজার কথা এই যে, শাস্ত্রীর সময়ে অনুরূপ অনুপ্রবেশ সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তিরাই ভারত যেন 'ভুল' না করে বলে ওকালতি করতে থাকেন (!) ; কারণ, আমার মনে হয় ততদিনে তাঁরা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

জন্য প্রস্তুত হতে সংশ্লিষ্ট অফিসরদের মধ্যরাত এবং রাত দুটোর মধ্যে সতর্ক করে দেওয়া হ'ল। আমার সমস্ত প্রস্তুতি যখন শেষ হ'ল, পূব আকাশে তখন দেখা দিয়েছে উষার আভাস।

৪ঠা অক্টোবর

তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নিলাম। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুও আমায় বিদায় জানাতে এসেছিলেন। তাঁদের এবং আমার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পালাম থেকে বিমানযোগে রওনা হলাম নিয়তির উদ্দেশ্যে।

বিকেলে তেজপুরে নামলাম। লেঃ জেনারেল সেন এবং লেঃ জেনারেল উমরাও সিং বিমান বন্দরে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের সঙ্গে মোটরে করে উপস্থিত হলাম সার্কিট হাউসে। রাত কাটাবার ব্যবস্থা সেখানেই হয়েছিল। এ যাবৎ নিফার ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করছিলেন লেঃ জেনারেল উমরাও সিং। সম্বলের তুলনায় তাঁর তত্ত্বাবধানের এলাকাটি ছিল বিশাল।

'কোর' কমাণ্ডার হিসাবে আমার অধীনে মোট পদাতিক সেনাবাহিনী দেওয়া হ'ল ৪নং ডিভিশন; তারও আবার একটি ব্রিগেড কম ছিল। (তিন থেকে চারটি ডিভিশন নিয়েও একটি 'কোর' হতে পারে। ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাক সংঘর্ষের সময় তাই করা হয়েছিল।) আমাকে দেওয়া হয়েছিল বিশাল একটি অঞ্চলের দায়িত্বভার। অথচ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল অপ্রতুল, জঙ্গী বিমানের সাহায্য ছিল না, জরাজীর্ণ কতগুলি ট্যাঙ্ক ছাড়া সাঁজোয়া গাড়ীও ছিল না কোন রকম। তার উপর সৈন্য চলাচল, সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল শোচনীয়। তেজপুরে নামার অব্যবহিত পরেই ভগবানের নাম স্মরণ করে লেঃ জেনারেল সেন এবং লেঃ জেনারেল উমরাও সিং-এর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলাম। ৭নং ব্রিগেডকে ঢোলা অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট করার জন্য এযাবৎ যা' যা' করা হয়েছে, সে সমস্ত শুনলাম তাঁদের কাছে। দিল্লীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈঠকে লেঃ জেনারেল সেন বলেছিলেন, ২৯ তারিখের মধ্যেই আমাদের তিনটি ব্যাটেলিয়নকে অগ্রবর্তী এলাকায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। আসলে কিন্তু ৪ঠা অক্টোবর তারিখেও একটি মাত্র ব্যাটেলিয়ন এবং আরেকটির খানিকটা অংশ মাত্র ঢোলা-য় ছিল। অন্যগুলির অধিকাংশই তখনও পড়ে ছিল ঢোলা থেকে প্রায় পনের মাইল পশ্চিমে লুম্‌পু-তে। কুলীর অভাবে ভূমিপরে সৈন্য চলাচল ও রসদ সরবরাহের

ব্যবস্থাও পরিকল্পনার চাইতে পিছিয়েছিল অনেকখানি। কারণ ওই উচ্চতায় কুলী ছাড়া পরিবহনের আর কোন উপায় নেই; এবং কুলীর সংখ্যাও আমাদের ছিল খুবই কম। সীমান্ত সড়ক সংস্থার কাছ থেকে হাজার কুলী আনিয়ে নিলাম, এবং সরকারকেও সে কথা জানিয়ে দিলাম। অনুরূপ আরও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পর আশা হ'ল, ৯ই অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত ঢোলা অঞ্চলে ৭নং বিগ্রেডকে হয়তো জমায়েত করা যাবে। সৈন্য-সমাবেশের জন্য আমার এই ব্যস্ততার কারণ ছিল ঃ

(ক) সামরিক শক্তির দিক থেকে চীনাদের সঙ্গে আমাদের বহু অসমকক্ষতা সত্ত্বেও ঢোলা-র ভারতীয় অঞ্চল থেকে তাদের বিতাড়িত করতে হলে, শক্রদের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি আমাদের সৈন্য সমাবেশ করে ফেলতে হবে।

(খ) ঢোলা-য় অচিরেই বরফ পড়া শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং প্রয়োজনীয় এলাকায় সৈন্য সমাবেশে এখনও বিলম্ব করলে আবহাওয়াই আমাদের পরিকল্পিত সামরিক তৎপরতার বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

সরকারের কাছে আমি সরাসরি বার্তা প্রেরণ করতাম বলে অনেকে ইঙ্গিত করেছেন। সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভুল। বার্তা আমি যা' পাঠিয়েছি তা' কেবলমাত্র পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল সেনের কাছে (এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে বার্তাগুলির প্রতিলিপি প্রেরণ করেছি প্রধান সেনাপতি জেনারেল থাপারের কাছে)। তেজপুরে ৪ঠা অক্টোবর তারিখের প্রথম বৈঠকের পর পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড (সেনের কাছে) এবং সামরিক সদর দফতরে (থাপারের কাছে) একটি বার্তা পাঠিয়ে জানাই, আমার আশঙ্কা তাওয়াঙ দখল করার মতলবে শক্ররা আমাদের সাঙ্‌ধর-ঢোলা অংশে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কয়েকদিন পরে ঘটেও ঠিক তাই।

ব্রিগেডিয়ার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কোন অফিসর এযাবৎ 'সাঙধর-ঢোলা-নামকাচু'-র মতো সু-উচ্চ এবং ভয়ঙ্কর পার্বত্য অঞ্চলে পদার্পণ করেন নি। তাই ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যায় তেজপুরে পৌছিয়েই স্থির করলাম, পরদিন সকালেই ঢোলা-য় গিয়ে, যে ভূখণ্ডে আমাদের অভিযান পরিচালনা করতে হবে সেটি এবং অগ্রবর্তী রণাঙ্গনে আমাদের সৈন্যদের মনোবল স্বচক্ষে পরিদর্শন করে আসবো। (আমার 'কোর' তখনও একত্রিত হচ্ছিল, এই সফরে লাগত মাত্র সাত দিন সময়।)

সৈন্য-চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তথা সৈন্য বাহিনীর সমাবেশ সম্পর্কিত আদেশাদি দেওয়া শেষ করতে করতে মধ্যরাত অতিবাহিত হয়ে গেল। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ঢোলা-র পথে যাত্রা করতে হবে। তাই একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

৫ই অক্টোবর

লেঃ জেনারেল সেন ও লেঃ জেনারেল উমরাও সিং তেজপুর বিমান বন্দরে আমায় বিদায় জানালেন। সকাল ছ'টার সময় বিমানযোগে ভূটান সীমান্তের দাররাঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করলাম। সঙ্গে রইলেন লেঃ কর্ণেল সঞ্জীব রাও। আমার 'কোরে'র সমাবেশ হতে তখনও কয়েকদিন লাগবার কথা। তাই ব্রিগেডিয়ার কে. কে. সিং, মেজর মালহোত্রা এবং অধীনস্থ আরও দু'একজন অফিসরকে পরদিন আমার পিছু পিছু আসতে বললাম, যাতে যে অঞ্চলে আমাদের তৎপরতা চালাতে হবে সেটিকে স্বচক্ষে দেখে এবং মূল্যায়ন করে যথাকালে উদ্ভূত সমস্যাগুলির বাস্তবোচিত মোকাবিলা করতে পারেন। ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদকেও জিমিন্‌থাং-এ আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে ঢোলা-য় যাবার কথা বললাম। (আমাদের অনুপস্থিতিতে সৈন্য-চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাদির জন্য সদর দফতরে প্রশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসর ব্রিগেডিয়ার কে. ডি পছ্‌নন্দা এবং আরও কয়েকজনকে রেখে গেলাম।)

দাররাঙ্গা-তে বিমান বদল করে একটি হেলিকপ্টার নেওয়া হ'ল। এখানকার তথা-কথিত বিমান অবতরণ ক্ষেত্রটিতে দেখলাম বিমানে পেট্রল ঢালবার সেই আদিম পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এর ফলে আমার সময়-সূচীতে বেশ কয়েক ঘণ্টার বিলম্ব ঘটে গেল। অবশেষে সেই অপরাহ্ণেই জিমিন্‌থাং-এ অবতরণ করলাম। লাসা থেকে থিন্‌জামানে হয়ে তাওয়াঙ-এর ভিতর দিয়ে ভারতে আসবার প্রাচীন বাণিজ্য-পথের উপর প্রায় ৬,০০০ ফিট উচ্চতায় এই ছোট্ট গ্রামটি অবস্থিত। সেখানে পৌঁছে গুপ্তচর সংস্থার জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'ল। ঢোলা অঞ্চলে আমাদের বিরুদ্ধে সন্নিবেশিত চীনা সৈন্যের সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে কিছু তথ্যাদি পাওয়া গেল। আমাদের সৈন্যবল তথা চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার পরিপ্রেক্ষিতে

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড এবং সামরিক সদর দফতরে যে বার্তা পাঠাই তাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ ছিল :

(ক) থাগ্‌লা অঞ্চলে চীনারা ইতিমধ্যেই অন্ততঃপক্ষে এক ব্রিগেড সৈন্য সমাবেশ করে ফেলেছে।

(খ) এই অঞ্চলে চীনাদের কামান ও ভারী মর্টার ছাড়াও প্রতিক্ষেপ বিহীন (recoil-less) আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।

(গ) (আমাদের নগণ্য এবং শত্রুপক্ষের অনেক উন্নততর সমর-সম্ভারের পরিপ্রেক্ষিতে) শত্রুসৈন্য কর্তৃক আমাদের সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হবার আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিতে পারছি না।

(ঘ) এই অবস্থার দ্রুত প্রতিকার না করলে আমাদের একটা জাতীয় বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে (যে অবস্থার মধ্যে আমাদের ও চীনাদের আপেক্ষিক শক্তির বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই আমরা ভুল করে এসে পড়েছি)।

(ঙ) অতএব, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আক্রমণাত্মক বিমান সাহায্যের প্রস্তাব করছি (হয়তো দ্বিমুখী অস্ত্রের মতো হবে এটা। তবু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই)। বিমানগুলিকে অবিলম্বে এমন স্থানে সন্নিবেশিত করতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় সংবাদ দেওয়া মাত্র তাদের সাহায্য পাওয়া যায়।

[১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা শুরু করবার পূর্বেই আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রচুর পরিমাণে আক্রমণাত্মক বিমান সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে উক্ত সাহায্য আমাকে দেওয়া হবে কি না তাই নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন অবধি।]

বিকেলের দিকে আবহাওয়ার অবনতি ঘটায় আমাদের হেলিকপ্টার পরবর্তী অবতরণক্ষেত্র সিরখিম্ পর্যন্ত যেতে পারল না। সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য তাই লুম্‌পু-র দিকেই রওনা হলাম। ওদিককার আবহাওয়াও পরিষ্কার ছিল। ৭নং ব্রিগেড, ২নং রাজপুত এবং ১/৯ নং গোরখা বাহিনীর হেড-কোয়ার্টারের অধিকাংশই তাদের মালপত্র বহন করবার জন্য কুলীর অপেক্ষায় ছিল। পরদিনই ঢোলা অঞ্চলে যাত্রা করবার আদেশ দিলাম তাদের ; রসদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র যথাসত্বর পরে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি বলে কথা দিলাম।

ব্যাটেলিয়নগুলি অবিলম্বে সামনের দিকে এগিয়ে না গেলে ঢোলা অঞ্চলে আমাদের চাইতে তাড়াতাড়ি শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশের আশঙ্কা ছাড়াও আমাদের গন্তব্যপথের সমস্ত গিরিবর্ত্মগুলির বরফে বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা

ছিল। সেক্ষেত্রে ছ'মাস কিংবা তারও বেশী সময়ের জন্য সমস্ত রকম সামরিক তৎপরতা হয়ে পড়বে অসম্ভব। পূর্বেই বলেছি, এই অবস্থা আমাদের পক্ষে হবে খুবই ক্ষতিকর। পরদিন ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদ-এর সঙ্গে দেখা হতে উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলির কথা তাঁকে জানিয়ে দিলাম।

খিন্‌জামানে থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে জিমিন্‌থাং-এ গুপ্তচর সংস্থার পূর্বোক্ত কর্মচারীটির সঙ্গে একটি কুঁড়ে ঘরে রাত অতিবাহিত করলাম।

৬ই অক্টোবর

সেদিন খুব ভোরে মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদ (এরপর থেকে এঁকে এন. পি. বলেই অভিহিত করবো) ও লেঃ কর্ণেল রাওকে সঙ্গে নিয়ে একটি হেলিকপ্টার যোগে ৯,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত সিরখিম্ পর্যন্ত গেলাম। তারপর পাক-দণ্ডী পথে প্রায় দু' ঘণ্টা চড়াইয়ে হাঁটবার পর উপস্থিত হলাম প্রায় ১০,৫০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত 'দলদল' নামক স্থানে। এখানে প্রায় আধ মাইল ধরে জলকাদায় পরিপূর্ণ একটি স্থানের ভিতর দিয়ে যেতে হ'ল। মাটি এত নরম যে আমাদের পা অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি কাদায় ডুবে যেতে লাগল। ফলে অগ্রসর হওয়া হয়ে পড়ল অত্যন্ত কষ্টকর। এইভাবে হাথুং লা'র তলায় ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরে এসে পৌছলাম। এখান থেকে ঘণ্টা তিনেক ধরে ক্রমাগত উপরে উঠে অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় ১৫,০০০ ফিট উঁচু এই গিরিপথের মাথায় এসে পৌছন গেল। খুঁটিতে বাঁধা বৌদ্ধ পতাকাগুলি দেখলাম যথারীতি ঝোড়ো হাওয়ায় পত্‌পত্ করে উড়ছে। অশুভ আত্মাকে বিতাড়িত করবার প্রতীক হিসাবে এগুলি ব্যবহার করা হয়। (হায়! আমাদের বেলায় পতাকাগুলি ব্যর্থ হয়েছিল)। খাড়া একটা উতরাই অতিক্রম করবার পর পিচ্ছিল পাথরে-ভর্তি নালা ও অত্যন্ত বন্ধুর খানিকটা পাহাড়ী অঞ্চল পেরিয়ে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ১০,০০৯ ফিট উচ্চে অবস্থিত নামকাচু নদীর ১নং সেতুতে উপস্থিত হলাম। ২নং রাজপুত বাহিনীর একটি কোম্পানী এই সেতুটি রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। এখান থেকে একটি পথ চলে গেছে খিন্‌জামানে অবধি। আর একটি রাস্তা মাঝপথ থেকে বেরিয়ে চলে গেছে থাগ্‌লা পর্যন্ত।

মনে পড়ছে, সেই রাতেই এন. পি. আমাকে বলেন, সেই বছরেরই আগস্ট

মাসের প্রথম দিকে (ঢোলা-য় চীনা অনুপ্রবেশের মাসাধিক কাল পূর্বে) তিনি ৩৩নং কোরের কাছে থাগ্‌লা শৈলশিরা অধিকার করবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতর (লেঃ জেনারেল সেন) সে অনুমতি তাঁকে দেন নি। এন. পি.-র বক্তব্য ছিল, থাগ্‌লা শৈলশিরা হ'ল আমাদেরই এলাকা এবং তখন পর্যন্ত চীনারা সেখানে আসে নি। শৈলশিরাটি সেই সময়েই অধিকার করলে সেপ্টেম্বর মাসে চীনারা কখনই ঢোলা-য় আসতে পারত না। আরও বলেন, মাত্র দু'দিন আগে তাওয়াঙ-এ সেন তাঁকে বলেছেন : '(যথাযথ উদ্ধৃত করা হ'ল) আপনাদের কোর কমাণ্ডারকে (উমরাও সিং-কে) আমি বরখাস্ত করেছি এবং নতুন একজন কোর কমাণ্ডার (কল) এবার আপনারা পাবেন। ৭নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেড যদি দ্রুত অগ্রসর না হয় তা' হলে কী হবে বুঝতেই পারছেন।' ঢোলা-র আশেপাশে ৭নং ব্রিগেডকে সন্নিবেশিত করতে কতদিন লাগবে সে সম্বন্ধে লেঃ জেনারেল সেন দিল্লীর উচ্চমহলের বৈঠকগুলিতে বিভিন্ন তারিখের উল্লেখ করেছিলেন (২৯শে সেপ্টেম্বর, ৫ই অক্টোবর এবং ১০ই অক্টোবর) বলে এন. পি. বিস্মিত হন। কারণ, তিনি বরাবরই এই ব্যাপারে বিভিন্ন অসুবিধাগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন।

১নং সেতুতে লেঃ কর্ণেল মিশ্রর সঙ্গে দেখা হ'ল। চারপাশের ভূ-সংস্থান এবং বিপরীত দিকে অবস্থিত সুউচ্চ থাগ্‌লা-র উপর চীনাদের সৈন্য-সংস্থান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে তিনি অবহিত করলেন আমাদের। ইতিমধ্যে চীনাদের সামরিক শক্তি এক ব্রিগেডে পরিণত হয়েছিল। সে কথা এবং তাদের গতিবিধি সম্বন্ধেও বহু তথ্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল। গত কয়েকদিন ধরে চীনাদের গতিবিধির সঙ্গে বেশ ভালো করে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

৭ই অক্টোবর

প্রাতরাশের পর ২নং সেতুতে উপস্থিত হলাম। ৯নং পঞ্জাব বাহিনী সেতুটি রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল। ব্যাটেলিয়নটির সর্বস্তরের সৈনিকদেরই মনোবল দেখলাম অটুট রয়েছে। নিজেদের জন্য চমৎকার মোর্চাও তৈরী করে নিয়েছে তারা। এখান থেকে দুর্গম পার্বত্য পথে খানিকটা হাঁটবার পর পৌছলাম ঢোলা-য়। ঢোলা-র অপর নাম হল সে ডোং। ৭নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জন পরশোতম দল্‌ভি আমার ঠিক আগেই এখানে

এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁর সঙ্গে, এবং ২নং রাজপুত বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল রিখ ও ১/৯ গোর্খা বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল আহলুওয়ালিয়া-র সঙ্গে দেখা হ'ল। ৯নং পঞ্জাব বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মিশ্র ১নং সেতু থেকে আমার সঙ্গেই এসেছিলেন। এখান থেকেই পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড ও সামরিক সদর দফতরে একটি বার্তা পাঠালাম। বার্তাটির সারমর্ম নীচে দেওয়া হ'ল:

(ক) এখানকার যা' অবস্থা, তাতে এ লড়াইকে 'সুউচ্চ অঞ্চলে জঙ্গলযুদ্ধ' বলা যেতে পারে।

(খ) ৫নং সেতুটি আমরা বিনা বাধায় দখল করেছি, এবং কাঠের অস্থায়ী সেতুটিতে এক প্লেটুন সৈন্য মোতায়েন করেছি।

(গ) 'সাঙলে'-ও আমরা অধিকার করেছি বিনা বাধায়।

আরও কয়েক ঘণ্টা ধরে কখনও চড়াই, কখনও উতরাই পথে হাঁটবার পর সেই দিনই বেলা তুটোর সময় ৩নং সেতু থেকে ৩০০ গজ দূরে অবস্থিত ঢোলা চৌকিতে উপস্থিত হলাম। ১২,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত এই চৌকিটির ১,৫০০ গজ দূরেই অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে শত্রুপক্ষ নিজেদের প্রধান সৈন্য-সংস্থান করেছিল। আশেপাশের কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গে ইতস্ততঃভাবে দেখা যাচ্ছিল সদ্য তুষারপাতের চিহ্ন।

সব দেখেশুনে প্রথমেই মনে হ'ল নানা কারণে ঢোলা অঞ্চলটি উপযুক্ত নয়; এবং সামরিক তৎপরতার উদ্দেশ্যে (আত্মরক্ষামূলক অথবা আক্রমণাত্মক যাই হোক না কেন) লেঃ জেনারেল সেন অথবা ব্রিগেডিয়ার দল্‌ভির এই স্থানটি নির্বাচন করা মোটেই উচিত হয় নি। আমার ধারণার কারণ ছিল এই:

(i) নিকৃষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এই অঞ্চলের প্রবেশপথগুলি তুর্গম ও অসন্তোষজনক। তাই স্থানটি অগম্য।

(ii) নিজেদের এবং শত্রুপক্ষের কয়েকটি ঘাঁটির উপর আমাদের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আশানুরূপ না হওয়ার জন্য, এলোপাথারি গুলি চালনার আশঙ্কা ছিল।

(iii) নিকৃষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আমাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সৈন্য চালনা করা সম্ভব ছিল না।

(iv) আমাদের অবস্থানের ঠিক সম্মুখেই কঠিন বাধাস্বরূপ একটি দুর্বার স্রোতধারা বইবার ফলে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল।

লেঃ জেনারেল্ সেনকে সরকার ঢোলা অঞ্চল থেকে চীনাদের বিতাড়িত করবার এবং সেই উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানে সৈন্য সমাবেশের কথা বলে থাকলেও, আলোচ্য অঞ্চলে বূ্যহ রচনা, ভূ-সংস্থান এবং অন্যান্য বিষয়ের অসুবিধাগুলির কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা তথা অনুকূল কোন অবস্থান থেকে চীনাদের মোকাবিলা করা তাঁর উচিত ছিল।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল শত্রুপক্ষ থাগ্‌লা শৈলশিরা বরাবর আমাদের নাকের ডগায় বিরাট সংখ্যায় এবং উন্নত ধরনের সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত সেনাবিন্যাস করেছে। পক্ষান্তরে আমাদের সৈনিকদের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জামেব ছিল একান্ত অভাব। আমি অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবার পূর্বেই অন্যদের দ্বারা নির্বাচিত আমাদের এই অবস্থানটি ছিল নীচুতে পাতা বিপজ্জনক একটি ফাঁদের মতো। বস্তুতঃ, সর্বত্রই চীনারা ছিল আমাদের মাথার উপরে।

পরে পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতর এবং সামরিক সদর দফতরে জানাই যে:

(ক) বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত আমাদের অধিকাংশ রসদ, গোলা-গুলি এবং শীতবস্ত্রগুলি এমন স্থানে পড়ছে, যেখানে যাওয়াই যায় না।

(খ) ২নং রাজপুত ও ১/৯নং গোরখা বাহিনীর হাতে রয়েছে মাত্র তিন দিনের রেশন এবং মাথা পিছু পঞ্চাশ রাউণ্ড করে ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি। আমাদের মর্টার এবং সংশ্লিষ্ট গোলা-বারুদ এখনও লুম্‌পু ও এই স্থানের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে রয়েছে।

(গ) শীত বস্ত্রের অভাবে[৯] উক্ত দু'টি বাহিনীর সৈনিকগণ ১৫,০০০ ফিট উচ্চতায় গ্রীষ্মকালীন পোষাক আর একটিমাত্র কম্বল নিয়ে রাত কাটাচ্ছে। (বুটেরও ঘাটতি আমাদের ছিল অনেক।)[১০]

৯। পরিস্থিতিব গুরুত্ব বিবেচনা করে লেঃ জেনারেল সেনের উচিত ছিল তাঁর কমাণ্ডের অধীনস্থ অন্যান্য ডিপো থেকে গোলা-গুলি, রেশন ও বস্ত্রাদি দ্রুত সরবরাহের এমন জরুরী ব্যবস্থা করা যাতে জিনিসগুলি ঢোলা এলাকায় যথাসময়ে পৌঁছে যায়।

১০। বুটের অভাব আমাদের বরাবরই ছিল, কারণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বুট তৈরীর ব্যাপারে আগাগোড়া আপত্তি ছিল মেননের।

(ঘ) অসামরিক কুলীর নিদারুণ অভাব এবং বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র সঠিক স্থানে না পড়ার দরুন সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা দ্রুত গড়ে তুলতে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

(ঙ) সীমান্তসড়ক সংস্থার যে সমস্ত কুলীদের এই কাজে নিযুক্ত করতে মনস্থ করেছি, তারা ছড়িয়ে রয়েছে ২০০ মাইল এলাকায়। তাই তাদের পৌঁছতে এখনও কিছুদিন বিলম্ব হবে।

(চ) বিমান থেকে নিক্ষেপ সরবরাহের জন্য অবিলম্বে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আরও বিমান দেওয়া হোক।

(ছ) আদেশ মতো আমাদের এলাকা থেকে চীনাদের বিতাড়িত করবার জন্য (বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও) আমি সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

(জ) প্রাথমিক পর্যায়ে যে স্থানই আমরা অধিকার করি না কেন, চীনারা তাদের উন্নততর সমর সম্ভারের সাহায্যে সেখান থেকে আমাদের হটিয়ে দিতে পারে।

৭।৮ অক্টোবর তারিখের রাতটি আমরা ঢোলা-য় অতিবাহিত করলাম। পরবর্তী কয়েকদিনে বিভিন্ন যে সমস্ত সামরিক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে সেগুলি নিয়ে অনেক রাত অবধি আলোচনা হ'ল।

৮ই অক্টোবর

সে রাতে একেবারেই ঘুম হ'ল না। অস্থিরভাবে রাতটুকু কাটিয়ে ভোর বেলাতেই পায়ে হেঁটে প্রায় আধমাইল দূরবর্তী, ১২,৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত ৪নং সেতুতে[১১] চলে এলাম। পথটুকু অতিক্রম করতে ঠিক ত্রিশ মিনিটের একটু বেশী সময় লাগল। এখানে ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নগুলির, ব্রিগেডের ও ডিভিশনের অধিনায়কদের সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ আলোচনা হ'ল। এই জটিল পরিস্থিতিতে একসঙ্গে বসে পরিকল্পনা রচনা, পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা এবং সমবেতভাবে কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই এই বৈঠকে বসা হয়েছিল। একত্রে কতকগুলি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হ'ল।

১১। এই স্থানে ছিল ৭নং ব্রিগেডের সদর দফতর। ২নং রাজপুত ও ১/৯নং গোরখা বাহিনী, ৩ ও ৪নং সেতুর মাঝামাঝি জায়গায় ছড়িয়ে ছিল।

আলোচনার মধ্যে আমরা মগ্ন রয়েছি, এমন সময় চীনারা প্রায় ৪০০ গজ দূর হ'তে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে এক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করল। হয় আমাদের ভয় দেখানো, নয়তো কোনপ্রকার হঠকারী কাজে প্ররোচিত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। যাই হোক, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ওই একবার মাত্র গর্জনের পর আর কিছুই ঘটলো না। পুনরায় আমাদের আলোচনা বৈঠক শুরু হ'ল।

১৯৬২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখেই ৭নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার দল্‌ভি, ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের কাছে দাখিল করা একটি সামরিক মূল্যায়নে বলেছিলেন, সাঙলে-তে একটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপিত করে ঢোলা-র বাম পার্শ্ব থেকে আক্রমণ চালানো সম্ভব। অবশ্য এর জন্য প্রথমেই সাঙলে-কে সুদৃঢ় করে তুলতে হবে। ঢোলা এলাকায় ৭নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডের সমাবেশ ত্বরান্বিত করার জন্য পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড ৩৩নং 'কোর'কে আদেশ প্রদান করে। ৩৩নং 'কোর' আবার ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনকে (লেঃ জেনারেল সেনের চাপ দেবার ফলে) আদেশ দেয় ৭নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডের সমাবেশের তারিখ যেন ৫ই অক্টোবর, ১৯৬২ থেকে আর পিছিয়ে না যায়।

আমার ওখানে যাবার পূর্বেই ৮ তারিখে ব্রিগেডিয়ার দল্‌ভি নামকাচু নদীর উত্তরে আমাদের এলাকাভুক্ত সেঙ-জোঙ অঞ্চলে এক কোম্পানী মতো সৈন্য প্রেরণ করে কোন রকম বাধা না আসলে স্থানটি দখল করে নেবার একটা প্রস্তাব করেছিলেন। নিম্নলিখিত কারণে উক্ত প্রস্তাব আমি সমর্থন করি :

(ক) রঙ্গমঞ্চে আমার অবতরণের পূর্বেই আমাদের সৈন্যেরা নামকাচু নদীর উত্তরে গিয়ে সাঙলে অধিকার করে নিয়েছিল।

(খ) আমরা তখন সেঙ-জোঙ দখল না করলে, কয়েক দিন পরেই চীনারা স্থানটি দখল করতো (স্থানটি আমরা দখল করবার আগে থেকেই এ ধরনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল), এবং কাঠের সেতুর কাছে আমাদের সৈন্য-ব্যূহের অবস্থা হয়ে পড়ত সঙ্কটজনক।

(গ) আমার কার্যভার গ্রহণের ছ' দিন পূর্বে ৭নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডের অধিনায়ক তাঁর ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাবে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর সৈন্যেরা নদী পার হয়ে সেঙ-জোঙ অধিকার করবে। (উক্ত আদেশ আমি প্রদান করেছিলাম বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে)। নির্দেশটি আমি বাতিল

করতে চাইলেও, তখন আর তা' করবার উপায় ছিল না; কারণ ৮ তারিখে যখন ওখানে পৌছই, তখন আমাদের সৈন্যদল ব্রিগেড অধিনায়কের আদেশে সেঙ-জোঙ অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে।

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড ও সামরিক সদর দফতরের কাছে পরে এই মর্মে একটি বার্তা পাঠাই:

(i) বিনা বাধায় সেঙ-জোঙ দখল করা হয়েছে। মনে হয় চীনাদের সুরক্ষিত শক্তি কেন্দ্র প্রায় ১৪,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত থাগ্‌লা ও য়ুম-সো লা'র মধ্যে ৩,৫০০ গজ স্থান জুড়ে রয়েছে। ফলে ঢোলা ও ৪নং সেতুতে আমাদের ঘাঁটিগুলির উপর আধিপত্য করার অধিক সুযোগ রয়েছে তাদের।

(ii) শত্রুরা এই অঞ্চলে গভীর পরিখা খনন করেছে, এবং বামে সেঙ-জোঙ-কারপো লা এবং দক্ষিণে ১নং সেতু—খিন্‌জামানে-র দিক থেকে আমাদের সম্ভাব্য অগ্রগমন আগলাবার জন্য তাদের প্রধান প্রতিরক্ষা ঘাঁটি-গুলি ছাড়াও একাধিক নকল বিকল্প ঘাঁটি নির্মাণ করেছে।

(iii) রেশনের স্বল্পতা হেতু সর্বস্তরের সৈনিককেই পরবর্তী আদেশ না পাওয়া অবধি খাদ্য সংযমের কথা বলেছি।

আজ হ'ল দশহরা উৎসব!

৯ই অক্টোবর

সামরিক সদর দফতর থেকে প্রেরিত একটি বার্তায় আমাকে জানানো হ'ল, বিশ্বস্ত সূত্রে তাঁরা খবর পেয়েছেন ৩০০ মর্টার ও কামান নিয়ে শত্রুর একটি দলকে সোনা-জোঙ'এর কাছে আমাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেছে, এবং তাওয়াঙ-এর উপর চীনারা আক্রমণ চালাতে পারে। এর উত্তরে বললাম, আমার যে শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে তা' নিয়ে এই রণাঙ্গনের তীব্র অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হওয়াই আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে প্রায় অসম্ভব। সুতরাং আশা করি উক্ত আক্রমণের মোকাবিলা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা সামরিক সদর দফতরই করবেন।

৪নং সেতুতে আমাদের ব্যূহ সংস্থান ঘুরে ঘুরে দেখলাম এবং সাধারণভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিলাম। এতে ব্রিগেডিয়ার দল্‌ভি যে কত খুশি হয়েছেন সে কথা জানালেন। এর আগে কোন জেনারেল অফিসার

এতখানি কষ্ট করে এখানে আসেন নি। আমিই ছিলাম প্রথম। সে কথা উল্লেখ করে দল্‌ভি আরও বললেন, তিনি এবং তাঁর সৈন্তেরা সকলেই বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের অসুবিধাগুলির প্রতি আমি কতখানি সহানুভূতিশীল।

আমাদের কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন করে লক্ষ্য করলাম, নদীর ওপারেই চীনাদের সৈন্য সংস্থান আমাদের তুলনায় অনেক বেশী সন্তোষজনক। কথাটা বলতে বাধ্য হলাম দল্‌ভিকে। লেঃ কর্ণেল ডি. এস. রাও এবং আরও অনেকে আমার এই মন্তব্য শুনতে পেয়েছিলেন। দল্‌ভির সৈন্য সন্নিবেশের স্থানগুলি সুনির্বাচিত হয় নি। শত্রুকে প্রতারিত করবার কৌশলও সন্তোষজনক ছিল না। আশ্রয়স্থল এবং বাঙ্কারগুলি শত্রুর কামান ও মর্টারের তীব্র গোলাবর্ষণ সহ্য করবার পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এছাড়া, একমাত্র ৯নং পঞ্জাব বাহিনী ব্যতীত আর বিশেষ কারোই অঞ্চলটি সম্বন্ধে সম্যক কোন ধারণা ছিল না। কারণ সবে তারা এসে পৌঁছেছিল সেখানে। লক্ষ্য করলাম, দল্‌ভি আমার মন্তব্যগুলি পছন্দ করলেন না। কিন্তু প্রবীণ সেনানায়ক হিসাবে যে দোষ-ত্রুটি-গুলি আমার নজরে পড়ছে, বিশেষতঃ অগ্রবর্তী রণাঙ্গনে, সেগুলি দেখিয়ে দেওয়াই আমার কর্তব্য। ভুল-ভ্রান্তি দেখেও পিঠ চাপড়াবার জন্য আমি সেখানে যাই নি। আমার বিশ্বাস, কেবলমাত্র দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য কোন কমাণ্ড গঠিত হয় না। প্রবীণ অফিসরেরা পুতুল অথবা ডাকঘর হিসাবে বসে থাকতে পারেন না শুধু। মানুষের জীবন যখন বিপন্ন, সেই সঙ্কট-কালে প্রদত্ত নির্দেশগুলি কখনোই অফিসের ফাইলের মতো গতানুগতিক চালে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারে না। সময়ের গুরুত্বই যেখানে প্রধান, সেখানে ত্বড়িৎগতিতে কাজ করা হ'ল অত্যাবশ্যক। (১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শনের জন্য বহু অধীনস্থ অফিসরকে অধিনায়কত্ব থেকে তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করেছিলেন।)

সেই দিন অপরাহ্ণে সমস্ত অফিসর ও জে. সি. ও.-দের কাছে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণে আমাদের দায়িত্বের গুরুত্ব এবং সেই দায়িত্বপালনে তাঁদের যোগ্যতার প্রতি আমার অকুণ্ঠ বিশ্বাসের কথা বিশেষভাবে বললাম। তাঁদের সকলকেই বেশ প্রফুল্ল মনে হ'ল।

আমার প্রতি প্রধান সেনাপতি এবং ভারত সরকারের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে সেই দিনই সন্ধ্যায় জেনারেল থাপারের কাছ থেকে একটি সরকারী বার্তা পেলাম।

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড ও সামরিক সদর দফতরে একটি বার্তা পাঠিয়ে আমাদের সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতি সমান তালে চালাবার জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জামের নিক্ষেপ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিমানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানালাম।

সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর এন. পি. এবং আমি নিজেদের বাঙ্কারে ফিরে এলাম। পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতরে পাঠাবার জন্য একটি জরুরী বার্তার নির্দেশ দিলাম লেঃ কর্ণেল রাও-কে। সমস্তদিন ধরে কুচকাওয়াজ করে ব্রিগেডিয়ার কে. কে. সিং এবং মেজর তিলক মালহোত্রা এই মাত্র ৪নং সেতুতে এসে পৌছলেন। স্থির করলাম, এইবার একটু গড়িয়ে নিতে হবে। কয়েক মিনিট হ'ল সবে একটু আরাম করে শুয়েছি, এমন সময় আমাদের বাঙ্কারের কাছেই প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণের শব্দ হ'ল। রহস্য ছলেই হোক অথবা আমাদের হঠকারিতায় প্ররোচিত করবার আর একটা প্রচেষ্টা হিসাবেই হোক, চীনারা আমাদের লক্ষ্য করে একটি হাতবোমা নিক্ষেপ করেছিল। এন. পি. মন্তব্য করলেন, এরকম অগ্রবর্তী এলাকায় এবং এত উচ্চতায় বেশী দিন ধরে থাকা আমার মতো অতি উচ্চপদস্থ একজন অফিসরের পক্ষে সমীচীন নয়। চীনারা আকস্মিক ভাবেই হোক কিংবা দুরভিসন্ধিমূলক ভাবেই হোক দু' দু'বার প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং আমার ব্যক্তিগত নিরপত্তার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই অঞ্চল থেকে আমার এই মুহূর্তে চলে যাওয়া উচিত। তাঁকে বোঝালাম, বিপদাশঙ্কা যতই থাকুক না কেন, এই অবস্থায় এখান থেকে চলে গেলে জওয়ানেরা আমাকে ভুল বুঝবে; বিশেষ করে যখন জওয়ানদের সঙ্গে এই ধরনের পরিস্থিতির অংশীদার হওয়াই আমার এখানে আসার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। বললাম, আর একদিন থাকার পর আমি ফিরে যাবার কথা বিবেচনা করবো।

১০ই অক্টোবর

এই অঞ্চলে খুব তাড়াতাড়ি দিনের আলো ফুটে ওঠে। পরিচারক যখন চায়ের জল গরম করতে শুরু করেছে এবং আমি প্রস্তুত হচ্ছি, তখন ভোর প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। ৪নং সেতুর ঠিক উপরে আমার বাঙ্কারের পাশে একটা গাছের ডালে আয়নাটা ঝুলিয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করেছি, এমন সময় নদীর ওপার থেকে প্রচণ্ড গুলি-বর্ষণের শব্দ শোনা গেল। বাঙ্কার থেকে

এন. পি. ছুটে বেরিয়ে এসে ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল চীনারা নামকাচু নদীর উত্তরে ঢোলা-র অনতিদূরে সেঙ-জোঙ'এর কাছে ৯নং পঞ্জাব বাহিনীর নিয়মমাফিক প্রাতঃকালীন টহলদারী দলটির উপর গুলিবর্ষণ করেছে। দ্রুত ক্ষৌর কর্ম শেষ করে এন. পি.-কে সঙ্গে নিয়ে ৪নং সেতুর কাছে রাস্তায় নেমে এলাম। ২নং রাজপুত বাহিনীকে দ্রুত এগিয়ে যেতে দেখলাম কাঠের সেতুটির দিকে। আগের দিন তাদের উক্ত স্থান এবং সেঙ-জোঙ দখল করতে বলা হয়েছিল। আমাদের পক্ষে সেই সময় পরিস্থিতিটি একটু ঘোরালো হয়েই দাঁড়াল। গত কয়েকদিন ধরে ব্রিগেডের অধিকাংশ ব্যক্তিকেই স্বল্প রেশন দেওয়া হচ্ছিল। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের স্বল্পতা ছাড়াও আমাদের জওয়ানদের বুট ও শীতবস্ত্রের ছিল দারুণ অভাব। এই শীতে ও এত উচ্চতায় ধূসর সবুজ রঙের পোষাক (গরম কালের) পরে থাকার ফলে অনেকেই ভুগছিল নিউমোনিয়ায়। সাঙধর-এর আমাদের নিক্ষেপ সরবরাহের এলাকাটি ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ফলে রেশনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীগুলি এমন জায়গায় পড়ছিল যেখানে যাওয়া অসম্ভব।

১, ২ ও ৩নং সেতুতে আমাদের কোন মাঝারি মেসিনগান ছিল না। ৪নং সেতুতে ছিল মাত্র দু'টি। পরে অবশ্য আরও চারটি মাঝারি মেশিনগান আসে। কিন্তু গুলির পরিমাণ যা পাওয়া যায় তাতে সাধারণ হারে চালালেও আধ ঘণ্টারও কম সময় বড় জোর চলে। রাইফেল পিছু ৫০ রাউণ্ড এবং হাল্কা মেশিনগান পিছু ৫০০ রাউণ্ড করে মাত্র গুলি ছিল আমাদের কাছে। ৩ ইঞ্চির মর্টারের সংখ্যা ছিল ২নং সেতুতে দু'টি এবং ৪নং সেতুতে দু'টি ; এবং সাঙধর-এ ছিল দু'টি অক্ষত এবং দু'টি ভাঙ্গা ৭৫ এম. এম. কামান। অস্ত্রশস্ত্র এবং লোকবলের দিক থেকে চীনারা ছিল আমাদের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী।

সেঙ-জোঙ'এ আমাদের প্রায় ৫০ জন জওয়ান বেশ সুবিধাজনক একটি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে অবস্থান করছিল। প্রায় ৫০০ জনের একটি চীনা ব্যাটেলিয়ন প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে ঘাঁটিটির উপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়, এবং আমাদের জওয়ানেরা একের পর এক চীনা আক্রমণের ঢেউ প্রতিহত করে। সেঙ-জোঙ'এ ঠিক উপরে কারপো লা-২'তে ৯নং পঞ্জাব বাহিনীর একটি অংশ চীনাদের অগোচরে একটি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন

করেছিল। ওই উঁচু জায়গা থেকে তারা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে বহু শত্রুসৈন্য হতাহত করলো। আমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর চৌধুরী হাতে সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে সঙ্কল্প করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর কমাণ্ডিং অফিসর লেঃ কর্ণেল মিশ্রের কাছে ৪নং সেতু থেকে মেশিনগান এবং মর্টার আক্রমণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মিশ্র এই কথা ব্রিগেডিয়ার দল্‌ভিকে জানালে, দল্‌ভি বলেন, ৪নং সেতু অঞ্চল থেকে তিনি যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। প্রার্থিত সাহায্য সম্বন্ধে তিনি একমত হন না। কারণ তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল মর্টার অথবা মেশিনগানের গুলি ৪নং সেতু থেকে চীনাদের পাল্লা অবধি পৌছবে না ; এবং এতে উন্নততর সমর-সম্ভারে সজ্জিত চীনাদের কাছ থেকে কেবলমাত্র তীব্রতর প্রতিশোধমূলক প্রতি-আক্রমণই আসবে। (এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলা হয় নি, বলবার কথাও নয়। তবু অনেকের বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াসের উত্তরেই বলছি, এই ব্যাপারে আমি কোন আদেশই প্রদান করি নি।)

মেজর মালহোত্রার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এমন সময় এই এলাকার ভারপ্রাপ্ত ২নং রাজপুত বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসর লেঃ কর্ণেল রিখ্‌ চীৎকার করে আমাকে সাবধান করে দিলেন : 'একটু আড়ালেই থাকবেন স্যার।' নিজে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একেবারে খোলা জায়গায়। নদীর অপর পারেই সেঙ-জোঙ থেকে ভেসে আসছিল যুদ্ধের কোলাহল। আমাদের লোকজন সবাই ছুটে যাচ্ছিল যে যার নিজের মোর্চার দিকে।

সেদিন সকালেই কিছুক্ষণ পর চীনারা আবার পুনর্গঠিত হয়ে মর্টারের সাহায্যে সেঙ-জোঙ এলাকায় তিন দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করল। খানিকক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি লড়াই। কয়েক ঘণ্টা পর ব্রিগেড অধিনায়ক আমাদের কোম্পানীকে নদীর দক্ষিণ পারে সরে আসবার আদেশ দিলেন। সেই অনুসারে নদীর ভিতর দিয়ে হেঁটে (কাঠের সেতুটির পতনের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায়) আমাদের জওয়ানেরা সরে এল ৫নং সেতুর দিকে। আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ জন নিহত, ১১ জন আহত ও ৫ জন নিখোঁজ। পিকিং বেতার থেকে চীনাদের হতাহতের সংখ্যা প্রায় ১০০ বলে ঘোষণা করা হয়।

এই প্রথম চীনের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ হ'ল। এর আগে যা'

হয়েছে, তা' কেবল ইতস্ততঃ সংঘর্ষ। সুতরাং যুদ্ধ প্রথম শুরু করে চীন[১২], ভারত নয়। আমরা কেবলমাত্র বিনা বাধায় নামকাচু নদীর উত্তরে আমাদেরই এলাকাভুক্ত সেঙ-জোঙ অধিকার করেছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ এলাকায় একটিমাত্র ঘাঁটিও যদি অধিকার করবার সামর্থ্য আমাদের থাকতো, তা' হলে ঢোলা-র পরিবর্তে থাগ্‌লা দখল করাই ছিল কর্তব্য। (১৯৬২ সালের জুলাই মাসেই এই প্রস্তাবটি ৩৩নং 'কোর' করেছিল পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কাছে, কিন্তু সেন সেটিকে অগ্রাহ্য করেন।) বিশেষ করে ঢোলা-র উত্তর থেকে থাগ্‌লা-র দক্ষিণ পর্যন্ত অঞ্চলটি যখন ছিল আমাদেরই।

সেদিন সকালের যুদ্ধে দু'টি জিনিস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। প্রথম, চীনাদের উন্নততর সমর-সম্ভার, এবং দ্বিতীয়, ঢোলা এলাকার খাঁজের মধ্যে আমাদের ঘাঁটিগুলির অবস্থানের দরুন সেগুলি রক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এমত অবস্থায় এ অঞ্চল থেকে চীনাদের 'বহিষ্কার' করবার জন্য আমাদের উপর যাতে চাপ না দেওয়া হয়, সেজন্য দিল্লী গিয়ে সামরিক সদর দফতর ও সরকারকে অনুরোধ করতে ডিভিশনের অধিনায়কও আমাকে পরামর্শ দিলেন। কাজটি সত্যিই ছিল আমাদের সামর্থ্যের অতীত। বরং শত্রুর তুলনায় অধিকতর সুবিধাজনক কোন স্থানে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানোই হ'ত যুক্তিযুক্ত। দল্‌ভিও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করলেন। ডিভিশন ও ব্রিগেড অধিনায়কের অভিমত মেনে নিয়ে এন. পি.-কে বললাম, আমি দিল্লী থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত চীনাদের বিতাড়িত করবার আদেশটি স্থগিত থাকবে; এবং ততদিন আমাদের বর্তমান ঘাঁটিগুলিই শুধু রক্ষা করতে হবে।

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড এবং সামরিক সদর দফতরের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করে জানালাম, সেঙ-জোঙ এবং সাধারণভাবে আমাদের এলাকায় সেদিন একটি গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে (চীনারা এই প্রথম আমাদের উপর একটি বড় রকমের আক্রমণ চালিয়েছে); এবং আমাদের চাইতে চীনাদের হতাহতের সংখ্যা অধিক হলেও সেই মাপকাঠিতে পরিস্থিতির বিচার করা হবে বিরাট একটি ভুল।

আমার অনুমান মতো চীনারা এপর্যন্ত ৭নং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে এক ডিভিশন সৈন্য নিয়োগ করেছে। গত দু'দিনে থাগ্‌লা পার হয়ে প্রায় দুই

১২। আমার কাছে লেখা চেস্টার বোলজের পূর্বলিখিত পত্রটি দ্রষ্টব্য।

ব্যাটেলিয়ন চীনা সৈন্যকে ৩ ও ৪নং সেতুর দিকে আমি নিজেই আসতে দেখেছি। বার্তাটিতে তাওয়াঙ অঞ্চলে ঘনায়মান বিপদের কথাও উল্লেখ করে দিল্লী গিয়ে প্রধান সেনাপতি ও সরকারের কাছে এখানকার পরিস্থিতির একটি হাল বিবরণী দাখিল করবারও প্রস্তাব করলাম।

সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের বিপজ্জনক অবস্থার গুরুত্ব বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম এবার। কয়েকটি বিষয়ও বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের স্থান নির্বাচনে হয়েছিল ভুল।[১৩] আপ্রাণ চেষ্টা করেও ৭নং ব্রিগেডের জন্য এই অঞ্চলে সময়মতো সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করতে পারি নি। এছাড়া, এমন কতগুলি অসুবিধা ছিল যেগুলি অবিলম্বে দূর করা ছিল অসম্ভব। সব কিছু ভালোভাবে চিন্তা করে আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল, এই রণাঙ্গনে আমাদের অবস্থা পুনর্বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

আমার বার্তার জবাবে সামরিক সদর দফতর অবিলম্বে আমায় দিল্লী ডেকে পাঠালেন।

সেঙ-জোঙে'র যুদ্ধকে ব্যাটেলিয়ন অথবা ব্রিগেডের যুদ্ধ বলা চলে। ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের অধিনায়ক এবং আমি ৭নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডের সদর দফতরের কাছাকাছি থাকলেও তাদের কাজ-কর্মে কোনরকম হস্তক্ষেপ করি নি। সেঙ-জোঙ'এ আমাদের কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কারণ সম্পূর্ণ অঞ্চল জুড়েই আমাদের লোকবল ছিল কম। অতীতের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অঞ্চলটি আমরা এই ভরসায় অধিকার করেছিলাম যে, আমাদের অধিকৃত অঞ্চলটুকু আমাদেরই থাকবে, এবং তা' নিয়ে কেউ কোন আপত্তি করবে না।

৪নং সেতু থেকে মাঝারি মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে সেঙ-জোঙ'এ আমাদের জওয়ানদের কোন সাহায্য আমরা করতে পারি নি; কারণ মাঝারি মেশিনগানের পাল্লা অতদূর পৌছত না এবং গুলিও ছিল কম। তা' ছাড়া আমাদের তৎকালীন বহু অসুবিধা এবং ঘাটতির কথা চিন্তা করে ৪নং ডিভিশন ও ৭নং ব্রিগেডের অধিনায়কগণ কিংবা আমি, কেউই যুদ্ধ বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলাম না।

১৩। এলাকাটি নির্বাচন করেছিলেন অন্য ব্যক্তিরা; আমি এই 'কোরে'র অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবার অনেক আগে।

যাই হোক, অধীনস্থ কয়েকজন অফিসরকে সঙ্গে নিয়ে ঢোলা থেকে আবার পিছন দিকে যাত্রা করলাম। তারপর দুর্গম অঞ্চলটি পায়ে হেঁটে হাথুং লা-র সুকঠিন চড়াইয়ে আরোহণ করলাম আর একবার। গিরিপথটির ঠিক আগে সেই কুঁড়ে ঘরটির কাছাকাছি পৌছতেই অন্ধকার হয়ে গেল। সুতরাং রাতটুকু সেইখানেই কাটানো স্থির হ'ল।

এখানেই হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা অনুভূত হ'ল আমার। রাতের সঙ্গে সঙ্গে যত শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে লাগল, ততই বেশী হতে লাগল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট। ব্যথাটাও হয়ে উঠল তীব্রতর। মনে হ'ল শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। অবশেষে সঙ্গীরা প্রায় ৬,০০০ ফিট নীচের ১নং সেতু থেকে একজন মেডিকেল অফিসরকে আনতে লোক পাঠালেন। রাত প্রায় দশটার সময় সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বেচারী ডাক্তার খাড়াই ভেঙে উঠে এলেন উপরে। কিন্তু রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না কোন। সারারাত এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোতে পারলাম না।

১১ই অক্টোবর

উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়লাম। এখানে থাকলে ঠাণ্ডা আর রোগের প্রকোপেই মারা পড়ব। আবার এই অসুস্থ অবস্থায় এগিয়ে যাবার অর্থই হ'ল বিরাট একটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। তবু, ব্যথা খুব বেশী থাকা সত্ত্বেও ভোর চারটে নাগাদ পুনরায় এগিয়ে চলাই স্থির করলাম। বস্তুতঃ আমাকে বহন করেই হাথুং লা-র শীর্ষদেশে নিয়ে যাওয়া হ'ল। শরীরের অবস্থা একটু ভালো মনে হতেই বলতে গেলে একরকম দৌড়েই দলদল (কর্দমপূর্ণ অঞ্চলটি) হয়ে সিরখিম-এ নেমে এলাম। কার্যসূচী যাতে এদিক-ওদিক না হয় সেই জন্যই উৎকণ্ঠা ছিল আমার বেশী। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে তেজপুর নিয়ে যাবার জন্য সিরখিম-এ একটি হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিল। জ্বরভাব হওয়া সত্ত্বেও গরম জলে স্নান করে নিলাম। অনেকদিন স্নান করা হয় নি। তাই স্নানের প্রয়োজনও বোধ করছিলাম খুব। অনেকদিন পর আবার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরলাম। বিমানে দিল্লী যাত্রার ঠিক আগে শরীরের উত্তাপ নিয়ে দেখলাম ১০২° ডিগ্রী। পাছে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, সেই ভয়ে জ্বর কিংবা অন্য কোন কষ্টের কথা কাউকেই বললাম না; শেষ পর্যন্ত সাধ্য মতো সহ্য করে যাওয়াই স্থির করলাম।

সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করেই খবর পেলাম সেই রাতেই পরে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে একটি আলোচনা-বৈঠক বসবে এবং আমাকে সেই বৈঠকে যোগদান করতে হবে।

বৈঠকে উপস্থিত হয়ে দেখলাম নেহ্‌রু সভাপতিত্ব করছেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ মেনন, সেনা ও বিমান বাহিনীর প্রধানদ্বয় এবং মন্ত্রীপরিষদীয়, বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা সচিবগণ। ঢোলা এলাকায় চার দিনের সাম্প্রতিক সফরে যা' যা' প্রত্যক্ষ করেছি এবং আগের দিনের যুদ্ধের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করলাম তাঁদের কাছে। আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের ঘাটতি এবং নানাদিক থেকে আমাদের তুলনায় চীনাদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধাগুলির কথা উল্লেখ করে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বললাম, নামকাচু নদী বরাবর আমাদের সৈন্য-সংস্থান একেবারে অনুপযুক্ত হয়েছে; আমাদের অবস্থানের জায়গাটি একটি খাদের মধ্যে হওয়ার দরুন রণ-কৌশলের পক্ষে মোটেই প্রশস্ত নয়, এবং চীনাদের ঘাঁটিগুলি সর্বত্রই আমাদের চাইতে উচ্চে অবস্থিত হওয়ায়, স্থানটি রক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। পরিশেষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম:

(ক) বর্তমান অবস্থায় চীনাদের আক্রমণ করলে আমাদের বিপর্যয় অনিবার্য। সুতরাং ঢোলা পরিত্যাগ করে সমর-কৌশলের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত এমন একটি স্থানে আমাদের সরে যাওয়া উচিত, যেখান থেকে আরও ভালোভাবে চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো যেতে পারে।

(খ) ঢোলা অঞ্চল শীঘ্রই তুষারাবৃত হয়ে পড়বে। তখন সেখানকার ঘাঁটিটিকে বজায় রাখা আর সম্ভব হবে না।

(গ) থাগ্‌লা-র বিপরীত দিকে আমরা যে কোন রকম যুদ্ধ প্রস্তুতিই গড়ে তুলি না কেন, শত্রুপক্ষ তাদের উন্নততর সমর সম্ভারের সহায়তায় এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য সেখান থেকে আমাদের হটিয়ে দিতে সমর্থ হবে। (এই ভাবে অন্যান্য রণাঙ্গনেও আমাদের অবস্থান হয়ে পড়বে দুর্বল।)

(ঘ) চীনাদের অগ্রবর্তী সৈন্য-সংস্থানের পশ্চাদ্দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত থাকায় তারা উন্নততর সৈন্য-বিন্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম। এই সুবিধাটি আমাদের নেই।

[সেই সময় নিফার বিপরীত দিকে চীনাদের সৈন্যবল ছিল প্রায় ৪ ডিভিশনের মতো। পক্ষান্তরে আমাদের ছিল মাত্র একটি ডিভিশন (তা'ও আবার এক ব্রিগেড কম)। তিব্বতে তাদের ছিল ১০ ডিভিশন সৈন্য। এ ছাড়া, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল অনেক আধুনিক এবং সৈন্য-চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাও ছিল অনেক উন্নত ধরনের। এ সব ব্যাপারে আমাদের অবস্থা ছিল ঠিক বিপরীত।]

এই সমস্ত বিবেচনা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমি যথোচিত আদেশ প্রার্থনা করলাম :

(ক) চীনাদের উন্নততর সামরিক শক্তি এবং আমাদের বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, উক্ত এলাকায় যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যাবো কি না, এবং চীনাদের আক্রমণ করবো কি না ;

(খ) অথবা, আক্রমণের আদেশ বাতিল করে দিয়ে বর্তমান অবস্থানগুলিই শুধু রক্ষা করবো ;

(গ) অথবা, অন্য কোন (অধিকতর সুবিধাজনক) স্থানে সেনা-বিন্যাস করবো।

উপস্থিত সকলকেই বললাম, আমার সেনাবাহিনী যে কোনো হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত রয়েছে ; কিন্তু ফল কি হতে পারে সেটা সরকারকে মনে রাখতে হবে।

এরপর থাপার এবং সেনের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন নেহ্রু। উভয়েই উপরিউক্ত (খ) প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন, (গ) প্রস্তাবটি নয়।

সব শুনে নেহ্রু মন্তব্য করলেন, আমাদের বিরুদ্ধে যদি এতসব অসুবিধাই থাকে এবং উক্ত রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসাবে আমার মনোভাব যদি এই হয়, তবে সে অবস্থায় চীনাদের আক্রমণ না করে, বর্তমান ঘাঁটিগুলি আগ্লে রাখার প্রস্তাবটিতেই তিনিও সায় দিচ্ছেন।

অনেক রাতে বৈঠক শেষ হ'ল। আমার তখন ১০৩° ডিগ্রী জ্বর। তার উপর ভয়ঙ্কর শ্বাস-কষ্ট বোধ করছি। কিন্তু সেই নিদারুণ অবস্থার কথা কেউই জানতে পারলেন না।

১২ই অক্টোবর

আমার 'কোর' সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী সমস্যার ফয়সালা করবার জন্য সারাদিন সামরিক সদর দফতরে প্রধান সেনাপতি জেনারেল থাপার এবং অন্যান্যদের সঙ্গে অতিবাহিত করলাম।

১৩ই অক্টোবর

তেজপুরে চতুর্থ 'কোরে'র সদর দফতরে ফিরে এসেই শুনলাম সিংহল যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে নেহরু সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে বলেছেন, নিফায় আমাদের এলাকা থেকে চীনাদের বহিষ্কৃত করে দেবার জন্য তিনি সেনাবাহিনীকে আদেশ দিয়েছেন। ১১ই অক্টোবর রাতে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নেহরু আমাকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, এই বিবৃতিটি ছিল ঠিক তার বিপরীত। উক্ত বৈঠকে তিনি প্রধান সেনাপতির সামনে আমাকে বলেছিলেন, আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো আমাদের পক্ষে যখন সম্ভব নয়, তখন চীনাদের আক্রমণ না করে বরং আমাদের বর্তমান ঘাঁটিগুলি রক্ষা করাই উচিত। (সাঙ্লে সম্পর্কে ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবরের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।)

১৩ তারিখে নেহরু[১৪] কেন যে এই পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি প্রদান করলেন তা' একটি দুর্বোধ্য ব্যাপার। ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী বলে তাঁর কি সত্যিই বিশ্বাস ছিল, এবং সেই বিশ্বাসেই কি উক্ত ঘোষণাটি করেছিলেন; না, কারও পরামর্শে পড়েই করেছিলেন? নিফা ও লাদাকে আমাদের তৎকালীন শোচনীয় সামরিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কোন জেনারেলই তাঁকে কখনও এ ধরনের পরামর্শ দিতেন না। (আমার '১১ই অক্টোবর' শিরোনামার সুপারিশ এবং '১৪ই সেপ্টেম্বর' ও বিশেষ করে '২২শে সেপ্টেম্বর' শিরোনামার মন্তব্যগুলি দেখুন।) অনুমান হয়, আমাদের সামরিক দুর্বলতার

১৪। চীনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের মানসিক আঘাত সত্ত্বেও, নেহরু অধিকতর বাস্তবোচিত পন্থায় এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারতেন। কিন্তু অনুগতদের সোচ্চার দাবী ও বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র বিদ্রূপে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন, এবং সম্ভবতঃ কারও পরামর্শ মতোই ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় এলাকা থেকে চীনাদের বিতাড়িত করবার জন্য তিনি সেনাবাহিনীকে আদেশ প্রদান করেছেন। এই উক্তিটির সুযোগই হয়তো চীনারা গ্রহণ করে, এবং আমরাই তাদের প্রথম আক্রমণ করেছি বলে বাজে অজুহাত তোলে।

কথাটি জানতে পেরেই তিনি বীরত্বের ভানটুকু এই আশায় করেছিলেন যে, তাঁর হুমকিতে (যদিও পরস্পর-বিরোধী) চীনারা ভয় পেয়ে ভারত আক্রমণ করা থেকে বিরত হবে। আবার এমনও হতে পারে যে, বিশ্বাসভাজন রাজনৈতিক কোন ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিক কারণে জনসাধারণকে খুশী করবার জন্য উক্ত ঘোষণা করতে তাঁকে পরামর্শ দেন। চীনারা আমাদের আঘাত হানতো-ই ; তখন না হয়, পরে। কিন্তু নেহ্রুর এই উক্তিই তাদের আক্রমণ ত্বরান্বিত করেছিল এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যাই হোক, ৪নং ইন্ফ্যানট্রি ডিভিশনের অধিনায়কের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়ে একটি আদেশনামা প্রেরণ করলাম :

(ক) ১নং সেতু থেকে নিয়ে অস্থায়ী কাঠের সেতুটি অবধি নামকাচু নদীর উপরিস্থিত সবগুলি সেতু (দক্ষিণ পার্শ্বে) যেকোন প্রকারেই হোক দখলে রাখতে হবে।

(খ) লুম্পুর ভিতর দিয়ে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাটি রক্ষা করতে হবে।

(গ) (নামকাচুর দক্ষিণে) হাথুং লা'কে দখলে রাখতে হবে।

(ঘ) আমাদের সাঙলে-র ঘাঁটিগুলিকে চতুর্থ ডিভিশনের অধিনায়কের বিবেচনা অনুযায়ী দখলে রাখতে হবে।

এই আদেশগুলিই কয়েকদিন আগে মৌখিকভাবে প্রদান করেছিলাম। এখন সেগুলিকে লিখিতভাবে সমর্থন করলাম।

১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর

১৮ তারিখে তাওয়াঙ ও ঢোলা-র অগ্রবর্তী এলাকায় আর একবার যাবার পরিকল্পনা ছিল আমার। যাত্রার পূর্বে সৈন্যচলাচল ও সরবরাহ তথা যুদ্ধ সংক্রান্ত একাধিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করলাম। বিমানের সংখ্যাল্পতার দরুন এই কাজে আমাদের বহুবিধ অসুবিধার প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড ও সামরিক সদর দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালাম, বর্তমান সামর্থ্য নিয়ে বিমান বাহিনী একাজ সম্পূর্ণ করে উঠতে পারছে না ; সুতরাং বিমান বাহিনীকে হয় অতিরিক্ত আরও মার্ক ৪ ডাকোটা ও ক্যারিবুয়া বিমান দেওয়া হোক, অথবা নিফায়

যে সমস্ত বেসামরিক প্রতিষ্ঠান সেদিন অবধি আমাদের ঘাঁটিগুলি চালু রেখেছিল, তাদের কাউকে এ কাজের জন্য সরকার থেকে অতিরিক্ত ও উপযুক্ত বিমান সংগ্রহ করে দেওয়া হোক। আমাদের সাঙ্‌লে-র ঘাঁটিটিকে রক্ষার ব্যাপারে সৈন্যচলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা তথা অন্যান্য অসুবিধার কথাও উল্লেখ করে জানালাম, ১০ই অক্টোবরের সেঙ-জোঙে'র লড়াইয়ের পর থেকে চীনারা উক্ত স্থানের সন্নিকটে এক ব্যাটেলিয়নের মতো সেনাবাহিনী নিয়ে শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করেছে, এবং সাঙ্‌লে হয়তো তারা দখলও করে নিতে পারে। এমত অবস্থায় সম্মানের চাইতে সুবিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন কোম্পানীটিকে সাঙ্‌লে থেকে নামকাচু নদীর দক্ষিণে (বৃহত্তর সামরিক স্বার্থে) সরিয়ে নিয়ে আসা উচিত।

১৭ই অক্টোবর

১৭ তারিখের ভোর বেলায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি এবং পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ বিমানযোগে তেজপুরে উপস্থিত হলেন। প্রধান সেনাপতি, পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ এবং আমার কয়েকজন অধীনস্থ কর্মচারীর সামনে মেনন দৃঢ়তার সঙ্গে আমাকে বললেন, সাঙ্‌লে—ভারত, ভূটান ও তিব্বত ত্রিসংযোগ স্থলের নিকটবর্তী হবার দরুন রাজনৈতিক কারণে সাঙ্‌লে দখলে রাখা আমাদেব একান্ত প্রয়োজন। তাঁকে বললাম, রাজনৈতিক গুরুত্ব যাই থাক না কেন, অতিরিক্ত সেনাবাহিনী এবং সমরোপকরণ আমাকে না দিলে, সামরিক দিক থেকে এ কাজটি করা অসম্ভব। থাপার এবং সেনের সামনেই নামকাচু নদীর উত্তরে অবস্থিত সাঙ্‌লে দখলে রাখার সম্ভবনার বিরুদ্ধে বিশদ তর্ক করেও ব্যর্থ হলাম। অগত্যা, আমার যৎসামান্য সামর্থ্যকে বৃথাই নিয়োজিত করতে হ'ল সাঙ্‌লে দখলে রাখার প্রচেষ্টায়।

মাননীয় ব্যক্তিরা সন্ধ্যাতেই ফিরে গেলেন দিল্লী। তাবপরই আমি সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লাম। স্থানীয় মেডিকেল অফিসর কিছু ওষুধ-পত্র দিলেন, কিন্তু অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হতে থাকলো। রাতে বুকেব মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। প্রচণ্ড শ্বাস-কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে এলো। অবস্থা আমার যখন সঙ্গিণ, তখন ব্রিগেডিয়ার পছ্‌নন্দা ও লেঃ কর্নেল রাও আমার সেই অবস্থার কথা টেলিফোনযোগে দিল্লীর সামরিক সদর দফতরে, সামরিক তৎপরতা বিভাগের অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার পালিতকে

জানালেন। আমার বারংবার আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না কেউ। ব্রিগেডিয়ার পালিত সেকথা জানালেন জেনারেল থাপারকে; থাপার আবার জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে। পছ্‌নন্দা ও'রাও সারারাত বসে রইলেন আমার শয্যার পাশে।

১৮ই অক্টোবর

সেদিন ভোর বেলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্ণেল এইচ. বি. লাল তেজপুরে উপস্থিত হয়ে জানালেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি তাঁকে একটি বিশেষ বিমানযোগে তেজপুরে আমাকে দেখবার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি যখন কথাটি বলেন তখন সেখানে লেঃ কর্ণেল রাও, ব্রিগেডিয়ার পছ্‌নন্দা এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, পরীক্ষা করবার পর, অবিলম্বে ভালো করে রোগ নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য আমাকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করবার অভিমত প্রকাশ করলেন তিনি। লালের সঙ্গে পরিচয় আমার বহুদিনের। তর্ক তুলে বললাম, বর্তমানে এক গুরুতর সামরিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, এবং ঐ অবস্থায় আমার পক্ষে দিল্লী না যাওয়াই ভালো। কিন্তু লাল বললেন, আমার অবস্থা এতটা খারাপ না হলে, কখনই তিনি অস্থায়ীভাবে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করবার প্রশ্ন তুলতেন না। সেখানে রোগ নির্ণয়ের সর্বোৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত রয়েছে। কথা দিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে এখানে ফেরত পাঠাবেন। মেনন ও থাপার উভয়েই যে আমাকে দিল্লী নিয়ে এসে ভালো করে পরীক্ষা করাতে চান, সেকথাও জানালেন; এবং তেজপুরের আর্দ্র জলবায়ুতে আমার বর্তমান অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন। অগত্যা উক্ত শর্ত অনুযায়ী অনিচ্ছাভরে তাঁর সঙ্গে দিল্লী যেতে সম্মত হলাম। বিমানে ওঠবার পূর্বে পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরে টেলিফোন করে লালের উপদেশ মতো দিল্লী যাবার অনুমতি চাইলাম লেঃ জেনারেল সেনের কাছে। সেন অনুমতি প্রদান করলেন। টেলিফোনে এই কথা-বার্তার সময় আমার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার কে. কে. সিং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটির উল্লেখ করতে হ'ল, কারণ অনেকেই দুরভিসন্ধিমূলক রটনা করে বলেছেন, আমি না কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছ থেকে সরাসরি আদেশ পেয়ে, পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষের বিনানুমতিতেই দিল্লী চলে যাই। সেই রাতে দিল্লী পৌঁছে

আমাকে সোজা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হ'ল, এবং পরদিন সকালেই বিশদভাবে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ল সামরিক হাসপাতালে।

১৯শে অক্টোবর

সেনাবাহিনীর প্রধান চিকিৎসক ব্রিগেডিয়ার (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ইন্দর সিং আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলেন। এক্‌সরে নেওয়া হ'ল ; নাড়ির গতি দেখা গেল ১০৬° ও রক্তের চাপ ১৯০/১২০। অবশেষে ধরা পড়লো অধিক উচ্চতায় অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রমের জন্য আমি না কি এক ধরনের মারাত্মক 'ওডেমা' দ্বারা (হৃৎপিণ্ডের সম্প্রসারণ ও উভয় ফুসফুসে জল জমে যাওয়া) আক্রান্ত হয়েছি।' আমার গত পনের দিনের কার্যাবলীর বিবরণ শুনে ইন্দর সিং অভিমত প্রকাশ করলেন, ১০ তারিখের সন্ধ্যায় হাথুং লা-তে যখন প্রথম রোগের লক্ষণ অনুভব করি, তখনই আমার কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা' না করে আমি অত্যধিক পরিশ্রম ও কাজকর্ম করেছি ; এখনও যে বেঁচে রয়েছি সেইটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। সরাসরি আমাকে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে আদেশ করে ইন্দর সিং বললেন, ভালো করে পরীক্ষা করবার পর তাঁর সুনিশ্চিত অভিমত হ'ল আমাকে আপাততঃ বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে! দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিরা যাতে আমার কাছে না আসতে পারে তার জন্য ঘরের বাইরে একজন সান্ত্রী মোতায়েন করা হ'ল। অদৃষ্ট আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা শুরু করেছিল। অসুস্থতা এবং দ্বারে সান্ত্রী মোতায়েন ইত্যাদি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে আর একবার লোকের জিহ্বা হয়ে উঠল মুখর।

(রোগ ভোগের পর ২৯শে অক্টোবর তারিখে তেজপুরে ফিরে) খবর পেলাম, ১৫ থেকে ১৯শে অক্টোবরের মধ্যে থাগ্‌লা এলাকায় চীনাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ-প্রস্তুতি করতে দেখা গেছে। সাঙ্‌ধর-এ আমাদের সামান্য যে কয়েকটি কামান বিমান-ছত্রের সাহায্যে নামানো হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটি নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে চীনারা নিজেদের কামানগুলি পশু-পৃষ্ঠে চাপিয়ে থাগ্‌লা পার হয়ে ৩ ও ৪নং সেতুর অপর পাশে এনে জড়ো করে। প্রায় একই উচ্চতা বিশিষ্ট হাথুং লা অতিক্রম করে আমরা কিন্তু এই কাজটি করতে পারি নি। এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক পশু যেমন আমরা সংগ্রহ করি নি, তেমনি আবার এত বেশী উচ্চতায় পশুগুলি উঠতে পারবে না বলে আমাদের কয়েকজন

বিশেষজ্ঞ যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্নও কখনও তুলি নি। (ব্যাপারগুলি ঘটে যখন আমি বিপুল সংখ্যক চীনা বাহিনীর আক্রমণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এখানে এসে উপস্থিত হই। তখন দেরী হয়ে গেছে অনেক, এবং যা' যা' ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম তার অতিরিক্ত আর কিছু করা সম্ভবও ছিল না।) থাগ্‌লা-র উত্তরে লে[১৫] পর্যন্ত চীনাদের বেশ ভালো একটা সড়ক ছিল। পরে আমাদের এলাকাগুলি দখল করবার পর নিশ্চয়ই তারা আবিষ্কার করে যে, তাওয়াঙ থেকে জিমিং থাং প্রায় ৩৫ মাইল, জিমিং থাং থেকে ১নং সেতু ১৫ মাইল এবং ১নং সেতু থেকে ৫নং সেতু পর্যন্ত প্রায় ৭ মাইল পথ সম্পূর্ণটাই ছিল শুধু পায়ে চলার মতো। (আমাদের নিকটতম প্রধান সড়ক ছিল প্রায় ৬০ মাইল দূরবর্তী তাওয়াঙ-এ। পক্ষান্তরে চীনাদের সড়ক থাগ্‌লা থেকে প্রায় দশ মাইলের ভিতরে ছিল।)

রাজনৈতিক কারণে সীমান্তের খুব কাছাকাছি রাস্তা-ঘাট তৈরী না করবার আদেশ আমরা উচ্চতম সামরিক মহল থেকে পেয়েছিলাম। সেই নীতি অনুসারে মাল-পত্র বহনের জন্য বাধ্য হয়ে আমাদের কুলীর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। অথচ যথেষ্ট সংখ্যক কুলীও সহজলভ্য ছিল না।

এমন কি তাওয়াঙ অবধি পথটিও নির্মাণের কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম মাত্র সেদিন। অথচ চীনাদের মতো এটি আমাদের করা উচিত ছিল অন্ততঃ-পক্ষে পাঁচ বছর আগে। (পরিপূর্ণ একটি সংস্থা-রূপে 'সীমান্ত সড়ক সংস্থা' গড়ে ওঠে ১৯৬০ সালে।) তার উপর সড়ক নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুমোদনও প্রায়ই দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক আর অন্তহীন প্রশাসনিক তর্কাতর্কির মধ্যে মাসের পর মাস আটকে থাকতো। অথচ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী আর্থিক অনুমোদন মঞ্জুর করাই কর্তব্য ছিল সরকারের। আমাদের চোখ খুললো অনেক দেরীতে এবং অতি ধীরে ধীরে। তিব্বত থেকে আমাদের সীমান্ত অভিমুখে পথ নির্মাণের কাজ চীনারা সম্ভবতঃ শুরু করে ১৯৫৫ সাল থেকেই। তাই সুবিধাও তারা পায় অনেক।

১৭ তারিখে চীনারা এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের সাহায্যে সাঙ্‌লে-র বিপরীত দিকে অবস্থিত দম্‌দম্‌ লা অধিকার করেছিল। স্থানটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল এই

১৫। ১৯ তারিখে আমাদের জওয়ানেরা থাগ্‌লা এলাকায় একটি জীপ্‌ গাড়ী দেখতে পায়। তার অর্থ হ'ল চীনাদের অতি সম্মানিত কোন ব্যক্তি ২০ তারিখের চীনা আক্রমণের একদিন পূর্বে তাদের প্রধান ঘাঁটিগুলি নিশ্চয়ই পরিদর্শন করতে এসেছিলেন।

কারণে যে, এখান থেকেই থাগ্‌লা-র দিকে যাওয়া যায়। ১৮ তারিখে দম্‌দম্‌ লা থেকে তারা একটি টহলদারী দলকে ৫নং সেতুর দিকে পাঠিয়েছিল। ৫নং সেতু থেকে আমাদের জওয়ানেরা তাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে এবং একজন চীনা নিহত হয়। তাকে কবর দেবার সময় আমরা লক্ষ্য করি লোকটি সৈনিক নয়; খুব সম্ভব একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। ১৯ তারিখে বেলা পাঁচটা নাগাদ আমাদের সাঙধরস্থিত চৌকি সংবাদ দেয়, প্রায় ২,০০০ চীনা সৈন্যকে তারা থাগ্‌লা থেকে সাঙ্‌লে অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখেছে। ৪নং সেতু এবং কাঠের সেতু থেকে ২নং রাজপুত বাহিনীও একই সংবাদ দেয়। ব্রিগেডিয়ার দল্‌ভি অনুমান করলেন সাঙ্‌লেই চীনাদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল হবে। ইতিমধ্যে এখানে বরফ পড়তে শুরু করেছিল। দল্‌ভির ইচ্ছা ছিল তাঁর ব্রিগেডটিকে ২৫শে অক্টোবরের মধ্যেই লুম্‌পুতে পিছিয়ে নিয়ে যাবেন। সেই অনুসারে তিনি মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। নিরঞ্জন পেরসাদও লেঃ জেনারেল সেনের কাছে সুপারিশ করেন যে, সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ২৫শে অক্টোবরের মধ্যেই ৭নং ব্রিগেডের লুম্‌পুতে পিছিয়ে যাওয়া উচিত।

সে রাতে খুবই শারীরিক কষ্ট বোধ হ'ল আমার। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ড ও বুকে যন্ত্রণাও অনুভব করলাম।

২০শে অক্টোবর

খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই ভয়ানক অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। ঘড়িতে তখনও ন'টা হয় নি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। তেজপুর থেকে ব্রিগেডিয়ার কে. কে. সিং কথা বলছিলেন। জানালেন, সেই দিনই খুব ভোরে বিপুল সংখ্যক শত্রুসৈন্য ঢোলা এলাকায় আমাদের ৭নং ব্রিগেডের অবস্থান স্থানগুলির উপর আক্রমণ চালিয়েছে। তখনও হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে, এবং কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না। পরে আরও খবর জানাবেন বললেন।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নিরুপায় হ'য়ে আমি এখানে পড়ে রয়েছি, আর ওদিকে আমার জওয়ানেরা কঠিন এক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে চলেছে।

পরে শুনেছিলাম, ভোর প্রায় চারটের সময় আমাদের সাঙ্‌লে-র ঘাঁটি চীনাদের গুলিবর্ষণের সংবাদ দেয়। সাড়ে চারটে নাগাদ ৪নং সেতুর বিপরীত দিকে চীনাদের কামান সংস্থানের কাছাকাছি দু'টি 'রেড ভেরে লাইটস্‌' (Red

Verey Lights) নিক্ষেপ করা হয়। এগুলি সম্ভবতঃ ছিল আক্রমণ আরম্ভ করার সংকেত।[১৬] তার পরেই তিন ও চার নম্বর সেতু এবং সাঙ্‌ধর লক্ষ্য করে বহু মর্টার ও কামান মুহুর্মুহুঃ গর্জন শুরু করে দেয়। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার একটু পরেই চীনারা ৩নং, ৪নং এবং কাঠের সেতুর মাঝে বহু স্থান দিয়ে একই সঙ্গে নামকাচু নদী অতিক্রম করে।

যে চীনা রেজিমেণ্টটিকে একদিন আগে সাঙ্‌লে-র দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল, এইবার তারা সাঙ্‌ধর-এর দিকে উঠে আসতে থাকে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তারা উক্ত ঘাঁটিটির ঠিক নীচে এসে পৌঁছয়। প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্য তারপর তিন ও চার নম্বর সেতুতে আমাদের অবস্থান স্থলগুলিকে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করে, এবং খানিকক্ষণ যুদ্ধের পর আমাদের সৈনিকদের কাবু করে ফেলে। (আমাদের ঘাঁটিগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল ২নং রাজপুত এবং ১/৯নং গোরখা বাহিনীর উপর)।

দুই ও তিন নম্বর সেতুর মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকদিন পূর্বেই ব্রিগেডিয়ার দল্‌ভি নিজের ব্রিগেডের সদর দফতর স্থাপন করেছিলেন। সকাল ৭টার মধ্যে সেটির পতন হয়। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনলাম, ব্রিগেড সদর দফতরটিকে মোটেই উপযুক্তভাবে প্রস্তুত রাখা হয় নি। ঝোপঝাড়ের উপর প্যারাশূট ফেলে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিবর-ঘাঁটি খনন করা হয়েছিল মাত্র কয়েকটি ; এবং কোনরকম প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপন করা হয় নি বললেই চলে।

সেদিন খুব ভোরেই বিভিন্ন স্থানে শত্রুরা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সকাল ছ'টাতেই ব্রিগেডের বেতার যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যায়। আটটা নাগাদ আসাম রাইফেলের দু'জন সৈনিক ২নং সেতুতে উপস্থিত হয়ে ৯নং পঞ্জাব বাহিনীকে জানায় যে তিন ও চার নম্বর সেতুর পতন হয়েছে। শত্রুরা ততক্ষণে খিন্‌জামানে-ও অধিকার করে ফেলেছিল।

৯নং পঞ্জাব বাহিনীর একটি টহলদারী দল ২নং সেতু থেকে ৩নং সেতুতে

১৬। দিন অথবা রাতের যে কোন সময়েই শত্রুর আক্রমণ হতে পারে। সেটা নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের উপর। তবে সাধারণতঃ দিনের আলো দেখা দেবার পূর্ব মুহূর্তে অথবা সূর্যাস্তের ঠিক পরেই (প্রত্যুষে অথবা গোধূলিতে) আক্রমণ আরম্ভ করা হয়। কারণ সেই সময় লোকে ঘুম থেকে উঠে হয় দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে, নয়তো দিনের কাজের শেষে বিশ্রামের জন্য তৈরী হয়।

গিয়েছিল। বেলা ন'টা নাগাদ তারা ফিরে এসে খবর দেয় যে আমাদের ব্রিগেড সদর দফতরের কোন চিহ্নই কোথাও নেই, এবং অঞ্চলটি এখন চীনাদের দ্বারা পরিপূর্ণ।

সাঙধর-এর যুদ্ধ :

ভোর পাঁচটার পর থেকেই চীনারা এই ঘাঁটিটির উপর কামান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। আমাদের কামানগুলিও পাল্টা জবাব দেয়; কিন্তু গোলাগুলির পরিমাণ আমাদের ছিল কম। কিছুক্ষণ পরেই চীনারা সাঙধর আক্রমণ করে। এখানে আমাদের কামান ঘাঁটিগুলির রক্ষাকারী গোরখা কোম্পানীটি দুর্বল হ'লেও, প্রচণ্ড প্রতিরোধ প্রদান করে। ইতিমধ্যে চতুর্থ ডিভিশন একটি হেলিকপ্টারে একজন সিগ্‌নাল অফিসর ও একটি বেতার যন্ত্র পাঠায়। এখানে অবতরণ করেই তাঁরা সর্বত্র চীনাদের দেখতে পান। বিমান-চালক, ফ্লাইট লেফ্‌টনান্ট্‌ সেহগলকে খুব সম্ভব গুলি করে মারা হয়, এবং হেলিকপ্টারটি চীনারা অধিকার করে। বেলা এগারটার আগেই পতন হয় সাঙ্‌ধর-এর।

এখান থেকে শত্রুরা অগ্রসর হতে থাকে, এবং ২১ তারিখের বিকেল নাগাদ কারপো লা-১ হয়ে লুম্‌পুতে পৌছয়। সেই দিনই তারা ১ থেকে ৪নং সেতু পর্যন্ত অঞ্চল অতিক্রম করে হাথুং লা এবং খিন্‌জামানে-তেও উপস্থিত হয়। লুম্‌পুতে তারা বিভিন্ন পথ দিয়ে প্রবেশ করে। ২২ তারিখে লুম্‌পু ও খিন্‌জামানে ত্যাগ করে শকৃতি হয়ে তাওয়াঙ-এর দিকে তারা অগ্রসর হয়।

চীনারা সাঙধর দখল করে নেওয়ায় সাঙলে-তে অবস্থিত আমাদের কোম্পানীটি প্রতিবেশী রাজ্য ভূটানের তাসি গঙ জোঙ'এ সরে যায়। ব্রিগেড অধিনায়ক আগেই বন্দী হয়েছিলেন। সুতরাং মেজর জেনারেল নিরঞ্জন পেরসাদই লুম্‌পু থেকে ব্রিগেডের সব ক'টি ইউনিটকে আদেশাদি প্রদান করছিলেন। ৯নং পঞ্জাব বাহিনীকে তিনি হাথুং লা অধিকার করবার আদেশ দেন। ৪নং গ্রেনেড বাহিনীকে ১নং সেতুতেই থাকবার আদেশ দেওয়া হয়। সন্ধ্যার মুখে তারা হাথুং লা-য়,পশ্চাদপসরণ করে। ২১ তারিখ সকালে পতন হয় হাথুং লা-র। ৯নং পঞ্জাব বাহিনী প্রথমে পিছিয়ে যায় লুম্‌পু-তে; তারপর যুমু লা পার হয়ে তাসি গঙ জোঙ'এ। একই পথে গ্রেনেড, গোরখা ও রাজপুত বাহিনীও পশ্চাদপসরণ করে। ১৬ থেকে ১৭ হাজার ফিটের উপর দিয়ে যাবার

সময় পথে ভয়ানক দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয় তাদের। প্রচণ্ড শীত, অপর্যাপ্ত বস্ত্রাদি এবং অনাহারে বহু লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ৭ই নভেম্বরের মধ্যে ব্রিগেডের অধিকাংশ ভাগ ডারবাঙ্গা-য় পৌঁছে যায়।

২২শে অক্টোবর

১৯৬২ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে লেঃ জেনারেল সেন তাওয়াঙ-এ যান। সেখানে তাঁর পৌঁছবার অল্পক্ষণ পরেই চীনারা প্রায় এক ডিভিশন সৈন্য নিয়ে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে তাওয়াঙ ও জাঙ্-কে বিপদগ্রস্ত করে তোলে:

(ক) লুম্ লা-তাওয়াঙ
(খ) বুম্ লা-তাওয়াঙ
(গ) খিন্‌জামানে-সোমাৎসো তাওয়াঙ
(ঘ) বুম্ লা-লান্‌ডা-জাঙ

শত্রুরা পাছে তাওয়াঙ-কে চারদিক থেকে ঘিরে ধ্বংস করে ফেলে এই আশঙ্কায় লেঃ জেনারেল সেন তাওয়াঙস্থিত সৈন্যদলকে জাঙ-এর দক্ষিণে সরে আসবার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি দ্রুত তাওয়াঙ পরিত্যাগ করেন। (২৫ তারিখে বিনা বাধায় শত্রুরা তাওয়াঙ অধিকার করে। আমি সে সময় অসুস্থ অবস্থায় দিল্লীতে পড়ে রয়েছি।)

আমি এবং আরও কয়েকজন সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছি বলে চীন ও পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র থেকে বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার চালান হতে থাকে। ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, আমারই দেশবাসী কিছু লোক ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে এই অপপ্রচারের সুযোগ নিয়ে মিথ্যা ভাষণগুলিকে দাবানলের মতো এমনভাবে চতুর্দিকে ছড়াতে থাকেন যেন তাঁরা নিজেরাই হলেন শত্রুপক্ষের দালাল। এই সঙ্কট মুহূর্তে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে, জনসাধারণ এবং সংবাদপত্রের একটি অংশও নেহ্‌রু, মেনন ও আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রচার শুরু করে দেয়, এবং বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমাদের দায়ী করতে থাকে। অনেকে আবার এমন কথাও বলেন যে, আমিই নাকি সরকারকে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। আরও

বলেন যে, ৪নং কোরের অধিনায়করূপে আমাকে নিযুক্ত করার জন্যই নাকি জওয়ানদের মনোবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (৪নং কোরের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলাম মাত্র পনের দিন হ'ল। পক্ষান্তরে অন্যান্য ব্যক্তিরা এই রণাঙ্গনের অধিনায়কত্বে ঢের বেশী দিন ধরে ছিলেন। আমার উপস্থিতিতে হাজার হাজার জওয়ানের মনোবলের অবনতি রাতারাতি ঘটতে পারে না।) বস্তুতঃ, আমি গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছি বলে যেদিন গুজব রটলো, সেই দিন হ'ল আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের চূড়ান্ত[১৭]। [এই জঘন্য নিন্দাপ্রচারকারীর দল নিজেদের মতলব মতো হয়তো আমার সুনাম বিনষ্ট করতে সমর্থ হয় ; কিন্তু সেই সঙ্গে তারা যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমাদের জনগণের, বিশেষকরে সৈনিকদের মনোবল দুর্বল করে দেবার শত্রুর প্রয়াসকেও দৃঢ়তর করে। এগুলি না করে, যে-কোন ধরনের কাজ নিয়ে রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী এলাকায় তারা গেলে, অধিকতর সেবা করা হ'ত দেশের, এবং নিজেদের দেশপ্রেমের যথার্থ পরিচয়ও দিতে পারতো তারা।]

২৩শে থেকে ২৫শে অক্টোবর

আমাকে দেখতে, ২৩ তারিখ কিংবা কাছাকাছি কোন সময়ে নেহ্রু ও মেনন আমার বাসায় এলেন ; এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খবরাখবর নেবার পর, আমাদের এলাকা থেকে চীনাদের বিতাড়িত করবার উপায় সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত[১৮] জিজ্ঞাসা করলেন। তিনটি বাস্তব পন্থার সুপারিশ করলাম : প্রথমতঃ, বর্তমান অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে হিমালয় বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমাণ্ড ও কণ্ট্রোল প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠন ; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সঙ্গতির মধ্যেই দ্রুত ও ব্যাপক সৈন্য বৃদ্ধি, এবং তৃতীয়তঃ, কোন

১৭। রোগশয্যা থেকেই আমি নিফার যুদ্ধ পরিচালনা করছি বলে একটি সংবাদ কয়েকদিন পরেই একটি সংবাদপত্রে প্রক.' ত হয়। প্রকৃত ঘটনা হ'ল, দশ দিন আমি রোগশয্যায় পড়ে ছিলাম, এবং সেই সময় ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে, ত্রি-সংযোগ স্থলের নিকটবর্তী সাঙ্গুলে সম্বন্ধে দিল্লী থেকে ৪নং কোরের কাছে একটি আদেশ পাঠাই। যাই হোক, আমার অসুস্থতার পাঁচ দিন পরেই লেঃ জেনারেল হরবক্স্ সিংকে অস্থায়ীভাবে আমার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

১৮। এই আপৎকালীন অবস্থায় আরও কয়েকজনের কাছে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল।

বৈদেশিক শক্তি বা শক্তি সমূহের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা। শেষোক্ত প্রস্তাবটি করি, কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে এটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সত্বর সৈন্য বৃদ্ধির প্রস্তাবটি সমর্থন করলেও বৈদেশিক সাহায্যের প্রস্তাবটি কিন্তু তখন নেহ্‌রু ও মেননের কাছে প্রীতিকর বলে মনে হয় নি।

সামরিক পরিস্থিতির অবনতি (তাওয়াঙ-এর পতন ?) অথবা অন্য কোন ব্যাপার মেনন ও নেহ্‌রুকে এই বিষয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে প্রভাবিত করেছিল কি না জানি না। কিন্তু ২৬ তারিখে উত্তেজিত অবস্থায় মেনন আমার কাছে আসেন, এবং আগের দিন আমি যে অভিমতগুলি ব্যক্ত করেছিলাম সেগুলি যত শীঘ্র সম্ভব সংক্ষেপে লিখে দিতে বলেন। বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করবার পর অতিরিক্ত কি কি সংগঠন (পার্বত্য সংগঠন সমেত) আমাদের প্রয়োজন এবং বর্তমান সংগঠনকে কি ভাবে পুনর্গঠিত করা দরকার সে সম্বন্ধে রোগশয্যা থেকেই তখন আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখাই। আমি অসুস্থ থাকাকালীন অবস্থাতেই মন্ত্রী পরিষদের সচিব খেরা আমার বাড়ীতে এসে উক্ত বিবরণটি সংগ্রহ করেন। বিদেশ থেকে যে সমস্ত অস্ত্রাদি এবং সাজসরঞ্জাম আমদানী করা প্রয়োজন সেগুলিরও একটি তালিকা পরে প্রস্তুত করি। সেই সৈন্য সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক সামরিক সাহায্য প্রার্থনা—দু'টিই সরকার অবশেষে করলেন, কিন্তু অনেক বিলম্বে। সেনা বিভাগের বারংবার অনুরোধ অনুসারে নেহ্‌রু, মেনন ও আরও কয়েকজন সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, আজ হয়তো অন্য কাহিনী রচিত হতো।

[নেহ্‌রু ও মেননের কাছে আমি বৈদেশিক সামরিক সাহায্য গ্রহণের সুপারিশ করবার কয়েকদিন পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উৎসাহী সংযুক্ত সচিব সারিন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বৈদেশিক সচিব এম. জে. দেশাইকে বলেন যে, এই সঙ্কট মুহূর্তে বিশ্বের সমস্ত দেশের কাছে সামরিক সাহায্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আবেদন জানানো উচিত। দেশাই এ বিষয়ে নেহ্‌রুর সঙ্গে কথা বলেন। অবশেষে নেহ্‌রু পাকিস্তানসহ পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে অনুরূপ আবেদন জানান। আমেরিকা, ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আরও কয়েকটি দেশ সামরিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করতে সম্মত হয়। প্রায় ৭৫টি দেশ তাদের নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে। কিন্তু নিফায় (অথবা লাদাকে)

আমাদের বিভিন্ন সংগঠন ও ইউনিটগুলির কাছে এই ভাবে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছে দেবার তথা আমাদের জওয়ানদের ওই-গুলির ব্যবহারে শিক্ষাদানের পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়।]

১৯ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে থাপার আমার সঙ্গে তিন-চার বার সাক্ষাৎ করেন। তিনি যে আমাকে পুনরায় সি. জি. এস.-রূপে চান সে কথা জানিয়ে অনুরোধ করেন, আমি যেন 'কোর' কমাণ্ডে প্রত্যাবর্তন না করে তাঁর কাছে ফিরে আসি। এ বিষয়ে আমার অভিমত খোলাখুলি ভাবে থাপারের কাছে ব্যক্ত করি। সক্রিয় একটি কমাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে না করতে, বিশেষ করে এই সামরিক বিপর্যয়ের পরে সেটিকে ছেড়ে তার পরিবর্তে যে কারণেই হোক না কেন, দফতরের কাজ গ্রহণ করার মধ্যে একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অথবা আমার দিক থেকে দায়িত্ব এড়ানোর আভাস সূচিত করবে। সুতরাং সেটার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যাই ঘটুক না কেন, রণাঙ্গনে জওয়ানদের কাছে ফিরে আমায় যেতেই হবে।

থাপার আমার সঙ্গে একমত হন।

২৬।২৯শে অক্টোবর

২৬ তারিখে ব্রিগেডিয়ার ইন্দর সিং-এর কাছে নিফায় আমার কমাণ্ডে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমার অবস্থা তখনও সন্তোষজনক না হওয়ায় চিকিৎসক হিসাবে আরও কয়েক সপ্তাহের আগে তিনি আমায় ফিরে যাবার অনুমতি দিতে অসম্মত হলেন। বললাম, চিকিৎসাশাস্ত্রগত দৃষ্টি-কোণ থেকে ব্যাপারটি আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু আমার ক্ষেত্রে মানবিক বিষয়গুলি কী তিনি বিবেচনা করতে পারেন না? দেশের ভাগ্য একটি অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে, এবং আমার বিরুদ্ধে তীব্র অপপ্রচার চলছে সমানে। তাই সঙ্কল্প করেছি, জীবন বিপন্ন করেও সম্মান রক্ষা করবো। ইন্দর সিং যেমন ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক, তেমনি ছিলেন সংবেদনশীল এবং যথার্থ ভদ্রলোক। ব্যাপারটি তিনি অনুভব করলেন। এবং, সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পূর্বেই ২৯ তারিখে নিফার রণক্ষেত্রে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন আমায়। পাহাড়ে উঠতে অবশ্য আমায় নিষেধ করে দেন কিন্তু সে নিষেধ তেজপুর পৌঁছবার দু'এক দিনের মধ্যেই অনন্যোপায় হয়ে অমান্য করি। আমার অনুরোধ যে তিনি রক্ষা করেছিলেন, এতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। ২৮ তারিখে

একটু হেঁটে বেড়াবার অনুমতি মিললো। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ২৯ তারিখে পুনরায় বিমানযোগে তেজপুর রওনা হলাম।

গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়াটা আমার হাতের মধ্যে ছিল না; যদিও নিন্দাকারীরা এটিকে অসুস্থতার ভান বলে ঘোষণা করেছিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই কাজে যোগদান করা ছাড়া, ওই অবস্থায় আর কিছুই করবার সাধ্য ছিল না আমার। সামরিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে, ভগ্ন স্বাস্থ্যকে কোন বাধা বলেই গ্রাহ্য করি নি। এবং আমার অসুস্থতা অথবা ক্রমিক আরোগ্যলাভ কোনটার জন্যেই ঢোলা, তাওয়াঙ, সে লা, বম্‌ডি লা এবং ওয়ালঙ-এ আমাদের বিপর্যয় ঘটেনি। এ বিপর্যয়েব কারণ ছিল অনেক গভীরে, এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সেগুলি ভালো করে জেনেও সুবিধামতো অগ্রাহ্য করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে কবেন।

তেজপুরে 'কোর' সদর দফতরে প্রবেশ করেই দেখলাম নিরঞ্জন পেরসাদ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। অবিলম্বে তাঁকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে তিনি দিল্লী ফিরে যেতে সম্মত হন নি। বেশ অসন্তুষ্ট মনে হ'ল তাঁকে। আমাকে গোপনে বললেন, জেঃ জেনারেল সেন তাঁর প্রতি গুরুতর অবিচাব করেছেন; এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বহীনতার অভিযোগ করেছেন প্রধান সেনাপতির কাছে। এবং সেই কারণেই তাঁকে কমাণ্ডের দায়িত্বভাব থেকে অপসারিত করা হয়েছে। (এই প্রসঙ্গে বলতে পারি আমার সঙ্গে অবস্থানকালে এন পি.-র মধ্যে এ ধবনেব কোন ত্রুটি আমি কোন দিন দেখি নি)। তারপর এন. পি. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেব উদ্দেশ্যে একটি লিখিত আবেদনপত্র আমার হাতে দেন। অনুকূল মন্তব্য সহকারে সেটিকে আমি যথাস্থানে প্রেরণ করি। আমাদের রাষ্ট্রপতি হলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এন. পি. শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। অবশেষে তাঁর দাবীর যথার্থতা প্রমাণিত হয়, এবং তাঁকে ১৫নং কোরের চীফ্ অফ্ স্টাফ-রূপে নিযুক্ত করা হয়।

২৯শে অক্টোবর

১৯৬২ সালের ১৩ অক্টোবর তারিখের নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়: 'অদম্য এবং যোগ্যতম সৈনিকদের একজন' বলে বিবেচিত লেঃ জেনারেল কলকে নিফার একটি বিশেষ কোরের অধিনায়করূপে

নিযুক্ত করা হয়েছে।' ১৯৬২ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে পত্রিকাটি আবার আমার সম্বন্ধে লেখেঃ '…সাহসিকতা, উপায়াদি-উদ্ভাবনে তৎপরতা এবং অক্লান্ত কর্মক্ষমতার খ্যাতি রয়েছে তাঁর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বর্মায় জাপানীদের বিরুদ্ধে এবং ১৯৪৮ সনে কাশ্মীর যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন…। বহুবার তিনি স্বেচ্ছায় বিপজ্জনক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। (উদাহরণস্বরূপ) ১৯৫৫ সালে তিনি তুষারাবৃত রোটাং গিরিসঙ্কটের অপর পার্শ্বে অবরুদ্ধ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য তথায় গমন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি পদব্রজে নাগা পর্বতমালা, নিফা, সিকিম এবং লাদাকে-র সুদূর অঞ্চলে অবস্থিত ঘাঁটিগুলিতে গমন করেন।…লাদাকে এই ঘাঁটিগুলি পরিদর্শনের সময় তিনি প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। ঝড়ের ঝাপ্‌টায় তাঁর হেলিকপ্টারটি একটি বিশাল হিমপ্রবাহের মধ্যে পড়ে যেতে যেতে রক্ষা পায়।'

৩০শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর

অবস্থা বিচারে বাধ্য হয়ে, ডাক্তারি নির্দেশ অমান্য করে এই সময় আমি ওয়ালঙ ও সে লা'র সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করি এবং উভয় রণাঙ্গনের ডিভিশন অধিনায়কদের সঙ্গে স্থল-যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তথাকার সামরিক পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা করি। তা' ছাড়া আমার কোরের সদর দফতরেও বহুবিধ সামরিক তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করি।

ভারতীয় অথবা বিদেশী সাংবাদিকদের নিফার অগ্রবর্তী রণাঙ্গনে যাওয়া মেনন যে কেন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন জানি না; তাঁদের মধ্যে অনেকেই অনুমতির জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু অনুমতি দিলে 'সরকারী' নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হ'তো। এটি ছিল মেননের ব্যক্তিগত আদেশগুলির অন্যতম। এই সমস্ত ভারতীয় এবং বিদেশী সাংবাদিকগণ পৃথিবীর সর্বত্র থেকে এখানে এসেছিলেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েও আমাদের কর্ম-তৎপরতার সংবাদ সংগ্রহ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাই মেননের আদেশ অগ্রাহ্য করে কয়েকজন সাংবাদিককে (পরে) অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে প্রেরণ করি। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'টাইম্‌' পত্রিকার এডোয়ার্ড ব্যেয়র।[১৯]

১৯। ভারতীয় সেনা-বাহিনী থেকে আমি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করছি শুনে ব্যেয়র আমাকে লেখেন: 'গত বৎসর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তাঁবুতে অবস্থানকারী স্বল্পসংখ্যক

তেজপুরে আগের রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর মোজা দু'টি গরুতে খেয়ে ফেলে। আমাদের অগ্রবর্তী এলাকাগুলি সফরান্তে তিনি লেখেন: 'সেনাবাহিনী অথবা পরিবহনের জন্য এই রকম একটা পরীক্ষার স্থান কোন শয়তানী বুদ্ধিতেও পরিকল্পনা করতে পারবে না।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যেয়র ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ব্রিটিশ অফিসররূপে তিন বৎসর কাজ করেছিলেন।

৮ই নভেম্বর

পূর্ববর্তী সামরিক পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত করবার সময় আমার ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার কে. কে. সিং আমাকে যে অমূল্য সাহায্য করেছিলেন, সে কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও পরবর্তীকালে বহু সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন আমার শক্তির অন্যতম স্তম্ভ-স্বরূপ।

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড ও সামরিক সদর দফতরে ৮ই নভেম্বর তারিখে একটি তার-বার্তা প্রেরণ করে আমার এলাকার ঘনায়মান নিম্নলিখিত ত্রিবিধ সঙ্কটের কথা উল্লেখ করি:

(ক) তাওয়াঙ এলাকায় শত্রুরা দুই-ডিভিশন সৈন্য সমাবেশে ব্যাপৃত রয়েছে; এবং সম্ভবতঃ প্রধান কেন্দ্রের পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে সঙ্গোপনে অগ্রসর হয়ে তারা আমাদের সে লা'র অবস্থান স্থলগুলিকে পরিবেষ্টন করবার চেষ্টা করবে।

(খ) শত্রুরা মাচুকার বিপরীত দিকে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, এবং উক্ত অঞ্চলে আমাদের অবস্থানটিকে তারা বিচ্ছিন্ন করে দেবার চেষ্টা করবে বলে মনে হয়।

(গ) ওয়ালঙ-হায়ুলিয়াঙ'এর বিপরীত দিকে শত্রুরা এক ডিভিশন সৈন্য সমাবেশে ব্যাপৃত রয়েছে।

৭ই নভেম্বর তারিখে ওয়ালঙ যে চতুর্থবারের মতো আক্রান্ত হয়েছে সে সংবাদেরও উল্লেখ করে জানাই যে, পরিবহন বিমান ও এক টনের গাড়ীর

লোকই আপনার দুরূহ, কঠিন সমস্যা এবং অধিনায়কত্বের বিষয়ে অবগত আছেন; এবং এই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, ওই সমস্ত প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে আপনা'র চাইতে ভালোভাবে কাজ করা আর কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না...।'

ব্যেয়র তখন আমেরিকার 'স্যাটারডে ইভ্‌নিং পোস্ট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন।

অভাবে উল্লিখিত অঞ্চলে আমাদের লোকজন ও সাজসরঞ্জাম আনয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রধান সেনাপতি ও পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষকে তাঁদের ৭ই নভেম্বর তারিখে তেজপুর পরিদর্শনের সময় যে কথা বলেছিলাম, তার সমর্থনে এই তার-বার্তায় আরও জানাই যে, উল্লিখিত সঙ্কটগুলির মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের অতিরিক্ত আরও দুই ডিভিশন সৈন্য ও তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় সহায়ক সংস্থাগুলির আশু প্রয়োজন। কিন্তু এই চাহিদার পরিবর্তে ১৭ই নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত আমাকে অতিরিক্ত আর একটি মাত্র ব্রিগেড দেওয়া হয়েছিল। (পরে অবশ্য আরও একটি ডিভিশন আসে, কিন্তু খুবই দেরীতে।) সুতরাং আমার কাজের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র অথবা সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাদির সহায়তা কিছুই পাই নি।

দু'টি কারণে সামরিক সদর দফতর আমাকে অতিরিক্ত সাহায্য প্রদানে অসমর্থ হয়। পাকিস্তান রণাঙ্গনের একমাত্র পঞ্জাব অথবা কাশ্মীর অঞ্চল থেকেই সৈন্য সরিয়ে এনে কার্যকরীভাবে আমাকে সাহায্য প্রদান করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সরকার নাপারকে উক্ত অঞ্চল থেকে কোন সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন নি। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক সদর দফতরের কাছে অতিরিক্ত আর কোন মালবাহী গাড়ী অথবা পরিবহন বিমান ছিল না বললেই চলে। দু'টি ব্রিগেডকে দু'টি দুর্বল ডিভিশনে রূপান্তরিত করে আমার 'কোর'টিকে গঠন করা হয়েছিল। সে লা ও বম্‌ডি লা-র পতনের পর অতিরিক্ত আর একটি ডিভিশন আসে।

৮ই নভেম্বর তারিখে আমার চাহিদা ছিল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ ডিভিশনের জন্য বিমানযোগে প্রতিদিন ২৬০ টন মাল সরবরাহ এবং ১,২০০ একটন-মালবহনকারী লরী (মিশামারি থেকে সে লা পর্যন্ত চারদিন যাতায়াতের জন্য ৩০০ গাড়ীর চারটি দল)। অথচ সেই সময়ে আমার কাছে মাত্র তিনশ'র কাছাকাছি একটন-মালবহনকারী গাড়ী ছিল। পরিবহন বিমানের অভাবে বিমান বাহিনী প্রতিদিন ২৬০ টনের বদলে ৬০ থেকে ৮০ টন মালের নিক্ষেপ-সরবরাহ করছিল। ফলে আমাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি যেভাবে হওয়া উচিত ছিল তার চাইতে অনেক শ্লথগতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

৯ই থেকে ১১ই নভেম্বর

চতুর্থ ও দ্বিতীয় ডিভিশনের অধিনায়কদের (উভয়েরই নাম ছিল পাঠানিয়া)

কাছে যথাক্রমে ৯ই ও ১১ই নভেম্বর তারিখে যুদ্ধসংক্রান্ত দু'টি নির্দেশ প্রেরণ করি। (তেজপুরে পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ এবং প্রধান সেনাপতিকে উক্ত নির্দেশ দু'টির সারমর্ম পূর্বেই জ্ঞাপন করেছিলাম)। নির্দেশগুলিতে জানাই, আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলিকে সম্মুখভাগ থেকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখে পশ্চাদ্দেশে আসল আক্রমণ করা তথা একই সঙ্গে পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলের সড়ক কিংবা পায়ে-চলা পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করাই হ'ল শত্রুদের কৌশল। চতুর্থ ডিভিশনের অধিনায়কের নিকট প্রেরিত নির্দেশটিতে পূর্বাহ্লেই আভাস দিয়েছিলাম, শত্রুরা তাওয়াঙ-এ নিজেদের আসল উদ্দেশ্য সাধিত করবার পর, উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হয়ে তাওয়াঙ চু নদীর দক্ষিণ ধরে পুনরায় অগ্রসর হবে বলে আমার ধারণা; এবং তাদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল সম্ভবতঃ হবে বম্‌ডি লা। আরও জানাই, আমার অনুমান অনুসারে শত্রুর সম্ভাব্য কর্মপন্থা হ'ল:

(ক) নুরানাগ-এ অবস্থিত আমাদের সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলে সে লা'তে আমাদের সৈন্যবাহিনীর সংস্পর্শে আসা।

(খ) সেন্‌জে-তে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে পশ্চাদ্দেশ থেকে সে লা'র উপর আক্রমণ চালানো।

(গ) দিরাঙ জোঙ অধিকার করা।

(ঘ) লা ঠুঙরি জোঙ-এর পথে বম্‌ডি লা অধিকার করা।

মোটামুটিভাবে ঘটেও তাই।

নুরানাগ, সে লা এবং বম্‌ডি লা রক্ষা করবার এবং তাওয়াঙ চু নদী বরাবর কর্তৃত্ব বজায় রাখবার আদেশও তাঁকে প্রদান করি। প্রধান সড়কের উপর শত্রুর অনুপ্রবেশ রোধ করবার জন্য সে লা পর্যন্ত সড়কের দু'এক জায়গায় টহলদারীর ব্যবস্থা করতে এবং প্রধান সড়কের উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে বম্‌ডি লা-র ভিতর বিভিন্ন অনুপ্রবেশের পথগুলিও বন্ধ করবার নির্দেশ দিই। এছাড়া জওয়ানদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করা তথা মনোবল গড়ে তোলবার জন্য তাঁকে বলি, খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক টহলদারীর ব্যবস্থা করতে।

২নং ডিভিশনের অধিনায়কের নিকট ১১ই নভেম্বর তারিখে প্রদত্ত আমার যুদ্ধ-সংক্রান্ত নির্দেশে, শত্রুরা যে আমাদের ওয়ালঙস্থিত ঘাঁটির বিরুদ্ধে এক ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ করবার চেষ্টা করবে এবং শীঘ্রই ঘাঁটিটিকে আক্রমণ করবে, এই রকম একটি পূর্বাভাস প্রদান করি। সুতরাং ওয়ালঙ-এ আমাদের বিমান অবতরণ ক্ষেত্রগুলিকে শত্রুর দৃষ্টিবহির্ভূত করে রাখাটা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। উক্ত নির্দেশনামায় তাঁকে এও জানাই যে, সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালঙ-এ তাঁর গ্যারিসনটিকে দুই ব্রিগেড গ্রুপ পর্যন্ত সজ্জিত করবার অভিপ্রায় আমার রয়েছে।

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে নিফায় আমার কমাণ্ডের অধীনে যে যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়েছিল, তার কয়েকটির বিবরণ আমি এখানে প্রদান করবো। নিফা রণাঙ্গনে চীন এবং আমাদের পারস্পরিক শক্তির সমীক্ষা করলে মোটামুটি এসে দাঁড়ায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলিতে :

ভারতে অথবা ভারতীয় সীমান্তগুলিতে আমাদের যে পরিমাণ সৈন্য ছিল, তিব্বত এবং আমাদের সীমান্ত বরাবর সে তুলনায় চীনাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। রণকৌশল ও উদ্ভাবন-তৎপরতায় তারা ছিল সুদক্ষ; এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ, বিশেষতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের চাইতে ছিল উন্নততর। সুতরাং আমাদের চাইতে অনেক দ্রুত নিজেদের ঘাঁটিগুলির শক্তিবৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল তাদের পক্ষে। এগুলি ছাড়া, আরও বহুবিধ সুযোগ-সুবিধার জন্যই এই যুদ্ধে তারা জয়ী হয়।

ওয়ালঙ-এর যুদ্ধ [২০]

নিফার পূর্বপ্রান্তে ভারত, তিব্বত ও ব্রহ্ম সীমান্তের সংযোগস্থলের অনতিদূরে অবস্থিত ওয়ালঙ হ'ল নিকটতম প্রধান সড়ক-কেন্দ্র তেজু থেকে একশ মাইলেরও বেশী উত্তরে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫ থেকে ৬ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত এই স্থানটির চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগের উচ্চতা কোথাও ১০,০০০ ফিট, কোথাও ব ১৫,০০০ ফিট। ৪নং শিখ, ৬ নং কুমায়ুন ও ৩/৩ নং গোরখা বাহিনী নিয়ে ২নং

২০। ২নং ডিভিশনের অধীনে ওয়ালঙ-এ ছিল ১১নং ব্রিগেড এবং মধ্যাঞ্চলে ছিল ৫নং ব্রিগেড। শেষোক্ত ব্রিগেডে কোন বড় রকমের যুদ্ধ হয় নি, এবং আমার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এটির সৈন্যসংখ্যার ঘাটতি রয়ে যায়।

ডিভিশনের অঙ্গ হিসাবে ১১নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেড এখানকার ঘাঁটিটি রক্ষা করছিল। আমাদের বিরুদ্ধে চীনারা প্রথমে নিযুক্ত করে দুই ব্রিগেড সৈন্য। পরে সেটিকে বাড়িয়ে করে তিন ব্রিগেড। প্রথম থেকেই এই ঘাঁটিটির উপর তারা বারংবার আক্রমণ চালায়; কিন্তু বিরাট অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যেরা প্রতিটি আক্রমণ দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করে।

ওয়ালঙ-এ একটি আকর্ষণীয় যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠছে শুনে আমার জি. এস. ও.-১, ৩/৩ নং গোরখা বাহিনীর লেঃ কর্ণেল এ. এম. ভোরাকে সঙ্গে নিয়ে ১২ তারিখে বিমান যোগে পুনরায় সেখানে রওনা হলাম। (দিন দশেক আগে একবার ওয়ালঙ গিয়েছিলাম)। পথিমধ্যে একবার হায়ুলিয়াঙ-এ থেমে সেখানকার প্রতিরোধ ব্যবস্থাদি পরিদর্শন করে, সেই দিনই সকালে একটু বেলায় ওয়ালঙ পৌঁছলাম।

'অটারে'র বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিমান ক্ষেত্রের ২০০ গজের মধ্যে একটি বিস্ফোরণ ঘটলো। ১১নং ব্রিগেডের অধিনায়ক[২১] ব্রিগেডিয়ার 'নবীন' রওলি বললেন, ওয়ালঙ-এর বিমান ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করবার জন্যই শত্রুরা সম্ভবতঃ গোলাটি নিক্ষেপ করেছে। পরে অবশ্য জানা গেল গোলাটি আমাদেরই। বিমান থেকে নিক্ষেপ সরবরাহের সময় প্যারাশূট্ না খোলার ফলে মাটিতে পড়ে ফেটে যায়।

খুব কাছাকাছিই সে সময় একটা যুদ্ধ চলছিল। দেখার উদ্দেশ্যে বিমান ক্ষেত্র থেকে পায়ে হেঁটে ৪ নং শিখ বাহিনীর সদর দফতরে উপস্থিত হলাম। চারদিকের পাহাড়ে যুদ্ধের কোলাহল প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত ৪নং শিখ বাহিনীর এক কোম্পানী সোজা গিয়ে পড়ে শক্তিশালী শত্রুর মুখে। সংঘর্ষে আমাদের তরফে ৭ জন আহত এবং ২ জন নিহত হয়। হতাহতদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসতে দেখলাম। ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে আহত লোকগুলি দেখলাম ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পূর্বে বাহিনীর চিকিৎসাকেন্দ্রে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হ'ল। বন্ধুর পার্বত্য প্রদেশের উপর দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাদের বহন করে নিয়ে যেতে হয়। (হতাহতদের দ্রুত অপসারণ এবং আহতদের অন্ততঃ

২১। ইতিপূর্বে দু'বার আমি এই ব্রিগেডে কাজ করেছি। ১৯৩৯ সালে একবার লেফ্‌টনান্ট্ হিসাবে, এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ব্রিগেড অধিনায়ক-রূপে।

কিছুটা যন্ত্রণা লাঘবের জন্য আমি লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসত্বর কয়েকটি হেলিকপ্টার পাঠাতে অনুরোধ করি। এতে আর একটি উদ্দেশ্যও সাধিত হ'ত। দূর-দুর্গম অঞ্চলে দ্রুত গোলা-বারুদ সরবরাহ করার জন্য এই হেলিকপ্টারগুলিকেই ব্যবহার করা যেতো।)

শিখ টহলদার বাহিনীটি যখন এই যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন আর একটি কোম্পানীকে পাশ কাটিয়ে 'ত্রি-সংযোগ স্থল' নামক একটি স্থান অধিকার করতে আদেশ দেওয়া হয়। স্থানটি অধিকার করা আমাদের পক্ষে হয়ে পড়েছিল অত্যাবশ্যক। কারণ, বিমানক্ষেত্রটির উপর চীনাদের আধিপত্য বিস্তারের পক্ষে এটি হ'ত প্রথম পদক্ষেপ। যাই হোক, আদেশ মতো কোম্পানীটি এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড গোলাগুলির সম্মুখীন হয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, আমি ৪নং শিখ বাহিনীর সদর দফতরে থাকতে থাকতেই স্থানটিতে তারা পৌঁছে যায়। সেখান থেকে চীনাদের অবস্থান স্থান-গুলি নিশানা করা ছিল অনেক সুবিধাজনক। ফলে দণ্ড নামক একটি স্থান থেকে কামান, এবং ওয়ালঙ থেকে ভারী মর্টারের গোলা বর্ষণ করে শত্রু শিবিরগুলিকে আমাদের সৈন্যেরা পর্যদুস্ত করে দিতে থাকে।

এই সাফল্যের পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্য ৬নং কুমায়ুনকে আরও দু'টি কোম্পানী পাঠিয়ে যুদ্ধরত দলটির শক্তি বৃদ্ধি করতে ব্রিগেড থেকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। পথটি শীলাকীর্ণ এবং খাড়া হলেও, দ্রুত কার্য-করণ যেখানে অত্যাবশ্যক, সেখানে ৬নং কুমায়ুনের অত্যধিক বিলম্বের কোন অজুহাতই টিকতে পারে না। বস্তুতঃ, তাদের ওই বিলম্বের ফলেই আমাদের আগে চীনারা উক্ত স্থানটি অধিকার করে নয়।

ওয়ালঙ-এ রাত্রি অতিবাহিত করে ১৩ তারিখে আলঙ, তুতিঙ এবং মাচুকা হয়ে তেজপুর ফিরে এলাম। ১৪ তারিখের সকালে চীনারা ওয়ালঙ-এ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের উপর আক্রমণ চালিয়ে আংশিকভাবে অধিকার করে নেয়। ফলে আমাদের বাহিনী ত্রি-সংযোগ স্থলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

পরিস্থিতিতে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এই ভাবে শত্রুপক্ষের সাফল্য যদি অব্যাহত থাকে, তবে ওয়ালঙ-এ আমাদের বিমান ক্ষেত্রটিও শেষ পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এবং সে ক্ষেত্রে, সেখানে আমাদের অবস্থাও হয়ে পড়বে সঙ্কটজনক।

কয়েকদিন আগেই সে লা পরিদর্শন করে এসেছি। শত্রুর কোন আসন্ন আক্রমণের সংবাদও সেখান থেকে এখনও পাইনি। সুতরাং ওয়ালঙ-এর যুদ্ধটির প্রতি মনোনিবেশ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল।

সেই দিনই আমার পুরাতন সহকারী মেজর জেনারেল ধীলন তেজপুরে 'কোর' সদর দফতর পরিদর্শনে এসেছিলেন। অনুরোধ করতে তিনিও আমার সঙ্গে ১৫ তারিখ বিকালে বিমানযোগে তেজু রওনা হলেন। আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য রাতটা তেজুতেই কাটাতে হ'ল। ১৬ই নভেম্বর প্রত্যুষে আবার রওনা হয়ে ভোর পাঁচটার একটু পরে ওয়ালঙ-এ অবতরণ করলাম।

সেখানে তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। অনতিদূরেই কামান এবং মর্টারের গর্জন আমরা শুনতে পেলাম। এক ডিভিশন সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করে চীনারা তখন আমাদের ঘাঁটিগুলির ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

সেইদিন সকালেই খানিক পরে মেজর জেনারেল ধীলন দিল্লী ফিরে গেলেন। একই সঙ্গে আমাকেও ফিরে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন তিনি। কিন্তু পরিস্থিতি তখন অতীব সঙ্কটজনক। তা' ছাড়া এক সময় এই ব্রিগেডটির অধিনায়কত্বও আমি করেছি। তাই মনস্তাত্ত্বিক কারণেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললাম ধীলনকে।

শত্রুপক্ষের চাপ ক্রমশঃ প্রবলতর হচ্ছিল। ৪নং শিখ বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসর টেলিফোনে সে কথা ব্রিগেড মেজর, মেজর অশোক হান্ডুকে জানাতে, আমার সম্মুখেই ১১নং ব্রিগেডের অধিনায়ক তাঁকে ঘাঁটি রক্ষা করতে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। এই যুদ্ধের ভিতরেই ৪নং ডোগরা বাহিনীকে বিমানযোগে ওয়ালঙ-এ নামাবার কাজ চলছিল। কিন্তু নবাগত বলে এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফলে, স্বভাবতঃই সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

ওয়ালঙ-এ আমাদের ঘাঁটিগুলির মাঝ-বরাবর ছিল একটি নদী। ডকোটা পাহাড়—দঙ্ উপত্যকা অঞ্চলে নদীটির দক্ষিণ তীর এবং সংলগ্ন এলাকাগুলি রক্ষা করছিল ৩/৩ নং গোরখা বাহিনী, এবং বাম ভাগে ছিল ৪ নং শিখ ও ৬নং কুমায়ুন। ৬নং কুমায়ুনের বদলী হিসাবে পাঠানো হ'ল ৪নং ডোগরা বাহিনীকে। গুরুত্বপূর্ণ বিমানক্ষেত্রটিকেও রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হ'ল।

এই সময়, (আমি ১১নং ব্রিগেডের সদর দফতরে ছিলাম বলে) একদিকে

১১নং ব্রিগেডের অধিনায়ক অথবা ব্রিগেড মেজর এবং অপর দিকে আমাদের সম্মুখভাগ-রক্ষাকারী কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়নগুলির কমাণ্ডিং অফিসরদের মধ্যে বহু টেলিফোনে বার্তালাপ আমার কানে আসে। সেগুলি শুনে আমার ধারণা হয়, ব্রিগেড অধিনায়কের সুদৃঢ় মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সেই পরিস্থিতিতে আমাদের কয়েকজন কমাণ্ডিং অফিসর অধিকতর দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারতেন।

যাই হোক, শত্রুর প্রবল চাপের মুখে অল্পক্ষণ পরেই ৪নং শিখ ও ৩/৩নং গোরখা বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করে। মেজর হান্‌ডুকে আমি টেলিফোনে পরিষ্কার ভাষায় বিভিন্ন ব্যাটেলিয়নের বহু অফিসরদের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিতে শুনেছি। অনেকে সেই আদেশ মান্য করেছিলেন; অনেকে করেন নি।

এই যুদ্ধে ব্রিগেড অধিনায়ক যে যথাসাধ্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি, সেটা আমি ও ডিভিশনের অধিনায়ক উভয়েই স্বচক্ষে দেখেছি। আমাদের পক্ষে সেই অবস্থায় একমাত্র নৈতিক সমর্থন জানানো ছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিল না। (প্রধান সড়ক থেকে ১৫০ মাইল দূরবর্তী এই গ্যারিসনটির শক্তিবৃদ্ধির জন্য আমারা অতিরিক্ত সেনাবাহিনী ছাড়াও, গত কয়েকদিন বা সপ্তাহে বহু ফিল্ডগান, ভারী এবং ৩ ইঞ্চির মর্টার ইত্যাদি সরবরাহ করেছিলাম। যুদ্ধ বিরতির পর এই ধরনের বহু অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্র চীনারা আমাদের ফেরত দেয়।)

ব্রিগেড সদর দফতর থেকে সকাল ৯-৪৫ মিনিটে যুদ্ধের সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতির সংবাদ প্রধান সেনাপতি ও পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষের কাছে তারযোগে পাঠাবার সময়েই শুনলাম শত্রুপক্ষের গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশঃ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। শত্রুরা যে এক ডিভিশন সৈন্য নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে কথাও তার-বার্তাটিতে উল্লেখ করে অবিলম্বে আরও সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য অনুরোধ জানালাম। কিছুক্ষণ পর, যুদ্ধে আমার সাফল্য কামনা করে এবং পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে একটি জবাব এলো।

বেলা ১০টা নাগাদ ১১নং ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার রওলি আমার কাছে এসে বললেন, তাঁর অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলি এক এক করে শত্রু-কবলিত হয়ে পড়েছে, এবং আমাদের ওয়ালঙস্থিত ব্রিগেড ঘাঁটিটিকেও

আর রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এমত অবস্থায় ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে রওলি আমার আদেশ প্রার্থনা করলেন। সেই সময় ২নং ডিভিশনের অধিনায়কও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুমোদনক্রমে এবং উপস্থিতিতেই রওলিকে বললাম:

(ক) বর্তমান ঘাঁটিটিকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

(খ) সেটা যদি সম্ভব না হয়, তবে কোন বিকল্প ঘাঁটি স্থাপন করে সেটিকে যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবে।

(গ) তাও যদি অসম্ভব হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে শত্রুকে যথাসম্ভব দেরী করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে একের পর এক বিকল্প ঘাঁটি স্থাপন করে সেগুলিকে রক্ষা করে যেতে হবে।

(পরে লিখিতভাবে. উপর্যুক্ত নির্দেশগুলিকে সমর্থন করে তার একটি প্রতিলিপি ডিভিশন অধিনায়কের কাছে প্রেরণ করি)। সৈন্যদল এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে অগ্রাধিকার সম্বন্ধেও ব্রিগেডিয়ার রওলি আমার নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। এ বিষয়ে কয়েকটি নির্দেশ তাঁকে দিলাম; এবং সেগুলির সঙ্গে তিনিও একমত হলেন।

ঠিক এই সময় বিমানক্ষেত্রের কাছে চারটি কামানের গোলা এসে পড়লো। বেলা ১১টার একটু আগে, অবশিষ্ট দু'টি 'অটারে'র মধ্যে একটি নিয়ে আমি ওয়ালঙ ত্যাগ করলাম। তার খানিকক্ষণ পরেই ১১নং ব্রিগেড হায়ুলিয়াঙ-এর দিকে পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করল।

তখন অবধি সে লা অঞ্চল সম্পর্কে আমার সদর দফতর থেকে কোন সংবাদ না পাওয়ায় ১৬।১৭ই নভেম্বরের রাতটি ২নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের সদর দফতরেই অতিবাহিত করলাম। সেই রাতেই পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড ও সামরিক সদর দফতরে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে নিফায় চীনাদের প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম পাঠাতে অনুরোধ জানালাম। আমাদের তুলনায় শত্রুর শক্তি অনেক বেশী হবার কারণে (জাতীয় স্বার্থের খাতিরে) আর কালবিলম্ব না করে বৈদেশিক[২২] সামরিক সাহায্য চাইবার পরামর্শও

২২। ১৭ই নভেম্বর তারিখে থাপার যখন আমার 'কোর' পরিদর্শনে আসেন, তখনও তাঁকে মৌখিকভাবে এই সুপারিশ করেছিলাম। থাপার পরদিনই নেহরুকে কথাটি জানান।

দিলাম। সেই সঙ্গে একথাও যোগ করে দিলাম যে, এই পরামর্শ ভয়-প্রসূত নয়; এটা হ'ল নগ্ন বাস্তব।

মোটের উপর নিফায় আমাদের অসুবিধা ছিল বিস্তর। সৈনিকদের কাছে যথেষ্ট সংখ্যক খনন যন্ত্রাদি ছিল না। স্বয়ংক্রিয় ও অন্যান্য ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি এবং বেতার যন্ত্রগুলি সবই ছিল ত্রুটিপূর্ণ, এবং সংখ্যায়ও কম। বিভিন্ন কাজ এবং হতাহতদের স্থানান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হেলিকপ্টারের ছিল অভাব। দুর্গম অঞ্চলগুলি থেকে হতাহতদের মানুষের সাহায্যে বহন করে নিয়ে আসাটা ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। তা' ছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক প্যারাশূট সময়মতো না খোলার ফলে প্রয়োজনীয় বহু সাজসরঞ্জাম মাটিতে আছাড় পড়ে নষ্ট হয়ে যেতেও দেখেছি। আমাদের বহু জওয়ানকে তীক্ষ্ণ খাড়াই এবং অধিক উচ্চতায় পতিত ভারী মালপত্রগুলিকে এক স্থানে জড়ো করে রাখার কাজে নিযুক্ত করতে হয়।

সে লা সম্বন্ধে চিন্তিত হবার মতো কোন সংবাদ ১৬ কিংবা ১৭ তারিখের সকালেও পেলাম না। এদিকে ১১নং ব্রিগেডের পশ্চাদপসরণকারী সৈনিকদের নিরপত্তা সম্বন্ধেও (পাছে তারা শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে থাকে) যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। তাই ব্রিগেডটির অন্বেষণের জন্য ১৭ তারিখ-সকালে বিমান বাহিনীকে একটি হেলিকপ্টারে করে আমাকে ওয়ালঙ-এর যথাসম্ভব নিকটে নিয়ে যেতে বললাম। বিমান বাহিনী পূর্বাহ্নেই সাবধান করে দিল, লোকগুলির জন্য অঞ্চলটি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাতে গেলে খুব নীচু দিয়ে উড়ে যেতে হবে এবং তাতে স্থলভাগ থেকে শত্রু-নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রের গুলির পাল্লার মধ্যে পড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

হায়ুলিয়াঙ পার হয়ে আমরা উড়ে চললাম। জানালার ভিতর দিয়ে তীব্র

শুনেছি, নেহরু নাকি কয়েকদিন পরেই এই বিষয়ে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে (কেনেডি?) একটি বার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু হায়! চার দিন পরেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্তকাল ধরে বৈদেশিক সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকার সপক্ষে আমি ওকালতি করছি না। কিন্তু গুরুতর জাতীয়-সঙ্কটের সময় মিত্র শক্তিগুলির কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করাটা অসঙ্গত নয় বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। (অল্পকাল পরেই বিভিন্ন বিদেশী শক্তির কাছে আমরা সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করি এবং সাহায্যও পাই। সেটা না মিললে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় অথবা আজ আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াত?)

ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা আসার ফলে হেলিকপ্টারের একটি ঢিলে-'ফ্ল্যাপে' এমন শব্দ হচ্ছিল যেন দূর থেকে কেউ মেশিনগানের গুলি চালাচ্ছে। শব্দটি শুনে আমাদের একজন চীৎকার করে উঠলেন, 'শক্রুরা আমাদের উপর গুলি ছুঁড়ছে'। (বৈমানিক অবশ্য যথারীতি বিমান চালিয়ে যাচ্ছিলেন।) ক্ষণতরে মনে হ'ল শক্রুরা বাস্তবিকই বুঝি আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল সে সব কিছু নয়। ওয়ালঙ পৌছতে আর যখন মাত্র ১০ মাইল (?) বাকী, সেই সময় ধূসর রংয়ের পশমী জামা পরিহিত ব্রিগেডিয়ার রওলিকে দেখলাম নদীর ঠিক ধারেই একটি পায়ে-চলা পথের উপর কিছু সংখ্যক লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের হেলিকপ্টারটি লক্ষ্য করে হাত নাড়ছেন। বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হবার দরুণ, পায়ে-চলা পথটির উপর নামার মতো কোন জায়গা ছিল না। বিমানচালক অগত্যা শুষ্ক বালুকাময় নদীগর্ভেই হেলিকপ্টারটিকে নামালেন। পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দলবল সহ রওলিকে নিরাপদ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার ইচ্ছা ছিল রওলি এবং আরও কয়েকজন অফিসর আমার সঙ্গে হায়ুলিয়াঙ গিয়ে জলযোগাদির পর আবার তাঁদের লোকজনের কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু প্রস্তাবটি করতে, অতি সঙ্গতভাবেই রওলি নিজের লোকজনদের ছেড়ে যেতে আপত্তি জানালেন। আগের দিন থেকে তাঁদের কোন আহারাদি জোটে নি। তাই বিমান থেকে নিক্ষেপ করে কিছু খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করতে আমায় অনুরোধ করলেন তিনি। হায়ুলিয়াঙ-এ ফিরে এসেই তার ব্যবস্থা করলাম। এখানেই আমার সদর দফতর থেকে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানলাম থাপার এবং সেন শীঘ্রই তেজপুরে আসছেন। সুতরাং অবিলম্বে রওনা হলাম সদর দফতরের দিকে।

অগ্রবর্তী রণাঙ্গনে আমাব ঘন ঘন যাতায়াতের যৌক্তিকতা নিয়ে কয়েকজন সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, আমি সদর দফতরে থাকলেই বরং সুষ্ঠুতরভাবে সামরিক তৎপরতাগুলির সমন্বয়-সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম। আমার কিন্তু ধারণা, সত্যিকারের কোন সেনানায়ক কখনই সদর দফতরে নিজের চেয়ারে সর্বক্ষণ আঠার মতো লেপ্‌টে থাকতে চাইবেন না। বরং পর্যায়ক্রমে অগ্রবর্তী এলাকাগুলিতে গিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বচক্ষে পরিদর্শন, বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে নিজে উপস্থিত থেকে সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন, এবং সঙ্কটজনক যুদ্ধগুলিতে অধীনস্থ সেনানায়ক ও সৈনিকদের

সঙ্গে অগ্নিপরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তাদের মনোবল অটুট রাখার প্রচেষ্টাই, তাঁর অধিকতর কাম্য হবে; এবং, এই জিনিসটাই আমি করতে প্রয়াসী হয়েছিলাম। এ বিষয়ে জেনারেল প্যাটনের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আপন সদর দফতর ছেড়ে একটি যুদ্ধে তিনি অগ্রবর্তী রণাঙ্গনে গমন করেন। পরে সে সম্বন্ধে লেখেন:

'সৈনিকদের সঙ্গে সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবস্থান করে, নৌকাগুলিকে ধাক্কা দিয়ে চালিয়ে এবং মাথার উপরে শত্রু-বিমানকে উপেক্ষা করে কোন আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাদের অচঞ্চল রাখি। আঠারো ঘণ্টা যাবৎ সদর দফতর ছেড়ে দূরে ছিলাম। সর্বাঙ্গ আমার ভিজে গিয়েছিল। অনেকে বলেন, সেনাধ্যক্ষদের পক্ষে এই ধরনের কার্যকলাপের প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত। আমার কিন্তু অভিমত হ'লো, উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যা' করা দরকার, একজন পদস্থ সেনাধ্যক্ষের তাই করা উচিত। প্রতিটি লক্ষ্যেরই প্রায় আশী ভাগ হ'ল সৈনিকদের মনোবল সুদৃঢ় করা।'

সে যাই হোক, সদর দফতর ছেড়ে কখনও আমি বেশী দিনের জন্য বাইরে থাকি নি, এবং ফিরে এসেই অগ্রবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের সামরিক তাৎপরতাগুলির সমন্বয়-সাধন ও নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। সে লা'র উপরে অথবা সেই অঞ্চলে শত্রু আক্রম'ণর কোন সংবাদ আমার কাছে পৌঁছবার পূর্বে, আমার সৈন্য-বূ্যহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বদেশ ওয়ালঙ থেকে একদিন হঠাৎ একটি সাংঘাতিক সংবাদ পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যাই। কিন্তু তবুও, আমার অনুপস্থিতিকালে সেনাপতিদের মধ্যে কেউ অথবা স্টাফ অফিসর কোন ব্যাপারে আমার নির্দেশ গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করলে, আমি যেখানেই থাকি না কেন, সব সময় সংবাদ-বাহক অথবা বেতার মারফত আমার সঙ্গে যাতে যোগাযোগরক্ষা করতে পারেন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রাখি।

সে লা'র যুদ্ধ

১৪,০০০ ফিট উচ্চে সে লা গিরিসঙ্কটের প্রধানতঃ চারপাশ দিয়ে আমাদের

সৈন্য-সংস্থান ছিল। তাওয়াঙ (১০,০০০ ফিট) থেকে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে এবং বম্‌ডি লা-র (৮,৫০০ ফিট) প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে হ'ল সে লা'র অবস্থান। দিরোঙ জোঙ হ'ল প্রায় ৬,০০০ ফিট উচ্চ একটি উপত্যকার মধ্যে। সাম্প্রতিককালে নির্মিত একটি সড়ক সে লা'র সঙ্গে তাওয়াঙ-কে সংযুক্ত করেছে।

তাওয়াঙ রক্ষা করা অসাধ্য বিবেচনা করে থাপার ও সেন ২৪শে অক্টোবর তারিখে উক্ত স্থান পরিত্যাগের (আমি তখন দিল্লীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছি) এবং তৎপরিবর্তে সে লা রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে লা'র দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে আমার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার কে. কে. সিং লেঃ জেনারেল সেনকে বলেন, তাওয়াঙ-এর পর চীনাদের বিরুদ্ধে আমাদের পরবর্তী প্রতিরোধ ঘাঁটি সে লা'তে না করে বম্‌ডি লা-য় করা বাঞ্ছনীয়। কারণ, বম্‌ডি লা-য় যোগাযোগ ব্যবস্থার দৈর্ঘ্য সে লা'র চাইতে কম হবে, এবং সমর-কৌশল ও ব্যূহ রচনাদি সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাগুলিও পাওয়া যাবে। সেন অবশ্য তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন।

সে লা রক্ষার ভার ছিল ৪নং ডিভিশনের উপর। মেজর জেনারেল এ. এস. পাঠানিয়া, এম. ভি. সি., এম. সি.-কে এই ডিভিশনের অধিনায়ক হিসাবে থাপার নির্বাচিত করেন। পাঠানিয়ার অতীত সামরিক কৃতিত্ব ছিল অতীব উজ্জ্বল। (আমার অসুস্থতার সময় লেঃ জেনারেল হরবক্‌স্ সিং-কে এক সপ্তাহেরও কম সময়ের জন্য ৫নং কোরের অস্থায়ী অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।)

স্থির হয়েছিল ৪৮নং, ৬২নং এবং ৬৫নং ব্রিগেড নিয়ে গঠিত ৪নং ডিভিশনের[২৩] সদর দফতর দিরোঙ জোঙ-এ স্থাপন করা হবে। বম্‌ডি লা, সে লা[২৪] এবং দিরোঙ জোঙ রক্ষার ভার দেওয়া হয় যথাক্রমে ৪৮নং, ৬২নং এবং ৬৫নং ব্রিগেডের উপর। এছাড়া ৩০১নং ব্রিগেডকেও যথাশীঘ্র সম্ভব

২৩। ডিভিশনটির সংকেত চিহ্ন 'লাল ঈগল' দেখে আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। আশা হয়েছিল, অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে এই যুদ্ধে তারা আরও কয়েকটি গৌরবময় কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবে। কিন্তু তখন কল্পনাও করতে পারি নি, কী দুর্দৈব তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

২৪। সে লা থেকে বম্‌ডি লা-র দূরত্ব ৭০ মাইলের কাছাকাছি।

সন্নিবেশিত করার কথা ছিল। ৬২নং ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন খ্যাতনামা ব্রিগেডিয়ার হোশিয়ার সিং। তাঁকে সে লা রক্ষার ভার দেওয়া হয়। অবস্থা অনুযায়ী যতদূর সম্ভব গোলন্দাজ বাহিনী, গোলাগুলি এবং রসদ দিয়ে সুরক্ষিত করা হয় তাঁর ঘাঁটিটিকে।

তাওয়াঙ-এ চীনারা নিজেদের সামরিক প্রস্তুতি পুরোদমে চালিয়ে যেতে থাকে। তাওয়াঙ এবং বুম্‌লা-কে একটি সড়ক দিয়ে সংযুক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ওই অঞ্চলে প্রায় দুই ডিভিশনের মতো সৈন্য সমাবেশ করে ফেলে।

৭ই নভেম্বর তারিখে শেষ যেবার আমি দিরোঙ জোঙ-এ ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের সদর দফতর পরিদর্শন করি, তখন পাঠানিয়া অতিরিক্ত সৈন্যবল ও সাজসরঞ্জামের জন্য আমার কাছে অনুরোধ জানালেও, মোটামুটিভাবে নিজের ডিভিশনের একটি সন্তোষজনক চিত্রই আমার কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন। অবশ্য শক্তিবৃদ্ধির জন্য তাঁর অনুরোধ মতো কালবিলম্ব না করে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে জোরদার সুপারিশ করি। (নিজস্ব কোন অতিরিক্ত সঙ্গতি আমার ছিল না।) সেই সময় সে লা পরিদর্শন করে সেখানকার বিভিন্ন সেনাপতিদের অটুট মনোবলেরই পরিচয় পাই।

ইতিমধ্যে আমাদের জোর টহলদারী এবং মাঝে মাঝে শত্রুঘাঁটিগুলির উপর গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকে। সে লা'য় রসদাদি মজুত করা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। একমাত্র অসুবিধা ছিল স্থানটির সুদীর্ঘ যোগাযোগ পথ। তথাপি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে এবং পুনরায় সরবরাহ না আসা অবধি বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের সেনাবাহিনী এই স্থানটি রক্ষা করতে পারবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল।

১৭ তারিখ সকালে চীনারা সে লা গিরিপথের উত্তরে নওরানাগ নামক স্থানে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি রক্ষাকারী ৪নং গাড়োয়াল বাহিনীর উপর চারবার আক্রমণ চালায়। প্রতিটি আক্রমণই গাড়োয়ালীরা অসীম বীরত্ব সহকারে[২৫] প্রতিহত করে। চীনারা অতঃপর গিরিপথের পূর্বদিকে অবস্থিত ১নং শিখ লাইট ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নকে আক্রমণ করে। এই ব্যাটেলিয়নটি কিন্তু গাড়োয়ালীদের মতো দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হ'ল না।

ওয়ালঙ-এর যুদ্ধ থেকে ফিরে ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তেজপুরে

২৫। ৪নং গাড়োয়াল বাহিনীর মতো ৪নং ডিভিশনও যদি যুদ্ধ করতে পারতো, তবে সে লা যুদ্ধের কাহিনী আজ হ'ত অন্যরকম।

আমার সমর দফতরের পরামর্শ-কক্ষে প্রবেশ করে দেখি লেঃ জেনারেল সেন এবং জেনারেল থাপার, ব্রিগেডিয়ার পালিতের সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁদের, বিশেষ করে পালিতকে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। মাত্র সেদিন—১৯৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে পালিত আমাকে একখানি চিঠিতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখেন, 'আপনার কমাণ্ড যে বাহিনীতেই হোক না কেন, এবং যে কোন সময়, নিশ্চয় করে আমাকে ডেকে নেবেন বলে বিশ্বাস রাখি।' যাই হোক, অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন শেষ করতে না করতেই সংবাদ পেলাম, সে লা'য় আমাদের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। থাপার বললেন, একটু আগেই ৪নং ডিভিশনের অধিনায়ক মেঃ জেনারেল পাঠানিয়া আমার সঙ্গে টেলিফোনে সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, এবং তিনি ও সেন তাঁর সঙ্গে কথা বললে পাঠানিয়া জানান, সে লা'য় চীনাদের আক্রমণ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে এবং দিরোঙ জোঙ ও সে লা'র যোগাযোগ তারা যে কোন মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। এমত অবস্থায় ৬২নং ব্রিগেডকে বর্তমান অবস্থান থেকে সরিয়ে দিরোঙ জোঙ-এ নিয়ে যাবার আদেশ তিনি পেতে পারেন কি না? থাপার ও সেন পাঠানিয়াকে কোন নির্দেশ না দিয়ে বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ একমাত্র আমিই সদর দফতরে ফিরে এসে দেবো।

সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিট নাগাদ মেঃ জেনারেল পাঠানিয়া আমাকে টেলিফোন করে জানালেন, সেই রাতেই সেন্জে থেকে সে লা'র সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এবং তাই, ১৭।১৮ নভেম্বর তারিখের রাতেই ৬২নং ব্রিগেডকে সে লা থেকে সরিয়ে নেবার অনুমতি দেবার জন্য বারংবার আমাকে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। আরও জানালেন, তাঁর অনুমান শত্রুরা এক ডিভিশনেরও বেশী সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছে। উত্তরে, সে লা'কে আমাদের দখলে রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বললাম, পিছন দিক থেকে শত্রুরা তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হলেও, সেখানে অন্ততঃ এক সপ্তাহ-কাল প্রতিরোধ বজায় রাখবার মতো যথেষ্ট শক্তি, গোলাগুলি ও রসদাদি তাঁর রয়েছে। সে লা থেকে পশ্চাদপসরণের সময় শত্রু কর্তৃক তাঁর পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বার আশঙ্কার কথাও উল্লেখ করে বারংবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, বর্তমান অবস্থানে ঘাঁটি বজায় রেখে ৬২নং ব্রিগেডের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই হ'ল সব চাইতে সুবিধাজনক। সেই রাতেই খানিক বাদে যখন

থাপার, সেন ও আমি নৈশ আহারে বসেছি, পাঠানিয়া তখন আবার টেলিফোন করে জানালেন, সে লা অঞ্চলের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলেছে; সুতরাং সেই রাতেই তাঁকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি দেওয়া হোক। প্রধান সেনাপতি থাপারের শ্রুতিগোচরেই পাঠানিয়াকে অন্ততঃ ১৭/১৮ নভেম্বরের রাতটুকু সে লা রক্ষা করতে আদেশ দিলাম, এবং বললাম, চূড়ান্ত নির্দেশ ১৮ তারিখ সকালে দেবো। (ভেবেছিলাম, রাতটুকু টিকে থাকতে পারলে, সকাল নাগাদ হয়তো অবস্থা সামলে নিতে পারবেন তিনি)। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও তাঁর মনঃপূত হয়েছে বলে মনে হ'ল না। তাঁর এই বারংবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান সেনাপতি ও পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সেই রাতেই পাঠানিয়াকে নিম্নলিখিত বার্তাটি প্রেরণ করলাম:

(ক) বর্তমান অবস্থানটি আপনাকে যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবে।

(খ) কোন অবস্থান রক্ষা করা যদি সম্ভব না হয়, তবে পশ্চাদপসরণ করে বিকল্প যে অবস্থান রক্ষা করতে পারবেন সেখানে সরে আসার অধিকার আপনাকে দেওয়া হ'ল।

(গ) প্রায় ৪০০ শত্রু সৈন্য বম্‌ডি লা-দিরোঙ জোঙ সড়কটি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

(ঘ) বম্‌ডি লা-য় ৪৮ নং ব্রিগেডের অধিনায়ককে আজ রাতেই (কারণ ৪নং ডিভিশনের সঙ্গে ৪৮নং ব্রিগেডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল) দ্রুত এবং দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ করে, যে কোন প্রকারেই হোক উক্ত সড়কটি পরিষ্কার করতে আদেশ দিয়েছি।

(ঙ) সেন্‌জে-তে আপনি শত্রু কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারেন। (এই আশঙ্কার কথা আমার দিন দশেক পূর্বের যুদ্ধ-সংক্রান্ত নির্দেশেই তাঁকে জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।)

(চ) যথাসাধ্য লড়াই চালিয়ে যাওয়াই এখন আপনার একমাত্র পথ।

(ছ) ১৮ তারিখ সকাল নাগাদ অতিরিক্ত দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য বম্‌ডি লা-য় পৌঁছবে।

(জ) যোগাযোগের পথ পরিষ্কার রাখার জন্য যতদূর সম্ভব ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সহায়ক অস্ত্রাদি ব্যবহার করুন।

[এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। ১৭ এবং ১৮ তারিখে জেনারেল থাপার ও লেঃ জেনারেল সেন আমার সঙ্গেই ছিলেন। এই সময়ে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশই আমি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাঁদের সমর্থন সহকারে প্রদান করি।]

বেশ কিছুদিন পর জানতে পারি, ১৭ তারিখেই কোন এক সময় পাঠানিয়া, পশ্চাদ্দেশ থেকে তাঁর বিচ্ছিন্ন[২৬] হয়ে পড়বার আশঙ্কা এবং ডিভিশন ও ৬৫নং ব্রিগেডের অবস্থান দু'টির সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা ৬২নং ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার হোশিয়ার সিং-কে বলেছিলেন, এবং সেই রাতেই তাঁর পশ্চাদপসরণ করে এসে দিরোঙ জোঙ-এর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিকে শক্তিশালী করে তোলা উচিত বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য ইতিমধ্যেই হোশিয়ার সিং পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দিরোঙ জোঙ-এ। তাই সে লা'য় অনেক পরিশ্রমে গড়ে তোলা নিজের শক্তিশালী ঘাঁটিটি ছেড়ে পিছু হঠবার প্রস্তাবে প্রথমটা তিনি আপত্তি করেন। কিন্তু পাঠানিয়ার জিদের কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বলেন, এই বিরাট ধরনের একটি সৈন্য অপসারণের জন্য অন্ততঃপক্ষে দু'দিনের প্রস্তুতির প্রয়োজন; তাই পশ্চাদপসরণ করতে তাঁর অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগবে। পাঠানিয়া কিন্তু অবিলম্বে তাঁর সৈন্য অপসারণের ভয়ানক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বারংবার বলতে থাকেন। অগত্যা হোশিয়ার সিং নিজের উৎকৃষ্টতর বিচার-বিবেচনার বিরুদ্ধে সেই রাতেই যথাশীঘ্র সম্ভব সৈন্য অপসারণ করতে শুরু করে দেন।

আমার নির্দেশের প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধেই পাঠানিয়া পশ্চাদপসরণের আদেশটি প্রদান করেন। আমার নির্দেশ ছিল, বর্তমান ঘাঁটিটি তাঁকে যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবে; এবং কোনমতে আর রক্ষা করা সম্ভব না হলে একমাত্র তখনই পশ্চাদপসরণ করবেন।

সেন্‌জে-তে পৌঁছে ব্রিগেডিয়ার হোশিয়ার সিং দেখেন তাঁর অফিসর ও জোয়ানদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তবু পরিস্থিতি পুনর্বিন্যাসের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। পাল্টা আক্রমণ চালাবার সময় লেঃ কর্নেল ভট্টাচার্য চীনাদের হাতে

২৬। পশ্চাদ্দেশ থেকে শত্রুরা তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে বলে পাঠানিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করলে হোশিয়ার সিং জবাবে বলেছিলেন, সেক্ষেত্রে শত্রুরা নিজেরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্কট এবং সে লা রক্ষার সমস্যা, দু'টিরই তিনি মোকাবিলা করতে পারবেন বলেও হোশিয়ার সিং পাঠানিয়াকে জানিয়েছিলেন।

বন্দী হন। সেই রাতেই নাইয়ুকামাদোঙ-এর সংলগ্ন শৈলশিরাটি চীনারা আক্রমণ করে। ১৮ তারিখ সকালে ২নং সেতুর উপর শত্রুপক্ষ গোলাবর্ষণ শুরু করে দেয়। নদী পার হবার পর ব্রিগেডটি তখন সেতুটিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছিল।

সে লা ও দিরোঙ জোঙ-এর ভিতরে চীনারা কীলকাকারে প্রবেশ করেছিল। পশ্চাদপসরণের সময় অর্ধেক পথ যেতেই ব্রিগেডটি সড়কের উপরেই চীনাদের মেশিনগান ও মর্টার আক্রমণের মুখে পড়ে যায়। গাড়ীগুলি নিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় এবং গাদাগাদি করে থাকার ফলে বহু সৈন্য এখানে হতাহত হ'ল আমাদের। কী যে ঘটছে কেউই বুঝতে পারে নি। আদেশ ও প্রত্যাদেশ চলতে থাকে একধার থেকে। অনেকেই অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি ও বেতার-যন্ত্রাদি ফেলে প্রাণ বাঁচাবার জন্য সংলগ্ন পাহাড়গুলিতে পলায়ন করে। অপরিষ্কার দূষিত জল ছাড়া খাদ্য বা পানীয় কিছুই জোটে না তাদের। দারুণ শীতে ওই ভাবেই তারা রাত কাটায়। এই রকম ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সে লা পরিত্যাগের আদেশ দিয়ে পাঠানিয়া তাদের এই দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত করেন।

অন্যান্য কারণের সঙ্গে, কয়েকজন সেনানায়কের অকর্মণ্যতার ফলেই আমাদের এই দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়। (অবশ্য উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও ছিল; যেমন, ৪নং গাড়োয়াল বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসর অপূর্ব নেতৃত্বের পরিচয় দেন। আর একজন হলেন ৪নং রাজপুত বাহিনীর পরোলোকগত লেঃ কর্ণেল অবস্থি। ইচ্ছা করলেই তিনি নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করতে পারতেন। কিন্তু তা' না করে, সেন্‌জে এবং দিরোঙ জোঙ-এর মধ্যে নিজের লোকজনদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, এবং শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন।)

১৮ই নভেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটায় পাঠানিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে, আবার তিনি সে লা থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন আমার কাছে। (থাপার ও সেন তখনও আমার সঙ্গেই ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে) অনিচ্ছাভরে অনুমতি দিলাম। না দিয়ে গত্যন্তর ছিল না; বিশেষ করে পাঠানিয়া যখন জানালেন, সে লা'র উভয় পার্শ্বে 'ভীষণ' (sic) যুদ্ধের পর ৬২নং ব্রিগেড ১৭ তারিখের রাত থেকেই পশ্চাদপসরণ শুরু করে দিয়েছে। পরে জানতে পারি, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া (যেমন

৪নং গাড়োয়াল) সে লা'য় আদৌ কোন 'ভীষণ' যুদ্ধ হয় নি। ৪নং ডিভিশনের কাছে এখানে পাঁচটি ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ন, এক ব্যাটারি কম গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ফিল্ড রেজিমেণ্ট, এবং ব্রিগেড গ্রুপের পক্ষে আবশ্যকীয় যাবতীয় সহায়ক আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ কোন প্রতিরোধ ছাড়াই সে লা পরিত্যক্ত হ'ল। এ ছাড়া, এক সপ্তাহেরও বেশী মজুত রসদ তো ছিলই।

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, সে লা থেকে পশ্চাদ্‌পসরণের জন্য হোশিয়ার সিং পাঠানিয়াকে চাপ দেন নি; পাঠানিয়াই চাপ দিয়েছিলেন হোশিয়ার সিংকে। বস্তুতঃ, নিজের জনৈক স্টাফ অফিসরের পরামর্শ মতোই পাঠানিয়া দিরোঙ জোঙ-এ তাঁর ঘাঁটিটিকে শক্তিশালী করার জন্য সে লা'র সুদৃঢ় ঘাঁটিটি পরিত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবং এটা করতে গিয়ে উভয় কূলই বিনষ্ট হ'ল তাঁর। (একই সঙ্গে তিনি শৌর্য, সে লা, দিরোঙ জোঙ এবং বম্‌ডি লা—সব কিছু হারালেন)। নিফার অন্যান্য স্থানে আমাদের পরাজয়ের কারণ ছিল চীনাদের উন্নততর সাজসরঞ্জাম ও আমাদের নানাবিধ অস্থবিধা। কিন্তু এখানে পাঠানিয়া ও তাঁর কয়েকজন সেনানায়কই আমাদের বিপর্যয়ের কারণ ছিলেন।

সে লা অধিকারের অত্যল্পকাল পরেই চীনারা দিরোঙ জোঙ ও বম্‌ডি লা-য় আমাদের ঘাঁটিগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অঞ্চল দু'টিকে চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই ১৮ তারিখ সকালে ৬৫নং ব্রিগেড এবং ৪নং ডিভিশনের সদর দপ্তর দিরোঙ জোঙ পরিত্যাগ করে।

দিরোঙ জোঙ-বম্‌ডি লা সড়ক ধরে ৪নং ডিভিশনের জি. ও. সি. পশ্চাদপসরণ শুরু করেছিলেন। পথিমধ্যে কিছু শত্রুর বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে; তবে কতটা যুদ্ধ হয়েছিল তা' নির্ণয় করতে আমি সক্ষম হই নি। যাই হোক, নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি প্রধান সড়ক পরিত্যাগ করে মান্‌দালা-র পায়ে-চলা পথ ধরে ফুটহিল্‌স্‌-এর দিকে পিছু হঠতে আরম্ভ করেন।

শুনেছি কিছুসংখ্যক চীনা আমাদের সামরিক পোষাক [২৭] পরিধান করে উক্ত দলের সঙ্গে মিশে যায়, এবং নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য হিন্দীতে আদেশ প্রদান করতে থাকে। আমাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব

২৭। সম্ভবতঃ আমাদের মৃত সৈনিকদের দেহ থেকে তারা পোষাকগুলি খুলে নিয়েছিল।

ছিল না ; কারণ আমাদের মধ্যে চীনা-ভাষায় কথা বলতে পারে এমন একজনও ছিল না। দিরোঙ জোঙ এবং প্রধান সড়ক পরিত্যাগের সময় পিছনে পড়ে থাকা সৈনিকদের প্রতি পাঠানিয়া কী আদেশ দিয়েছিলেন জানি না। এই ভাবে, বিশেষ কোন রক্তপাত বিনাই দিরোঙ জোঙ ও সে লা'র পতন হ'ল।

সুবিখ্যাত ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের পক্ষে ঐটি ছিল চরম দুর্ভাগ্য-জনক। এই বাহিনীটির অধিনায়কত্ব করবার সৌভাগ্য এক সময় আমার হয়েছিল। ১৯৫৬-৫৯ সালে যে বাহিনীকে আমি দেখেছিলাম, ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে সে বাহিনী আর তা' ছিল না। কয়েকটি ব্রিগেড এবং ব্যাটেলিয়ন ছিল নতুন। অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে ডিভিশনটি যুদ্ধ করতে পারে নি। (এ. এস. পাঠানিয়াকে এই ডিভিশনের অধিনায়কত্ব থেকে অপসারিত করা হয়, এবং সরকার তাঁকে সেনাবাহিনীর বাইরে অন্য একটি কার্যভার প্রদান করেন।)

বম্‌ডি লা-র যুদ্ধ

সে লা ও ফুটহিল্‌স্‌-এর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বম্‌ডি লা অবস্থিত। অনেক বিলম্বে, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ ব্রিগেডিয়ার গুরুবক্‌স্‌ সিং-এর অধীনে ৪৮নং ব্রিগেডকে বম্‌ডি লা প্রতিরক্ষার জন্য সন্নিবেশিত করা হয় কিন্তু এই কঠিন অবস্থান স্থলটি রক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ কোন সাজসরঞ্জামাদি তাঁকে দেওয়া হয় নি। বরং রসদ ও সমর-সম্ভার সরবরাহের তালিকায় তার স্থান যে সবার শেষে, সে কথাটি ৩নং ডিভিশন ৪৮নং ব্রিগেডকে জানিয়ে দেয়। ১১ই নভেম্বর তারিখে ৪নং ডিভিশন, এই ব্রিগেডকে ১৩ই নভেম্বরের মধ্যে পোশিঙ লা নামক একটি চৌকিতে এক কোম্পানী সৈন্য সমাবেশের জন্য একটি অবিবেচনা প্রসূত আদেশ প্রদান করে। ইতিপূর্বেই একটি প্ল্যাটুনকে উক্ত স্থানে পাঠানো হয়েছিল। ৪৮নং ব্রিগেড তাই আরও দু'টি প্ল্যাটুন্‌ ১২ এবং ৩ তারিখে সেখানে প্রেরণ করে। পোশিঙ লা-তে ১৪ তারিখের মধ্যেই যে ৫নং গার্ডবাহিনীর একটি কোম্পানীকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সে কথাটাও ৪৮নং ব্রিগেড ৪নং ডিভিশনকে জানিয়ে দেয়। পরে প্রায় এক ব্রিগেড শত্রু সৈন্য এই চৌকিটিকে আক্রমণ করে দখল করে নেয়। (এটি এবং পরবর্তী আক্রমণের সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছয় অনেক দেরীতে।)

এর পর চীনারা বম্‌ডি লা ও দিরোঙ জোঙ-এর দিকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে আসতে থাকে।

১৫ তারিখে ৪নং ডিভিশন, ৪৮নং ব্রিগেডকে থেম্‌বঙ-এ এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের একটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে পোশিঙ লা পুনরাধিকারের আদেশ দেয়। ৫নং গার্ডবাহিনীকে পাঠানো হয় এই কাজের জন্য। ৪৮নং ব্রিগেডের বামপার্শ্ব রক্ষার জন্য ৬৫নং ব্রিগেডকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৬ তারিখের মধ্যে থেম্‌বঙ-এ পৌঁছে ৫নং গার্ডবাহিনীর কমাণ্ডার একটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করতে শুরু করেন, এবং একটি কোম্পানীকে পোশিঙ লা-র পথে আগেই প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে শত্রুরা আমাদের দিকে আরও অগ্রসর হয়ে এসেছে। ৪নং ডিভিশন তখন ৪৮নং ব্রিগেডকে ৫নং গার্ড-বাহিনীর সাহায্যে থেম্‌বঙ রক্ষা করতে আদেশ প্রদান করে। কিন্তু ৫নং গার্ড-বাহিনী এই ঘাঁটিটি রক্ষা করতে নিজেদের অসামর্থ্যের কথা জানালে, ব্রিগেড অধিনায়ক তাদের বম্‌ডি লা-য় পিছু হঠে আসতে বলেন।

চীনারা ইতিমধ্যে তাদের পশ্চাদপসরণের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ফলে বাহিনীটি শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ফুটহিল্‌স্‌-এ এসে পৌঁছয়। ৫নং গার্ডবাহিনীকে পিছু হঠিয়ে দিয়ে শত্রুরা ১৭ তারিখ রাত ন'টা নাগাদ বম্‌ডি লা-র প্রায় ছয় কিলোমিটার উত্তরে একটি স্থানে প্রায় ৪০০ সৈন্য নিয়ে আমাদের বম্‌ডি লা-দিরোঙ জোঙ সড়কটি বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একটু পরেই ৪৮নং ব্রিগেডের অধিনায়ক উক্ত পরিস্থিতির বিষয় আমাকে জানিয়ে বলেন, ৪নং ডিভিশনের অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সময়ই হ'ল আসল কথা। তাই সেই রাতেই দ্রুততার সঙ্গে প্রবল বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করে সড়কটি শত্রুমুক্ত করতে আদেশ দিলাম তাঁকে। আমার আশঙ্কা ছিল, চীনারা উক্ত স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে বম্‌ডি লা-য় আমাদের অবস্থা সঙ্কটজনক করে তুলবে। তাঁকে জানালাম, পরিস্থিতি সামলাবার জন্য ১৮ তারিখের মধ্যে অতিরিক্ত সাহায্য হিসাবে দু'টি ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ন (৬/৮ নং গোরখা রাইফেল্‌স্‌ এবং ৩নং জম্মু ও কাশ্মীর রাইফেল্‌স্‌) সেখানে পাঠাচ্ছি। ৪৮নং ব্রিগেডের অধিনায়ক উত্তরে বললেন, বম্‌ডি লা-য় যেখানে ১৬টি কোম্পানী থাকা উচিৎ, সেখানে রয়েছে মাত্র ৬টি; এবং এই সৈন্য ঘাটতির দরুন বম্‌ডি লা-র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপদাপন্ন না করে, আমার নির্দেশ পালনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করা

সম্ভব হবে না। তার পরিবর্তে তিনি আক্রমণাত্মক টহলদারী ব্যবস্থা চালু রাখবার সুপারিশ করলেন। সামান্য যে কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী তাঁর কাছে ছিল (দু'টি কার্যক্ষম ট্যাঙ্ক), সেগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার করে সম্ভব হলে দিরোঙ জোঙ-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পরামর্শ দিলাম তাঁকে।

পরদিন সকাল ১১টায় দিরোঙ জোঙ-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যতক্ষণে দু'টি ইন্‌ফ্যানট্রি কোম্পানীর একটি দল, দু'টি ট্যাঙ্ক ও মোট চারটি পার্বত্য কামানের মধ্যে দু'টি নিয়ে রাস্তার উপর সমবেত হয়েছে, ততক্ষণে চীনারা ৪৮নং ব্রিগেডের পরিত্যক্ত স্থানটি দখল করে নিয়ে আমাদের কামান সংস্থান এবং প্রশাসনিক অঞ্চলের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয়।

১৮ তারিখের দুপুর নাগাদ ৩নং জম্মু ও কাশ্মীর ইন্‌ফ্যানট্রি বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসর নিজের সহকারী ও একটি অগ্রবর্তী দল নিয়ে বম্‌ডি লা-য় উপস্থিত হন। ব্যাটেলিয়নটির অবশিষ্ট অংশ পিছু-পিছু আসতে থাকে। এদিকে, ৪৮নং ব্রিগেডের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ৬/৮ নং গোরখা রাইফেল বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নটি এগিয়ে আসছিল। কিন্তু সংকটজনক অবস্থা থেকে বম্‌ডি লা-কে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেখানে দ্রুত না গিয়ে, চাকোতেই তারা থেমে যায়। অথচ, ১৮ তারিখ সকালের মধ্যেই বাহিনী দু'টি অনায়াসে বম্‌ডি লা পৌঁছতে পারতো, এবং সে ক্ষেত্রে সঙ্কটও এড়ানো যেত সহজেই।

শিখ লাইট ইন্‌ফ্যানট্রি বাহিনী তাদের পূর্ব অবস্থান স্থলে আর ফিরে যেতে না পেরে কিছু হঠে আসে। বম্‌ডি লা-র চার পাশের উচ্চস্থানগুলি ইতিমধ্যে শত্রুরা দখল করে নিয়েছিল। ফলে অন্যান্য বাহিনীগুলিও বিনা আদেশেই পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করে দেয়। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে দেখে ব্রিগেড অধিনায়ক, ব্রিগেডিয়ার গুরবক্‌স্ সিং কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ রূপা-য় ফিরে এলেন। সেখানে ৬/৮নং গোরখা রাইফেল বাহিনীর অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। কিন্তু গোরখা বাহিনী কেন বম্‌ডি লা অবধি যায় নি, ব্রিগেড অধিনায়কের এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর গোরখা বাহিনীর অধিনায়কের কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

রূপা-য় পৌঁছবার পর ব্রিগেড অধিনায়ক জানতে পারেন, তাঁর কিছু লোকজন তখনও বম্‌ডি লা-য় রয়ে গেছে। সেই রাতেই তিনি সেখানে ফিরে গিয়ে (পরে তিনি আমাকে একথা বলেছিলেন) দেখেন, তাঁর দলের প্রায়

দু'শ জন জওয়ান বম্‌ডি লা-র বিমান ক্ষেত্রটির কাছে গাদাগাদি করে রয়েছে। ভোর হবার আগেই গুরবক্‌স্‌ সিং তাদের রূপা-য় ফিরিয়ে আনেন।

১৮ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় তেজপুরে খবর পেলাম সেদিন বিকেলেই বম্‌ডি লা-র পতন হয়েছে। শুনেই মনে হ'ল এই সঙ্কট মুহূর্তে পশ্চাদবর্তী সদর দফতরে বসে থাকার[২৮] কোন অর্থ হয় না। সুতরাং ৩০ মিনিটের মধ্যেই তেজপুর ত্যাগ করে রাত ৯টা নাগাদ ফুটহিল্‌স্‌-এ পৌঁছলাম। পথে দেখলাম কাতারে কাতারে আসছে মানুষ আর যানবাহন।

১৯ তারিখ সকালে ফুটহিল্‌স্‌ থেকে বম্‌ডি লা যাবার সময় দেখলাম সারাটা পথ জুড়ে দলে দলে উদ্বাস্তু ও সৈনিকরা ফিরে আসছে। সেই ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে অতি ধীরে ধীরে এগুতে হ'ল। অথচ কোন রকমে যদি অবস্থা সামলানো যায় সেই আশায় যথাসম্ভব দ্রুত যেতে চাইছিলাম। যাই হোক, পথপার্শ্বস্থ টেলিফোনের তারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে 'কোর' সদর দফতর ও রূপা-র মধ্যে বহু কথোপকথন শুনে নিলাম। পশ্চাদপসরণ সম্বন্ধে এতক্ষণে বেশ একটা সুস্পষ্ট ধারণা হ'ল। একই উপায়ে আমিও কতকগুলি নির্দেশ প্রদান করলাম।

ফুটহিল্‌স্‌ এবং বম্‌ডি লা-র মধ্যস্থিত চাকো-র কাছাকাছি পৌঁছে শুনলাম সে লা ও বম্‌ডি লা-র শক্তি বৃদ্ধির জন্য (তাদের পতনের পর!) ৫নং ডিভিশন ফুটহিল্‌স্‌-এ এসে পৌঁছেছে। উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল কে. কে. ভাণ্ডারীর সঙ্গে দেখা হ'ল। সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতির কথা তাঁকে জানালাম।

সেই দিনই বেলা এগারোটার সময় ৪৮নং ব্রিগেড কর্তৃক টেঙ্গো উপত্যকায় অবস্থিত রূপা পরিত্যক্ত হয়েছিল। কয়েকজন ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিক এবং আরও বহু লোককে ফিরে আসতে দেখলাম। অগ্রসরমান শত্রুর দিকে আমাকে যেতে দেখে কোন সাংবাদিক নিশ্চয়ই অনুমানের ভিত্তিতে বি. বি. সি'র কাছে কোন বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। কারণ, সেই দিনই বি. বি. সি'র সান্ধ্যকালীন সংবাদে শত্রু-হস্তে আমার বন্দী হবার সংবাদ প্রচারিত হয়।

১৯ তারিখে ৪৮নং ব্রিগেড চাকোতে অবস্থিত তার ইউনিটগুলির জন্য

২৮। আমার সৈনিকেরা তখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এমত অবস্থায় যেকোন সেনাধ্যক্ষের পক্ষেই তাদের পাশে যেয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক।

গোলাগুলি, রেশন ও খনন যন্ত্রাদি চেয়ে পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি প্রেরণ করি; এবং পথিমধ্যে যাতে বিলম্ব না ঘটে সে জন্য পিছু পিছু লেঃ কর্ণেল সাহবেগ সিংকে পাঠাই। সাহবেগ সিং চাকো ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে যান; এবং স্বীয় দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট তৎপরতা ও সাহসের পরিচয় প্রদান করেন। সেই রাতেই চীনারা চাকো আক্রমণ করে ৬/৮নং গোরখা এবং ৩নং জম্মু ও কাশ্মীর বাহিনী দু'টিকে পর্যদুস্ত করে ফেলে।

আমি, লেঃ জেনারেল সেন এবং জেনারেল থাপার, এই তিনজনের পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতিক্রমেই কোর সদর দফতরটিকে তেজপুর থেকে গৌহাটিতে স্থানান্তরিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০ তারিখ বিকেলেই অপসারণের কাজটি সম্পন্ন করা হ'ল। অবশ্য আসামের রাজ্যপালের উপদেষ্টা লুথরা, ব্রিগেডিয়ার কে. কে. সিং এবং আরও দুই তিন জনের সঙ্গে আমি তেজপুরে রয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। লুথরা সে সময় আমার সঙ্গেই ছিলেন। অথচ সেনাবাহিনীর ভিতরে ও বাইরে গুজব রটনাকারীরা বলতে থাকে, আমি না কি সেই দিনই, অথবা কিছু পরে গৌহাটি চলে যাই। এটি ছিল সর্বৈব মিথ্যা। হীন অপপ্রচার এবং কুৎসা রটনা করাই তখন লোকের কাজ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ধেবর আগেই তেজপুর পৌঁছেছিলেন। ধেবর এসেছিলেন কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকের পুনর্বাসন এবং আরও কয়েকটি কাজে। ওয়ালঙ্, সে লা ও বম্‌ডি লা পতনের পর তেজপুরের ডেপুটি কমিশনারকে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি জ্ঞাপন করলাম। পরে শুনি, সেই দিন বিকেলেই ...নানুমতিতে তিনি সপরিবারে বিমানযোগে কলকাতা চলে যান।

চা বাগিচার ইংরেজ মালিকদের প্রতিনিধিগণ সামরিক পরিস্থিতির অবনতিতে সপরিবারে তাঁদের বর্তমান স্থানেই অবস্থান করবেন, না অন্য কোন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে চলে যাবেন, সে বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইলেন। নারী ও শিশুদের জীবনরক্ষার্থে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে দিয়ে, অন্যদের নিজ নিজ স্থানে থাকার পরামর্শ দিই। পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন তাঁরা। ওই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা যে খাঁটি ব্রিটিশ-সুলভ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

১৮ থেকে ২০শে নভেম্বর

১৮ তারিখে তেজপুরে থাকতেই থাপার আমায় বলেছিলেন যে, (লাদাক ও নিফায়) আমাদের এতগুলি সামরিক বিপর্যয় ঘটে যাওয়ায়, সরকারকে হয়তো জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে ; এবং সে ক্ষেত্রে যদি তাঁর পদত্যাগে কোন লাভ হয়, তবে তিনি নেহ্‌রুর কাছে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করবেন। জবাবে বলেছিলাম, এসব কিছুই করবার দরকার হবে না তাঁর। বিমানযোগে তেজপুর থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের সময় ব্রিগেডিয়ার পালিতকেও থাপার তাঁর এই চিন্তার আভাস দেন। পালিত প্রথমে এসবের কোন প্রয়োজন নেই বলেই মন্তব্য করেন। কিন্তু পরে চিন্তা করে বলেন, যদিও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে নেহ্‌রু প্রধান সেনাপতির পদত্যাগপত্র কখনই গ্রহণ করবেন না, তথাপি পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করাটা তাঁর পক্ষে একটা প্রশংসনীয় মনোভাবের পরিচায়ক হবে। সেই রাতে দিল্লী পৌঁছেই থাপার সোজা নেহ্‌রুর বাসভবনে চলে যান, এবং তাঁকে বলেন, সাম্প্রতিক বিপর্যয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে নেহ্‌রু অথবা সরকারের কোন সুবিধা হলে, তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু পদত্যাগ করার আদৌ কোন প্রয়োজন রয়েছে কি না সেটা নেহ্‌রু থাপারকে পরে জানাবেন বলেন। পরদিন মন্ত্রী পরিষদের সচিব এস. এস. খেরা থাপারের সঙ্গে দেখা করে জানান, নেহ্‌রু তাঁর পদত্যাগের প্রস্তাবটির সদ্ব্যবহার করতে মনস্থ করেছেন। অতঃপর থাপার নিজের কার্যকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই অবসর গ্রহণের অনুরোধ দাখিল করেন, এবং সেটি মঞ্জুর হয়। এইভাবে রাজনীতির যূপকাষ্ঠে থাপার বলি হলেন।

চাকুরীগত প্রবীণতার ভিত্তিতে নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে থাপার পরবর্তী প্রবীণ জেনারেল লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর নাম সুপারিশ করেন। লেফ্‌টনাণ্ট্‌ জেনারেল হিসাবে চৌধুরীর চাকুরীকাল ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এবং অবসর গ্রহণের আদেশও তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবতা এগিয়ে এলেন তাঁর উদ্ধারের জন্য। সামরিক কর্মজীবনে আর কোন জয়মাল্য লাভের আশা যেখানে তাঁর ছিল না, সেখানে অকস্মাৎ জুটে গেল প্রধান সেনাপতির পদ। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যলাভ তাঁর সম্ভব হ'ল ভগবৎ কৃপাতেই। এ ঘটনা ঘটলো ২০শে নভেম্বর তারিখে। পরিস্থিতির এমনি পরিহাস যে, তাঁকে দিল্লীতে ফিরিয়ে

নিয়ে এসে সামরিক সদর দফতরে (কর্মব্যস্ততার কেন্দ্রে) কোন যোগ্য কাজে নিযুক্ত করার জন্য কয়েকদিন আগেই চৌধুরী থাপারকে অনুরোধ করেছিলেন। কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল, পুনায় আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষ হিসাবে বৃথাই তিনি সময় নষ্ট করছেন। থাপার এই বিষয়ে নিজের কয়েকজন মুখ্য স্টাফ অফিসরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ নিজের আত্মশ্লাঘার জন্য চৌধুরী দলের আদর্শ-সদস্য হতে পারবেন না বলে দিল্লীতে এনে তাঁকে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার প্রদান করতে কেউই থাপারকে পরামর্শ দেন নি। সুতরাং চৌধুরীকে দিল্লী থেকে দূরে রাখাই স্থির করেছিলেন থাপার। কিন্তু ইতিমধ্যে ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন চৌধুরীর প্রতি।

পরিস্থিতি তখনও সঙ্গিন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভাগ্যে আর কোন্ কোন্ দুর্বিপাক লেখা রয়েছে, অথবা চীনারা তাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখবে কি না সে সম্বন্ধে চৌধুরী তো দূরের কথা, কেউই যখন নিঃসংশয় নন, চৌধুরী তখন ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েন, এবং আমাদের সেনাবাহিনীর লোকবল ও সমর-সম্ভারের নিদারুণ ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে কতদিন তিনি প্রধান সেনাপতির পদে টিকে থাকতে পারবেন সে সম্বন্ধে থাপারের ধারণা জানতে চান। অথচ এই চৌধুরীই গৌরবের প্রোজ্জ্বল শিখা নিজের পশ্চাতে রেখে গেছেন বলে স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেছে। থাপার অবশ্য তাঁকে আশ্বাস প্রদান করেন, এবং অহেতুক চিন্তাগ্রস্ত হতে নিষেধ করে বলেন, চরম যা কিছু ঘটবার, তা' ঘ'টে গেছে ; এবং সমতল-ভূমিতে বিনা প্রতিরোধে চীনাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে বলে তাঁর মনে হয় না। ভাগ্যদেবতা এরপর আরেকবার চৌধুরীকে রক্ষার জন্য আবির্ভূত হলেন। অকস্মাৎ চীনারা একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলো এবং আমাদের যে সমস্ত এলাকার উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছিল, সেগুলি থেকে পশ্চাদপসরণ করলো। চৌধুরীরও রূপান্তর হতে দেরী হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একজন 'বলিষ্ঠ' প্রধানসেনাপতিরূপে জাহির করলেন এবং লোকের মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করলেন, যেন অতীতের দলাদলি ও দুর্বল নেতৃত্বে অবসন্ন একটি সৈন্যবাহিনীকে মন্ত্রবলে তিনি 'নবজীবন দানে বদ্ধপরিকর'। এই অভিমতটি অবশ্য কানাঘুষার মধ্যেই সীমিত রইল। চৌধুরীর মতো সুযোগ-সন্ধানী দুর্লভ। তার উপর পরিস্থিতিও তাঁর আনুকূল্য করতে থাকে। (এর পরেই আমাদের জনৈক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা একটি বিবৃতি প্রদান করেন যার

সারমর্ম হ'ল, চীনাদের হাতে আমরা যে সমস্ত এলাকাগুলি হারিয়েছি সেগুলি পুনরাধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশেষ একটি শহরে প্রবেশ করবেন না। এমনই বিড়ম্বনা যে, প্রায় চার বছর পরেও এই প্রতিশ্রুতি আজ অবধি পূর্ণ হয় নি। জানিনা উক্ত রাজনীতিবিদ সেই শহরে এর পরে প্রবেশ করেছেন কি না।)

আমাদের নেতাদের মনে রাখা কর্তব্য যে, উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম দিয়ে এবং দক্ষ সেনানায়কদের অধীনে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রাদিতে শিক্ষিত করে একটি অতিরিক্ত সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে বেশ কয়েক বৎসর সময় লাগে। অতীতেব ভুল থেকে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এবং নীরবে সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে উপযুক্ত সময়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় প্রদান করতে হবে। নিজের ঢাক নিজে বাজালে তাতে আমরাই শুধু বিভ্রান্ত হতে পারি; অন্য কেউ হবে না। চীন কিংবা পাকিস্তান অথবা অন্য কোন শক্তি আমাদের কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করবে তখনই, যখন আমরা যথার্থই শক্তিশালী হবো। শূন্যগর্ভ আওয়াজকে কেউ-ই আমল দেবে না। এবং মাও সেতুং-এর মতে 'বন্দুকের নল থেকেই জন্ম হয় শক্তির'।

মোটের উপর সারা দেশটাকেই বোঝানো হয়েছিল যে, বিশেষ কয়েকজন সেনানায়কের ব্যক্তিগত অক্ষমতার কারণেই ১৯৬২ সালের সামরিক বিপর্যয় ঘটে। (সেনাবিভাগের বারংবার পরামর্শ উপেক্ষা করে যে সরকার বছরের পর বছর ধবে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত অবস্থায় রেখেছিলেন, সামগ্রিকভাবে সেই সরকারের অক্ষমতার জন্য নয়। (?))

২১শে নভেম্বর (ক)

সে লা, বম্‌ডি লা, রূপা ও চাকো-র পতন হ'ল। তার আগেই হাতছাড়া হয়েছিল ঢোলা, তাওয়াঙ এবং ওয়ালঙ। লাদাকেও অনুরূপ বহু বিপর্যয় ঘটলো। তারপর অকস্মাৎ চীনারা ঘোষণা করলো একতরফা যুদ্ধ-বিরতির। সাম্প্রতিক এই বিপর্যয় ও যুদ্ধবিরতি, তার উপর অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতেও এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি এবং আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত অপপ্রচার ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হ'ল সামরিক সদর দফতরের পরিবর্তিত প্রশাসন-ব্যবস্থা। এতগুলি এক সঙ্গে গলাধঃকরণ করা আমার পক্ষে হয়ে পড়ল কঠিন। ব্যাপারটি এত তীব্রভাবে আমায়

নাড়া দিয়ে গেল যে, চাকুরীর কার্যকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই অবসর গ্রহণের চিন্তাটা মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই রাতেই।

সমালোচকদের মতে জঙ্গী 'কোরে'র অধিনায়কত্বের ব্যাপারে আমার সম্যক অভিজ্ঞতার অভাবই ছিল নিফা-বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। এ থেকে একটি সঙ্গত প্রশ্ন ওঠে। সেটি হ'ল, পদস্থ সেনাপতিদের ক্ষেত্রে সম্যক অভিজ্ঞতা কি? আমি মনে করি, নেতৃত্বের গুণাবলী ও তত্ত্বগত পেশাদারী দক্ষতাকে যুদ্ধ অথবা শান্তিকালীন অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর তথা সেনাপতিত্বে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করার সুযোগগুলির সমাবেশেই অভিজ্ঞতা জন্মে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কিংবা কাশ্মীর লড়াইয়ের সময় উচ্চতর সামরিক পদগুলিতে নিযুক্তির ব্যাপারে অধিকাংশ ভারতীয় অফিসরেরই বয়স ছিল নিতান্ত কম। তাই মেজর অথবা লেঃ কর্ণেল[২৯] পদের ঊর্ধ্বে নিযুক্ত থেকে যুদ্ধ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তাঁদের অধিকাংশেরই হয় নি। আবার কয়েকজন ভারতীয় অফিসর কোন যুদ্ধ দেখার সুযোগ না পেয়েও লেঃ জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এ কথাগুলি বলে আমার কর্মজীবনের বিশেষ কোন দিকের উপর অযথা জোর দেবার চেষ্টা করছি না; কারণ সেটা যা' রয়েছে, তাই থাকবে। শুধু একটা কথা বলবো। সামগ্রিকভাবে কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা, সমসাময়িক কারও চাইতে কম ছিল না।

১৯৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে আমি যখন নিফা 'কোরে'র অধিনায়কত্ব গ্রহণ করি, তখন সে 'কোরে'র মোট শক্তি ছয় থেকে নয় ব্রিগেডের পরিবর্তে ছিল মাত্র দু'টি ব্রিগেড। এক পক্ষকাল পরেই ঢোলা-য় অবস্থিত ব্রিগেডটি শত্রু কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। পেশাগত যোগ্যতার দিক থেকে ব্রিগেডটি যদি নিম্নমানের হয়ে থাকে, অথবা কোন ভুল-ত্রুটি করে থাকে, তার জবাবদিহি করবার দায়িত্ব হ'ল ব্রিগেড অধিনায়ক, ব্রিগেডিয়ার দলভির। নিফায় আমার অধীনে আসার ঠিক আগেই এই ব্রিগেডটি (এবং পরে অন্যান্য

২৯। অতি উচ্চপদস্থ তিন জন অফিসরকে জানি, যাঁরা বিগত প্রায় বিশ বছরে কখনও গুলির আওয়াজ পর্যন্ত শোনেন নি, এবং যুদ্ধ-সংক্রান্ত যা' কিছু অভিজ্ঞতা তাঁরা লাভ করেছিলেন, তা' অপেক্ষাকৃত নিম্নপদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়েই। কিন্তু 'বিপুল' সামরিক অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বলে এঁরা ভান করে থাকেন (এবং অনেকে তা' স্বীকারও করেন)।

বাহিনীগুলি) অন্যান্য সমস্ত সংস্থার অধীনে কিছুকাল কাজ করেছিল। সুতরাং তাদের দুর্বলতার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিই দায়ী। তাদের প্রশিক্ষণের অভাব এবং নতুন জলবায়ুতে অনভ্যস্ততা অথবা সাজসরঞ্জামের ঘাটতি ইত্যাদি অসুবিধার জন্য সামগ্রিকভাবে দায়ী ছিলেন ভারত সরকার কিংবা সেনাবিভাগ। সেনাবাহিনীর অংশ হিসাবে আমিও এই সমষ্টিগত দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ; কিন্তু একাকী আমাকে এর জন্য দায়ী করা সঙ্গত নয়। অধিকন্তু আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। যে বাহিনী এই সেদিন মাত্র আমার অধীনে কাজ করতে এল, কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সমস্ত দুর্বলতা দূরীভূত করে অত্যাশ্চর্য কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার জবাবদিহির দায়িত্ব হ'ল যেদিন থেকে যেন-তেন প্রকারে সমাবেশিত সৈন্য-সংগঠন এবং দলগুলি আমার অধীনে এসেছে, সেই দিন থেকে ; এবং তাও গৌণতঃ। বস্তুতঃ, ওই স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যাপারে অধীনস্থদের জন্য সাধ্যমতো সব কিছুই করেছিলাম। পরিশেষে বলতে চাই, আমার কমাণ্ডের অধীনস্থ কোন সেনা-সংগঠন অথবা দলের কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ করি নি এবং তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাবিহিত অবহিত না করে সরাসরি কোন আদেশও প্রদান করি নি। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন ত্রুটিপূর্ণ আদেশের কারণেও নিফা, ঢোলা, তাওয়াঙ, সে লা, বমডি লা অথবা ওয়ালঙ-এর পতন হয় নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে উক্ত স্থানগুলি রক্ষা করতে আদেশ দিয়েছিলেন ; এবং স্থানগুলির পতনের কারণ ছিল আমার আয়ত্তের অতীত।

অধিকন্তু, ১৯৬২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের নিফা-যুদ্ধের দায়িত্ব উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে একমাত্র আমার উপরেই যে ন্যস্ত ছিল তা' নয়। আমার ঊর্ধ্বতন এবং নিম্নতন একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীও এর দায়িত্বে ছিলেন। বস্তুতঃ, সামরিক শ্রেণীবিন্যাস ছিল এইরূপ : সবার উপরে ছিলেন প্রধান সেনাপতি, এবং তাঁর অধীনে ছিলেন তিন জন আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষ। এই তিন জনের অন্যতম লেঃ জেনারেল সেনের উপর নিফাসহ সমগ্র পূর্বরণাঙ্গনের দায়িত্ব ছিল ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস থেকে। তাঁর অধীনে আবার ছিল দুটি 'কোর'—নাগাভূমি এবং আরও কয়েকটি এলাকার জন্য ৩৩নং 'কোর' এবং নিফার জন্য ৪নং 'কোর'। আমার 'কোরে' দুই জন

মেজর জেনারেলের অধীনে ছিল দু'টি[৩০] ডিভিশন। তাঁদের অধীনে আবার ছিল ব্রিগেডিয়ার পরিচালিত অনেকগুলি ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেড। সুতরাং অংশতঃ অথবা পূর্ণতঃ নিফা রক্ষার যৌথ দায়িত্ব ছিল আমার উপরস্থ এবং নিম্নস্থ এই সমস্ত উচ্চপদস্থ সেনানায়কদের। উদাহরণস্বরূপ, সে লা'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিটির পতনের জন্য দায়ী ছিলেন আমার অন্যতম ডিভিশন অধিনায়ক মেজর জেনারেল এ. এস. পাঠানিয়া। তা'ছাড়া, আমি নিফার কমাণ্ডে থাকাকালীন পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল সেন আমার প্রতিটি কাজকেই সমর্থন করেছেন; এবং কোন কাজে ভুল ধরেছেন বলে আমি অন্ততঃ জানি না। (আমি এখানে আসার আগে প্রায় আঠারো মাস যাবৎ নিফা ছিল তাঁরই অধীনে।) সুতরাং নিফা-বিপর্যয়ের জন্য তাঁরও দায়িত্ব রয়েছে। নিম্নতর পর্যায়ের ব্যর্থতার ফলে সংঘটিত বিপর্যয়ের জন্য সামগ্রিকভাবে কমাণ্ডকে দায়ী করে সেনাধ্যক্ষ এবং তদূর্ধ্ব ব্যক্তিগণকে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই কমাণ্ড থেকে অপসারণ করার নজির সামরিক ইতিহাসে রয়েছে অনেক। (ঠিক যেমনটি সেনের অধীনস্থ নিফা এলাকায় ঘটেছিল।)

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করা আশা করি অসঙ্গত হবে না। লাদাকের প্রতিরক্ষা দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল আমার সেই 'অধিকতর দক্ষ' সহকর্মীদের অধীনস্থ কমাণ্ডে একই সময়ে অনুরূপ বিপর্যয় ঘটা সত্ত্বেও, কেন তাঁদের প্রশংসা করা হ'ল 'শক্তিশালী প্রতিরোধ' গড়ে তুলেছেন বলে?

বস্তুতঃ নিফায় (অথবা লাদাকে) যা ঘটে, তা' ছিল সরকার এবং তার একাধিক সামরিক ও অসামরিক পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তির গাফিলতির ফল। এঁদের সকলের সঙ্গে আমিও এই বিপর্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি; তার বেশী নয়।

আসলে আমার সমালোচকদের উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করা। তাই তাঁরা এভাবে আমার বিরুদ্ধেই শুধু প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। অনুরূপ বিপর্যয়ের জন্য অন্যান্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একই প্রচার-কার্য চালালে তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত।

৩০। যুদ্ধ-বিরতির ঠিক আগে অবশ্য আরও কিছু অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী আমার কমাণ্ডের অধীনে আসে।

২১শে নভেম্বর (খ)

লোকজন সবাই চলে গিয়েছিল তেজপুর ছেড়ে। জেল আসামীদেরও অসামরিক কর্তৃপক্ষ মুক্তি প্রদান করলেন। টাকার নোটগুলি পুড়িয়ে ফেলার পর ব্যাঙ্কগুলিও বন্ধ হয়ে গেল।

২১ তারিখে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, 'বিজু' পট্টনায়ক এবং চালিহা[৩১] বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তেজপুর বিমান বন্দরে প্রায় একঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন।

১৮ থেকে ২২শে নভেম্বরের মধ্যে মেজর জেনারেল এ. এস. পাঠানিয়ার কোন সংবাদই পাই নি। যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছেন, না শত্রুহস্তে বন্দী হয়েছেন; নিফার জঙ্গলে কোথাও আটকা পড়ে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসের অভাবে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় দুর্দশায় পতিত হয়েছেন, না আহত অথবা অসুস্থ অবস্থায় তাঁর অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন,—কিছুই জানতাম না। তাই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। এখন যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায়, স্থির করলাম যে ভাবেই হোক তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে।

বিকেলে খবর পেলাম, ৪নং ডিভিশনের পশ্চাদপসরণকারী কিছু সংখ্যক সৈনিককে তেজপুরের উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়তলিতে অবস্থিত কালাকতঙে'র কাছে দেখা গেছে। একটি হেলিকপ্টার নিয়ে সেখানে যেতে মনস্থ করলাম। পাঠানিয়াকে শেষ কোথায় দেখা গেছে সে হদিস্ হয়তো তাদের কারও কাছ থেকেই মিলতে পারে। তাই থেকে তাঁকে খুঁজে বার করবার একটা সূত্রও হয়তো পেয়ে যেতে পারি। ঠিক সেই সময়েই হোমগার্ডের কমাণ্ডিং জেনারেল মানেকজী দিল্লী থেকে এসে আমার সাথে দেখা করলেন। সঙ্গে যেতে বলাতে, সানন্দে তিনি রাজী হলেন।

আমাদের বিমান বাহিনীতে সাহসী বৈমানিকের অভাব নেই। তাই উদ্দিষ্ট স্থানে যাবার জন্য হেলিকপ্টার পেতে কোন অসুবিধা হ'ল না। কালাকতঙে'র দিকে খানিকটা গিয়ে, বমৃডি লা-দিরোঙ জোঙে'র দিকে আমাদের হেলিকপ্টার উড়ে চললো। দুর্দশাগ্রস্ত লোকগুলিকে খুঁজতে খুঁজতে আমাদের বৈমানিক ওই অঞ্চলের প্রতিটি সম্ভাব্য পথ ধরে মাইলের পর মাইল হেলিকপ্টারটিকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। বহু

৩১। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যথাক্রমে উড়িষ্যা ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়।

সময় ধরে এমন সমস্ত অঞ্চলের উপর দিয়ে আমরা উড়ে গেলাম যেখানে শত্রুপক্ষের থাকার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। তা'ছাড়া লোকগুলির অন্বেষণের জন্য বেশ নীচু দিয়ে আমাদের উড়ে যেতে হচ্ছিল। অবস্থাটা দাঁড়াল যেন বুনো হাঁস তাড়া করার মতো। শেষপর্যন্ত ব্যর্থতা বরণ করে ফিরে এলাম। মনটা বেশ দমে গেল। মানেকজী তারপর দিল্লী ফিরে গেলেন।

তেজপুর বিমান-বন্দরে থাকতে থাকতেই অপর একটি হেলিকপ্টারের ভারপ্রাপ্ত জনৈক তরুণ বৈমানিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু'এক দিন পূর্বে পায়ে সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। তবু আমাকে নিয়ে আর একবার পাঠানিয়ার খোঁজে বেরুতে রাজী হলেন। বিচ্ছিন্ন লোকগুলিকে সঠিক কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করেছেন বললেন। তখন দিনের আলো শেষ হতে আধ ঘণ্টাটেক দেরী আছে। চাঁদও উঠবে বেশ রাত করে। সুতরাং ফিরতে ফিরতে হয়তো ঘোর অন্ধকার হয়ে যাবে। এ রকম অবস্থায় কেউ হেলিকপ্টার চালায় না। কিন্তু আমাদের এই বীর বৈমানিকটি বেশ আগ্রহ সহকারেই রাজী হলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর নামটি আমি ভুলে গেছি।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে বিমান চালনার পর ফুটহিল্‌স্-এ অবস্থিত উদলগিরির প্রায় পনের মাইল উত্তরে ভৈরপকুণ্ডের কাছে নামলাম। আমাদের কয়েকজন লোককে এখানে পাওয়া গেল। অমানুষিক কষ্ট করে দিরোঙ জোঙ থেকে এই স্থান অবধি তারা পদব্রজে এসেছে। পরিশ্রান্ত এবং বিস্রস্ত লোকগুলির পথে খাদ্যাদি প্রায় কিছুই জোটে নি। কয়েক মিনিট পর পাঠানিয়াও এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি কথাও মনে হ'ল। এই ব্যক্তিটির জন্যই নিফায়[৩২] আমাদের এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে।

দলের মধ্যে কয়েকজন আহত ব্যক্তিও ছিল। পাঠানিয়ার সঙ্গে তাদের দু'একজনকেও হেলিকপ্টারে তুলে নিলাম। প্রথমে আবছা-আলোয়, তারপর

৩২। আমার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের কথা শুনে মেজর জেনারেল এ. এস. পাঠানিয়া ৫ই ডিসেম্বর তারিখে আমাকে লেখেন: '...ঘটনাচক্রর শিকারে (আপনি) পরিণত হলেও, (আমাদের সাম্প্রতিক) বিপর্যয়ের পর আপনার এই কাজ অতি মহৎ ব্যক্তির মতোই হয়েছে ...পরোক্ষভাবে সম্ভবতঃ আমি আপনার অপদস্থ হবার কারণ...আপনার মানসিক অশান্তি এবং মর্ম-যন্ত্রণা আমি বেশ ভালো করেই কল্পনা করতে পারছি...।'

নিরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমরা উড়ে চললাম, এবং নির্ভীক বৈমানিকের সুদক্ষ বিমান চালনায় প্রায় ৪৫ মিনিট পর এসে অবতরণ করলাম তেজপুর বিমান ঘাঁটিতে।

চতুর্দিকের প্রচণ্ড চাপের ফলে কয়েকদিন আগেই মেনন সরকার থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তীব্র বিরোধিতার মুখেও তাঁকে মন্ত্রী-সভায় রাখার ফলে নেহ্রুর নিজের অবস্থাও সঙ্গিণ হয়ে পড়েছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মেননের দক্ষতা অনস্বীকার্য; কিন্তু সামরিক ব্যাপারে নিজের ত্রুটিপূর্ণ মতবাদেরই শেষ পর্যন্ত শিকার হয়ে পড়লেন। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, ঘটনাচক্রও এই নিঃসঙ্গ, চতুর ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছিল। ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তাঁর অতীতের সমস্ত দেশসেবার কথা লোকে ভুলে গেল; মনে রাখলো শুধু তাঁর ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে। মনুষ্য-স্বভাবের চপলতা অনুযায়ী, সুদিনে যারা তাঁর ভক্ত ছিল, দুর্দিনে তারাই দ্রুত তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

পরবর্তী ঘটনাগুলি বর্ণনা করার পূর্বে লাদাক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া সঙ্গত মনে করি। লাদাক অঞ্চলেও নির্মম চীনারা যেভাবে আমাদের পর্যুদস্ত করছিল সেকথা জানতে পেরে নিফাতে আমরাও সৈনিক তথা ভারতীয় হিসাবে মর্মান্তিক বেদনা বোধ করেছিলাম। সেখানেও আমাদের সৈনিকরা অতীব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধ করছিল। লাদাকে আমাদের সেনাবাহিনীর তথাকথিত 'দৃঢ়' প্রতিরোধের কথা বলে বেড়ানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল তুলনামূলক একটা বৈষম্য প্রদর্শন করে নিফাতে আমাদের তথাকথিত 'দুর্বল' প্রতিরোধের একটি চিত্র জমকালোভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা; এবং সেটা ছিল আমাকে অপদস্থ করার প্রচেষ্টায় বিবেকবর্জিত তার্কিকদের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দেশবাসীকে চিরদিনের জন্য ভ্রান্তপথে চালিত হতে দেওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ, নিফার মতো লাদাকেও আমাদের চরম ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। সেখানকার ঘটনাবলী পরবর্তী অনুচ্ছেদ-গুলিতে বর্ণিত হ'ল।

২০শে অক্টোবর সকালে দৌলত বেগ ওলদি অঞ্চলে নিক্ষেপ-সরবরাহে নিযুক্ত আমাদের একটি বিমান ভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত চীনাদের কুড়িটি বুলেট দ্বারা ঘায়েল হয়। বিমানচালক কারাকোরাম গিরিপথের কয়েক মাইল

নীচে দৌলত বেগ ওলদি-র কাছাকাছি আমাদের একটি ঘাঁটিকে চীনা সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পান। যে অঞ্চলে ঘাঁটিগুলি অবস্থিত ছিল, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠে আসতেও দেখা যায়। সন্ধ্যার মধ্যে উক্ত অঞ্চলের পাঁচটি ঘাঁটি চীনারা দখল করে নেয়। ১১৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডের নির্দেশে তখন আশে-পাশের অন্যান্য বাহিনীগুলি দৌলত বেগ ওলদি-র পিছনে সরে আসে। এখানকার আঞ্চলিক এবং 'কোর' অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে লেঃ জেনারেল দৌলত সিং এবং লেঃ জেনারেল বিক্রম সিং। ২৩ তারিখের মধ্যে এই পশ্চাদপসরণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

২১শে ও ২২শে অক্টোবর তারিখে আমাদের ১৮,৫৪০ পয়েণ্টে অবস্থিত ঘাঁটিটির পতন হ'ল। এই পতনের ফলে গালোয়ান-এর সঙ্কট ঘনিয়ে আসে এবং ২২ তারিখে চীনারা স্থানটি অধিকার করে। সিরি জাপ-এ অবস্থিত আমাদের ঘাঁটি দু'টিও খানিকক্ষণ যুদ্ধের পর রণে ভঙ্গ দেয়। এরপর পতন হয় কোংগা এবং চাঙ্‌-চেনমো নামক দু'টি ঘাঁটির। আনে লা এবং চারসে-তে অবস্থিত আমাদের সেনাদলকে ফোবরঙ-এ পশ্চাদপসরণ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৪ তারিখে য়ুলা-১ ঘাঁটি ছেড়ে আমাদের সৈনিকরা পিছু হঠতে শুরু করে। এই ভাবে ৪৮ ঘণ্টার ভিতরে সমগ্র উত্তর লাদাক আমাদের হাত-ছাড়া হয়ে যায়।

২৭ তারিখে শত্রুরা চাঙ লা অধিকার করে। প্রথমে কিছুক্ষণ টিকে থাকলেও শেষ অবধি জারা লা ঘাটিটিরও পতন হয়। দামচক পরিত্যক্ত হয়; এবং নালা সংযোগস্থল ও হট স্প্রীং-এ অবস্থিত আমাদের ঘাঁটিগুলিকেও পিছন দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়। লাদাকের উপযুক্ত ঘাঁটিগুলি এবং নিফায় ঢোলা ও তাওয়াঙ-এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে চীনা আক্রমণের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হ'ল।

চীনা আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৮ই নভেম্বর তারিখে লাদাকে শত্রুরা রাজাঙ লা, গুরুঙ হিল, স্পাঙ্গুর শৈলমালার ফাটল এবং চুস্থল বিমান ক্ষেত্র সন্নিহিত অঞ্চলগুলির উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে (প্রায় একই সময়ে নিফায় ওয়ালঙ্, সে লা এবং বম্‌ডি লা শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয়)। ১৯/২০ তারিখে চীনারা নিজেদের দাবীরেখা বরাবর অঞ্চলগুলি অধিকার করে নেয়। চুস্থল গ্রাম থেকে বিমান ক্ষেত্রটির দূরত্ব হ'ল চার মাইল। দু'টি স্থানই ছিল চীনাদের

দাবীরেখার বাইরে। উক্ত রেখার মধ্যে পড়ে রাজাঙ লা পাহাড় ও তার পার্শ্বস্থ শাখা এবং মুগ্‌গর পাহাড়। এই স্থানগুলি স্পাঙ্গুর শৈলমালার ফাটল, গুরুঙ পাহাড়, গোস্বামী পাহাড়, গান্‌ পাহাড় এবং পয়েন্ট ১৮,৩০০ থেকে উচ্চে অবস্থিত। ফলে শত্রুরা বেশ সুবিধাজনক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। এই অঞ্চলগুলি থেকে আমাদের হঠিয়ে দিয়েই চীনারা নিজেদের অগ্রগতি বন্ধ করে দেয়। (রাজাঙ লা'র যুদ্ধে মেজর শৈতান সিং বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।)

লাদাকে আমাদের সেনাবাহিনী যে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল (এবং নিফায় কিছুই করা হয় নি) সেটা জনসমক্ষে প্রচার করার উদ্দেশ্যে চুস্থল 'যুদ্ধের' তীব্র লড়াইয়ের ভয়াল একটি চিত্র অঙ্কিত করা হলেও, আসলে কিন্তু চুস্থল গ্রাম অথবা বিমানক্ষেত্র আদৌ আক্রান্ত হয় নি এবং কোন যুদ্ধও হয় নি সেখানে। লাদাকে সর্বরক্ষা এই যে, চীনা দাবীরেখার বহির্ভূত হওয়ার কারণে চুস্থল অক্ষত রয়ে যায় (কারণ কোন আক্রমণই সেখানে হয় নি)। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ লাদাকের চীনা দাবীরেখার অন্তর্ভুক্ত বিরাট একটি এলাকা জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ২০/২১ তারিখ রাতে চীনারা একতরফা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। লাদাকে বহু ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি ছিল। শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আক্রান্ত হলে, তাদের কয়েকটি বেশ ভালো যুদ্ধ করে। অন্যগুলি করে না। নিফাতেও ঘটেছিল একই ব্যাপার। সে লা'তে গাড়োয়ালীরা প্রশংসনীয় যুদ্ধ করে। ওয়ালঙস্থিত আমার গ্যারিসনটি শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রশ্ন হ'ল, এই ঘটনাগুলিকে বিবেচনার বিষয়ভূত করা হ'ল না কেন? লাদাক ও নিফা উভয় অঞ্চলেই যুদ্ধের ফলাফল ছিল একই ধরনের। উভয় অঞ্চলেই বিরাট এলাকা আমাদের হস্তচ্যুত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখার যোগ্য। লাদাক অঞ্চলে চীনা অনুপ্রবেশ তথা সেখানকার হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা তাদের নিঃশব্দে দখল করে নেওয়া সম্বন্ধে প্রথম যখন আমরা সজাগ হয়ে উঠি, তখন জনসাধারণের সেই বিক্ষোভকে আমাদের কয়েকজন নেতা অগ্রাহ্য করে ভাসাভাসাভাবে অঞ্চলটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'সেখানে একগাছি তৃণও জন্মায় না।' এই উক্তিই জনমানসে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করে যে, সব দিক থেকে নিফার গুরুত্ব লাদাকের চাইতে অধিক। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু তা' নয়।

প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যতখানি গুরুত্ব নিফার, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ততখানিই গুরুত্ব রয়েছে লাদাকের।

সুদক্ষ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার (বর্তমানে মেজর জেনারেল) রায়না-র সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লাদাকে যে ঘাঁটি ও এলাকাগুলির পতন হয়, তাদের সংখ্যা নিফার চাইতে কম নয়। লাদাকে কোন বড় রকমের যুদ্ধ হয়নি; কিন্তু ছোট-খাটো যে যুদ্ধগুলি হয়েছিল, তাতেও আমরা কোন স্থানেই চীনাদের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারি নি। ব্যক্তিগত শৌর্যের[৩৩] নজির অবশ্য লাদাক এবং নিফা উভয় রণাঙ্গনেই ছিল। সামরিক সম্মান-পদক প্রদানের একাধিক ঘটনাই তার প্রমাণ। ৯নং পঞ্জাব বাহিনীর সিপাহী কাঁশী রামের ঘটনাটি হ'ল এর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। উক্ত জওয়ানকে সরকার থেকে মহাবীর চক্র প্রদান করা হয়; এবং সেই পদকে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়:

১৯৬২ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে নিফার সেঙ জোঙ ঘাঁটিটি প্রায় ৫০০ চীনা সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শত্রুপক্ষের মুহুর্মুহুঃ গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে সিপাহী কাঁশী রাম নিজের হাল্‌কা মেশিনগানসহ এই ঘাঁটিটির দক্ষিণপার্শ্বের প্রবেশমুখ রক্ষা করতে থাকেন এবং প্রচুর চীনা সৈন্য হতাহত করেন। তাঁর বিবর ঘাঁটির ঠিক বাইরে শত্রু-নিক্ষিপ্ত একটি মর্টারের গোলা পড়ে ফেটে যায়, এবং বোমার টুকরায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত হবার পর সিপাহী কাঁশী রামকে প্রাথমিক চিকিৎসাদি করা হয়। কিন্তু আঘাত গুরুতর এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকায় কোম্পানী কমাণ্ডার তাঁকে অপসারণ করবার প্রস্তাব করলে, সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, এবং যুদ্ধ করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আপন ঘাঁটিতেই থেকে যান।

শত্রুপক্ষের আরেকটি দল তীব্রতর মর্টার গোলাবর্ষণের সাহায্যে ঘাঁটিটিকে আবার আক্রমণ করে। আহত হওয়া সত্ত্বেও সিপাহী কাঁশী রাম নিজের মেশিনগানটি নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, একের পর এক শত্রুদল ঘাঁটিটিকে ঘিরে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে থাকে। চারজন সৈনিকসহ একজন চীনা

৩৩। মানুষ স্বেচ্ছায় বিপদবরণ করে কেন? চাকুরীর উন্নতির প্রলোভনে, বীরত্বের পুরস্কারের সম্ভাবনায়, প্রশংসনীয় কাজের জন্য কোনভাবে পরিচিতি পাবার আশায়, ঐতিহ্য, নিয়মানুবর্তীতা, গৌরবের স্বপ্ন, ব্যক্তিগত আনুগত্য, পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরক্তি, অথবা নিছক দেশপ্রেমে? সম্ভবতঃ সামান্য মাত্রায় সবগুলির জন্যই।

অফিসর সিপাহী কাঁশী রামের খুব কাছে এগিয়ে এসে বিবর ঘাঁটিতে অবস্থিত আমাদের সৈন্যদের চীৎকার করে আত্মসমর্পণ করতে বলে। ততক্ষণে কাঁশী রামের গুলিও প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। তথাপি তিনি শত্রুদের লক্ষ্য করে একটি হাতবোমা নিক্ষেপ করেন। চীনা অফিসর সহ আরও তিনজন শত্রুসৈন্য তৎক্ষণাৎ নিহত হয়। তারপর কাঁশী রাম নিজের বিবর ঘাঁটিতে অবস্থিত অন্যান্য সৈনিকদের পিছনে চলে যেতে বলেন। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন চীনা সৈন্য তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। একজন তাঁর হাত থেকে হাল্‌কা মেশিনগানটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করে এবং অন্য একজন তাঁকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে গুলী করে। আবার আহত হলেও, কাঁশী রাম কিন্তু নিজের মেশিনগানটি ছাড়েন না। বরং এমন কৌশলে চীনা সৈনিকটিকে ধাক্কা দেন যে তারা সবাই পড়ে যায়। কাঁশী রাম তখন একজন শত্রুসৈন্যের হাত থেকে গুলীভরা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি কেড়ে নিয়ে নিজের প্ল্যাটুনে ফিরে আসেন। সঙ্গে নিজের হাল্‌কা মেশিনগানটিকেও আনতে ভোলেন নি। ৭নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেড কর্তৃক অধিকৃত এইটিই ছিল প্রথম চীনা অস্ত্র। এই লড়াইয়ে সিপাহী কাঁশী রাম অদম্য সাহস, উদ্যম এবং অপূর্ব উদ্ভাবন-তৎপরতার পরিচয় দেন।

এই ধরনের সাহসিকতার উদাহরণ নিফায় ছিল একাধিক। সেগুলিকে কোন লোকচক্ষুর সামনে তুলে না ধরে জনসাধারণের কাছে এমন একটি ছবি তুলে ধরা হ'ল, যেন নিফাতে আমাদের সৈনিকেরা কোনরকম যুদ্ধই করে নি।

নিফায় এবং লাদাকে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির নিম্নলিখিত চিত্রটিই প্রকৃত তথ্য প্রদান করবে :

১৯৬২ সালের অক্টোবর/নভেম্বর মাসে চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিফা এবং লাদাকে আমাদের সেনাবাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির প্রায় যথাযথ হিসাব :

	নিহত	আহত	নিখোঁজ	মোট
নিফা···	১,১৫০	৫০০	১,৬০০	৩,২৫০
লাদাক···	২৩০	৫০	৬০	৩৪০

উল্লিখিত হিসাব থেকে দেখা যায়, লাদাকের চাইতে নিফায় পাঁচগুণ বেশী সৈন্য নিহত এবং দশগুণ বেশী আহত হয়েছিল। তথাপি লাদাকে নিফায়

চাইতে তীব্রতর যুদ্ধ হয়েছিল বলে যে প্রচারকার্য চালানো হয়েছে, তার ভিত্তি কি ?

লাদাকের চাইতে নিফায় যে আমাদের সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল সেকথা অনস্বীকার্য; কিন্তু তদনুপাতে চীনাদের সৈন্যসংখ্যা এবং সমর-সম্ভার ছিল বহুগুণে বেশী। আরেকটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। ১৯৬২ সালের বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই লাদাকে আমরা চীনাদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। ফলে সেই সময়ের মধ্যে চীনাদের বিরুদ্ধে লাদাকে যা' হোক একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছিল। সৈনিকেরাও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সেখানকার জলবায়ুতে। উচ্চতর পার্বত্য প্রদেশের সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গেও আমরা ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তার উপর, সেখানে একটি কমাণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণ তথা সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাও স্থাপিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে, নিফায় বাস্তবিকভাবে আমরা প্রথম ম্যাকমোহন রেখার কাছে যাই ১৯৬২ সালে, এবং সীমান্ত বরাবর কয়েকটি ছোট ছোট চৌকি স্থাপন করতে না করতেই চীনা-আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। ফলে নিফায় আমরা না পাই উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য, না স্থাপন করতে পারি কোন কমাণ্ড অথবা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। এমন কি সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবার মতো কোনো চলাচল ও সরবরাহকারী সংস্থাও স্থাপিত হয় নি। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিপুণ প্রচারকার্য দ্বারা এই অনস্বীকার্য তথ্যগুলিকে জনসাধারণের চক্ষুর আড়াল করে রাখে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে এমন একটি ধারণার স্থষ্টি করা যে, লেঃ জেনারেল কলের মতো একজন অযোগ্য জেনারেলকে মেনন এবং নেহ্‌রু নিফার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, এবং তাঁদের পক্ষপাতিত্বের ফলেই বহু অযোগ্য ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে উচ্চপদগুলিতে নিযুক্ত করা হয়। (অনুরূপ কটাক্ষ থাপারের বিরুদ্ধেও করা হয়েছিল।) তাঁদের মতে লাদাক কমাণ্ডের ভার পেশাগতভাবে সুযোগ্য জেনারেলদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল, এবং ওই সব জেনারেলরা আপন যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

আসল ঘটনা হ'ল, চীনা সৈন্যবাহিনী নিফা ও লাদাকে একই উপায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে, এবং উভয় স্থানেই নিজেদের দাবীরেখা পর্যন্ত পৌছবার পর একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

এই অধ্যায়ে যে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করেছি, সেগুলি হ'ল,—চীন কেন

ভারত আক্রমণ করল ও সেই আক্রমণ ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখেই বা করা হ'ল কেন এবং কেন তারা একতরফা পশ্চাদপসরণ করল ; ভারতের পরাজয় ও চীনের সফলতার কারণ এবং ভবিষ্যতে ভারতের কি করা উচিত। প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তর নীচে দেওয়া হ'ল :

সম্পূর্ণ সীমান্ত জুড়ে আমাদের আক্রমণ করে চীন চেয়েছিল নিজেকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সেই সঙ্গে রাশিয়া ও আমেরিকাকে সতর্ক করে দিতে যে, সে হ'ল এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি ; এবং এই মহাদেশ তারই আধিপত্যের আওতায় পড়ে,—রাশিয়া কিংবা আমেরিকার নয়। এটা করার উদ্দেশ্য ছিল নিজের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করে এশিয়ার অন্যান্য দেশ যথা, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, কম্বোডিয়া এমন কি সিকিম ও ভূটান এবং পশ্চিমী তুনিয়াকেও ভারতের সংশ্রব থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং নিজেদের শাসনতন্ত্রের সাফল্য ও অর্থনৈতিক উন্নতি প্রদর্শন করা ; ভারতের গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার নীতি যে অসার সেটা রাশিয়াকে দেখিয়ে দেওয়া ; আদর্শগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ ভারতকে অপদস্থ করা ও তার অর্থনৈতিক কাঠামো ও মনোবল ভেঙে দেওয়া ; ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শকে খেলো প্রতিপন্ন করা ; এবং চীনের মতো একটি 'শক্তিশালী' দেশের বিরুদ্ধে ভারতের মতো একটি 'তুর্বল' দেশ যে তিব্বতকে কোনরূপ বাস্তব সাহায্য দিতে অপারগ সে সম্বন্ধে তিব্বতের অধিবাসী ও দালাই লামাকে 'শিক্ষা দেওয়া'। পরিশেষে, আভ্যন্তরিক সমস্যা থেকে (যথা, উন্নতির বিরাট পদক্ষেপের অসাফল্য ইত্যাদি) স্বদেশবাসীর মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করার জন্য 'সাম্রাজ্যবাদী ভারতের দিক থেকে বিপদ' এই নতুন জিগির দিয়ে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টাও ছিল।

কিউবা সংকটের সঙ্গে মিল রেখেই চীন সম্ভবতঃ ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করে। (কিউবা সংকট ঘটে ২০-২৬শে অক্টোবর তারিখে)। তার মতলব ছিল কিউবার ব্যাপারে আমেরিকা, রাশিয়া তথা সারা বিশ্ব যখন ব্যস্ত থাকবে, সেই অবসরে সে এখানে যা' ইচ্ছা তাই করবে। উপরন্তু, অক্টোবরের শেষ নাগাদ বর্ষাকাল শেষ হয়ে পরিষ্কার আবহাওয়া দেখা দেবে, এবং নিফার (ও লাদাকের) ভিতরে অগ্রগতির পক্ষে সেইটাই হবে প্রকৃষ্ট সময়।

চীনের একতরফা 'শান্তিপূর্ণ' পশ্চাদপসরণের কারণ ছিল একাধিক।

(ক্লজউইট্জ্ যেমন বলেছেন : বিজয়ী পক্ষ সর্বদাই শান্তির প্রেমিক হন।). চীন আশা করেছিল ভারত একেবারে ভেঙ্গে পড়ে শান্তি ভিক্ষা করবে। সেটা অবশ্য হয় নি। তিব্বত রক্ষার জন্য যে এলাকাগুলি সে প্রয়োজনীয় মনে করেছিল, সেইগুলি অধিকার করেই চীন তার সীমিত উদ্দেশ্য সাধন করে। উক্ত এলাকাগুলি দখলে রাখলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে শীতকালে, রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং যুদ্ধ বেশী দিন চললে অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে আমেরিকা ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ চীন আক্রমণের জন্য ব্যবহার করবে এবং সেক্ষেত্রে একাকী তাদের সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারবে না, এ ভয় চীনের পুরোমাত্রায় ছিল। সোভিয়েট রাশিয়া তথা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সে বিশ্বাস করেনি বলে উক্ত দেশগুলির সমর্থনের আশাও তার ছিল না। ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী, বিশেষতঃ রাশিয়া ও আমেরিকার দৃঢ় মনোভাব দেখে চীন বিস্মিত হয়ে পড়ে। কিউবা-সংকট যে এত শীঘ্র মিটে যাবে, এবং ক্রুশ্চভ ও কেনেডির মধ্যে একটা যুক্তিসংগত মিটমাট হয়ে যাবে এ আশাও সে করে নি। এই মিটমাটের ফলেই তার সমস্ত মতলব বানচাল হয়ে যায় এবং ক্রুশ্চভকে তীব্রভাবে আক্রমণও করে। পরিশেষে, আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিকে সে বোঝাতে চেয়েছিল যে, তার কোন জঙ্গী তথা আগ্রাসী সঙ্কল্প নেই। এই উদ্দেশ্যেই সে মহৎ ও নাটকীয় চাল চেলে (বিজয়ী সৈন্যবাহিনী দ্বারা) সারা পৃথিবীর উপর একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে চায়। অবশ্য চীনা-সৈন্য কর্তৃক পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলি আমরা পুনরধিকার করলে তাদের আবার ফিরে আসবার যে অধিকার রয়েছে, সে সম্বন্ধে চীন হুঁশিয়ার করে দিতে ভোলে নি। উদ্দেশ্য একবার পূর্ণ হয়ে যাবার পর, তার পক্ষে আর সেখানে থাকার কোন কারণ ছিল না।

চীনের আক্রমণে ভারত একটা উচিত শিক্ষা পেয়েছে বলে পশ্চিমী দেশগুলিতে বেশ একটি সন্তুষ্টির মনোভাব জেগে ওঠে ; কারণ, প্রথমতঃ এই আক্রমণের ফলে চীন সম্বন্ধে ভারতের ধারণা ভুল ও তাদের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারত এবার আর নিজস্ব কল্পিত জগতে বাস করতে না পেরে বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। তৃতীয়তঃ, ভারতকে তার বৈদেশিক নীতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। চীনের দিক থেকে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি দেশেরই আশঙ্কার কারণ

থাকায় উভয় দেশের মধ্যে একটা যুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এইবার গড়ে উঠবে বলেও পশ্চিমী দুনিয়ার আশা ছিল। তাদের ধারণায় ভারত তিনটি বিষয়ে বিশ্বাস করতো: পিকিং কখনই আক্রমণ করবে না; পশ্চিমী সাহায্য ছাড়াই ভারত নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম এবং সোভিয়েট রাশিয়া চীনের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে। এখন দেখা গেল বিশ্বাসগুলি সবই ভুল।

নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য ভারতের নেই এবং তাকে প্রদত্ত মার্কিন সাজসরঞ্জামগুলি চীনাদের হাতে পড়বার আশংকা রয়েছে বলে সেনেটর রাসেল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের অন্যান্য সমালোচকদের আশঙ্কা ছিল সোভিয়েট সাহায্য এ দেশকে এমন একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করবে যার ফলে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিরপত্তাও এক-সময় বিঘ্নিত হয়ে পড়তে পারে। (মার্কিন দেশে মিস্টার হ্যারিম্যানের মতো আমাদের বহু বিদেশী বন্ধুই মনে করেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের যে নীতি, তা' আর আত্মঘাতী সারল্যের পর্যায়ে নেই।)

১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের পর এ বিষয়ে সোভিয়েট প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মন্তব্য করা হয় যে, চীনারা হ'ল তাদের ভাই এবং ভারতীয়গণ হ'ল তাদের (প্রিয়) বন্ধু। (আজ যদিও সেই অবস্থা আর নেই।)

সামরিক পরিকল্পনা এবং সৈন্যচলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাদির বহুবিধ কারণে ১৯৬২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আমাদের ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে বেশ কয়েক বৎসর ধরে ভারতীয় ও চীনা সেনা-বাহিনী আমাদের সীমান্তবরাবর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তথাপি চীনাদের রণ-কৌশল পর্যালোচনা অথবা অনুধাবন করার অথবা কিভাবে তাদের প্রতিহত করা যায় সে সম্বন্ধে এবং তাদের রাজনৈতিক তথা সামরিক চাল-চলন বোঝবার কোন চেষ্টাই যথোচিত গুরুত্ব সহকারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন পর্যায়েই করা হয় নি। বিভিন্ন স্তরে আভ্যন্তরিক কাজকর্মে সমন্বয়েরও ছিল অভাব। এই গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সময়মতো সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার কোন বিশেষ ব্যবস্থাও সরকার করেন নি।

অগণিত সেনাবাহিনী নিয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে সাগর-তরঙ্গের মতো চীনা আক্রমণের সমর-কৌশল সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা গেছে। বস্তুতঃ, গেরিলা যুদ্ধ-কৌশলের অনেকখানি প্রভাব থাকলেও, চীনাদের ইদানীন্তন যুদ্ধ-কৌশল হ'ল মোটামুটি ভাবে চলিত প্রথা অনুযায়ী সংগ্রাম ধারা।

তাবৎ রণ-কৌশলের যে মূল কথা সেই আগ্নেয়াস্ত্র এবং দ্রুত চল উপরেই তারা এখনও নির্ভরশীল। ভূপ্রকৃতির সদ্ব্যবহারও তারা কর জানে। উন্মুক্ত অঞ্চলে তারা যুদ্ধ করে প্রথাগত ভাবেই। কেবলমাত্র অপ্রশস্ত স্থান অথবা সঙ্কীর্ণ রণাঙ্গনেই তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ে গতিবেগ সঞ্চয় করে নিয়ে শত্রু অবস্থানের অভ্যন্তরে তারা ঢুকে পড়ে। শুধুমাত্র বর্বর শক্তিরই যে তারা ব্যবহার করে তা' নয়; যুদ্ধ-কৌশলও তাদের নিখুঁত। বস্তুতঃ, ফাঁকা বুলি দিয়ে চীনাদের সমর-কৌশলকে নস্যাৎ করে দেওয়ার অর্থ হবে আকাশ-কুসুম রচনা করা।

এমন কথাও বলা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক চীনাসৈন্য নিরস্ত্র অবস্থাতেই সম্মুখবর্তী এলাকাগুলিতে অগ্রসর হয়ে এসেছিল। কথাটা কিন্তু যথার্থ নয়। চীনা শ্রমিক বাহিনীর লোকেরাই আসলে অগ্রবর্তী সৈনিকদের সঙ্গে নিরস্ত্র অবস্থায় আসে এবং পথে আমাদের মৃত সৈনিকদের কাছ থেকে অথবা হঠাৎ পেয়ে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে নেয়।

নিফায় আমার 'কোর'টি রাতারাতি গড়ে ওঠবার আগে চীনাদের সঙ্গে আমাদের আশু সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিভিন্ন হেডকোয়ার্টারের অধিকাংশ ব্যক্তির মনেই সাধারণভাবে সন্দেহ বর্তমান ছিল। সুতরাং জরুরী অবস্থার বিশেষ কোন চেতনাও আমাদের বেশীর ভাগ লোকের মনেই দেখা দেয় নি। সজাগ হওয়া উচিত যেখানে ছিল বহু পূর্বে, সেখানে আমাদের মধ্যে সাড়া জাগলো অনেক বিলম্বে,—থাগ্‌লা-ঢোলা এলাকায় চীনারা অনুপ্রবেশ করে যাবার পরে। এরপর থেকে ঘটনাস্রোত এত দ্রুত চলতে শুরু করে যে তার সঙ্গে তাল রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় ওঠে।

পার্বত্য যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম এবং সৈন্য চলাচল ও সরবরাহের দিক থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি ছিল অনুপযুক্ত। এই ব্যাপারে চীনাদের তুলনায় আমাদের অসুবিধা ছিল অনেক বেশী। তাড়াহুড়া করে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আমরা নিফায় সৈন্য আমদানী করেছিলাম। উচ্চতর আবহাওয়ায় তারা অভ্যস্ত হবারও সময় পায় নি (অত উচ্চতায় অভ্যস্ত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে)। তার উপর, এই দ্রুত সন্নিবেশনের ফলে রণাঙ্গনে আগত অফিসর এবং জওয়ানেরা শারীরিক অথবা মানসিক দিক থেকেও নিজেদের আশু দায়িত্ব সম্বন্ধে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হতে পারেন নি। অধিকাংশ ইউনিটই অস্ত্রশস্ত্রের, এমন কি বেতার যন্ত্র, খননের যন্ত্রপাতি ও

শীত বস্ত্রাদির গুরুতর ঘাটতি নিয়ে এসেছিল। এই জিনিসগুলি জোগাড় করে তাদের নতুন অবস্থান স্থলে সরবরাহ করতে হয়। ফলে আমাদের স্বল্প সংগতির উপর ভয়ানক চাপ পড়ে। এর জন্য আমাদের সৈনিকদের মধ্যে দলীয় সম্মান সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবও দেখা দেয়।

১৯৬২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু ডিভিশন ও ব্রিগেড ভেঙ্গে দেওয়ায়, বহু সংগঠনের সংহতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ৫ ও ১১নং ইন্‌ফ্যানট্রি ব্রিগেডকে ২নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের অধীনে রাখা হয়। অথচ এই ব্রিগেড দু'টিকে ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের অখণ্ড অঙ্গরূপেই রাখা উচিত ছিল (বরাবরই তারা ছিল ৪নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশনের অন্তর্গত)। বহু ব্যাটেলিয়নকেও এক ব্রিগেড থেকে অন্য ব্রিগেডে বদলী করা হয়। ফলে ইউনিট ও দলগুলি পরস্পরের 'অপরিচিত'রূপে একত্রে কাজ করতে থাকে। এই ধরনের অধিকাংশ পুনর্বিন্যাসই ঘটে আমার চাইতে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশে।

চীনাদের তুলনায় আমাদের গুপ্ততথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাও ছিল অনেক নিম্নস্তরের। সুশৃঙ্খলভাবে সারা ভারতে, বিশেষ করে নিফায় তারা গুপ্তচর প্রেরণ করে। (এ ব্যাপারে আমরা অনেক পিছিয়ে ছিলাম।) সংবাদাদি প্রেরণের জন্য চীনা গুপ্তচরেরা সারা ভারতব্যাপী সংস্থা গঠন করেছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোককেও তারা নিজেদের মতাদর্শে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত গুপ্তচরেরা নিফা প্রশাসন এবং সামরিক ইউনিটগুলিতে বিভিন্ন পদে কাজ জোগাড় করেছিল বলেও জানা যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের সামরিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার কথা পূর্বাহ্ণেই চীনাদের কাছে পৌঁছে যেত। পক্ষান্তরে, ত্রুটিপূর্ণ গুপ্ততথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার কারণে অনুরূপ সংবাদাদি আমরা পাই নি। নিফার স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই এই ব্যাপারে চীনাদের সাহায্য করে।

আমাদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত চীনা সৈন্যেরা রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করতে পারত (ফলে দুর্গম অঞ্চল অতিক্রমণে তাদের দ্রুতগতি আমাদের চাইতে ছিল অনেক বেশী)। পাখির ডাকের মতো বহুবিধ কলা-কৌশলের আশ্রয়ও তারা নিত। স্থানীয় উপজাতিদের ছদ্মবেশে আসা, যুদ্ধক্ষেত্রে দোভাষীর মারফত হিন্দী কথা চীৎকার করে বলা, ভারতীয় সামরিক পোষাকে (এগুলি তারা আমাদের মৃত সৈনিকদের শরীর থেকে খুলে নেয়) নিজেদের সৈনিকদের

প্রেরণ করে আমাদের সৈনিকদের বিভ্রান্ত করা, দিনের বেলায় নিজেদের সেনাদলকে একদিকে চালনা করে রাতের অন্ধকারে অন্যদিক থেকে আমাদের আক্রমণ করে প্রতারিত করা,—এ ধরনের বহু কলা-কৌশলই তারা প্রয়োগ করেছে। এছাড়া, দুর্গম অঞ্চলে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে নানা দিক থেকে আমাদের উপর গুলি চালিয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। এই গুলি চালনার লক্ষ্য সঠিক না হলেও, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সুযোগে আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজেদের অগ্রগতির মূল অবস্থান থেকে আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করে অন্যদিকে চালিত করতে সক্ষম হয়েছে তারা। উপরন্তু সড়ক প্রতিরোধ সৃষ্টি করে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত তথা আমাদের সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বহু ক্ষেত্রে।

আমাদের টহলদারী ব্যবস্থাও মোটের উপর ছিল ব্যর্থ। শত্রু অবস্থানকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে আমরা সক্ষম হই নি, এবং ১৯৬২ সালের এই যুদ্ধে লাদাক অথবা নিফায় একটি চীনা সৈন্যকেও বন্দী করতে পারি নি। পক্ষান্তরে, বহু ভারতীয় সৈন্য চীনাদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীদের সঙ্গে তাদের ব্যবহারও ভাল ছিল না। পরের বছর এপ্রিল মাসে বন্দীদের ফেরত দেওয়া স্থির করার পর থেকে অবশ্য তাদের ব্যবহারের কিছুটা উন্নতি হয়। ধূর্ত প্রচারের সাহায্যে তারা আমাদের অফিসর ও জওয়ানদের মধ্যে একটা ভুল-বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি করে। যেমন, কেউ কেউ হয়তো অফিসর সেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে এবং ভৃত্যসুলভ অন্যান্য কাজকর্ম করে দেখাতে চাইতো যে চীনাদের মতো ভারতীয় অফিসরেরা সাধারণ সৈনিকদের নিজেদের সমকক্ষ বলে গণ্য করে না।

উপরে (এবং পরবর্তী অংশে) যা বর্ণনা করলাম, তার জন্য বেশ কয়েক বৎসর ধরে আমাদের নিজেদের শিক্ষিত এবং প্রস্তুত করে তোলা উচিত ছিল। রাতারাতি কিছু করে বিশেষ কোন সুফল হ'ত না। চীনাদের বিরুদ্ধে যে আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি আমরা প্রয়োগ করেছিলাম, তার চাইতে বহুগুণে বেশী[৩৪]

৩৪। সামগ্রিকভাবে এবং প্রতিটি ইন্‌ফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নে, চীনাদের দ্রুত চলাচল ব্যবস্থা ও আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি আমাদের অপেক্ষা বেশী ছিল। ২০ তারিখে ঢোলা এলাকায় যখন একটি ডাকোটা বিমান আমাদের রসদ নিক্ষেপের জন্য আসে, সেই সময়ে সর্বপ্রথম চীনারা বিমান-বিধ্বংসী কামানের সাহায্যে থাগ্‌লা থেকে উক্ত বিমানটি লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষেপ করে। সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আমরা কিন্তু ওই জাতীয় অস্ত্রাদি অতদূর অগ্রবর্তী এলাকায় নিয়ে যেতে পারি নি।

তারা প্রয়োগ করেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রাদি ও কামান আমাদের চাইতে ছিল অনেক বেশী। প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য অতিপ্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম চীনাদের যেমন ছিল, আমাদের তেমন ছিল না। সৈন্য সংগঠনের অঙ্গরূপে আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিটগুলির প্রাথমিক যন্ত্রপাতির অভাব ছিল প্রচুর। আমাদের বেশীর ভাগ বেতার ও সিগ্‌নাল যন্ত্রগুলিই ছিল পুরনো, ব'য়ে নিয়ে যাবার পক্ষে অত্যন্ত ভারী এবং পার্বত্য প্রদেশে ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত। সিগ্‌নালের অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির অভাব তো ছিলই। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের ইউনিট এবং সংগঠনগুলি পিছু হঠে আসবার সময় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। চীনারা শুধুমাত্র নিজেদের বেতার যন্ত্রের উপরেই নির্ভর করে থাকে নি। দৃষ্টিগোচর তথা আলোক সংকেত, পাখির ডাক এবং যোগাযোগের একাধিক সহজ ও সরল উপায় তারা ব্যবহার করেছে।

সড়ক ও বিমান পরিবহন সাহায্যে অপর্যাপ্ততার কারণে অগ্রবর্তী এলাকায় আমাদের গোলাগুলি ও মজুত রসদের প্রায়ই ঘাটতি থেকে যায়। প্রশাসনিক সংস্থার স্বল্পতা তো ছিলই ; এগুলি গঠনের চেষ্টাও করা হয়েছিল শেষমুহূর্তে। আমাদের খাদ্য-তালিকাও ছিল অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিশদ। চীনারা শুধুমাত্র ভাত, নুন, এবং দুধ অথবা চিনি ছাড়া চা দিয়েই কাজ চালাতে পেরেছে। আমাদের সৈনিকেরা সে ধরনের কোন কৃচ্ছতা প্রদর্শন করতে পারে নি। প্রতিটি চীনা সৈনিক নিজের সঙ্গে তিন দিনের মতো নিয়ন্ত্রিত রেশন বহন করতো।

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ২ ও ৪ নং ইন্‌ফ্যানট্রি ডিভিশন এলাকার জন্য আমাদের জিনিসপত্র এবং খাদ্যদ্রব্যের দৈনিক প্রয়োজন ছিল আনুমানিক ২৬০ টন। বিমান থেকে নিক্ষেপ করে এগুলি সরবরাহ করা হ'তো। কিন্তু পরিবহন বিমানের অভাবে সেজায়গায় নিক্ষেপ করা হয়েছে মাত্র ৬০ থেকে ৮০ টন। ফলে, যে কোন সামরিক তৎপরতার জন্য আমাদের সংগঠন প্রস্তুতি হ'তো খুবই ধীর গতিতে। পক্ষান্তরে, শত্রুরা বিভিন্নস্থানে উন্নততর সামরিক শক্তি দ্রুত সন্নিবেশিত করে প্রথমে আমাদের আক্রমণ করতে পেরেছে। এই শ্লথগতি যুদ্ধ প্রস্তুতির দরুন বিশেষ কয়েকটি সামরিক পরিস্থিতির সুযোগ নিতে আমরা সক্ষম হই নি। শিক্ষিত বৈমানিকের অভাবও আমাদের ছিল ; এবং এই যুদ্ধে নামবার আগে প্রয়োজন অনুসারে বিমানক্ষেত্র নির্মাণ

অথবা সম্প্রসারণ কোনটাই করি নি। এর উপর রসদ নিক্ষেপের যন্ত্রপাতি-গুলি ত্রুটিপূর্ণ হবার দরুন বহুক্ষেত্রে প্যারাশুট্‌গুলি সময়মতো খোলে নি, এবং জিনিসপত্রগুলি হয় এদিক-ওদিকে পড়েছে, নয়তো মাটিতে আছড়ে পড়ে বিনষ্ট হয়েছে। মালপত্র বহনের জন্য শ্রমিক-জওয়ান কিংবা স্থানীয় মজুরের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল না। শত্রুপক্ষের আক্রমণের আতঙ্কে অথবা যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু বেসামরিক মজুর পলায়ন করেছে। চীনাদের মতো এদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। যতদূর জানি, চীনাদের ইউনিটগুলির অঙ্গ হিসাবেই মজুরদের রাখা হয়েছিল। তারপর, অধিক উচ্চতায় কার্যরত শ্রমিকদের জন্য শীতবস্ত্র অথবা আশ্রয়ের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাই আমরা করি নি। পরিবহনকারী পশুর ঘাটতিও ছিল আমাদের প্রচুর।

আমাদের শীতবস্ত্রগুলি ছিল অতি জবড়জঙ্গ ধরনের, এবং প্রয়োজন মতো কখনই পাওয়া যায় নি। পক্ষান্তরে চীনাদের শীতবস্ত্রগুলি ছিল মোটা প্যাড্ দিয়ে তৈরী, এবং দামেও সস্তা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হতাহতদের স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থাও আমাদের মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। সব ক'টি রণাঙ্গনের যে সমস্ত আহতদের চীনারা পরে আমাদের ফেরত দেয় তাতেই একথা প্রমাণিত হয় (এই সমস্ত আহতদের আমাদের ইউনিটগুলি পশ্চাদপসরণের সময় পিছনে ফেলে গিয়েছিল)।

প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত লোকের অনুপাতে চীনাদের যুদ্ধ করবার লোক ছিল অনেক বেশী। অর্থাৎ, লেজের তুলনায় তাদের দাঁতের সংখ্যা ছিল অধিক। আমাদের তুলনায় চীনারা নিজেদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির অনেক কাছাকাছি অবধি সড়ক নির্মাণ করেছিল। চলাচল ব্যবস্থাও তাদের ছিল অনেক উন্নত। ফলে সৈন্যবাহিনীর পুনর্বিন্যাস অথবা সরবরাহ ব্যবস্থা দ্বারা বাহিনীগুলিকে চালু রাখা তাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়। চীনাদের জীবনযাত্রা ছিল কঠোর, চলাচল ব্যবস্থা ছিল দ্রুত এবং শারীরিক দিক থেকেও তারা ছিল বলিষ্ঠ।

পরিশেষে, এই যুদ্ধে বিমান বহরের পূর্ণ সাহায্য না নিয়ে আমরা বিরাট ভুল করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে চীনাদের রণকৌশলগত সুবিধা রয়েছে বলে সম্ভবতঃ মনে করা হ'ত; বিশেষ করে চীন কর্তৃক তিব্বত অধিকার করবার পর থেকে। সুস্পষ্টতঃই এই কারণে, এবং ভারতীয় শহরগুলির উপর চীনা বিমান আক্রমণের ভয়ে, লাদাক ও নিফায় স্থল-যুদ্ধের সময় ভারতীয় বিমান বহরের জঙ্গী বিমানগুলিকে (যে-কটিকে কাজে লাগান হয়েছিল) নিষ্ক্রিয় করে রাখা

হয়। কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল কাল্পনিক। চীনা বিমান বহরের আয়তন ও ক্ষমতার[৩৫] কথা কখনও কোন রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার মধ্যে যে যাচাই করা হয় নি, এবং গুপ্তত‍থ্য সংস্থার অধিকতর নির্ভরযোগ্য সংবাদের ভিত্তিতে আমাদের আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আমাদের গুপ্তত‍থ্য সংস্থার অবশ্য এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। আসলে তাদের যা' কিছু দক্ষতা, তা' ছিল অনুমান করাতেই। তাদের ধারণাই ছিল না যে, শত্রু সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করা আর তাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে লঘু করে বলা, উভয়ই সমান বিপজ্জনক।

তিব্বতে চীনা বিমান বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে যতটুকু তথ্যই হোক না কেন, তা' পাবার পরও, এবং চীন কর্তৃক নির্লজ্জভাবে নিফাস্থ লংজু দখল করবার তিন বৎসরের মধ্যেও, এই কল্পিত আশঙ্কার মোকাবিলা করতে আদৌ কোন বিমান-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আদেশ প্রদান না করাটা, আমাদের অসাধারণ রাজনৈতিক অক্ষমতারই পরিচায়ক। বিমান বাহিনীর অধিনায়কদের পেশাদারী বিচার-বিবেচনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, তাদের সামরিক পরিকল্পনাকে চরম অবহেলা করা হয়।

চীনা বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা যে আকারে ছিল বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তা' যথার্থ হলে, অতিরিক্ত জঙ্গী বিমান সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈমানিকদের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হ'ল না কেন[৩৬]; এবং কেনই

৩৫। চীনা বিমানগুলিকে যে সমস্ত বিমানক্ষেত্র থেকে চলাচল করতে হতো, সেগুলি বেশ উচ্চতায় অবস্থিত। সুতরাং, বোমা বর্ষণের উদ্দেশ্যে ভারী বোঝা নিয়ে তাদের বিমানগুলির পক্ষে চলাচল করা সম্ভব হ'ত না। এই বিমানক্ষেত্রগুলি থেকে তাদের জঙ্গী বিমানগুলিও আদৌ কোন তৎপরতা চালাতে পারতো কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কারণ, ওঠা-নামার যান্ত্রিক অসুবিধার জন্য এই ধরনের বিমান অধিক উচ্চতায় অবস্থিত বিমানক্ষেত্র থেকে কোন তৎপরতা চালাতে পারে না।

৩৬। সব ধরনের বিমান এবং বিমান-ক্ষেত্রেরই অভাব ছিল আমাদের। বিমানক্ষেত্র-গুলিতে বাড়ার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ছিল না। যে বৈমানিক দু'মাস ধরে বিমান নিয়ে আকাশে ওঠেন নি, তাঁকে একাকী বিমান চালাবার আগে 'ডুয়াল ট্রেনার' বিমান চালাতে হবে বলে একটা নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বাড়তি যন্ত্রপাতির অভাবে বহু 'ডুয়াল ট্রেনার' বিমান অকেজো হয়ে পড়ে ছিল। অন্যান্য বহু বিমান পড়ে ছিল মেরামতের জন্য; এবং সে কাজেও বিলম্ব ঘটছিল রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধার কারণে। অক্সিজেন-মুখোস এবং বিমান চালনার জন্য প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদের ঘাটতিও ছিল প্রচুর। বৈমানিকেরা একে অন্যের কাছ থেকে এগুলি ধার নিয়ে কাজ চালাতেন। ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর, এবং এতে বিমানচালনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্তও এই শেষোক্ত ব্যাপারটি মোটামুটি সত্য ছিল।

বা উক্ত আশঙ্কার অন্ততঃ কিছুটা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাথমিক প্রয়োজনস্বরূপ সুবিধাজনক স্থানে বিমান ক্ষেত্রাদি নির্মাণ ও বর্তমান বিমানক্ষেত্রগুলির সংস্কার করা হ'ল না ?

আর যদি, উপর্যুক্ত সংবাদগুলি ভুল অথবা আংশিক সত্য বলে জানা গিয়ে থাকে (সম্ভবতঃ এইটিই ছিল প্রকৃত ঘটনা), তবে চীনা আক্রমণ যে সময় গুরুতর আকার ধারণ করেছে, সেই সময় বিমান বাহিনীর সুপরিকল্পিত তৎপরতাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার সামরিক অথবা রাজনৈতিক কোন অর্থ ই হয় না। বস্তুতঃ, বিমান যুদ্ধের বিস্তার এবং প্রতিশোধমূলক আক্রমণ সম্বন্ধে এলো-মেলো চিন্তাধারা ছাড়া, এ আচরণের আর কোন কারণ থাকতে পারে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, দিল্লীর সরকারী মহলের ভীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আত্মরক্ষার ন্যায়সঙ্গত উপায় হিসাবে আক্রমণাত্মক অভিযান চালনায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর অনিচ্ছা। বিমান বাহিনীর কর্তারা এই কাজটি করলে, রাজনৈতিক চিন্তাধারাও হয়তো অন্যরকম হতো (?) ; এবং বিমান শক্তির প্রাধান্যের উপরে অযথা গুরুত্ব আরোপ না করে বিমান বাহিনী এই স্থলযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করলে, ভারত-চীন যুদ্ধে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতো। এর ফলে, ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত বিমান-ঘাঁটি থেকে তৎপরতা চা ু রাখার উদ্দেশ্যে বৃহৎ আকারের কোন বিমান বাহিনী পোষণের জন্য চীনাদের যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যর্থতাও ধরা পড়ে যেত।

সর্বোপরি, যুদ্ধাঞ্চলের মধ্যে বিমান তৎপরতা সীমিত রাখলে সামরিক এবং কূটনৈতিক উভয় দিক থেকেই সেটা হ'ত অশেষ গুরুত্বপূর্ণ জটিল একটি চাল। এতে একদিকে যেমন বিরাটাকার চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে সীমান্তগুলিকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবার জন্য আমাদের সুদৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত হ'ত, অন্যদিকে তেমনি আমাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্থাগুলির দোষ-ত্রুটিও কিছু পরিমাণে এবং বাস্তবিকভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়তো। এই কাজটিকেই পরবর্তীকালে যুক্ত মহড়া দিয়ে করতে হয়। সব শেষে, চরম কোন বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে, ইচ্ছা করলে আমরা যতদিন পর্যন্ত চাইতাম, বন্ধু রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে তাদের অতি উন্নত ধরনের শক্তিশালী বিমান বহরের প্রতিরোধ-সাহায্য পাওয়া যেত। এবং পরিণামে, ১৯৬২ সালের এই যুদ্ধে

সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তক্ষেপ অথবা যুদ্ধ-এলাকা বিস্তারের কিছুমাত্র ঝুঁকিও আমাদের নিতে হ'ত না।

১৯৬২ সালের অক্টোবর/নভেম্বর মাসে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে কিভাবে আমাদের নিফা রক্ষা করা উচিত ছিল, সে সম্বন্ধে দু'টি মতবাদ শুনেছি। অনেকে বলেছেন, 'ইনার লাইন' অর্থাৎ আমাদের এলাকার গভীরতম প্রদেশে চীনাদের নিয়ে এসে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা দীর্ঘতর করতে বাধ্য করে, তারপর পিছন দিক থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করা উচিত ছিল; আবার অনেকের মতে, চীনাদের সমতল ভূমিতে নিয়ে এসে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা দীর্ঘতর করে দিয়ে তারপর ধ্বংস করা। এ সমস্ত বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। প্রথমতঃ, সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে চীনারা অন্ততঃ কিছুটা ওয়াকিবহাল ছিল। সুতরাং আমাদের ফাঁদে তারা কিছুতেই পা দিত না; আর দিলেও, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন তথা তাদের উপযুক্ত মোকাবিলা করার সামর্থ্য আমাদের থাকার দরকার ছিল আগে। বস্তুতঃ, সহায়ক সংস্থাসহ উপযুক্ত সংখ্যক সেনাবাহিনী, বিমান, সাঁজোয়া গাড়ী, সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ইত্যাদি কিছুরই ব্যবস্থা আমরা সময়মতো করি নি। এ ধরনের তৎপরতার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাও করা হয় নি। তার বদলে, অধিকাংশ জরুরী অবস্থায় আমরা যা' করে থাকি, তেমনি শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে অ্যাড্ হক্ ভিত্তিতে সেনাবাহিনীকে একত্রিত করা হয়েছিল। এরকম বিনা প্রস্তুতিতে শত্রু-বাহিনীকে কোনস্থানেই ধ্বংস করা যায় না। পরিশেষে, ঢোলা-থাগ্‌লা এলাকায় চীনারা আমাদের অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল, এবং সরকার উক্ত অঞ্চল থেকেই তাদের বিতাড়িত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং অন্যত্র তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

১৯৫৯ সালে লংজু-তে এবং ১৯৬২ সালে থাগ্‌লা-ঢোলা এলাকায় চীনারা আমাদের সীমান্ত লঙ্ঘন করলেও, ঘটনাক্রম পূর্ব থেকেই অনুমান করে নিয়ে কূটনৈতিক দক্ষতার সাহায্যে তাদের বিচ্ছিন্ন অথবা দূরে সরিয়ে রাখাই সম্ভবতঃ যুক্তিযুক্ত হ'ত আমাদের পক্ষে। এতে আমরা প্রস্তুত হবার যথেষ্ট সময় পেতাম। আর, ওই শান্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেদের সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও শক্তিবৃদ্ধি, বৈদেশিক সামরিক সাহায্য জোগাড় এবং (১৯৬৩ সালের মতো) জরুরী অবস্থায় বিমান আচ্ছাদন দিয়ে বন্ধু রাষ্ট্রগুলি যাতে আমাদের সাহায্য

করতে আসে তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল আমাদের। ইতিমধ্যে জোরদার প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনাবাহিনীকে তৈরী করে নিয়ে, সীমান্ত বরাবর উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করে, চীনাদের আমাদের স্থবিধামতো অঞ্চলে যুদ্ধ করতে বাধ্য করাও কর্তব্য ছিল।

মোট কথা, এই যুদ্ধের জন্য চীন উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়েছিল; আমরা হই নি। ভবিষ্যতে চীন অথবা অন্য কোন শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতায় নামবার আগে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেগুলি হ'ল, শত্রুর যুদ্ধ-পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ, গেরিলা-যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ, উদ্ভাবন-কৌশল শিক্ষা, স্বল্প রেশনসহ হালকা অবস্থায় চলাফেরায় রপ্ত হওয়া এবং উপযুক্ত স্থানে সময়মতো সৈন্য সমাবেশ করা। উপযুক্ত বিমান, সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনীয়ারিং, সিগ্‌নাল এবং সৈন্য-চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার সহায়তা তথা উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বসহ এমন একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী আমাদের গড়ে তুলতে হবে যারা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের রণাঙ্গনের কঠোরতা সহ্য করতে সমর্থ হয়। আমাদের সেনাবাহিনীর যে কেবলমাত্র উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর-সম্ভারেরই প্রয়োজন রয়েছে তা' নয়। তাদের মানসিক কাঠামোকেও আগাগোড়া ঢেলে সাজানো দরকার; এবং, জীবন পণ করে যুদ্ধ করবার উদ্দীপ্ত প্রেরণায় তাদের অনুপ্রাণিত করাও প্রয়োজন। এছাড়া, যুদ্ধের সময় কথায় ও কাজে সেনাবাহিনীকে সক্রিয় সমর্থন জানাবার জন্য সারা দেশকে দ্রুত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করবার সামর্থ্যও গড়ে তুলতে হবে আমাদের।

ভবিষ্যতের জন্য সীমান্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার ব্যাপারে দু'টি বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। তা' হ'ল, আমাদের প্রতিবেশী কারা এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। কৌটিল্য নামে পরিচিত চাণক্য দু' হাজার বছরেরও আগে প্রতিবেশী সম্বন্ধে বলেছিলেন: 'বিজেতার রাজ্যের সন্নিহিত যে কোন স্থানেই অন্য কোন রাজ্য থাকুক না কেন, সে রাজ্য হ'ল বিজেতার শত্রু; এবং বিজেতার রাজ্য থেকে শত্রুরাজ্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন যে কোন রাজ্যই হ'ল বিজেতার মিত্র...।'

যে পরিস্থিতির মধ্যে নিফার পতন হ'ল, তা' ছিল আমার আয়ত্তের বাইরে।

সেই দুঃসময়ে পাশে এসে যাঁরা দাঁড়াবেন ভেবেছিলাম, তাঁদের অধিকাংশই আমার সঙ্গে প্রতারণা করলেন। যে সমস্ত অসুবিধার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল এবং বিপর্যয়কর পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের জন্য যেরকম ভাবে চেষ্টা করেছিলাম; অথবা যুদ্ধে জয়-পরাজয় যে খেলার একটা অঙ্গ;—সেগুলি কেউ অনুভব করেছিলেন কিনা জানি না। অতীব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে শেষ মুহূর্তে আমাকে নিফায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যে বিপর্যয় ঘটে গেল, তার দায়িত্ব-ভাগ নিতে প্রকাশ্যে কেউ-ই প্রস্তুত হলেন না। সুতরাং সমালোচকেরাও সমস্বরে আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারে লেগে গেলেন। নিফা-বিপর্যয়ের প্রধান হোতা রূপে আমাকে চিহ্নিত করা হ'ল। দেশ ও সেনাবাহিনীর প্রতি আজীবন একনিষ্ঠভাবে যে সেবা করেছি, সে সমস্ত উপেক্ষা করে জঘন্য বিদ্বেষপ্রসূত প্রচারকার্য দ্বারা সুসম্বদ্ধভাবে আমার যশ ও সামরিক সম্মানকে পদদলিত ও কলঙ্কিত করা হতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল সুযোগ-মতো চারদিকে কানাঘুষায় নানা ধরনের গুজব[৩৭] ছড়ানো। এমন কথাও বলা হ'ল, নিফা যুদ্ধের সময় দায়িত্ব এড়ানোর জন্যই আমি রোগের ভান করেছিলাম। এ রকম অন্যায়ভাবে নিজেকে লাঞ্ছিত হতে দেখে সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেল আমার। এই অমর্যাদার সঙ্গে কোন রকমেই নিজেকে আর খাপ খাওয়াতে রাজী হলাম না। অনুভব করলাম, এই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে কর্মজীবন থেকে বিদায় নেবার সময় এবার এসে গেছে। এ অভিজ্ঞতা অবশ্য শুধু আমার একারই নয়। এর আগেও বহু সৈনিককে অনুরূপ মানসিক অবস্থা এবং পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে।

ভাগ্য এবং শত্রু উভয়েই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছিল; রক্তমাংসের মানুষ হয়ে, আর সহ্য করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, যতদিন চাকুরীর নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ থাকবো, ততদিন প্রকৃত ঘটনাগুলিকে জনসাধারণের গোচরে এনে নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করবার কোন সুযোগই পাবো না। একমাত্র স্বাধীনভাবেই এটা করা সম্ভব। সুতরাং অতিপ্রিয় সামরিক কর্মজীবন পরিত্যাগ করাই স্থির করলাম। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে

৩৭। আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত নানা ধরনের গুজবের উল্লেখ করে বিগত প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৬২ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে সংসদে বলেন: 'নিফা রণাঙ্গনের সর্বময় ভারপ্রাপ্ত জেনারেল কলের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত বিস্ময়কর কথা বলা হয়েছে, তা' অসঙ্গত। নিছক সাহস, উদ্যম ও পরিশ্রমের ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।'

যুদ্ধও শেষ হয়ে গিয়েছিল। অতএব এখন আর সামরিক বিভাগ থেকে অবসর নিতে বিবেকের দিক থেকেও কোন বাধা ছিল না।

প্রায় দিন তিনেক ধরে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবার পর আমার বিশ্বস্ত স্টাফ অফিসর, ব্রিগেডিয়ার আই. ডি. ভার্মাকে ডেকে পাঠালাম। ভার্মা ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, সুদক্ষ এবং হাসিখুশি মানুষ। চাকুরীকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই আমার অবসর গ্রহণের আবেদনপত্রটি টাইপ করতে বললাম তাঁকে। চিঠিটি এমনভাবে রচনা করলাম যাতে কোন বিতর্কের সৃষ্টি না হয়। লিখলাম, সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র, চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা, সংগঠন এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই আমাদের অপেক্ষা শত্রুপক্ষের অবস্থা উন্নততর হবার কারণে নিফা-বিপর্যয় ঘটলেও, আমি কমাণ্ডে থাকাকালীন উক্ত বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ায়, এবং (বিদ্বেষমূলক অপপ্রচারের জন্য) সেনাবাহিনীতে আমার পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব নয় জন্য, চাকুরীর স্বার্থে এবং সামরিক রীতি ও ঐতিহ্য বজায় রেখে আমি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের আবেদন করছি।

আমেরিকার সেনাবাহিনীর জেনারেল অ্যাডামস্ এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জেনারেল হাল্, সি. আই. জি. এস্., লেঃ জেনারেল সেনের সঙ্গে বোধ হয় ২৫শে নভেম্বর তারিখে আমার সদর দফতর পরিদর্শনে আসেন। বিদেশী জেনারেল দু'জনকে আমাদের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করবার পর, লেঃ জেনারেল সেনকে একান্তে ডেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের লিখিত অনুরোধপত্রটি তাঁর হাতে অর্পণ করলাম।

তিনদিন পর দিল্লী ফিরে যাবার জন্য আমার ৪নং 'কোরে'র সদর দফতরের অফিসরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তেজপুর বিমানবন্দরে উপস্থিত হ'লাম। শরীরটা আগের থেকেই খারাপ লাগছিল। গলার ভিতরটা মনে হ'ল ফুলে উঠেছে। আবার অসুস্থ হয়ে পড়ায়, আমার সঙ্গে যে দলটি দিল্লী যাচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন চিকিৎসক[৩৮] রইলেন।

সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভারিক্কী চালে মন্তব্য করেছেন, দৃঢ়ভাবে সব কিছুর মোকাবিলা করার বদলে চাকুরী থেকে সরে দাঁড়াবার 'সহজতর' পন্থাই আমি বেছে নিয়েছিলাম। ব্যাপারটি কিন্তু অত সোজা নয়;

৩৮। আর্মি মেডিকেল কোরের মেজর খান্না আমার সঙ্গেই দিল্লী ফিরে যাচ্ছিলেন। নিফায় তিনি অতি যত্নের সঙ্গে আমার দেখাশুনা করেন।

এবং এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধও রয়েছে। প্রতিপত্তিশালী যে পদাধিকারটিকে ইচ্ছা করলেই নিজের অধিকারে রাখা যায়, সেটিকে পরিত্যাগ করা আমার ধারণায়, খুব সহজ নয়। তার উপর, এমন বহু পরিস্থিতি রয়েছে, যা' অনেকে সহ্য করতে পারে, অনেকে পারে না। আবার সকল পরিস্থিতিতে সব মানুষ একই ভাবে চিন্তাও করতে পারে না। যাই হোক, কেবলমাত্র তর্কের দ্বারা এসব ব্যাপারের সমাধান করা যায় না।

কয়েক ঘণ্টা পর দিল্লীতে অবতরণ করলাম। অভ্যর্থনা করবার জন্য আমার স্ত্রী, মেঃ জেনারেল ধিলন, ব্রিগেডিয়ার পছ্‌নন্দা এবং কর্ণেল খান্না বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। অবসর গ্রহণের ব্যাপার ধান্নো কিছুই জানতেন না। প্রথম শুনলেন আমার সঙ্গে দেখা হবার পর ; এবং, নির্ভীক একটি হাসি দিয়ে আমায় সমর্থন জানালেন।

আমার আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই রাজনীতিক, সংসদ সদস্য, সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অনেকেই দেখা করতে এলেন। সকলেই অবসর গ্রহণের অনুরোধটি প্রত্যাহার করে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন আমায়। অনেকে এই মর্মে চিঠিও লিখলেন। উদাহরণস্বরূপ, মেঃ জেনারেল রয়উইন্দ্‌ সিং গাড়েওয়াল-এর চিঠিখানার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নির্ভীক সহকর্মীটিকে সেনাবাহিনীর সবাই একজন কঠোর সৈনিক বলে সম্মান করতো। মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি লিখলেন :

'...আপনার চলে যাওয়ার সংবাদে আমরা অনেকেই অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি, এবং উঁচু মহলের সঙ্গে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট নই। তবু বলবো, এই সংকটের সময় আপনার মতো একজন অতি সৎ, দৃঢ়চেতা এবং সর্বোপরি সহৃদয় ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির বিদায়ে সেনাবাহিনীর বিরাট ক্ষতি হবে। আপনাকে কোনরকম খোশামোদ করবার চেষ্টা করছি না ; এবং জোরের সঙ্গে বলছি, আপনাকে যেতে দিয়ে এই সেনাবাহিনী নিজেকেই বঞ্চিত করলো...। এখনো আপনি ছুটিতে রয়েছেন এবং আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ সেনাবাহিনী পরিত্যাগের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন...। কিছু লোক হয়তো আপনাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আমরা জানি আপনি ভীরু নন।'

কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে আমি ছিলাম অটল, এবং এ ব্যাপারে আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে ছিলেন একমত।

'কমাণ্ডের দায়িত্বভার থেকে আমাকে অব্যাহতি দেবার জন্য' জেনারেল চৌধুরী স্বয়ং নিফা গেছেন বলে এই সময় খবরের কাগজে একটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সংবাদ প্রকাশিত হয়। আসলে কিন্তু চৌধুরী এবং আমার উত্তরসূরী মানেকশ তেজপুর পৌঁছান আমি সেখান থেকে চলে আসার পর। পূর্বাহ্নেই সেখানে পৌঁছবার কোন উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। আমি যে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেছি, সে খবর সংবাদপত্রে কিছুদিন পর প্রকাশিত হয়।

দিল্লী পৌঁছবার পরই বেসরকারীভাবে নেহ্রু আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি পাথরের মূর্তির মতো বসে রয়েছেন তিনি। সামনে যেয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'তোমার মনের অবস্থা আমি জানি, বিজ্জি; কিন্তু পদত্যাগ করাটা তোমার কোনমতেই উচিত হয় নি। এটা করতে গেলে কেন?'

বললাম, 'বহুবিধ সঙ্গত কারণের জন্যই পদত্যাগ করেছি স্যার, এবং সেগুলির আর আলোচনা করতে চাই না।'

'ঠিক কী বলতে চাও?' নেহ্রু আবার জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'সেনাবাহিনী ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন তোমার নেই। জানি, তোমার বিরুদ্ধে বহু অন্যায় কথা বলা হয়েছে; কিন্তু আমি সে সমস্ত বিশ্বাস করি না এবং আরও অনেকেই করেন না। অনেকবার প্রকাশ্যে তোমাকে সমর্থন করেছি। অন্যান্য বহু বন্ধু-বান্ধবও তোমার যোগ্যতা জানেন। তাই বলছি, আর একবার ভেবে দেখ।'

ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে সরকারীভাবে জেনারেল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলাম। নিয়মমাফিক আমাকে অভিনন্দন জানাবার পর সিগারেটে একটা টান দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বেশ মুরুব্বীয়ানার সুরে বললেন, 'দুর্ভাগ্য সবারই আসে বিজ্জি। অবসর গ্রহণের অনুরোধটি নিয়ে যদি পীড়াপীড়ি না করেন তা'হলে সেনাবাহিনীতে আপনাকে বহাল রাখতে আমি রাজী আছি।'

আমি যাতে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, তাই প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে বহু ঘটনার স্মৃতি আমার মনের মধ্যে ভীড় করে এসে দাঁড়ালো।

১৯৫৯ সালে জেনারেল চৌধুরীর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে একটি সহানুভূতিসূচক পত্র লিখেছিলাম। জবাবে, ১৯৬০ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে তিনি আমাকে সুদীর্ঘ অসংলগ্ন বক্তৃতাপূর্ণ

একখানি চিঠি লিখে তাঁর রোগটি যে হৃদ্‌রোগ নয় সে কথাটা বোঝাবার একঘেয়ে চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে বহু বিষয়ে কটাক্ষও করেন। উত্তরে আমি লিখি :

'আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাকে যে সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেছেন, তাতে বিস্মিত হলাম। স্পষ্টতই আমি যা লিখিনি তাই আপনি আমার চিঠির প্রতি ছত্রে পড়বার চেষ্টা করেছেন···। সুযোগ-সন্ধানী মনোবৃত্তিকে যে আপনি পছন্দ করেন না, তার প্রমাণস্বরূপ নিজের জীবনের কয়েকটি নীতির উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সামরিক কর্ম-জীবনে আমরা কে কি করেছি, তা' উভয়েই জানি। সুতরাং নীতিকথা আমার কাছে বলা নিরর্থক। কারণ, নীতি সম্বন্ধে আমি শুধু মুখেই বলিনি, ব্যক্তিগতভাবে চর্চাও করেছি; এবং অনেকে যে নৈতিকতা সম্বন্ধে শুধু উপদেশই দিয়ে থাকেন সেকথাও জানি। যাই হোক, চিঠিখানা পড়ে বুঝলাম, আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া আমার উচিত হয় নি। এ ধরনের ভুল আমার দ্বারা আর কোনদিন হবে না···।'

এ চিঠির উত্তরে ১৯৬০ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে চৌধুরী লেখেন :

'আমার ১২ই জানুয়ারী, ১৯৬০ তারিখের চিঠি পড়ে আপনি যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তার জন্য আমি দুঃখিত। বস্তুতঃ, আপনার সাহায্য পাবো আশা করেই চিঠিখানা লিখেছিলাম।··· ভেবেছিলাম (সমস্ত ব্যাপারটা) আপনার জানা থাকলে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনি অবশ্যই ভিত্তিহীন গুজব-গুলির মূলোচ্ছেদ করতে পারবেন। (আমার বিরুদ্ধে) উচ্চাভিলাষের অভিযোগ করা হয়ে থাকে। উক্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনি যাতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, তাই চিঠিতে আমার জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথাও যোগ করেছিলাম। জীবনে কাউকে কখনও আমি 'নীতি বাক্য' শোনাই নি; এবং সে কাজটি নতুন করে শুরু করবার মতো সময়ও আজ আর নেই; বিশেষতঃ, আপনার মতো একজন বহুদিনের বন্ধুকে তো নয়ই। আশাকরি ব্যাপারটি এতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। যথোচিত শ্রদ্ধাসহ,

আপনার বিশ্বস্ত,

মুচু চৌধুরী

আরেকটি কথাও মনে পড়ে গেল। উপযুক্ত মহলে তাঁর সম্বন্ধে একটু সুপারিশ করে দেবার জন্য এই চৌধুরীই ১৯৬১ সালে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এগুলির সঙ্গে, এই গ্রন্থে উল্লিখিত আরও বহু ঘটনা ভীড় করে দাঁড়াল মনের মধ্যে। সেই চৌধুরীই আজ আমাকে সেনাবাহিনীতে বহাল রাখবার অনুকম্পা প্রদর্শন করছেন। গভীর একটা শ্বাস নিয়ে উদ্যত ক্রোধকে সংযত করলাম। তারপর দৃঢ়, স্থির কণ্ঠে বললাম: 'ভাগ্য যে আমার প্রতি বিরূপ হয়েছিল, সে কথাটা আপনি স্বীকার করায় খুশী হ'লাম। কিন্তু আপনি জানেন, কথার আমার নড়-চড় হয় না। সুতরাং, অবসর গ্রহণের অনুরোধটি বহাল রইল।'

তিনদিন পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী চ্যবন আমাকে ডেকে পাঠালেন। চৌধুরীও গেলেন আমার সঙ্গে। চ্যবন জানতে চাইলেন সেনাবাহিনী ত্যাগ করতে আমি বদ্ধপরিকর কি না। আমার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথাটা জানিয়ে দিলাম তাঁকে। উত্তরে চ্যবন বললেন, আমার অনুরোধটি তিনি নেহ্‌রুর কাছে পেশ করবেন।

আবার ডাক এলো নেহ্‌রুর কাছ থেকে। দেখা করলাম গিয়ে। বললেন, আমাকে সেনাবাহিনী ত্যাগ না করতে রাজী করাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু খবর পেয়েছেন চ্যবন ও চৌধুরীর কাছে, আমি নাকি অবসর গ্রহণের দৃঢ় সঙ্কল্পে' কথা ব্যক্ত করেছি। আরও বললেন, আমার বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগের দীর্ঘ একটি তালিকা চৌধুরী তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন কিন্তু সেগুলির স্বপক্ষে কোন প্রম''ই উপস্থিত করেন নি। মন্তব্যগুলির সত্যাসত্য সরকারীভাবে যাচাই করার জন্য নিয়ম মতো যে সমস্ত দলিলপত্র পাঠানো দরকার, তাও তিনি আমার চাকুরীর কাগজপত্রের সঙ্গে পাঠান নি।

অভিযোগগুলির[৩৯] সারমর্ম নেহ্‌রুর মুখ থেকে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

৩৯। পূর্ববর্তী একাধিক বাৎসরিক ''পন প্রতিবেদনে চৌধুরী আমার প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলি ছিল সেগুলির বিপরীত। যেমন, একখানি গোপন প্রতিবেদনে তিনি আমাকে অসাধারণ উদ্যমশীল, সেনাবিভাগের সুযোগ্য ও পরম নির্ভরযোগ্য কর্মী তথা সুস্পষ্ট ধারণা-শক্তি সম্পন্ন বলে বর্ণনা ক'রে, আমার প্রশ্নাতীত সততা এবং দেশ ও কর্মের প্রতি অসীম আনুগত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আরও বলেছিলেন, কমাণ্ড ও স্টাফ উভয়বিধ কর্মের পক্ষেই আমি সমান উপযুক্ত। আমাকে লেখা একাধিক পত্রেও তিনি আমার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সেগুলি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে অন্যত্র উল্লেখ করেছি। ভণ্ডামীর একটি বিশিষ্ট নজীর হয়ে থাকবে এগুলি। একদিকে লিখিত ও মৌখিকভাবে বছরের পর বছর তিনি আমার প্রশংসা করেছেন, আর আজ পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করলেন।

এগুলি আমার সামনে বলার মতো সাহস চৌধুরীর ছিল না। তাই আঘাত করেছিলেন পিছন থেকে। দলিলপত্র না পাঠানোর কারণও অনুমান করলাম। পূর্ববর্তী বৎসরগুলির গোপন প্রতিবেদনে চৌধুরী স্বয়ং আমার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ; এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাম্প্রতিক অভিযোগগুলি পরস্পর-বিরোধী হয়ে পড়ে ; এবং পাছে তা' নেহ্‌রুর নজরে পড়ে যায় তাই দলিলগুলি তিনি চেপে দিয়েছিলেন।

নেহ্‌রু আবার বললেন, আমাদের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পরিণতিস্বরূপ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপপ্রচারের উপর ভিত্তি করে দেশব্যাপী যে ধরনের প্রতিক্রিয়া তথা বাগ্‌-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে তিনি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছেন ; এবং এই মুহূর্তে এ ব্যাপার নিয়ে তাই আর কোন বিতর্কের সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নন। পরিশেষে বললেন, এই সমস্ত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখিত চিত্তে একটু আগে তিনি আমার অবসর গ্রহণের প্রার্থনা অনুমোদন করেছেন। জবাবে বললাম, তিনি যে কী অবস্থার মধ্যে রয়েছেন তা' আমি ভালো করেই বুঝতে পারছি ; এবং এ ব্যাপারে তাঁর বিবেকে কোন রকম অস্বস্তি বোধ করার কারণ নেই।

অবসর গ্রহণের অনুরোধটি সম্বন্ধে সরকার থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে, অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাকে সেটি প্রত্যাহার করে নিতে বলেন। চাকুরীতে বহাল থাকার বহুবিধ সুবিধার কথাও উল্লেখ করেন তাঁরা। মার্কিন রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ একদিন দ্বিপ্রাহরিক আহারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের এ. ডি. সি. হিসাবে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। তিনিও আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে দেখা করেন, এবং আমার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তে নেহ্‌রু যে দুঃখিত হয়েছেন সে কথা জানান। ওয়েলিস্ হেন্‌জেন্ তাঁর 'নেহ্‌রুর পর কে?' (After Nehru Who?) গ্রন্থটিতে আমার সম্বন্ধেও একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। ১০ই ডিসেম্বর তারিখে একখানি পত্রে তিনি আমাকে লেখেন: 'যে সামরিক কর্মক্ষেত্রে আপনি ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল অতীব সম্মানের সঙ্গে কাজ করে এসেছেন, সেই কর্মজীবনেই আপনার নিযুক্ত থাকা আমার মতে সব দিক থেকেই একান্ত প্রয়োজনীয়।...এই মুহূর্তে এটি আরও প্রয়োজনীয়...। আপনি চাকুরীতে থাকতে চান এটা জানিয়ে পুনরায় নেহ্‌রুর পরামর্শ গ্রহণ করুন।...কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ

করলে আপনার কুৎসা-রটনাকারীদেরই সুবিধা হবে; বেপরোয়া হয়ে উঠবে তারা…।'

বহু সংসদ-সদস্য এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিরাও অবসর গ্রহণের অনুরোধটি আমায় প্রত্যাহার করে নিতে বলেন। এমন নজীর যে নেই, তা' নয়। অতীতে অনেকেই পদত্যাগপত্র পেশ করবার দু'একদিনের মধ্যেই 'সাধাসাধির পর' মত পরিবর্তন করে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সে ধরনের কিছু করবার কোন প্রশ্ন ছিল না।

এই সময়েই লস্ এঞ্জেল্‌সের রেকি হল্‌সি এজেন্সীর কাছ থেকে একখানি চিঠি পাই। চিঠিতে তাঁরা আমাকে (আমার অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত) কিছু প্রকাশযোগ্য তথ্য ও চলচ্চিত্রের উপাদান পাঠাতে বলেন। তাঁদের সে অনুরোধ অবশ্য আমি রক্ষা করি নি।

১১ই ডিসেম্বর তারিখে জেনারেল চৌধুরী আমার বাসভবনে টেলিফোন করে জানালেন, সরকার আমার অবসর গ্রহণের অনুরোধপত্রটি গ্রহণ করেছেন। কার্যকাল পূর্ণ হবার বহু আগে, পঞ্চাশ বছর বয়সে, এইখানেই আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি হ'ল। স্যার এডুইন আর্নল্ড যথার্থই বলেছেন, 'ভাগ্যকে কে রোধ করবে!'

মোহ আমার সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সব কিছু ছেড়ে, বিশেষ করে যে সমস্ত ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র আর দুর্ব্যবহার আমার মন-প্রাণ তিক্ত করে দিয়েছিল তাদের এবং এই পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শ থেকে দূরে—বহুদূরে, প্রয়োজন হ'লে ভিন্ন দেশেও চলে যাবার জন্য হৃদয় আমার আকুল হয়ে উঠলো। মনে পড়লো জনৈক উর্দু কবির কবিতার দু'টি চরণ:

গর্‌দিশ্-ই-আইয়াম্ তেরা শুক্রিয়া
হম্‌নে হর্ পহেল সে দুনিয়া দেখ্‌লী।

[হে নিয়তি, তোমার কৌতুকের জন্য ধন্যবাদ। জীবনের সব ক'টি দিকই আমি দেখে নিলাম।]

স্বাস্থ্য আমার ভেঙে পড়ছিল। কন্যাও অসুস্থ হয়ে পড়ল আবার। তবু ৫নং ইয়র্ক রোডের বাসাটি ছেড়ে দিতে মনস্থ করলাম। বিকল্প বাসস্থানের জন্য আবেদনও করে দিলাম একটা। পেলামও; কিন্তু গ্রহণ করা হ'ল না।

মনে হল, বারংবার বাসা বদল না করে নিজের কোন একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে একেবারে চলে যাওয়াই শ্রেয়।

১৯৬২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিদায় জানিয়ে নেহ্‌রুকে একটি পত্র দিলাম। সেই দিনই জবাব এলো নেহ্‌রুর কাছ থেকে। লিখলেন:

প্রিয় বিজ্জি,

অবসর গ্রহণ করছো, সে জন্য দুঃখ বোধ করছি। এ কাজ থেকে তোমাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু তোমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে এ বিষয়ে আর কিছু করতে পারলাম না। অতীব দুঃখজনক কতগুলি ঘটনার জন্য তোমাকে অবসর গ্রহণ করতে হ'ল; এবং এর জন্য আমরা অনেকেই মর্মাহত[৪০]। যাই হোক, আমি নিশ্চিত যে, এগুলির জন্য বিশেষ করে তোমাকেই দোষ দেওয়া যায় না। একাধিক ব্যক্তি, এবং সম্ভবতঃ শুধু পরিস্থিতিই উক্ত ঘটনাগুলির জন্য দায়ী।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার মতো কর্মঠ এবং দেশপ্রেমিকের পক্ষে দেশের জন্য কার্যকরী কিছু না করে অলসভাবে বসে থাকা সম্ভব হবে না। আশাকরি অচিরেই যোগ্য কাজটি তুমি খুঁজে পাবে…।

তোমার অনুরাগী,
জওহরলাল নেহ্‌রু

১১ই জানুয়ারী তারিখে ৫নং ইয়র্ক রোডের বাসা ছেড়ে দেওয়া স্থির হ'ল। নেহ্‌রুর আমন্ত্রণে একদিন সন্ধ্যায় আমার কন্যা অনুকে নিয়ে তাঁর বাসভবনে দেখা করতে গেলাম। অনুকে (তখনও সে খুবই অসুস্থ) নেহ্‌রু সস্নেহে বললেন, 'নিজের ও তোমার বাবার প্রতি অবশ্যই নজর রাখবে।' তারপর আবেগ দমন করবার জন্য অকস্মাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

১০ই তারিখে ৫নং ইয়র্ক রোডের বাসায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন

৪০। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে নেহ্‌রু লোকসভায় ঘোষণা করেন, ১৯৬২ সালে চীনের বিরুদ্ধে আমাদের সামরিক বিপর্যয়ের জন্য সেনাবাহিনীর কোন জেনারেলকে দোষ দেওয়া যায় না। ১৯৬২ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে লিখিত তাঁর মাসিক পত্রেও নেহ্‌রু বলেন, সময়কাল পূর্ণ হবার পূর্বেই কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে জেনারেল থাপার এবং কল অতীব সম্মানযোগ্য মনোভাব প্রদর্শন করেছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর এই সৌজন্যমূলক ব্যবহার আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করলো।

কত আনন্দের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল ৫নং ইয়র্ক রোডের বাসার সঙ্গে। ১৯৬৩ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে সেই আবাস ত্যাগ করলাম। সমস্ত জিনিসপত্র ট্রাকে বোঝাই করা হ'ল। এবার যাবার পালা। এমন সময় দেখলাম বিবাহের একটি শোভাযাত্রা আমার বাসার সামনে দিয়ে চলেছে। আশ্চর্য! এমন পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতির সম্মুখীন মানুষকে প্রায়ই হতে হয়।

মালপত্রগুলি দিল্লী ক্যান্টনমেন্টের একটি গুদামে বিশৃঙ্খলভাবে জমা করে রাখা হ'ল। মেজর জেনারেল ভগবতী সিং-এর সঙ্গে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করলাম। তারপর একদিন আমার মোটর নিয়ে রওনা হলাম গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে। পথে মথুরা এবং আরও কয়েকটি স্থানে দু'এক দিন করে অতিবাহিত করলাম। যাযাবরের মতো এইভাবে কেটে গেল কয়েকটি সপ্তাহ।

তারপর একজন আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে আবার দিল্লীতে ফিরে আসতে হ'ল। সে উৎসবে নেহ্রুও নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। দিল্লীতে কোথায় এসে উঠেছি জিজ্ঞাসা করলেন নেহ্রু। নিজের কোন বাড়ী আমার ছিল না। তাই উঠেছিলাম এসে গীতা-আশ্রমে। (দিল্লী ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিতে অতিথিদের জন্য দু'টি ঘর তৈরী করতে একদিন দান করেছিলাম। ভাগ্যের পরিহাস, সেই ঘর দু'টিরই একখানাতে এসে উঠেছিলাম আমি।) কথাটি বলতেই বিস্ময় ও বেদনায় আমার দিকে তাকালেন নেহ্রু।

কয়েকদিন পর নেহ্রুর আহ্বানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এভাবে চাকুরী, বাসস্থান সমস্ত ছেড়ে, আমার ও কন্যার অসুস্থতা সত্ত্বেও আশ্রমে অতো কষ্টের মধ্যে বাস করে নিজেকে এভাবে 'নিঃশেষ' করে ফেলছি বলে প্রথমেই অনুযোগ করলেন তিনি। তারপর বললেন, সিমলায় হিমাচল প্রদেশের লেফ্টনান্ট্ গভর্ণররূপে[৪১] আমাকে নিযুক্ত করবার সম্ভাবনা রয়েছে। যাই হোক, এ ব্যাপারে পরে আর কিছু শুনিনি। মনে হয়, কোন কারণে প্রস্তাবটি চাপা পড়ে যায়।

৪১। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর কাছ থেকে এই সম্ভাবনার কথাটি তিনিও শুনেছিলেন বলে মেজর জেনারেল এম. এস. হিম্মতসিংজী আমাকে জানান।

গ্রীষ্মকাল এসে গেল। একেই আশ্রম-জীবনে আয়েস-আরাম বলে কিছু নেই। তার উপর আমি ও আমার কন্যা উভয়েই ছিলাম অসুস্থ। যে ধরনের জীবনযাত্রায় এতদিন ধরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, এখানকার জীবনযাত্রা ছিল ঠিক তার বিপরীত। পূর্বেকার মতো আমার চারদিক ঘিরে সেইরকম জাতীয়-কর্মচাঞ্চল্য, প্রতিষ্ঠা এবং প্রভুত্ব; সামরিক পদমর্যাদাসূচক তারকাচিহ্ন, পতাকা অথবা শিরোভূষণ; রক্ষীদল, ব্যক্তিগত কর্মচারী কিংবা পরিচারক-বৃন্দ; বিশিষ্ট উৎসবাদিতে নিমন্ত্রণ; বিভিন্ন সমিতি ও প্রতিষ্ঠানে সভাপতিত্ব অথবা মুখ্য পৃষ্ঠপোষকের আসন কিংবা বিউগলের ধ্বনি—কিছুই ছিল না। বছরের পর বছর ধরে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রুদ্ধশ্বাসে কাজ করবার পর, আজ যেন সময় আর কাটতে চাইতো না। এই পরিস্থিতির মধ্যে দেখে অনেকেই আমাকে অবজ্ঞা করতেন। ব্যথা পেতাম তাঁদের ব্যবহারে। বন্ধু-বান্ধবের অনেকেই অবশ্য পূর্বেকার আন্তরিকতা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন সুবিধাবাদী শিশিরবিন্দুর মতো অদৃশ্য হয়ে নিজেদের কৃতঘ্নতার নগ্ন পরিচয় প্রদান করলেন। ফলে, চরম একটা নিঃসঙ্গতা এবং হতাশার ভাব নেমে এলো আমার উপর। শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গুরুবাণী'র একটি উপদেশের কথা মনে পড়লো: 'দুঃসময়ে বন্ধুও শত্রু হয়ে ওঠে'। যাই হোক, এই ধরনের জীবনযাত্রাও আমার ও ধান্নোর উভয়েরই ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে এল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, প্রয়োজন হ'লে মানুষ কীভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।

আমার শত্রুদের সেই আনন্দোৎসবের দিনে, জীবনের একমাত্র ভরসাস্থল হিসাবে পেয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে[৪২]। পাশে এসে পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। যা' ঘটে গেছে, তার জন্য কোনদিন তাঁর মুখে এতটুকু বিরক্তির চিহ্ন দেখি নি। পরম সহিষ্ণুতায় সব কিছুকে যেন উদাসীনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কোনদিন তিনি আমার কাছে বেশী কিছু আকাঙ্খা করেন নি। সারাটা জীবন ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে নিঃস্বার্থ কর্ম এবং সংযমের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। সত্যি কথা বলতে গেলে, শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি ধান্নোই হলেন আমার জীবনের পরম সম্পদ।

এই সময়ে সংবাদ পাই যে, নিফা যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে লেঃ জেনারেল হেন্ডারসন্ ব্রুক্স্ তদন্ত করছেন। ১৯৬৩ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে

৪২। সেই দুর্দিনে পরিবারের সকলেই আমার পাশে এসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াল।

অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত সি. জি. এস.-কে সরকারীভাবে একখানি পত্র লিখে জানালাম (চিঠিখানি চৌধুরীও দেখেছিলেন), নিফা-যুদ্ধে যে সমস্ত সেনাপতি এবং কর্মচারী আমার অধীনে কাজ করেছিলেন তাঁদের অনেকের সাক্ষ্যই উক্ত তদন্ত কমিটিতে গ্রহণ করা হয়েছে; এবং আমার মনে হয় নিফার 'কোর' অধিনায়ক হিসাবে আমারও সাক্ষ্য উক্ত তদন্ত কমিটিতে গ্রহণ করা উচিত। আরও লিখলাম, পূর্বেকার মতো, এই তদন্তের ফলাফলও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে পারে এবং সংসদেও তা' নিয়ে আলোচনা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টির সঙ্গে আমার সামরিক মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল, এবং সংবাদপত্র ও অন্যান্য মহলে আমার বিরুদ্ধে এ নিয়ে বহু কুৎসাও রটনা করা হয়েছে। সুতরাং আমার অনুরোধ, হেন্‌ডার্‌সন্ ব্রুক্‌সের সামনে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে নিজের বক্তব্য বলবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হোক। (বেশ কয়েকমাস যাবৎ নিফা তদন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, এবং আমি যখন স্বেচ্ছায় উক্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হবার প্রস্তাব করি, তখন তার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তথাপি এই সুযোগ থেকে এ পর্যন্ত আমাকে মৌখিকভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়।) আমার অনুরোধের জবাবে নিজের সি. জি. এস.-এর মারফত চৌধুরী জানালেন, পরদিন জলন্ধরে আমি নিফা তদন্ত-কমিটির সামনে (হেন্‌ডার্‌সন্ ব্রুকসের অধীনে) উপস্থিত হতে পারি।

এ সত্ত্বেও তদন্ত-কমিটিতে হাজির হয়ে লেঃ জেনারেল হেন্‌ডার্‌সন্ ব্রুক্‌সের কাছে শুনলাম আমাকে মৌখিকভাবে পরীক্ষা না করার জন্য নাকি তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। চৌধুরী নিজেই আমাকে হেন্‌ডার্‌সন্ ব্রুক্‌সের কাছে মৌখিক সাক্ষ্য দেবার জন্য পাঠালেন; অথচ ব্রুকসের কথা মতো, তাঁকে সম্পূর্ণ বিপরীত এক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর কেতাবী অথবা লোক-দেখানো ব্যাখ্যা হতে পারে মাত্র দু'টি: লেঃ জেনারেল হিসাবে হেন্‌ডারসন্ ব্রুক্‌স্ আমার চাইতে জুনিয়র হবার কারণে আমায় তিনি 'পরীক্ষা' করতে পারেন না; অথবা, পূর্বেই যেহেতু নিফা যুদ্ধের ব্যাপারে আমার বক্তব্য লিখিতভাবে দাখিল করেছি, তাই আমার কাছ থেকে আর কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু, সেক্ষেত্রে চৌধুরী আমাকে হেন্‌ডারসন্ ব্রুক্‌সের কাছে আদৌ পাঠালেন কেন? বরং আগেই, দিল্লী থেকে জলন্ধর যাবার পূর্বেই জানিয়ে দিতেন যে, এই সমস্ত অথবা অন্য কোন কারণে আমার সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

এই কমিটির[৪৩] তদন্তের 'ফলাফল' নিয়ে সংসদে পরে আলোচনা হবার সম্ভাবনা ছিল। নিফা যুদ্ধে বিপর্যয়ের জন্য আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অন্ত ছিল না। নিফায় যাঁরা আমার অধীনে কাজ করেছিলেন, তাঁদের অনেককেই সাক্ষ্য দেবার সুযোগ দেওয়া হ'ল। অথচ উক্ত যুদ্ধের 'কোর' অধিনায়ক হিসাবে অনুসন্ধান কমিটি আমাকে মৌখিক সাক্ষ্য দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেন। লিখিতভাবে সব কথা নেহ্‌রুকে জানালাম। (তদন্তের সম্পূর্ণ ফলাফল আজ অবধি প্রকাশ করা হয় নি কেন? নিফা-বিপর্যয়ের ব্যাপারে উক্ত প্রতিবেদনে সরকারী দায়িত্ব সম্বন্ধে অস্বস্তিকর কোন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে বলেই কি?)

আমার মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হেন্‌ডারসন্ ব্রুক্‌সের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই, ১৯৬২ সালের নিফা যুদ্ধ সম্পর্কে আমার বক্তব্য লিখিতভাবে এই তদন্ত কমিটির কাছে দাখিল করবার প্রস্তাব করলাম। এর বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ না থাকায় ব্রুক্‌স্ এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমিও আমার লিখিত বক্তব্য দাখিল করলাম তাঁর কাছে।

১৯৬৩ সালের ১৫ই মে তারিখে আমার অবসর গ্রহণের কথা। নির্দিষ্ট দিবসের সাত দিন আগে মনে হ'ল, যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার আজীবনের সম্পর্ক ছিল, তাকে বিদায় অভিবাদন না জানিয়ে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা আমার পক্ষে অনুচিত হবে। কিন্তু একমাত্র প্রধান সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁরই মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে বিদায় জানানো যেতে পারে। তা' ছাড়া আর-কোন উপায় নেই। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চৌধুরীর দফতরে গেলাম। ভিতরে প্রবেশ করে স্যালুট্ করতেই সৌজন্যবশতঃ চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। চিরদিনের মতো সেনাবাহিনী ছেড়ে দেবার আগে, শেষ বিদায় জানাতে এসেছি শুনে খুশী হলেন চৌধুরী। তারপর, তাঁর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী আছি কি না জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে জানালাম, কর্মজীবনের শেষ দিনে কোন প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আমি আসি নি। তবে একান্তই যদি তিনি চান, তবে জবাব দেবার চেষ্টা করবো। চৌধুরী তখন বললেন, ১৯৬২ সালে উপযুক্ত সঙ্গতি বিনাই আমাদের

৪৩। কোন্ কোন্ সাক্ষীকে ডাকা হয়েছিল, কাদের বাদ দেওয়া হয় এবং বাদ দেবার কারণই বা কী, ইত্যাদি বিষয় হয়তো একদিন পরিসংখ্যানবিদ ও ঐতিহাসিকদের কৌতূহলের উদ্রেক করবে।

সেনাবাহিনীকে চীনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলা হয়েছিল, সেকথা তিনি জানেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে আমি কিংবা থাপার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং দৃঢ়ভাবে সরকারের সেই আদেশের বিরোধীতা করি নি কেন। প্রশ্নের যথোপযুক্ত জবাব দিলাম তাঁকে।

১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীর একটি পার্টিতে দেখা হবার পূর্বে তেজাকে আমি চিনতাম না, এবং তাঁর নামও শুনি নি। সেই পার্টিতেই তিনি আমাকে বলেন, ১৯৬২ সালে আমি যখন সেনাবিভাগে কর্মরত, সেই সময় একদিন দেখা করবার জন্য আমার বাসভবনে এসেছিলেন; কিন্তু সেদিন আমি অসুস্থ থাকায় দেখা করতে পারেন নি। তেজাই বিদেশে আমাকে একটি চাকুরীর প্রস্তাব দেন। বিশদ বিবরণাদি পরে তিনি একখানি পত্রে জানান। লেখেন:

'ভারতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-প্রকল্প গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি আমি। প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি হ'ল জয়ন্তী শিপিং কোম্পানী। বর্তমানে ১২০ মেগাওয়াট থারমল শক্তিসম্পন্ন একটি কেন্দ্র, বাৎসরিক ৩,০০,০০০ টন কাঁচা লোহা উৎপাদনে সক্ষম একটি কারখানা এবং বছরে ৯,০০০ টন উৎপাদনক্ষম একটি হেভী ডিউটি ফোরজিং কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা আমার রয়েছে।

প্রকল্পগুলি আরম্ভ করা এবং উন্নয়নের জন্য বাইরের যে সমস্ত দেশ থেকে কারিগরী সাহায্য, কারখানা ও যন্ত্রপাতি আমরা আমদানী করি, সেই সমস্ত দেশে আমাদের প্রস্তুতিমূলক তথা প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রচুর পরিমাণে করা দরকার। এবং এ সমস্ত কাজের জন্য উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন সুদক্ষ প্রশাসকেরও প্রয়োজন।

এই প্রকল্প ও পরিকল্পনাগুলিতে আপনি প্রবীণ উপদেষ্টা হিসাবে আমার সঙ্গে কাজ করলে আন্তরিকভাবে খুশী হব। সম্প্রতি টোকিওতে একটি দফতর স্থাপন করছি। আমার ইচ্ছা, আপনি সেই দফতরের ভার গ্রহণ করুন। ...এই ব্যাপারে আপনার মতো যোগ্য এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি সাহায্য করলে সেটা হবে আমার একটা বিরাট উপকার...। আমার, তথা এই প্রকল্পগুলির সঙ্গে যতদিন ইচ্ছা আপনি যুক্ত থাকতে পারেন...।

আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে এই চিঠি লেখার কারণ হ'ল, আমার বিশ্বাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সাহচর্যের ভিত্তিতে আমি এবং আপনি একযোগে যে কাজই করি না কেন…তা' ভারতের আর্থিক ও শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যের দিকেই চালিত হবে। এবং এ ব্যাপারে আপনার যে কোন উদ্যমকেই আমি সাগ্রহে অভিনন্দন জানাবো।

কয়েকদিন আগে মৌখিকভাবে এই অনুরোধটি আপনাকে করেছিলাম। তারপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চ্যবনের কাছেও এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। তাঁকে এ ব্যাপারটি জানিয়ে রাখা আমার সঙ্গত মনে হ'ল। আমার ধারণা, এতে তাঁর আপত্তি নেই…। ২৯শে এপ্রিল, ১৯৬৩ তারিখে আমি ভারতের বাইরে যাচ্ছি। আশা করি তার আগেই আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার মতামত পাবো।'

•

তেজা আমাকে বাৎসরিক কুড়ি হাজার ডলার বেতন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন (আয়কর মুক্ত নয়)। তৎকালীন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হিসাবে এটা মাসে প্রায় আট হাজার টাকার মতো দাঁড়ায়। প্রস্তাবটি ভালোই মনে হ'ল। মোটা বেতন[৪৪] কিংবা আয়েস-আরামের সম্ভাবনার জন্য নয়। কারণ, বেতনের অধিকাংশই চলে যাবে আয়কর দিতে। আসলে এই হতাশাব্যঞ্জক পারিপার্শ্বিক থেকে মনকে অন্য দিকে সরিয়ে নিতে এবং সাম্প্রতিক মোহভঙ্গের দৃশ্যপট থেকে যত দূরে সম্ভব চলে যাবার জন্য হৃদয় আমার আকুল হয়ে পড়েছিল। তেজার প্রস্তাব এনে দিল সেই সুযোগ। সুতরাং সরকারের সম্মতি নিয়ে লিখিতভাবে চাকুরী গ্রহণের ইচ্ছা তেজাকে জানিয়ে দিলাম। তেজা কর্তৃক আমাকে চাকুরী দেবার পশ্চাদ্‌পট সম্বন্ধে আমি এইটুকু মাত্র জানি।

তেজা আমাকে যে বেতন প্রদান করবার প্রস্তাব করেছিলেন, তা' যে আয়কর মুক্ত নয় সেকথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তথাপি সংসদে প্রশ্নোত্তরের সময় চাকুরীটিকে আয়কর মুক্ত বলে চ্যবন বিবৃতি দেন। পরের দিনই চ্যবনের দফতরে গিয়ে তাঁকে জানালাম যে বিবৃতিটি সঠিক নয়। অনুসন্ধানের পর অনিচ্ছাকৃত ওই ত্রুটির জন্য তিনি

৪৪। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে মাসিক ৪,০০০ টাকা বেতন এবং অন্যান্য বহু ভাতা পাচ্ছিলাম।

দুঃখ প্রকাশ করলেন। অতঃপর পূর্ব বিবৃতির একটি সংশোধনীও প্রকাশ করা হ'ল। কিন্তু প্রথম বিবৃতিটি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় শীর্ষসংবাদ হিসাবে স্থান পেয়েছিল। পরবর্তী সংশোধিত বিবৃতি কারও নজরেই পড়ল না।

উচ্চপদস্থ বহু সামরিক ও অসামরিক কর্মচারী বেসরকারী সংস্থায় মোটা বেতনের চাকুরী গ্রহণ করেছেন। তেজা আমাকে যা' দিচ্ছিলেন, তার থেকে কম বেতন তাঁরা পেতেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশীই পেতেন। তথাপি তাঁদের বিরুদ্ধে (আজ অবধি) একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নি। আমার ক্ষেত্রে চারদিকে একটা সোরগোল পরে গেল।

ভারত ত্যাগের পূর্বে নেহ্‌রুর কাছে বিদায় গ্রহণ করতে গেলাম। অত দূর বিদেশে চলে যাচ্ছি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে আবেগভরে বললেন, বেশীদিন বিদেশে না থেকে শীঘ্রই যেন ফিরে আসি।

স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে পড়ছিল আমার। টোকিও যাত্রার দিন পালাম বিমান বন্দরে ভয়ানক অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। সামরিক ও বেসামরিক বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বিদায় জানাতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সৌজন্যমূলক কথা-বার্তা বলবার সময় অনুভব করলাম আমার পা দুটো কাঁপছে আর মাথা ঘুরছে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলালাম। কয়েকমাস আগেও স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার একটা গর্ব ছিল। বিশ্বাস করা কঠিন যে আজ এই অবস্থায় উপনীত হয়েছি। চরম একটা অসহায় এবং অবসন্ন অবস্থার মধ্যে প্রায় ভেঙ্গে পড়বার পর্যায়ে এসে পৌছেছিলাম। বিমানযাত্রা পথের মধ্যে যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়ি সেজন্য ঈশ্বরের কাছে নীরবে প্রার্থনা জানালাম। বিমান এসে না পৌছন অবধি কোন রকমে সহ্য করে রইলাম সেই কঠিন পরীক্ষায়। এমন একটা মানসিক অবস্থায় তখন পৌছেছি যে কোথায় যাচ্ছি সে সম্বন্ধে কোন ভাবনা-চিন্তাই আর ছিল না।

টোকিও পৌছতে পৌছতে আমার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল। হাত-পা সব সময়ে টলতো। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হ'ত ভয়ানক। জাপানে পৌছে প্রথম কয়েকদিন যেন ভীতপ্রায় হয়ে রইলাম। মনে হ'ত দেশ ছেড়ে এত দূরে এসে ভুল করেছি। সম্পূর্ণ জীবনটা যেন শূন্য, উদ্দেশ্যহীন বলে বোধ হ'ত।

নতুন পরিবেশ এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে দ্রুত স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে লাগল আমার। কিছুদিন পর, কর্মোপলক্ষ্যে লণ্ডন যেতে হ'ল। সেখানে পৌঁছে মস্কোস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত টি. এন. কলের কাছ থেকে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ পেলাম। বন্ধুমহলে এই সুদক্ষ রাষ্ট্রদূত 'টিক্কি' নামে পরিচিত। লণ্ডন থেকে আমার যাবার কথা ছিল প্রাগে। তবুও টিক্কির আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

চেকোশ্লোভাকিয়ার উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিমোভিক্-এর সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। দশ বছর পূর্বে আমি যখন কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর চীফ্ অফ স্টাফ্, সিমোভিক্ তখন ছিলেন সেখানকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পুনর্বাসন কমিশনের চেক্ সদস্য। আবার ১৯৬২ সালে তিনি যখন চেক্ রাষ্ট্রদূতরূপে দিল্লীতে আসেন তখনও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। প্রাগে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আমায় গ্রহণ করলেন সিমোভিক্। প্রাগে আমার তিন দিন অবস্থানের মধ্যে অনেকখানি সময় তিনি আমার সঙ্গে অতিবাহিত করেন। ছবির মতো সুন্দর 'চেক্ হাইওয়ে'র উপর দিয়ে দীর্ঘ মোটর যাত্রায় আমায় নিয়ে যান, এবং নিজের বাড়ীতেও নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ হ'ল। চমৎকার লাগলো তাঁদের। আর দেখা হ'ল আরেকজন পুরাতন বন্ধু উইস্কলার-এর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল কোরিয়াতেই। চিত্তাকর্ষক চেক্ দেশের আরও বহু দর্শনীয় স্থান ও দৃশ্য আমায় দেখালেন উইস্কলার।

প্রাগ থেকে যে বিমানে আমার মস্কো যাবার কথা ছিল, খারাপ আবহাওয়ার দরুন সেটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্ব করতে থাকে। সুতরাং বিমান বন্দরে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়ালাম। হঠাৎ কানে গেল জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিভিন্ন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সম্পর্কে জোর-গলায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পূর্ণ মন্তব্য করে চলেছেন। এ ব্যাপারে সম্ভবতঃ তাঁর বেশ কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অনেকেই বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন তাঁর দিকে। ভদ্রলোক কিন্তু নিজের ভুল সম্বন্ধে নির্বিকার। কয়েক মিনিট পর একজন পুলিশ এসে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বেচারীর অদৃষ্টে কী ঘটলো জানি না।

মস্কো বিমান বন্দরে টিক্কি আমার জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আমার বিমানটি কখন পৌঁছবে সে সম্বন্ধে তাঁকে কেউ

কিছু বলতে না পারায়, বাড়ী ফিরে যান। মস্কো যখন পৌছিলাম তখন রাত দুটো বাজে। বিমান বন্দরটিকে[৪৫] রোম, প্যারিস অথবা নিউইয়র্কের মতো অতটা আধুনিক বলে মনে হ'ল না। শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীদের ব্যবহার দেখলাম ভালোই। কিন্তু আমার পাসপোর্টটি নিয়ে বিভিন্ন কর্মচারী বারংবার পরীক্ষা করলেন।

ছাড়া পেয়ে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ত্রিশ কিলোমিটার দূরবর্তী ভারতীয় দূতাবাসে পৌছলাম। টিক্কি নিজের সচিবকে আমার অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছিলেন। আমি পৌছতেই স্বাগত জানাবার জন্য নিজে উঠে এলেন।

পরদিন ছিল ৭ই নভেম্বর। ঠাণ্ডাও পড়লো বেশ ভালো করে। সেই দিনই আবার অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিক অনুষ্ঠান। দৈবক্রমে সেই দিন আমি মস্কোতে উপস্থিত থাকায় উৎসব দেখবার জন্য টিক্কি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। রুশ বৈদেশিক দফতর থেকে (MID) এই উৎসবের একটি প্রবেশপত্রও তিনি আমার জন্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। যাই হোক, সকাল ৬টা পর্যন্ত আমরা বসে বসে গল্পগুজব করলাম। তারপর প্রস্তুত হলাম অক্টোবর বিপ্লবের প্যারেড দেখতে যাবার জন্য।

রেড্ স্কোয়ারের সীমানাতেই সমস্ত গাড়ীগুলিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। গাড়ী থেকে নেমে -র্শকদের আসনের দিকে পদব্রজে যাবার সময় বারংবার নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হ'ল। কূটনৈতিক পরিচয়পত্র থাকার কারণে ']ক্কির ভিতরে যেতে কোন অসুবিধা হ'ল না। কিন্তু একজন নিরাপত্তা রক্ষী আমাকে (ভিতরের সারিতে প্রবেশ করবার মুখেই) থামিয়ে দিয়ে পাসপোর্ট দাবী করে বসলো। রুশ বৈদেশিক দফতরের অনুমতিপত্রটি দেখালাম; কিন্তু রক্ষীটি জিদ ধরলো পাসপোর্টের জন্য। পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা অনুমতিপত্রটিতে লেখা ছিল না। সে কথা বলা সত্ত্বেও রক্ষীটি দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিল, পাসপোর্ট না পেলে আমাকে সে আর এগুতে দেবে না। প্রথমটা নিরুদ্যম হয়ে পড়লাম। পাসপোর্ট সম্বন্ধে আগে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয় নি। তা' ছাড়া, জনসাধারণের এই উৎসবে এ ধরনের নিরাপত্তার কড়াকড়ি দেখে একবার

৪৫। সম্প্রতি মস্কোতে একটি উন্নততর বিমানবন্দর নির্মিত হয়েছে বলে শুনেছি।

ভাবলাম ফিরে যাই। অকস্মাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেঃ জেনারেল ভি. আর. খানোলকর-এর একটা কথা মনে পড়ল। বলতেন, ঝামেলা কিংবা গোলমেলে অবস্থায় পড়লে প্রথমটা চীৎকার-চেঁচামেচি করবে। এই পন্থায় যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তখন (পথ পরিষ্কার করে নেবার জন্য) চেষ্টা করবে আপসের। এই সহজ সূত্রটি তাঁর না কি অনেক উপকারে এসেছিল। এখানেও সেই সূত্র পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। নাছোড়বান্দা রক্ষীটির দিকে তাকিয়ে যত জোরে পারি হিন্দীতে চীৎকার করতে শুরু করলাম। এবার বেচারী সত্যিই ঘাবড়ে গেল। কোন্ অধিকারে তাকে এভাবে ধমকা-ধমকি করছি বুঝতে না পেরে, ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিল আমার।

তারপর টিক্কির সঙ্গে বসে দেখলাম সেই বিশাল সমরসজ্জা। অসীম উদ্দীপনায় হাজার হাজার পুরুষ, রমণী ও শিশু তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো এগিয়ে আসছে রেড্ স্কোয়ারের দিকে। অবিস্মরণীয়, মহান সে দৃশ্য।

মস্কোতে ছিলাম সপ্তাহখানেক। এত অল্প সময়ে সব কিছু দেখা সম্ভব নয়। তাড়াহুড়া করে দর্শনীয় স্থানগুলি এবং কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান[৪৬] দেখে নিলাম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া যে কী বিশাল উন্নতির[৪৭] দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং কী প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়েছে তা' স্পষ্ট বোঝা গেল। আর দেখলাম, মস্কোতে আমাদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে টিক্কির অসামান্য সাফল্য।

বিমানযোগে মস্কো থেকে টোকিওতে এসেই শুনলাম দু'টি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। আমেরিকায় নিহত হয়েছেন কেনেডি, এবং ভারতে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন লেঃ জেনারেল দৌলত সিং এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী। নিঃসন্দেহে আমেরিকা এবং ভারতের পক্ষে দিনটি ছিল অশুভ।

চার মাস অবস্থানের পর জাপানকে 'সায়োনারা' জানালাম। এই চার মাসের মধ্যে যেমন অনেকগুলি মনোরম স্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল,

৪৬। বলশোইতে 'সোয়ান লেক'-এর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং কুকোলনী থিয়েটারে একটি পুতুল নাচও দেখেছিলাম।

৪৭। লক্ষ্য করলাম, রাশিয়ায় উচ্চশ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্য আজকালকার অধিকাংশ দেশের তুলনায় অনেক কম।

তেমনি পরিচয় হয়েছিল একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে[৪৮] যাঁদের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। যাত্রাপথে আমেরিকার পঞ্চাশতম রাষ্ট্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনোলুলুর (১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে এখানকার পার্ল হারবারের পতন হয়) উপর একটা নজর বুলিয়ে, যে সময় টোকিও ত্যাগ করেছিলাম তার 'পূর্বেই' সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো পৌঁছে গেলাম। ঘড়ির এই কারসাজিটুকু হয় আন্তর্জাতিক অঙ্করেখা (International date-line) অতিক্রম করলেই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম নিউইয়র্কে। খানিক পরেই আমার স্ত্রী ও কন্যা এসে উপস্থিত হলেন। পরিবারবর্গের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে বড় ভালো লাগলো।

আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বি. কে. নেহ্‌রু এবং তাঁর স্ত্রী ফোরির সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটানোর উদ্দেশ্যে খানিক বাদেই ওয়াশিংটন অভিমুখে রওনা হলাম। (যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে এঁদের খাতির দেখলাম প্রচুর।)

আরলিংটন সমাধিক্ষেত্র যেদিন দেখতে গেলাম, সেদিন প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যেই দেখলাম পুরুষ, নারী ও শিশুর একটি দীর্ঘ সারি অবনত মস্তকে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে নিহত প্রেসিডেণ্টের সমাধিস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রেসিডেণ্টের সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী তথা মেরিনের ও অন্যান্য সামরিক সম্মান চিহ্নগুলি তাঁর দুই শিশু ও নিজের সমাধির পাশে সযত্নে রাখা রয়েছে দেখলাম[৪৯]। আর রয়েছে কিছু ফুল এবং একটি অনির্বাণ দীপ। এতো অল্প বয়সে এবং এমন দক্ষতার সঙ্গে দেশের সেবা করেছেন যে ব্যক্তি, আজ তিনি এখানে আরও বহু মানুষের সমাধির সাথে চিরনিদ্রায় লীন হয়ে রয়েছেন। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আমায় মর্মাহত করে দিল।

৪৮। জনৈক বিশিষ্ট জাপানী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমার বেশ ভালোভাবে পরিচয় হয়েছিল (নামটা প্রকাশ করতে চাই না)। কথা-প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেন, জাপানীরা কোনদিন অপমান ভোলে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিমী দেশগুলি তাঁদের যে চূড়ান্ত অপমান করেছিল সে কথার উল্লেখ করে বলেন, অপমান ছাড়াও, জীবন ও সম্পত্তির অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছে পশ্চিমী দেশগুলি, এবং নিজেকে সুগঠিত করে নিয়ে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ একদিন জাপান নেবেই।

৪৯। কেনেডির একটা ভাষণের কথা আমার মনে পড়ল। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: 'সুতরাং, আমেরিকাবাসী আমার বন্ধুগণ, দেশ আপনার জন্য কী করতে পারে সে প্রশ্ন করবেন না। প্রশ্ন করুন, আপনারা দেশের জন্য কী করতে পারেন।'

মে মাসের গোড়ার দিকে হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডান্স্টার হাউসের অধ্যাপক ও শ্রীমতী লয়েড রুডল্ফের কাছ থেকে ভারত ও চীন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য একটা নিমন্ত্রণ এলো। এই বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়টি বোষ্টনের নিকটে অবস্থিত। নিমন্ত্রণ অনুসারে সেখানে গিয়ে ছাত্র ও অন্যান্যদের একটি মিলিত সভায় ভাষণ প্রদান করি। বক্তৃতার শেষে ভিয়েৎনাম এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হয়। পরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি তথা কূটনীতিবিদদের আরেকটি সভাতেও বক্তৃতা প্রদান করি। এখানেও আমাকে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। একটি ছিল, ভারতে সামরিক অভ্যুত্থানের কোন সম্ভাবনা রয়েছে কি না। উত্তরে, আমেরিকার মতো বিরাট গণতান্ত্রিক দেশে সামরিক অভ্যুত্থান সফল হতে পারে কি না, এবং প্রশ্নকর্তা সম্প্রতি প্রদর্শিত 'সেভেন্ ডেজ্ ইন্ মে' শীর্ষক চলচ্চিত্রটি দেখেছেন কি না জিজ্ঞাসা করি। তারপর বলি, উক্ত চিত্র অনুসারে আমেরিকাতে যদি সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতে পারে, তবে গণতান্ত্রিক ভারতে সেটা সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

হার্ভার্ডে সুসান ও লয়েড রুডল্ফ্, বহু বিখ্যাত অধ্যাপক, গবেষক এবং গল্‌ব্রেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করি। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতরূপে গল্‌ব্রেথ দিল্লীতে ছিলেন। ওয়াল্‌থামের নিকটে নদী-তীরবর্তী মনোরম পরিবেশে অবস্থিত ব্রান্‌ডেইস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশবিশেষও দেখলাম, এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বিনোদ মুবাঙ্গি-এর সঙ্গে নিউ ইংলণ্ডের মধ্য দিয়ে খানিকটা ভ্রমণের আনন্দও উপভোগ করা গেল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল বিনোদ।

কেন্‌ট্ হল থেকে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. টি. এম্‌ব্রি আমাকে একটি নির্বাচিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণটি গ্রহণ করি। কয়েকদিন পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওরাল হিস্ট্রী রিসার্চ' দফতরের অধিকর্তা লুই. এম. স্টার একখানি পত্রে আমাকে লেখেন:

'...যে সমস্ত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে, তাঁদের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ

করে থাকে। আপনার কাছ থেকে এ ধরনের স্মৃতিকথা যে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তাই (কলম্বিয়ার) 'ওরাল হিস্ট্রী' সংগ্রহ-বিভাগে কিছু অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্যপ্রদানের জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ...সাম্প্রতিককালের বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের অনেকের স্মৃতিকথাই এই সংগ্রহে ইতিমধ্যে জোগাড় করা হয়েছে; এবং আপনাকে এঁদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আমরা নিজেদের অতীব গৌরবান্বিত বোধ করবো।...আশা করি আমাদের সহায়তা করতে সম্মত হবেন; এবং বিশ্বাস রাখি ব্যাপারটি আপনার কাছে আকর্ষণীয় এবং মূল্যবান মনে হবে।'

এই আমন্ত্রণও গ্রহণ করি। কলম্বিয়া এবং হার্‌ভার্‌ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সত্যিই আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল আমার কাছে।

এই সমস্ত গুরুগম্ভীর ঘটনাবলীর মধ্যে নিউইয়র্কের জনৈক ট্যাক্সিচালকের ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয় নয়। এই ট্যাক্সি চালকেরা হ'ল সহৃদয়তা এবং ধৃষ্টতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। একদিন বিকেলে প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ দফতরের বিপরীতদিকে ৪৫নং স্ট্রীট ও ইয়র্ক অ্যাভেন্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে একটি ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টা করছি। আমার পাগলের মতো হাত-নাড়া উপেক্ষা করে একের পর এক ট্যাক্সিগুলি সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। থামবার গরজ নেই কারও। অনেকে ট্যাক্সিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে 'অফ ডিউটি' বোর্ড। বেশ বুঝতে পারছি, সেই বিশ্রী আবহাওয়ায় রোজগারপাতি ভালোই হয়েছে তাদের। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে ওই জমাট শীতের ভিতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে একটা ঝুঁকি নিয়ে পথের মাঝে একটি চলন্ত ট্যাক্সির গতিরোধ করে দাঁড়ালাম।

ট্যাক্সিচালক চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী চান আপনি?'

'ইয়র্ক অ্যাভেন্যুর ৮৫নং স্ট্রীটে যেতে চাই।'

'এভাবে আপনি যান-বাহন চলাচল বন্ধ করতে পারেন না। পথ ছেড়ে দিন, নইলে চাপা দেবো', চালক ভয় দেখাল আমাকে।

উত্তর দিলাম, 'রেখে দাও তোমার ভয় দেখানো। ট্যাক্সির জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে গেলাম। আর দাঁড়াতে পারছি না।'

'কিন্তু আমি যে বাড়ী যাচ্ছি,' ড্রাইভারের কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

'যতক্ষণ এই বর্বরের হাত থেকে রেহাই না পাচ্ছি, ততক্ষণ তুমি কোথায় যাচ্ছো, বা আমি কোথায় যাচ্ছি, তাতে আমার কিছুমাত্র যায় আসে না। বেশ তো, তোমার বাড়ীতেই নিয়ে চল না কেন আমায়', শ্লেষভরা কণ্ঠে বললাম।

চালকটিকে এতক্ষণ যমদূত বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু কথাটা শুনে হঠাৎ নরম হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, 'তাড়াতাড়ি ভিতরে এসো। যেখানে যেতে চাও, সেখানেই পৌঁছে দিচ্ছি।'

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে প্রচুর বকশিস দিলাম তাকে।

নিউইয়র্কে থাকতেই শুনলাম নেহ্‌রু মারা গেছেন।

অনেক ভারতবাসীর মতো সংবাদটি আমাকেও স্তম্ভিত করে দিল। এক বছরও হয় নি, বিদেশে আসার পূর্বে যেদিন তাঁর কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম, সেই দিনটির কথা মনে পড়ল। বেশীদিন বিদেশে না থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলেছিলেন আমায়। কিন্তু হায়! আমি ফেরবার আগেই তিনি চিরবিদায় নিলেন। আমি এবং পরিবারের সকলেই বসে রইলাম জড়ের মতো; কাঁদলাম।

শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, ভারতেই ফিরে যাবো। ইতিমধ্যে প্রতিদিনই আমার জ্বর হ'তে শুরু করেছিল। শ্বাসকষ্টও দেখা দিল আবার। প্রথমে ভেবেছিলাম শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবো। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে অবস্থা একই রকম থাকায় শেষ অবধি (ডাক্তার রল্‌স্‌টনের তত্ত্বাবধানে) নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ভর্তি হতে হ'ল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন প্রস্তুত হলাম, তখনো পুরোপুরি সেরে উঠি নি।

আমেরিকায় আমার প্রায় আট মাস হ'ল। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এখানকার অধিবাসী এবং তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নিলাম। আমেরিকাবাসীদের ধারণা, তাদের দেশটিই হ'ল বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বোত্তম। নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধেও তারা অকপট। যেমন, জনৈক মার্কিন সিনেটর, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সম্বন্ধে নিজের ডাইরীতে লেখেন:

'আমাদের অধিকাংশ সেনেটরের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আমার এতটুকুও আস্থা নেই। বেশীর ভাগই হলেন মানসিক দিক থেকে সঙ্কীর্ণ,

দুর্বল এবং সেনেটর হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।...এঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হলেন ধনবান এবং অর্থের বিনিময়ে আপন পদমর্যাদা ক্রয় করেছেন। আবার অনেকে হলেন সঙ্কীর্ণচেতা, সীমিত ধারণা তথা নীচ দলগত স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি...।'

মার্কিন রসবোধের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় একটি বহুল প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে: 'শোভন ও সুন্দর একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ যখন মাত্র ৫০ ডলার, তখন বেঁচে থেকে কী হবে।' অন্যদের প্রতি আমেরিকাবাসীদের মনোভাব যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ, তেমনি অপরেও তাদের পছন্দ করুক এইটাই তারা চায়। কাজ তাদের কাছে আনন্দস্বরূপ এবং ছুটির দিনগুলি হ'ল অতি প্রিয়। জীবন-যাত্রায় গতিশীলতা দেখে মনে হয় যেন ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে তারা।

মার্কিন দেশের অবাধ বাক্‌স্বাধীনতার আদর্শ নমুনা হিসাবে সংবাদপত্রের জনৈক বিশিষ্ট বিভাগীয় লেখকের একটি বক্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে:

'গণতান্ত্রিক দেশের সফল রাজনীতিকদের ভবিষ্যৎ হ'ল অনিশ্চিত এবং সর্বদাই তাঁরা তটস্থ হয়ে থাকেন। রাজনীতিক্ষেত্রে নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রের দাবীদার ও ভীতিপ্রদর্শনকারীদের উৎকোচ, প্রলোভন, ধোঁকা ইত্যাদি অথবা অন্য কোন উপায় যারা উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত তথা শান্ত করে তবেই তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন। এগুলি জনপ্রিয় অথবা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী কি না, সে সমস্ত বিবেচ্য নয়। নির্বাচকমণ্ডলী সেগুলি আরও পছন্দ করবে কি না, সেইটাই হ'ল চূড়ান্ত বিবেচনার বিষয়।'

ঠিক এক বৎসরেরও উপর বিদেশবাসের পর আমি ও ধান্নো কেনেডি বিমান বন্দর থেকে নিউইয়র্ক ত্যাগ করে ৯ই আগস্ট তারিখে দিল্লী পৌঁছলাম। পালামে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বিমান থেকে অবতরণ করলেও, মনোবল আমার ভেঙ্গে পড়ে নি। বিদেশে বহু নতুন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বহু আশ্চর্য-দেশ ঘুরেছি। কিন্তু স্বদেশে ফিরে এসে বড় ভালো লাগল। আবার সেই পুরনো মুখ, একই শব্দ, একই হতাশা। কিন্তু তবু, এই দেশেই আমি জন্মেছি, এবং এখানেই আমাকে মরতে হবে।

দিল্লী ফিরে আমার পুরাতন চিকিৎসক মেজর জেনারেল ইন্দর সিং-এর

সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করলাম। তিনিই আমার চিকিৎসা শুরু করলেন আবার। বলতে গেলে ইন্দর সিং, আমার ভ্রাতা বাবু এবং জ্ঞাতিভ্রাতা রাজার কল্যাণেই প্রায় ছয় সপ্তাহ শয্যাগত থাকার পর আবার উঠে দাঁড়ালাম। ততদিনে অক্টোবর মাস শেষ হতে চলেছে।

সারাটা বছর ধরেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। শেখ আবদুল্লাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কাশ্মীর চক্রান্তের মামলা তুলে নেওয়া হয়। একটি বেসরকারী শুভেচ্ছা মিশনের প্রধানরূপে মহান দেশপ্রেমিক জয়প্রকাশ নারায়ণ রাওলপিণ্ডি গমন করেন, এবং এর জন্য অকৃতজ্ঞ কিছুসংখ্যক দেশবাসী তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করে।

৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রোঁকে দিল্লী থেকে ২০ মাইল দূরে তাঁর নিজের মোটর গাড়ীতে চারজন মুখোশধারী আততায়ী গুলি করে হত্যা করে। ১লা এপ্রিল তারিখে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য আল্‌জিয়ার্সে চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মাস খানেক পর তাঁকে অন্তরীণ করা হয়। ১৬ই এপ্রিল তারিখে শাস্ত্রীর প্রস্তাবিত আমেরিকা সফর বাতিল হওয়ায় দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঝড় ব'য়ে যায়। ২০শে মে তারিখে এবং তার অত্যল্পকাল পরেই ভারতীয় পর্বতারোহীদের চারটি দল লেঃ কমাণ্ডার এম. এস. কোহলীর নেতৃত্বে এভারেস্ট্ পর্বত শিখরে আরোহণ করেন। সব মিলিয়ে বছরটি সত্যই ছিল ঘটনাপূর্ণ।

সম্প্রতি গত কয়েকমাসের মধ্যে নেহ্‌রুর প্রখ্যাত জীবনীকার কানাডাবাসী মাইকেল ব্রেচার[৫০] সহ বহু বিদেশী ও ভারতীয় লেখক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এঁরা সকলেই ভারত সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করছিলেন, এবং সেই প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁদের কয়েকটি ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার হয়। নেহ্‌রু যুগের বিভিন্ন দিক, ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করেন।

জুলাই মাস এসে গেল। বি. কে. নেহ্‌রুর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তখন তিনি দিল্লীতেই ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি প্রদর্শনের

৫০। আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ একটি দফ্‌তরের ভারপ্রাপ্ত অন্ততঃ একজন মন্ত্রী ব্রেচারকে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন।

উদ্দেশ্যে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সেখানে একটি টেলিফোন বার্তা পেয়ে জানলাম, অকস্মাৎ রক্তক্ষরণের জন্য কন্যা অনুকে কয়েক মিনিট আগে আমার স্ত্রী সামরিক-হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম হাসপাতালে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাকে ও ধান্নোকে জানালেন, অনুকে সম্ভবতঃ 'সিজারিয়ান্' অস্ত্রোপচার করতে হবে, এবং সন্তান অথবা মাতা কারও জীবনেরই কোন নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারছেন না।

অনুর,[৫১] এবং সেই সঙ্গে আমার ও ধান্নোর অদৃষ্টে যে আর কত দুর্দৈব রয়েছে তা' ভেবে অবাক লাগল। মাত্র চার বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। সেই থেকেই শুরু হয়েছে তার অন্তহীন দুঃখ-কষ্টের জীবন। এটা হবে তার চতুর্থ অস্ত্রোপচার। আমার ও ধান্নোর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করা আর অনুর নিরাময় হবার আশা করা ছাড়া আর কোন সাধ্যই ছিল না।

অনু কিন্তু ভয় পায় নি। অস্ত্রোপচারের কথা শুনেও এতটুকুও বিচলিত হ'ল না। তারপর, অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে প্রস্তুত করা হ'ল। অচঞ্চল, সরল মনে স্ট্রেচারে পড়ে রইল অনু। অস্ত্রোপচার কক্ষটি ছিল একটু দূরে। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সেখানে। আমার শুভকামনার উত্তরে নির্ভীকভাবে অনু শুধু একটু হাসলো।

অনুকে অস্ত্রোপচার কক্ষে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বিষণ্ণচিত্তে আমি আর ধান্নো বারান্দায় বসে রইলাম। ভিতরে যাবার আগে ডাক্তার বললেন, অস্ত্রোপচার করতে তাঁর ঘণ্টাখানেক লাগবে, এবং রক্তহীনতার কারণে অনুকে রক্তও দিতে হবে।

সেই একটা ঘণ্টা নিদারুণ দুর্ভাবনায় অসহায়ভাবে আমরা দু'জন বসে রইলাম। বার বার অনুর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। এ সমস্ত পরিস্থিতিতে সময় যেন আর কাটতে চায় না। বস্তুতঃ, কখনো কখনো মনে হয় সময় যেন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এ ধরনের সঙ্কট মুহূর্তে একমাত্র প্রিয়জনের জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব কিছুর গুরুত্বই তুচ্ছ হয়ে পড়ে। তার মঙ্গলের জন্য মানুষ তখন সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। মানত করে একধার থেকে। তারপর বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েই ভুলে যায় সব কিছু।

৫১। অনুর দুর্দৈবের যেন আর অন্ত ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার বেরিয়ে এসে জানালেন, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং অমু ভালোই আছে।

[পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছি, সেগুলি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ না হলেও, পূর্ব বক্তব্যের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। তাই সেগুলির উল্লেখ করলাম।]

এখনো হয় নি শেষ

৬

জীবনের সাফল্য মানুষের হাতে নয়

জোশেফ অ্যাভিসন্

●

নেহ্‌রুর মৃত্যুর পর আমাদের নেতৃবর্গ এমন একটি মনোভাব প্রদর্শন করতে শুরু করেছিলেন, যেন ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট জোরদার করা হয়েছে; এবং পাকিস্তান কিংবা চীন পৃথক পৃথক ভাবে অথবা একযোগে আমাদের আক্রমণ করলে, সে আক্রমণ আমরা কারও সাহায্য না নিয়ে একাই সামলাতে পারবো। অবশ্য প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ যেখানে ছিল প্রায় ৩০০ কোটি টাকা, বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮০০ কোটি টাকারও উপরে, এবং আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর যে আকার ছিল, সেটা সম্প্রসারিত হয়েছিল প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের একান্ত প্রার্থিত বৈদেশিক সামরিক সাহায্যস্বরূপ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজসরঞ্জামও পাওয়া গিয়েছিল। এই 'উন্নত অবস্থা' সত্ত্বেও, আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর অসুবিধাগুলি কিন্তু থেকেই যায়।

কাশ্মীরে আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল নির্দিষ্ট দু'টি পর্বে: অনুপ্রবেশ, এবং প্রচলিত সামরিক অভিযান। ৫ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তানের ১২নং ডিভিশনের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল আখতার হুসেন মালিকের পরিচালনায় ৫,০০০ অনুপ্রবেশকারীর 'জিব্রাল্টার' বাহিনী সঙ্গোপনে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে। প্রকৃত কোন আক্রমণ হয়েছিল বলে অবশ্য আমাদের রাজনৈতিক অথবা সামরিক কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বীকার করেন নি। আক্রমণকারী বাহিনীটি হাল্‌কা ধরনের আধুনিক তথা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র এবং বেতার যোগাযোগ ও অতি উন্নত ধরনের দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ছাড়াও এদের উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরীদের শলা-পরামর্শ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করা; অস্ত্রাদি ব্যবহারের ব্যাপারে কাশ্মীরীদের শিক্ষিত করে তুলে, তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত অস্ত্রাদিও অনুপ্রবেশকারীরা সঙ্গে করে নিয়ে আসে। আমাদের লোকজনদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের মতলবে

সাধারণতঃ রাত্রিকালে তারা দূর থেকে গুলিবর্ষণ করতো, এবং প্রত্যুত্তরে আমাদের তরফ থেকে গুলিবর্ষণ হলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ত পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের জন্য। কাশ্মীরের স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তারা পথপ্রদর্শক, ভারবাহক, খাদ্যদ্রব্য, আশ্রয় ইত্যাদি নানা ধরনের সাহায্য পায়। ১৯৫৩ সালের ৯ই আগস্ট তারিখে শেখ আবদুল্লা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের সেই ৯ই আগস্ট তারিখটিকেই জিব্রাল্টার বাহিনীর চরম আক্রমণের দিন হিসাবে স্থির করা হয়। প্রথমে বেশ একটা আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে আমরা ঘোষণা করি যে, মাত্র হাজার খানেক অনুপ্রবেশকারী কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছে। তারপর স্বীকার করি, অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা দুই কিংবা তিন হাজার, অথবা তারও বেশী হতে পারে। বস্তুতঃ, আসন্ন এই সঙ্কটের গুরুত্ব তুচ্ছ করে ক্রমাগত আমরা নিজেদের সঙ্গেই প্রবঞ্চনা করতে থাকি। এমন কথাও বলা হয় যে, অনুপ্রবেশকারীদের খাদ্য ও গোলাগুলি নেই; স্থানীয় অধিবাসীদের অসহযোগিতা তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে, এবং আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে উচিত শিক্ষা পেয়ে তারা এখন দলে দলে পলায়নে ব্যস্ত। আসলে কিন্তু সেতু ধ্বংস, হত্যা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিপর্যয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি ব্যাপারে আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করলেও, বেশ কিছু অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ তারা চালিয়ে যায়। কাশ্মীরীদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাতেও তারা পারে নি। তবু, সম্পূর্ণরূপে তারা ব্যর্থ হয়েছিল বললেও ভুল বলা হবে। ভেবে অবাক লাগে যে, এই বিপুল সংখ্যক হানাদার আমাদের তথাকথিত সদা-জাগ্রত সীমান্ত প্রহরা এড়িয়ে নিঃশব্দে কাশ্মীরের ভিতর প্রবেশ করলো, অথচ তাদের সেই মতলব আমরা আগের থেকে এতটুকুও আঁচ করতে পারলাম না। বস্তুতঃ, জম্মু অঞ্চলের রিয়াসী তহশীলের বুদিল এবং কয়েকটি স্থানে হানাদারেরা যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তার থেকে রেহাই পেতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

[তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আগস্ট মাসের শেষের দিকে একদিন আমাকে টেলিফোন করে পর দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানান। সেই অনুসারে সাক্ষাৎ করলে বলেন, কাশ্মীর বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকিবহাল কয়েক ব্যক্তি অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যাটি মোকাবিলা করবার জন্য আমাকে কাশ্মীরে পাঠাতে সুপারিশ করেছেন। আরও বলেন, পরস্পরবিরোধী নানা ধরনের সংবাদ পাবার কারণে, ব্যাপারটির সঠিক গুরুত্ব

তিনি নিজেও স্পষ্ট করে জানেন না। তাই প্রয়োজন হলে এই উদ্দেশ্যে আমি কাশ্মীর যেতে পারবো কি না সেটা জানতে চান। আমি সম্মতি জ্ঞাপন করি। ইতিমধ্যে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তান জম্মু অঞ্চলে আমাদের আক্রমণ করে বসে; এবং উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে তারপর আমি আর কোন সংবাদ পাই নি।]

১লা থেকে ৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাকিস্তান বাহিনী জউরিয়ান অবধি আমাদের এলাকায় খানিকটা অগ্রসর হয়। প্রথম ধাক্কায় চেনাব নদীর উপরে অবস্থিত আখনুর অধিকার করে জম্মু থেকে পুন্‌চ অবধি আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা এবং জম্মু শহরটি দখল করে জম্মু-শ্রীনগর প্রধান সড়কটি অবধি পৌছানোই ছিল তাদের মতলব। কিন্তু আমাদের স্থানীয় 'কোর' অধিনায়ক লেঃ জেনারেল কে. এস্. কটোচে'র সময়োচিত সতর্কতার জন্যই শেষ পর্যন্ত তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বহু উত্থান-পতনের মধ্যে মাতৃভূমির সেবা করেছি আমি। এখন ভারত আবার একটি গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে পতিত হওয়ায় নিজের যথাসাধ্য করবার একটা তাগিদ অনুভব করলাম; এবং সেই উদ্দেশ্যে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে এই পত্রখানি লিখলাম:

'দেশের এই দুঃসময়ে, আপনার বিবেচনা মতো যে কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত রয়েছি…। মাতৃভূমিব সেবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, অন্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করতেও আমি প্রস্তুত।'

চিঠিটির নিম্নলিখিত নিয়মমাফিক উত্তরখানি সেইদিনই পাই তাঁর কাছ থেকে:

'আপনার ৬ই সেপ্টেম্বর, পত্রের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জানাই যে, আপনার মনোভাব আমি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছি।'

জম্মু ও কাশ্মীর রণাঙ্গন থেকে শত্রুর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমাদের সামরিক হাইকমাণ্ড ৬ই এবং ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে লাহোর ও শিয়ালকোট অঞ্চল তথা রাজস্থানে একটি দ্বিমুখী অভিযান শুরু করেন।

৬ই সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তীকালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকে তিন ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে : এই যুদ্ধে ভারতকে ভালো-মন্দ যে-সমস্ত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করা ; অনেকে যেমন করেছেন তেমনি ভাবে আমাদের শুধু উজ্জ্বল দিকটিকেই তুলে ধরা ; অথবা, যুদ্ধের এবং যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করা।

নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত থাকায় এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া চলবে না। কেবলমাত্র উজ্জ্বল দিকটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকাটা আত্মপ্রবঞ্চনারই সামিল হবে। সুতরাং, আপাততঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থগিত রেখে তৃতীয় পন্থাটিই অনুসরণ করবো।

মোটমাট আমার বক্তব্য হ'ল, সামরিক শক্তিতে আমাদের চাইতে দুর্বলতর পাকিস্তানকে পরাজিত করা উচিত হলেও, এই যুদ্ধে তাকে আমরা পরাস্ত করতে পারি নি ; এবং বিশেষ কতকগুলি পরিস্থিতিতে আমরা রক্ষা পেয়েছি একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই। পক্ষান্তরে, আক্রমণের মুখে আমাদের সেনা এবং বিমান বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে, পাকিস্তানের এই অনুমানও হয়েছিল ভুল।

মাত্র বাইশ দিন যুদ্ধের পর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, পাকিস্তানকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ফেলা হয়েছে বলে যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তা' যদি যথার্থ হয় ; এবং ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে শাস্ত্রী যখন ঘোষণা করেছিলেন যে, বারংবার যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারে ভারত যাবে না ; ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে সমবেত মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে যখন বলেছিলেন : 'পরিস্থিতি যাই দাঁড়াক না কেন, হাতিয়ার আমরা নামাবো না ;'—তখন উক্ত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হ'ল কেন? শাস্ত্রী এবং সরকার উভয়েরই অনুমান করা উচিত ছিল, আজ হোক কিম্বা কাল হোক বৃহৎ শক্তিবর্গ রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছা তাঁদের উপর চাপিয়ে দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য অপ্রতিরোধ্য চাপের সৃষ্টি করবেই। সুতরাং, যে ঘোষণা থেকে পরে পশ্চাদপসরণ করতেই হবে, তেমন ঘোষণা তাঁদের না করাই ছিল কর্তব্য।

বল প্রয়োগ দ্বারা মীমাংসায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েই দুই যুদ্ধমান পক্ষ যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত হয়ে থাকে। এ ধরনের যুদ্ধ হ'ল হার-জিতহীন লড়াই

অথবা একটা অচল অবস্থার মতো; এবং উভয় পক্ষই এ সমস্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধ-বিরতিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। আসলে কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণটি অমীমাংসিতই থেকে যায়। অ্যাবে লিংকন্ যেমন বলেছেন: 'যুদ্ধ শুরু করলে অনির্দিষ্টকাল অবধি লড়াই করা যায় না; এবং প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির পর উভয় পক্ষই যখন আবিষ্কার করে যে লাভ কারুরই হয় নি, তখন তারা যুদ্ধ বন্ধ করে। সেই পুরাতন প্রশ্নটি তখনো কিন্তু উভয় পক্ষের মনেই থেকে যায়।'

আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রচার ব্যবস্থা আরও বাস্তবসম্মত হতে পারতো। সাংবাদিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য বারংবার আবেদন জানান। কিন্তু, বিপদের সম্ভাবনা এবং সেনাবাহিনী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারবে না ইত্যাদি নানা অজুহাত তুলে তাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করা হয়। এটা সত্যিই ছিল একটা শোচনীয় ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কোরিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদিতে সাংবাদিকদের যুদ্ধ পরিদর্শনের জন্য অগ্রবর্তী রণাঙ্গনে যাবার অনুমতি সব দেশই প্রদান করেছিল। বহু সাংবাদিক এই উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জন দিয়ে সাংবাদিকবৃত্তির মহৎ ঐতিহ্য স্থাপন করেন। আমাদের দেশের এমন বহু সাংবাদিককে জানি যাঁরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্বেচ্ছায় জীবন বিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত নন। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তাঁদের কাউকেই এ সুযোগ প্রদান করা হয় নি। এর ফলে যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবু স্বীকার করতে হবে, বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের সাংবাদিকগণ এই যুদ্ধের সংবাদাদি সংগ্রহে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতের (এবং পাকিস্তানের) সরকারী ঘোষণা সমূহের উল্লেখ করে স্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকার সামরিক পর্যবেক্ষক ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লেখেন, 'ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই সরকারী ঘোষণায় যে দাবীগুলি করা হয়েছে, সেগুলি এক সঙ্গে যোগ করলে দেখা যাবে যে, উভয় দেশেরই ট্যাঙ্ক এবং বিমান বহরের মোট সংখ্যার দ্বিগুণ পরিমাণ ধ্বংস হয়ে গেছে…।'

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় যথাক্রমে আমাদের স্থল এবং বিমান বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু বলা সঙ্গত মনে করি। বৈমানিক এবং প্রবীণ স্টাফ্ অফিসর হিসাবে, বিমান বাহিনীর প্রধান, এয়ার চীফ্ মার্শাল অর্জন সিং-এর কর্মজীবন হ'ল একাধিক কৃতিত্বের

নিদর্শনে ভাস্বর। অদম সাহসী যোদ্ধসুলভ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি এই সংঘর্ষে আগাগোড়া লড়াই চালিয়ে গেছেন; এবং অতীব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কখন নিরুৎসাহ হন নি। বিমান পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা, পেশাগত জ্ঞান এবং সাহসিকতা,—তরুণ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে; এবং, চরম চাপের সম্মুখেও তাঁর স্থৈর্য, দৃঢ়তা, বিচক্ষণ পরামর্শ ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও তাঁর আদর্শ দায়িত্ববোধ সরকারকেও প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালী করেছে।

অনুরূপ মন্তব্য তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল জে. এন. চৌধুরী সম্বন্ধেও করতে পারলে অতীব সুখী হতাম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাঁর কর্মজীবন তথা ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক এই গ্রন্থের অন্যত্র উল্লেখ করেছি। সেনাবিভাগের বহু ব্যক্তিই সেগুলি জানেন। প্রসঙ্গতঃ উক্ত বিষয়গুলি পুনরায় এখানে উপস্থাপিত করবো; এবং তা' করতে গিয়ে চৌধুরীর এমন একটি রূপ যদি বেরিয়ে আসে যেটি জনসাধারণকে যা' বিশ্বাস করানো হয়েছে তার বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, তাতে আমার কোন স্বার্থ রয়েছে। কারণ, আমরা উভয়েই আজ কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। আসল কথা হ'ল, প্রকৃত যা' সত্য, তা' প্রকাশ করতেই হবে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রকৃত তথ্য যাচাই না করে মানুষের বিরুদ্ধে দোষারোপ অথবা উচ্চ প্রশংসা করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। বহু বৎসর ধরে চৌধুরী স্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁর অবসরগ্রহণ সম্বন্ধে মন্তব্য করে উক্ত পত্রিকা লেখে:

জেনারেল জে. এন. চৌধুরী হলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিকদের অন্যতম। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তিনি আমাদের সেনাবাহিনীকে অপূর্ব নেতৃত্ব প্রদান করেন, এবং উক্ত যুদ্ধের পর, বিশেষ করে সাম্প্রতিক কয়েকমাসে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তা' অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হতে পারে।…নিজের পশ্চাতে তিনি রেখে গেছেন গৌরবের উজ্জ্বল শিখা…এবং হয়ে পড়েছেন জাতীয় নায়ক।

(স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ পত্রিকা চৌধুরীর[১] সঙ্গে জেনারেল থিমায়ার মতো অসম-সাহসী, মধুরস্বভাব এবং অকপট ব্যক্তিকে একই পর্যায়ভুক্ত করে। অথচ উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না।)

অতি অসঙ্গতভাবে চৌধুরীর নামের সঙ্গে অলৌকিক মহিমা যুক্ত করা হয়েছে। তাঁর তথাকথিত 'শৌর্য' এবং সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধে 'অপূর্ব' নেতৃত্ব সম্বন্ধে প্রচুর প্রচারকার্য চালালেও, সেনাবিভাগের ভিতরে এবং বাইরে বহু ব্যক্তি এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

চাকুরীর ক্ষেত্রে চৌধুরী ছিলেন ভাগ্যবান। পেশাদারী বিষয়ে পুঁথিগত গভীর জ্ঞান রয়েছে তাঁর। সুদক্ষ স্টাফ অফিসর তথা সুযোগ্য অফিস-কর্মী হিসাবে সেনাবিভাগে সহকর্মীর মধ্যে তাঁর খ্যাতি রয়েছে প্রচুর। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েক মাসে কোন কোন মহল থেকে তাঁর সমর-কুশলতার যে সুখ্যাতি প্রচার করা হয়েছে, সে রকম কোন সুনাম তাঁর কোন কালেই ছিল না। সামরিক কর্ম-জীবনে থিমায়ার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসিমুখে জীবনকে তুচ্ছ করে বিশিষ্ট সেনানায়করূপে নিজেকে তিনি চিহ্নিত করেছেন, এমন কথাও কোনদিন শোনা যায় নি। বস্তুতঃ, চৌধুরী হলেন বাক-সর্বস্ব, একগুঁয়ে এবং উপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট করতে সদা সচেষ্ট।

প্রায়ই নিজের 'প্রচুর' সামরিক অভিজ্ঞতার কথা বলতেন চৌধুরী। আসলে কিন্তু কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার অথবা মেজর জেনারেলরূপে আদৌ তিনি কোন যুদ্ধ পরিচালনা করেন নি। ১৯৫৮ সালে একবার তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেন, থিমায়া কিংবা অন্য যে কোন ভারতীয় সিনিয়র অফিসরের চাইতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর বেশী রয়েছে। কথাটা আমি স্বীকার করি কি না তাও জানতে চান। উত্তরে, কোন্‌ কোন্‌ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে, সেকথা

সন্দেহভরে জানতে চেয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল স্টাফ অফিসররূপে; সেনাপতি হিসাবে ছিল যৎসামান্য।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় অনেকেই জেনারেল জে. এন. চৌধুরীকে পৃথিবীর ছয় জন মুখ্য ট্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞের অন্যতম বলে অভিহিত করেন; অর্থাৎ অগণিত ট্যাঙ্কযুদ্ধে বিখ্যাত ফিল্ড মার্শাল রোমেলের মতো সেনাপতির সঙ্গে একাসনে বসানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে চৌধুরী কিন্তু স্বয়ং কোন ট্যাঙ্ক যুদ্ধই পরিচালনা করেন নি। যুদ্ধগুলি তাঁর অধীনস্থ কমাণ্ডারেরা নিজের থেকেই করেছিলেন। ট্যাঙ্ক যুদ্ধ দিল্লীর মতো সদর দফতরে বসে থেকে পরিচালনা করা যায় না; পরিচালনা করতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে। অতীতে সর্ববৃহৎ যে ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়কত্ব চৌধুরী করেছেন, সেটি ছিল একটি ডিভিশন; এবং উক্ত ডিভিশন নিয়ে কোন যুদ্ধও তিনি করেন নি। যা' করেছিলেন, তা' ছিল হায়দরাবাদে পুলিশী তৎপরতার সময় প্রায় নিরস্ত্র এবং অশিক্ষিত রাজাকারদের বিরুদ্ধে অভিযান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও কেবলমাত্র একটি সাঁজোয়া রেজিমেণ্ট ছাড়া, ট্যাঙ্ক অথবা অন্য কোন ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব তিনি (কোন দিন) করেন নি। ট্যাঙ্কের যান্ত্রিক কলা-কৌশল, গঠন-প্রণালী এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকতে পারে; (সে রকম জ্ঞান অনেকেরই রয়েছে)। কিন্তু ট্যাঙ্ক যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা যে তাঁর নেই, এইটাই হ'ল আমার বক্তব্য। সুতরাং বিশ্বের মুখ্য ট্যাঙ্ক 'বিশেষজ্ঞদের' অন্যতম বলে তাঁকে অভিহিত করবার কোন যুক্তিই তাঁর সামরিক কর্মজীবনের ইতিহাস থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তা'ছাড়া, এই যুদ্ধে তাঁর বিচার-বিবেচনার ভুল-ভ্রান্তিও হয়েছিল অনেক। ফলাফল সঠিকভাবে চিন্তা না করেই কাশ্মীরে প্রথমে তিনি কয়েকটি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তৃত একটি এলাকা জুড়ে আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালাবারও কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, এর ফলে কোন স্থানেই তিনি উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করতে পারেন নি; এবং সিন্ধু, লাহোর অথবা শিয়ালকোট রণাঙ্গনে সফলতার সঙ্গে আক্রমণ চালাতেও ব্যর্থ হন। আমাদের কয়েকটি বাহিনীকে অগ্রবর্তী এলাকায় তিনি পাঠিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু অনেক দেরীতে, এবং উপযুক্ত সৈন্যবল ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত না করেই। ফলে, তাদের পক্ষেও সময়মতো এবং সুবিধাজনক কিছু করে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। সেপ্টেম্বর মাসের ৯/১০ তারিখে

খেম্‌করণে যখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে, সেই সময় নিজের অন্যতম প্রবীণ সেনাপতিকে তিনি বেশ কয়েক মাইল পশ্চাতে সরে গিয়ে বিকল্প কোন স্থানে সৈন্য সমাবেশ করতে আদেশ দেন। অর্থাৎ, এতে অনেকগুলি সুপরিচিত এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান তথা অঞ্চল আমাদের ত্যাগ করে আসতে হ'ত। এ যুদ্ধে তাঁর 'অমূল্য' প্রচেষ্টার নিদর্শন হ'ল এই। (চৌধুরীর উক্ত আদেশ প্রতিপালিত হলে ভারতকে এক শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হ'ত। কিন্তু সর্বরক্ষা এই যে, লেঃ জেনারেল হরবক্‌স্ সিং এবং লেঃ জেনারেল ধীলনের দৃঢ়তার কারণে এই দুরবস্থার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম।) প্রধান সেনাপতি-সুলভ দৃঢ়চিত্ততা অথবা উৎসাহব্যঞ্জক আচরণের নিদর্শন এগুলি নয়। আর একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হ'ল, আগাগোড়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে 'দুর্ধর্ষ' জেনারেল চৌধুরী কোন লড়াইয়েরই কাছাকাছি কোথাও যেতে সাহস করেন নি। (অথচ, অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রধান সেনাপতিগণ সৈন্যদের মনোবল সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী রণাঙ্গনে গমন করেছেন। অতীতের এমন নজির রয়েছে বহু।) অবশ্য ইছোগিল খালের ধারে আমাদের জওয়ানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার একাধিক ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি তোলা হয়েছিল যুদ্ধ বিরতির পর।

যুদ্ধ বিরতির কয়েক সপ্তাহ পরে খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় যে, অবসর গ্রহণের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পার হয়ে গেলেও, সরকার চৌধুরীর চাকুরীকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন। পরের দিনই সরকারপক্ষ থেকে উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করা হয়। প্রধান সেনাপতিকে ফিল্ড মার্শালের পদ প্রদান পূর্বক প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান রূপে নিযুক্ত করা উচিত বলে সংবাদপত্র মহলের বহু ব্যক্তিই অভিমত পোষণ করতেন। কিন্তু সে সংবাদ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণিত হ'ল। এ সংবাদের উৎস সম্বন্ধে লোকের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। অযোগ্য ব্যক্তির নামের সঙ্গে অলৌকিক মহিমা যুক্ত করার আমাদের যে অভ্যাস, এগুলি ' 'স তারই নিদর্শন।

মানুষের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাপ্ত ইতিহাসে মোটামুটি পনেরো হাজারের মতো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে বছরে প্রায় তিনটি। মনুষ্য সমাজে যুদ্ধ হ'ল একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। আমাদের রাজনীতিকেরা রিচার্ড বার্টনের উক্তিটি মনে রাখলে ভালো করতেন: 'শান্তি হ'ল জ্ঞানী ব্যক্তির

স্বপ্ন; যুদ্ধ হ'ল মানুষের ইতিহাস।' এই মৌলিক তথ্যটি উপেক্ষা করে স্বাধীনতালাভের পর থেকে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনে এমন একটি অলীক ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ এই বিষয়ে ১৯৫২ সালের পর থেকেই তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল।

উপর্যুক্ত তথ্য স্মরণে রেখে আমাদের সামরিক ব্যাপারের পরিচালকদের একদিকে যেমন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শান্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, অপর দিকে তেমনি সেনাবাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হবে যুদ্ধের জন্য। এছাড়া, প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞানও অর্জন করতে হবে তাঁদের। এতে, যে সমস্ত জটিল সামরিক বিষয়াদির উপব তাঁরা সাধাবণতঃ কর্তৃত্ব করে থাকেন, সেগুলি অনুধাবন করতে সুবিধা হবে, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রভাব-বিস্তারকারী বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গডে উঠবে, এবং সেই সঙ্গে সৈন্য পরিচালনার ব্যাপাবে সমর বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, সেগুলির যৌক্তিকতাও বুঝতে সুবিধা হবে। নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সর্বপ্রকার কৈফিয়তমূলক মনোভাব পরিহারপূর্বক লক্ষ্য রাখতে হবে, সেনাবাহিনী অথবা অন্য কেউ যেন তাঁদের আচরণকে অযথা হস্তক্ষেপ বলে ভুল না করে।

আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রায়ই বলে থাকেন, সেনাবাহিনীকে আপন বিচার-বিবেচনা মতো কাজ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এই বহুল প্রচারিত সস্তা কথাগুলি শুনতে খুবই ভালো, এবং এতে সুবিধাও অনেক। (সেনাবাহিনী তথা জনসাধারণের মনেও কথাগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।) কিন্তু এগুলি শুধু মুখে না বলে, আর একটু বেশী করে কার্যে পরিণত করার নীতি আমাদের নেতৃবৃন্দের মেনে চলা উচিত। যুদ্ধের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ যেমন তাঁদের কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়, তেমনি এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রতিরক্ষা হাই কমাণ্ডের উপযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করাও কর্তব্য। যাই হোক, এ ধরনের বাগাড়ম্বড় না করে বরং প্রধান মন্ত্রীর সুদৃঢ় এবং চূড়ান্ত নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধের জটিল ব্যাপারগুলিকে কূটনৈতিক আর্থিক তথা মিতব্যয়িতার পরিপ্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য তাঁদের অক্লান্তভাবে চেষ্টা করা উচিত। সেনাবাহিনীকে সর্বাধিকরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শক্তিশালী করে

তোলার জন্য যাই করা হোক না কেন, তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে সেনাবাহিনীর মধ্যে নতুন একটি উদ্যম তথা উৎসাহের সঞ্চার করা হয়।

এছাড়া, দূর ভবিষ্যতে নেপাল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী দাঁড়াবে সে সম্বন্ধেও এখনই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কূটনৈতিক পর্যায়ে অনেক কিছু করবার রয়েছে। নিজেদের স্বার্থেই আমাদের সীমান্তগুলিতে প্রশাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং সেখানে শান্তি বজায় রাখা দরকার।

সেই সঙ্গে আমাদের সমুদ্র-সীমান্তের দিকেও নজর দেওয়া কর্তব্য। লণ্ডন এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যে যে সমস্ত দেশ অবস্থিত, ভারত হ'ল তাদের মধ্যে বৃহত্তম। তা'ছাড়া এই অঞ্চলে অবস্থিত যে কোন দেশই ইচ্ছা করলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে। সুতরাং, অদূর ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সাগরগুলির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। শক্তিশালী আক্রমণকারীর কাছে বিশাল হিমালয় পর্বতশ্রেণী আজ যে আর কোন বাধাই নয়, সে কথা চীনা আক্রমণেই ভালোভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

উল্লিখিত দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের জন্য আমাদের সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর উপযুক্তভাবে গঠিত শক্তিশালী একটি আধুনিক সেনাবাহিনী এবং শক্তিশালী বন্ধুর প্রয়োজন।

চীন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক একাধিকবার আমাদের সীমান্ত লঙ্ঘন করে যথেষ্ট প্ররোচনা দিয়েছিল সত্য। তথাপি উপযুক্ত প্রস্তুতি বিনা একাকী তার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত হয় নি।

নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পর বন্ধু রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে সময়মতো এবং কোনরকম বাধ্য-বাধকতা বিহীন সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত ছিল আমাদের। অর্থশাস্ত্রের মতো অসাধারণ পুস্তকখানি চাণক্য রচনা করেছিলেন খৃষ্টপূর্ব ৩২১-৩০০ সালের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে উক্ত পুস্তকে তিনি যা' লিখেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য : 'কোন নৃপতির পক্ষে যদি একাকী শত্রুর মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়, অথচ যুদ্ধ করাও হয়ে পড়ে আবশ্যিক, সে ক্ষেত্রে তাঁর (প্রয়োজন মতো) নিজের চাইতে দুর্বলতর, সমান-সমান অথবা অধিকতর শক্তিশালী নৃপতিদের সহযোগিতায় একত্রিতভাবে আক্রমণ চালানো উচিত।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জর্মানীকে পরাস্ত করবার জন্য আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের মতো শক্তিও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। পরিশেষে, সময় সময় পরিস্থিতি দেখে আমাদের শাসকগোষ্ঠী যে অবাক হয়ে যান এবং চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের অভিযোগ তোলেন, তার কোন অর্থ হয় না। যে কোন রকম সামরিক (অথবা অন্য ধরনের) পরিস্থিতির জন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। দুই হাজার বৎসরেরও পূর্বে চাণক্য বলেছিলেন, যে নৃপতি শত্রুর অভিসন্ধি অনুধাবন করতে পারেন না, এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন, তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা উচিত।

দক্ষ সেনাপতিদের সদা তৎপর রাখার জন্য, প্রশংসা ছাড়াও, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে অবিরাম আমাদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার যথাযোগ্য সমালোচনাও হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে তাই হয়ে থাকে। তা' ছাড়া, মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শুধুমাত্র আমাদের সাফল্যগুলির উল্লেখ করলেই চলবে না ; বিপর্যয়ের ঘটনা যদি কিছু থাকে, সেগুলিকেও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। অপ্রিয় ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার চাইতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত থাকা অনেক শ্রেয়। ভুল-ভ্রান্তি থেকে সেক্ষেত্রে অন্ততঃ খানিকটা শিক্ষালাভ করা যায়।

আমাদের সঙ্কটের অবসান এখনও হয় নি ; এবং স্লোগানের জগতে বাস করলে যে চলবে না সেটাও আমাদের বোঝা উচিত। নিজেদের প্রচেষ্টাগুলিকে যেমন ছোট করে দেখা উচিত নয়, তেমনি অসঙ্গত আত্মপ্রশংসার প্রলোভনকেও সংযত করা দরকার। বাস্তবোচিত এবং সুদৃঢ় মনোভাব নিয়ে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য ঘটনার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং, পুনরায়

যদি কোন দিন প্ররোচনামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তবে পাকিস্তানই হোক আর যে-কোন শক্তিই হোক, তাকে প্রথমে আক্রমণাত্মক ভূমিকার সুবিধা গ্রহণ করতে না দিয়ে, সম্ভব হলে প্রথমে আমাদেরই যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যুদ্ধরত সৈনিক তথা সেনাবাহিনীর মনোবল চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব এবং রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের উপর আস্থা; সুযোগ্য প্রশিক্ষণ; যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক সাজসরঞ্জাম এবং সুষ্ঠু চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা। এগুলির ব্যবস্থা করলে, বাকীটুকু সেনাবাহিনী করে নেবে নিজে থেকেই। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মাতৃভূমির নামে এই পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

১৯৫৫ সালের শেষের দিকে তেজার চাকুরী পরিত্যাগ করবার সময়েই আমি ও আমার স্ত্রী দু'জনেই বুঝেছিলাম, দুঃখ-কষ্টের দিন আবার শুরু হ'ল আমাদের। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু হয়েছিল একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। প্রতি বৎসরের শেষে একবার করে ঘর-সংসারের পাট তুলে দিয়ে পথের উপর এসে দাঁড়ানো। অস্বাচ্ছন্দ্য তো ছিলই; তার উপর মানসিক দিক থেকেও খুব একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভরসা পেতাম না। এবার থেকে সম্বল মাত্র পেনশনের টাকাটুকু। নিজের কোন বাড়ী-ঘর বলতে কোথাও কিছু ছিল না আমার। আবার যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তা' হলে ভালো করে চিকিৎসাও হয়তো করাতে পারবো না। অন্যান্য বহু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকেই নিজেকে এবার বঞ্চিত করতে হবে। আশ্রমে ফিরে যাওয়া স্থির করেছিলাম; কিন্তু আশ্রমের জীবনও তো খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যের নয়। তা' ছাড়া, জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন অবধি আমার কাছেই ছিল। কারণ তার স্বামী কাজ করতো বিমান বাহিনীতে; এবং সে সময় তার কর্মক্ষেত্র ছিল ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে জঙ্গী বৈমানিক হিসাবে।

তবু ভাবলাম, হাজার অসুবিধা হলেও কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ঠিক নয়। কালক্রমে বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। তাই স্থির করলাম, এই গ্রন্থটি রচনার দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবো এবার।

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জোরবাগের আরাম-বহুল বাসভবন পরিত্যাগ

করলাম। গৃহস্থালির সব কিছু এলোমেলো ভাবে গাড়ীতে চাপানো হ'ল।

সেই দৃশ্যেরই হ'ল পুনরাবৃত্তি। সেদিনও এই ভাবে সামরিক কর্মজীবন পরিত্যাগ করে, দিল্লী ক্যান্টনমেণ্টের 'গীতা-আশ্রমের' মধুর ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে গিয়ে উঠেছিলাম। ক্ষত-বিক্ষত জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছিল শান্তির স্পর্শে।

নববর্ষ এসে গেল। নতুন করে যেন জীবন শুরু করলাম আবার। ভাগ্য যেন অবিরাম হিসাব-নিকাশ করে চলেছিল আমার সঙ্গে।

বইখানা লেখার চেষ্টা করছিলাম। সেটাও পড়েছিল এলোমেলো হয়ে। আবার সেই নিঃসীম একাকীত্ব। এরই মধ্যে তবু রাঘবন-দম্পতি, খান্না, উজ্জ্বল এবং গিয়ানীর মতো বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতেন।

ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফুটে ওঠে নি। ধান্নো এসে ঘুম থেকে তুলে জানালেন, এই মাত্র তিনি শুনেছেন কয়েক ঘণ্টা আগে প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রী হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাসখন্দে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে রেডিওটা খুলে দিলাম। সরকারী ইশ্‌তাহার ক্রমাগত প্রচারিত হয়ে চলেছে। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হ'ল অতীব দুঃখপূর্ণ, বিষণ্ণ একটা দিন। সেই দিনই বেলা আড়াইটার সময় পালাম বিমান বন্দরে শাস্ত্রীর মরদেহ এসে পৌছবার কথা। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে নয়া দিল্লী। একবার শেষ দর্শনের আশায় ক্যান্টনমেণ্টের পোলো গ্রাউণ্ডের কাছে পথের ধারে বিশৃঙ্খল জন-সমুদ্রের মধ্যে স্ত্রী ও কন্যাসহ গিয়ে দাঁড়ালাম। গার্ড বাহিনীর মেজর ওয়ালিয়া ওই ভীড়ের মধ্যে আমাদের দেখেই চিনতে পারলেন। অতি যত্ন সহকারে অদূরবর্তী নিজের ইউনিট্ লাইনের এক ধারে পৃথক একটি স্থানে আমাদের জায়গা করে দিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার ভাবে শাস্ত্রীর মরদেহ বহন করে নিয়ে যেতে দেখলাম।

শাস্ত্রীর মৃত্যুতে সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে এলো। এই সরল অথচ বিচক্ষণ ব্যক্তিটি যে সামান্য সময়ের জন্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন, তারই ভিতরে দেশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর ঠিক পূর্বে, সম্ভবতঃ চাপে পড়েই তিনি তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিলেন; এবং তার ফলে দেশের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তান

সম্বন্ধে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে ভালো করেই জানি যে, সুযোগ পেলেই পাকিস্তান ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘন করবে ; এবং এ ব্যাপারে কোন রকম যুক্তি-তর্কেই সে কর্ণপাত করবে না। এ কথাটা স্মরণে রেখে শাস্ত্রী যদি কোসিগিনের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করতেন এবং তাসখন্দ ঘোষণায় ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী বিষয়গুলি স্বীকার করতে অসম্মত হতেন, তবে একমাত্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করা ছাড়া রাশিয়া এ ব্যাপারে কার্যতঃ কিছুই করতে পারতো না। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এ ধরনের অসন্তোষের স্থায়ীত্ব অতি স্বল্পকালের, এবং তা' কাউকে আহতও করে না। স্বস্তি পরিষদও পরিস্থিতির সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য-বিধান করে নিত। এদিকে ভারতে ফিরে শাস্ত্রী অনায়াসেই বলতে পারতেন যে, দেশবাসীর ইচ্ছানুসারেই তিনি (অথবা তাঁর ইচ্ছানুসারেই দেশবাসী ?) জাতির মনোভাবকে তাসখন্দে রূপায়িত করেছেন মাত্র, তথা দেশবাসীর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে এক বিন্দুও সরে আসেন নি ; এবং এখন, উক্ত মনোভাবের ফলাফলের জন্য সবাইকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। তারপর এ বিষয়ে জনগণের 'রায়' নিয়ে সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।

শাস্ত্রীর দুঃখজনক মৃত্যু প্রসঙ্গে জে. বি. কৃপালনী লোক সভায় বলেন :

দেশবাসীর কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের দিক থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে যতদিন নিশ্চয়তা না পাওয়া যাবে, ততদিন আমরা সৈন্য অপসারণ করবো না। আমার ধারণা (তাসখন্দে) নানা দিক থেকে তাঁর উপর প্রবল চাপ এসে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যার ফলে উক্ত প্রতিশ্রুতির কথা তিনি বিস্মৃত হন এবং সেই কঠিন চাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এর ফলেই নিষ্কৃতি এবং উচ্ছ্বাসের একটি ক্ষণিক আবেগে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন···। রাত্রে শয্যা গ্রহণের সময় (১০ই জানুয়ারী) এই আবেগ কেটে যায়, এবং শাস্ত্রী গভীর ভাবে অনুভব করেন যে, দেশবাসীর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি কাজ করেন নি। এই অনুভূতিই তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের উপর আক্রমণের (এবং মৃত্যুর) কারণ।

তাসখন্দ ঘোষণায় কিছুটা সুবিধা নিঃসন্দেহে হয়েছিল, কিন্তু তাতে মূল

তথা জটিল পরিস্থিতির কোন অদল-বদল হয় নি। রাশিয়া যেমন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী, তেমনি পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন তথা সম্ভব হলে আমেরিকা ও চীনের আওতা থেকে তাকে অন্ততঃপক্ষে খানিকটা সরিয়ে আনতে ব্যগ্র। রাশিয়া, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের কাছে বিভিন্ন কারণে ভারতের যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি সামরিক সুবিধার দিক থেকে পাকিস্তানের গুরুত্ব সম্বন্ধেও তারা এবং চীন সকলেই সচেতন। সুতরাং পাকিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ভারত-পাক যুদ্ধের ক্ষেত্রে চীন ছাড়া অন্যান্য এই সমস্ত দেশ ভারত ও পাকিস্তানের উপর সর্বাধিক চাপ প্রয়োগ করে চেষ্টা করবে উভয়ে যাতে একটা আপষে আসে। নইলে একাধিক কারণে তাদের নিজেদেরও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। খোলাখুলিভাবে স্বীকার না করলেও, ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মূল কারণ কাশ্মীর। সমস্যাটির একটা সমাধান যাতে হয় সে বিষয়ে এরা সবাই ব্যগ্র। কিন্তু এদের ধারণা নেই যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হলেও, পাকিস্তান অন্য কোন ছল-ছুতোয় ভারতের সঙ্গে বিরোধ জীইয়ে রাখবেই। তাই লোকে যখন আমাদের শান্তির উপদেশ শোনাতে আসেন তখন ভুলে যান যে, বিগত আঠারো বছর ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবার চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু পাকিস্তানের দিক থেকে সে প্রচেষ্টায় কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি। বস্তুতঃ, এই আঠারো বছরে পাকিস্তান তিন তিনবার ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়েছে—১৯৪৭ সালে কাশ্মীরে।

কাশ্মীরে এইভাবে ভারতের প্রতি পাকিস্তানের বিদ্বেষপ্রসূত, নির্মম শক্রতা যদি অব্যাহত থাকে, তবে একদিন হয়তো কিরাতার্জুনীয় নামক সংস্কৃতগ্রন্থে গ্রন্থকার ভারবি প্রদত্ত নৃপতির প্রতি উপদেশটি আমাদেরও অনুসরণ করতে হবে: 'হে নৃপ! জড়ত্ব পরিত্যাগপূর্বক শত্রুকে বিধ্বস্ত করবার জন্য আপন শৌর্যশিখা প্রজ্জলিত করুন। কামনা-বাসনা থাকে না সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর। তাঁরা প্রেম দিয়ে শত্রুকে জয় করেন এবং আপন লক্ষ্যে উপনীত হন…। নৃপতির পথ তা' নয়…।'

তাসখন্দচুক্তির পূর্ণ জটিলতা অনুধাবন তথা শাস্ত্রীর মৃত্যুর আঘাত সামলে ওঠবার আগেই তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রশ্নটি বিরাট আকারে এসে উপস্থিত হ'ল জাতির সম্মুখে। নেহ্‌রুর মৃত্যুর পরও ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল।

উত্তরাধিকারের এই সময়ে তীব্র, বিবেকবর্জিত সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিল। প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী ছিলেন অনেকেই; কিন্তু জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না কেউ। শেষ পর্যন্ত মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অধিকাংশ ব্যক্তির সমর্থনপুষ্ট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করলেন।

ইন্দিরা গান্ধী এমন এক ভারতবর্ষের কর্ণধার হলেন, যে দেশ স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করতে পারতো। কিন্তু বহু দিকে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সে রকম কোন উন্নতিই হয় নি। যেমন, আমাদের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বর্ধিত হয়ে চললেও, জনসাধারণকে উপযুক্ত খাদ্য, বাসস্থান এবং জীবিকার সংস্থান করে দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়েছে। আমাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪,৫০০ কোটি টাকারও উপরে। কয়েক বৎসর পূর্বেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের যে মর্যাদা ছিল, আজ আর তা' নেই। যে সমস্ত কারণে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার কিছু কিছু অবশ্য ছিল আমাদের আয়ত্তাতীত। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আমাদের ঔদাসীন্য, অকর্মণ্যতা এবং অসাধুতা; বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ম-নিষ্ঠার অভাব; ব্যক্তিগত আচরণে কপটতা, উপদেশ প্রদান করবার ঝোঁক এবং আত্মপ্রতারণা করে অলীক জগতে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি দুর্বলতাগুলিও ছিল প্রধান কারণ।

ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দলীয় সঙ্গীদের সম্ভবতঃ জানা রয়েছে যে, সর্বাপেক্ষা মানবোচিত গুণ হ'ল সাহস; আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতে যে গুণটি মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে পরিস্থিতির চাপে পড়ে; এবং সেই সাহসই হওয়া উচিত আমাদের নেতৃবৃন্দের চরিত্রের প্রধান ভিত্তি। সমবেত দায়িত্ব নিয়ে সাহসের সঙ্গে, স্থির সংকল্প ও দৃঢ় নেতৃত্ব দ্বারা অবিলম্বে যদি আমরা নিজেদের ঘর না সামলাই, তবে চারদিকে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, এবং হয়তো সুযোগ-সন্ধানী ব্যক্তিরা স্বার্থসম্পন্ন দলগুলির সহায়তায় সেই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করবে। সুতরাং আশা করবো, আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য তথা অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করা ছাড়াও, নেতৃবৃন্দ যাতে ভাসা-ভাসা মনোভাব[৩] গ্রহণ না করেন,

৩। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিগত চার বৎসরে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বিরাট অগ্রগতি লাভ করেছি বলে গর্ব করে প্রায়ই বলা হয় যে,

সে বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধী সচেষ্ট হবেন ; এবং একমাত্র তা' হলেই ভারতে আসবে শান্তি এবং সমৃদ্ধি।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বক্সী গুলাম মহম্মদের সঙ্গে দিল্লীতে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে তিন বৎসর পর মার্চ মাসে আবার আমার দেখা হ'ল। শেষ যেবার আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তারপর থেকে তাঁর উপর দিয়ে রাজনৈতিক সঙ্কটের অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। অসুস্থ হয়েও বহুদিন ধরে পড়েছিলেন। ফলে, আগের সে চেহারা তাঁর আর ছিল না। শুধু উজ্জ্বল চোখ দু'টির দিকে তাকালেই বোঝা যেত, এখনও প্রাণ-প্রাচুর্য তাঁর রয়েছে পুরোমাত্রায়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের অঙ্গীকরণের প্রয়াসে বক্সীর অবদান অসামান্য। সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি এই উদ্দেশ্যে অনেক কাজ করে গেছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতায় সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁর। সুতরাং পাকিস্তানের সপক্ষে অথবা অন্য কোন ধরনের জাতীয়তা-বিরোধী কাজ-কর্মকে একেবারেই তিনি প্রশ্রয় দেন নি ; এবং এ ধরনের যে-কোন প্রয়াসকেই শক্ত হাতে দমন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মতো দৃঢ়তা, অতীতে কিংবা আজ অবধি দেখিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নেই। একদিকে যেমন তিনি আদর্শ নেতৃত্ব, সাহস এবং উদ্যমের প্রমাণ দিয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি ১৯৪৭-৪৮ সালে এবং তার পরেও জম্মু-কাশ্মীরে বিভিন্ন সামরিক তৎপরতা তথা অন্যান্য পরিস্থিতিতে বারংবার দৃঢ়ভাবে দুর্যোগের মোকাবিলা করেছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করার কৃতিত্ব হ'ল বক্সীরই। ১৯৪৮ সালের পর তিনিই জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মোটামুটি একটা রূপদান করেন ; এবং সেটা ছিল

সীমান্তের উপর যে কোন আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য এখন আমরা প্রস্তুত। কিন্তু

৪ঠা অক্টোবর তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুসারে চীনারা যখন ভুটানের সীমান্ত লঙ্ঘন করে (প্রকৃতপক্ষে সেটা হ'ল ভারত সীমান্ত), তখন আমাদের তরফ থেকে চীনের কাছে শুধুমাত্র একটি লিখিত প্রতিবাদপত্র প্রেরণ ছাড়া আর কিছুই করা হয় নি। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, তা' হ'ল, আশু বিপদ সম্বন্ধে এখনো যদি আমরা প্রস্তুত না হয়ে থাকি, তবে শুধুমাত্র বিবৃতি প্রদান না করে অবিলম্বে সে সম্বন্ধে প্রচেষ্টা চালানো দরকার ; এবং প্রস্তুতির পরও আগের থেকে নিজেদের শক্তির বড়াই না করে, উপযুক্ত সময়ে সে শক্তির পরিচয় প্রদান করা উচিত।

একটা দুরূহ কাজ। জম্মু-কাশ্মীরের ভূ-প্রকৃতি কিংবা রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কোন ব্যক্তির চাইতে অধিক।

এ হেন ব্যক্তিকে আমাদের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনেকেই আজ নিন্দাবাদ করে থাকেন। কিন্তু যতদিন তাঁর পদমর্যাদা ছিল, ততদিন এই ভদ্রলোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। আজ যে ব্যাপারগুলির জন্য বক্সীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেই কাজগুলিকেই তাঁরা সে সময় নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলেন। আজ বক্সী সম্বন্ধে তাঁরা যে কথাগুলি জানেন, সেগুলি আগে জানতেন না বললে চলবে না। কিন্তু আজ বক্সী যখন ক্ষমতাচ্যুত, তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে উক্ত ভদ্রলোকদের কী এতটুকুও বিবেকে বাধে না? চরিত্রের এই দুর্বলতাগুলি আমাদের যে করেই হোক দূরীভূত করতে হবে।

এপ্রিল মাসে একটি সংবাদপত্রে জম্মু থেকে প্রচারিত একটি খবরে বলা হ'ল, সাদিকের নেতৃত্বে কাশ্মীর সরকার, ডঃ করণ সিং-এর পর আমাকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন। আমার সম্বন্ধে অতীতে যাঁরা 'আগ্রহী' ছিলেন, সংবাদটি সম্ভবতঃ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিল যে আমি এখনো বেঁচে রয়েছি।

আগস্ট মাসে সংসদে 'তেজা' প্রসঙ্গে আর একবার আমার নাম উল্লেখ করা হ'ল। জয়ন্তী শিপিং কোম্পানী সম্পর্কে বিতর্কের সময় বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য সংসদে আমার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা বললেন যেগুলি তথ্য-ভিত্তিক নয়।[৪] এ ঘটনার পরই ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের নামে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠালাম। সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকটি সংবাদপত্রে চিঠিখানি প্রকাশিত হয়:

'সংসদে জয়ন্তী শিপিং কোম্পানী সংক্রান্ত বিতর্কের বিবরণ সারা ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকজন সংসদ সদস্য প্রায়ই,

৪। একমাত্র কংগ্রেসী সদস্য অর্জুন অরোরাই আমার দৃঢ় সমর্থনে দাঁড়াবার মতো সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করেন। উত্তরদান প্রসঙ্গে প্রারম্ভেই তিনি বলেন যে, আমার বিরুদ্ধে বহু কুৎসা রটনা করা হয়েছে; এবং তার ফলে লোকেও ভুল বুঝেছে আমাকে। তারপর উদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি প্রতিটি নির্দিষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধেই আমাকে সমর্থন করেন।

এবং বিশেষ করে উক্ত বিতর্ক প্রসঙ্গে বিগত সপ্তাহ দুয়েক ধরে আমার সম্বন্ধে ভিত্তিহীন অনেক কথা বলেছেন। সংসদীয় নিরাপত্তার আশ্রয়ে কথাগুলি না বলে, উক্ত ভদ্রলোকেরা যদি বাইরে এসে প্রকাশ্যে সেগুলি পুনরাবৃত্তি করবার মতো সৎসাহস দেখান, তা' হলে খুবই খুশী হব। সে ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য যথার্থ কি না, সেটা আইনের সাহায্যে যাচাই করে নেওয়া যাবে।'

সংসদের কোন সদস্য অবশ্য আমার পত্রটি সম্বন্ধে অদ্যাবধি কোন রকম উচ্চবাচ্য করেন নি।

কিভাবে আমি তেজার প্রবীণ পরামর্শদাতারূপে তাঁর সংস্পর্শে আসি, সে প্রসঙ্গ আগেই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। নেহ্‌রুকে খুশী করবার জন্য অথবা নেহ্‌রুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তেজা আমাকে উক্ত চাকুরীটি দিয়েছিলেন, এই মর্মে তার পর থেকেই বিভিন্ন মহলে কানাঘুষা চলতে থাকে। আমাদের দেশে (আজও) লোকে এই ভাবে কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ধরাধরি করে নিজের কার্যোদ্ধার করে, এবং আমার সম্বন্ধে কানাঘুষাও সম্ভবতঃ সেইটা অনুমান করেই শুরু হয়েছিল। অবশ্য এ বিষয়ে তেজার মনোভাব আমি কোন দিনই জানতে পারি নি। তেজাও এ সম্বন্ধে কখনও কোন আভাস আমায় দেন নি। যাই হোক, উক্ত গুজব সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নেহ্‌রু কখনও কাউকে চাকুরী 'জোগাড়' করে দিতেন না; এবং এ কথাটা নেহ্‌রুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবার যাঁরই সৌভাগ্য হয়েছে, তিনিই স্বীকার করবেন।

কোন কোন মহল মনে করতেন, নিফা যুদ্ধে আমার আচরণ তথা দায়ীত্ব যখন তদন্তাধীন ছিল, তখন বেসরকারী সংস্থায় আমাকে মাসিক আট হাজার টাকা বেতন (আয়কর থেকে মুক্ত!) গ্রহণ করতে তথা বিদেশে যেতে দেওয়া সরকারের পক্ষে অনুচিত হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হ'ল, প্রথমতঃ, আমার আচরণ কোন দিনই তদন্তাধীন ছিল না। তার উপর, আমি ভারত ত্যাগ করবার পূর্বেই নিফা তদন্ত কমিটির অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল; এবং কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্ণেই জানতে পেরেছিলেন যে, উক্ত তদন্ত কমিটি নিফা (এবং লাদাক) বিপর্যয়ের একাধিক কারণ আবিষ্কার করলেও এককভাবে কোন জেনারেলকেই দায়ী করেন নি।

তারপর রইল বেতনের ব্যাপার। একথা সকলেই জানেন যে, সরকারী

চাকুরীর চাইতে বেসরকারী সংস্থার চাকুরীর বেতন অনেক বেশী। আগেও বলেছি, একাধিক উচ্চপদস্থ অসামরিক এবং সামরিক কর্মচারী অতীতে এবং বর্তমানেও বেসরকারী সংস্থায় চাকুরী করে, তেজা আমাকে যে বেতন দিতেন তার চাইতে কম তো নয়-ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশী বেতন পেয়েছেন এবং এখনও পাচ্ছেন। সংসদে এ সম্পর্কে বিতর্ককালে আমার এবং আরও কয়েকজনের নাম টেনে আনার ব্যাপারটিকে আমাদের পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী সঞ্জীব রেড্ডী তুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেন; এবং বেতন প্রসঙ্গে বলেন, অবসর গ্রহণকালে যে সরকারী কর্মচারী মাসিক চার হাজার টাকা বেতন পেতেন, অবসর গ্রহণ করবার পর বেসরকারী সংস্থায় পুনর্নিযুক্ত হয়ে তিনি মাসিক (ধরা যাক) দশ হাজার টাকা বেতন পেয়েছেন, এমন ঘটনা বহু রয়েছে; জেনারেল কলের ঘটনাটিই একমাত্র নিদর্শন নয়।

তা' ছাড়া, আমার বেতন আয়কর মুক্ত ছিল না। এ বিষয়ে চ্যবন সংসদে যে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। তথাপি এই অমূলক গুজব নিয়ে সংসদে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। বস্তুতঃ, ১৯৫৩ সাল থেকে অদ্যাবধি আমি মোট প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আয়কর হিসাবে দিয়েছি। এর মধ্যে কিছুটা অংশ বিদেশ থেকে ফিরে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে স্বেচ্ছায় জমা দিয়েছিলাম, এবং বাকীটা আমার বেতন থেকে তেজা নিজেই কেটে রেখেছি'লেন। এসবগুলির রসিদও আমার কাছে রয়েছে।

তেজার কাছে আমি কী কাজ করতাম সে সম্বন্ধেও সংশয় জেগেছে অনেকের মনে। সংক্ষেপে সেগুলি এখানে বিবৃত করবো। জাপানে থাকতে

জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত উক্ত দেশের কয়েকটি সংস্থার কাছ থেকে হায়দরাবাদের নিকটস্থ রামগুন্দম্ থারমল শক্তি কেন্দ্রের জন্য কল-কব্জা ও যন্ত্রাদি সংগ্রহ সম্বন্ধে তেজাকে পরামর্শ দেওয়াই ছিল আমার প্রধান কাজ। তা' ছাড়া, তেজার প্রতিনিধিরূপে নাগাসাকি, কুরে এবং অন্যান্য স্থানের জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে, সংগঠনিক দিক থেকে উক্ত কেন্দ্রগুলিতে জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীর জন্য জাহাজ নির্মাণ করানো যেতে পারে কি না, সে বিষয়েও তাঁকে পরামর্শ দিই।

আমেরিকায় অবস্থানকালে, তেজা আমার কাছে ভারতস্থিত তাঁর কয়েকটি প্রকল্পের জন্য কারিগরী সাহায্য এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সম্বন্ধে পরামর্শ চান। হুগলী নদীর নাব্যতা অব্যাহত রাখার একটি পরিকল্পনাও

তেজার ছিল। অবশ্য সেটি কোনকালেই রূপায়িত হয় নি। যাই হোক, পরিকল্পনাটির বিভিন্ন সংগঠনিক জটিলতা নিয়ে আমেরিকার কয়েকজন জাহাজ-বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলাম। ভারতে একটি কাগজের কল স্থাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন সংগঠনিক বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে তেজা একবার আমাকে ফিন্‌ল্যাণ্ডেও ডেকে পাঠান। জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীর জাহাজ-গুলিকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছে ভাড়া খাটানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে তেজার প্রতিনিধিরূপে য়ুরোপ এবং লণ্ডনেও গমন করি। ১৯৫৪ সালে ভারতে ফিবে আসার পর, তেজা তাঁর রামগুন্‌দম্ থারমল প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে আমার বিস্তারিত পরামর্শ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যার (এবং অগ্রাধিকারযোগ্য কার্যের) মূল্যায়ন করে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি তাঁকে দিই :

(ক) বিদেশ থেকে কলকব্জা এবং যন্ত্রাদি প্রেরণ, ভারতে সেগুলি পৌছান, যে বন্দরে সেগুলি খালাস করা হবে সেখান থেকে প্রথমে রেল-স্টেশনে, তারপর প্রকল্প কেন্দ্রগুলিকে চালান দেওয়া সংক্রান্ত তালিকা ;

(খ) কারিগরী এবং কারিগরী নয়, এমন শ্রমশক্তির সমন্বয়-সাধন ;

(গ) গৃহাদি নির্মাণের মালপত্র, বিশেষ করে লোহা, সিমেণ্ট, ইট ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করা ;

(ঘ) কর্মীদের জন্য বাসস্থান এবং মালপত্র সংরক্ষণের জন্য গৃহাদি নির্মাণ (মালপত্রগুলিকে বর্ষা-বাদলের হাত থেকে রক্ষার জন্য) ;

(ঙ) প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের যান-বাহনের তালিকা ;

(চ) গাড়ীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তথা মেরামতীর জন্য উপযুক্ত সংস্থা স্থাপন ;

(ছ) রেলপথের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে মালপত্রগুলিকে দ্রুত প্রকল্প কেন্দ্র অবধি আনার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা গঠন ;

(জ) বিজলী বাতি, সড়ক, পানীয় জল তথা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ;

(ঝ) জনসংযোগ, প্রচার এবং কর্মীবৃন্দের সুখ-সুবিধা দেখাশুনার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

কলকাতায় অনেকগুলি ঢালাই করবার কারখানা পরিদর্শন করে এবং

অন্যান্য স্থানের অনুরূপ বহু কারখানার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করবার পর, হায়দরাবাদে অবস্থিত তেজার রিপাব্লিক্ ফোর্জ কোম্পানীর কিছু কিছু ব্যাপারেও তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। এছাড়া, উক্ত কোম্পানীটি চালু করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইন্ডাসট্রিয়াল্ ফিনান্স করপোরেশন, জীবন-বীমা করপোরেশন ইত্যাদি ভারতের আর্থিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে আনুমানিক এক কোটি টাকার মতো ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারেও তেজা আমার সহায়তা প্রার্থনা করেন। এ ব্যাপারে সংস্থাগুলির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যথাসাধ্য তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।

১৯৫৫ সালের শেষ দিকে স্বেচ্ছায় আমি তেজার চাকুরী থেকে পদত্যাগ করি। পদত্যাগের কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই সময়ে জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীর কাণ্ড-কারখানা সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। আমার কাজ ছিল উক্ত কোম্পানীর চেয়ারম্যান তেজাকে পরামর্শ দেওয়া ; তাও যখন তিনি চাইতেন। তাঁর কোন সংস্থারই পরিচালনার ভার আমার উপর ছিল না। সুতরাং ভাবী ঘটনাবলী অনুমান করাও সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীর ব্যাপার নিয়ে সুখতঙ্কর কমিটি যখন তদন্ত করেন, তখন আমি কেন সেই কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করি নি। আসলে এই কমিটি আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা আদৌ প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। তা' ছাড়া, তদন্তাধীন জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীর পরিচালনা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানও ছিল না।

নেহ্রু, মোরারজী দেশাই, এস কে. পাতিল প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরই তেজা আস্থাভাজন ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য, প্রাদেশিক মুখ্য তথা অন্যান্য মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, সরকারী দফতরের সচিব, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে শেষ অবধিও তেজার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। এঁদের অনেকেই বিদেশে যেয়ে তেজার আতিথ্য গ্রহণ করতেন এবং বিভিন্ন ভাবে তাঁর আতিথেয়তা উপভোগ করতেন।

আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট করে বলবো, তেজার সঙ্গে কাজ করবার সময় অথবা অন্য কোথাও এমন কোন কাজের প্রশ্রয় আমি দিই নি যাকে অবৈধ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এবং একমাত্র বেতন অথবা বৈধ প্রাপ্য ব্যতীত, তেজা কিংবা অন্য কোন

ব্যক্তির কাছ থেকে কখনও কোন অর্থ গ্রহণ করি নি। আর, এটা না বললেও অন্যায় হবে যে, তেজা আমাকে কখনও এমন কোন কাজ করতে বলেন নি যাকে, যে-কোন দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, অনুচিত অথবা অন্যায় বলা যেতে পারে।

আগেই বলেছি, আমার কর্মজীবনে, এবং কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরেও, অনেকেই আমার প্রতি রুষ্ট হয়ে বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার দ্বারা নানা রকম বিতর্কের মধ্যে আমাকে জড়িত করেছেন। সেগুলির সত্যতা নির্ধারণের ভার পাঠক-সাধারণের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

৭

উপসংহার

আগামী দিনের আশায়

লং ফেলো

ভারতের আজ বড় তুর্দিন। তবুও আশা করবো, তমিস্রার অবসানে নবারুণ দেখা দেবে; এবং আপন মাতৃভূমি সম্বন্ধে কিপ্‌লিং যা' বলেছিলেন, তা' প্রযোজ্য হবে আমাদের ক্ষেত্রেও: 'ব্রিটেন যদি বেঁচে থাকে, তবে কারও মৃত্যু নেই' (অথবা ব্রিটেনের যদি মৃত্যু হয়, বেঁচে থেকে কী হবে?)। যতদিন তা' না হয়, ততদিন ফ্রান্সিস্ কোয়ার্লস্-এর ভাষায় নিজেকে কেবল এই পরামর্শই দিতে পারি:

হে জীবন! ধৈর্যহারা হ'য়ো না এখনি;
অভিনয় হয়নি'ক শেষ, এখনি এ নাটকের করো না বিচার;
(ভাগ্যের) এ কাহিনীতে রূপান্তর রয়েছে অনেক;
নিত্য নব দৃশ্য আসে; শেষ দৃশ্য আনে সার্থকতা।

এবং, এখানেই শেষ হ'ল আমার কাহিনী।

———